সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন

২০১১

সেমিনার বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

সেমিনার-প্রবন্ধ সংকলন
[২০১১]

সম্পাদনায়

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া

সেমিনার বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সেমিনার-প্রবন্ধ সংকলন
[২০১১]

প্রকাশনায়
সেমিনার বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, ফ্যাক্স : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com
ই-মেইল : info@bicdhaka.com

প্রকাশকাল
মার্চ, ২০১২

কপিরাইট
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

প্রচ্ছদ
গোলাম মাওলা

মুদ্রণ
আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭

বিনিময়
দুইশত টাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীক্রম

সেমিনার-প্রবন্ধ

ইভটিজিং ঃ কারণ ও প্রতিকার
মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া ॥ ৭

কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলন
ড. মাহফুজ পারভেজ ॥ ৩৯

ব্যবস্থাপনা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ
ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ॥ ৫২

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতবোন রাজ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন
ড. মাহফুজ পারভেজ ॥ ৯৬

মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক গণবিস্ফোরণ : গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ
আজিজুল হক বান্না ॥ ১১০

ফারাক্কা বাঁধ ও আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প
অধ্যাপক আখতার হামিদ খান ॥ ১৫৯

শিক্ষা ও নৈতিকতা
শেখ মুহাম্মাদ শোয়েব নাজির ॥ ১৮৬

দারিদ্র দূরীকরণে ইসলামী কৌশল : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ
ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ॥ ২৪৮

টিপাইমুখ বাঁধ ঃ বাংলাদেশের আরেক মরণ ফাঁদ
ইঞ্জিনিয়ার এস.এম. ফজলে আলী ॥ ২৯৪

www.pathagar.com

ইভটিজিং ঃ কারণ ও প্রতিকার

শহীদুল ইসলাম ভুঁইয়া

০১. ভূমিকা ঃ

সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে একটি সামাজিক সমস্যা প্রবল ভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সমস্যাটি হলো- ইভটিজিং। এটি একটি গুরুতর সামাজিক ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে। ইভটিজিং এর শিকার হয়ে দেশব্যাপী হত্যা-আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটছে।

পুলিশ সদর দপ্তর হতে পাওয়া হিসেব অনুযায়ী, অগাস্ট, ২০১০ পর্যন্ত গত এক বছরে ইভটিজিং এর ঘটনায় সারা দেশে ১৫০টি মামলা হয়েছে। সাধারণ ডায়েরি হয়েছে ৩৭৭ টি। ১,২৬৯ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ হয়েছে। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছেন ৫২০ জনকে। বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা ডেমোক্রেসি ওয়াচের মাসিক প্রতিবেদন মতে, গত অক্টোবর মাসে বাংলাদেশে ইভটিজিং এর শিকার হয়েছেন ২৮ জন, আত্মহত্যা করেছেন ১৪ জন, খুন হয়েছেন ১৫৯ জন, ধর্ষিতা হয়েছেন ৮ জন এবং পড়ালেখা বন্ধ হয়েছে ৯ জনের। প্রতিবাদ করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের- প্রভাষক জনাব মিজানুর রহমান ও শ্রীমতী চাঁপা রাণী।

উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, সামগ্রিক পরিস্থিতির দ্রুত ক্রমাবনতি হচ্ছে। বিষয়টি সমাজ বিজ্ঞানী, অপরাধ বিজ্ঞানী, আইনবিদ, রাজনীতিবিদ ও সুশীল সমাজকে গভীর ভাবে ভাবিয়ে তুলছে।

www.pathagar.com

০২. প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য ঃ

বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের ক্রমবর্ধমান ইভটিজিং সমস্যার প্রকৃত কারণ সমূহ বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য প্রতিকার খুঁজে বের করা এবং জাতির সামনে এ লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা। যাতে করে আমাদের তরুণ তরুণীরা পঙ্কিলতার অতল গহবর থেকে বের হয়ে সুস্থ ও মানবিক জীবন ধারায় ফিরে আসতে পারে।

০৩. প্রবন্ধের বিন্যাস ঃ

প্রবন্ধের শুরুতে ইভটিজিং এর সংজ্ঞা নিয়ে কথা বলা হয়েছে। এরপর যথাক্রমে ইভ টিজার কারা, এ যন্ত্রণার শিকার কারা, ইভটিজিং এর উল্লেখযোগ্য কারণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর ইভটিজিং প্রতিরোধে দেশে বিদ্যমান আইন এবং বিভিন্ন ধর্মে বিধৃত ধর্মীয় অনুশাসন সমূহ সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হয়েছে। পরিশেষে এ অনাচার মুকাবিলায় কিছু সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

০৪. সংজ্ঞা ঃ

ইভ (Eve) শব্দটি পবিত্র বাইবেল এর ‘ইভ’ থেকে এসেছে, যার অর্থ পৃথিবীর আদি মাতা। ইসলাম ধর্মে যাঁকে বলা হয় হাওয়া, হিবরুতে বলে ‘হাব্বাহ’। শব্দটি নারী জাতির রূপক বা প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। টিজিং (Teasing) শব্দের আভিধানিক অর্থ ঠাট্টা করা, বিরক্ত করা, প্রশ্ন করে বিব্রত করা, উত্যক্ত বা জ্বালাতন করা।

ইভটিজিং এর সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ কোন আইনী সংজ্ঞা এখনও নির্ধারণ করা হয় নি। তবে সাধারণ ভাবে সুনির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে অন্য সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ স্বাভাবিক সভ্যতা, ভদ্রতা ও নীতি নৈতিকতা পরিহার করে যখন অশালীন ও আপত্তিকর কোনরূপ অঙ্গ-ভঙ্গি করেন অথবা কোন বাক্য প্রয়োগ করেন তখন সেটিকে ‘ইভটিজিং’ বলা হয়ে থাকে।

সমাজ বিজ্ঞানীগণের মতে, ইভটিজিং শব্দটি বাস্তব নির্মমতার তুলনায় অনেকটাই হালকা এবং এ শব্দের দ্বারা নির্মমতার ব্যাপকতা বোঝা যায় না। নারীর প্রতি টিজিং বা নারীকে বিব্রত করা, উত্যক্ত করার মধ্যেই কেবল ইভ টিজিং শব্দটির গূঢ়ার্থ সীমিত থাকে না। এটি মূলত এক ধরনের ইউফেমিজম (Euphemism)। পুরো উপমহাদেশে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। জনসমাবেশে, রাস্তাঘাটে, বাসে, জনসাধারণের সামনে নারী কেবল উত্যক্তের শিকারই হন না, তাঁরা নিগৃহীত হন, যৌন হয়রানি বা যৌন নিপীড়নের শিকার হন। অর্থাৎ, উত্যক্ত করার আড়ালে থাকে যৌন প্রবৃত্তির মোড়ক। এটিই হলো ইউফেমিজম। বখাটেদের উৎপাতের আড়ালে লুকিয়ে থাকা যৌন উৎপাতের ক্ষত সামাজিক দৃষ্টিতে কিংবা জনসাধারণের চোখে খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। কেবল ভুক্তভোগীই বোঝেন এর অন্তর্নিহিত গোপন যাতনা। স্বাধীনভাবে ও নিরাপদে পথচলার মতো মৌলিক অধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত এ উত্যক্ততা। সুতরাং, ইভ টিজিং এক প্রকার ভয়াবহ যৌন হয়রানি বা যৌন সন্ত্রাস।

www.pathagar.com

হতো, যারা রকে বসে আড্ডা দিতো, মেয়েদের দেখলে শিস দিতো। বর্তমানে সেই রোমিওরাই হয়ে উঠেছে যৌনদস্যু, নারী উৎপীড়ক। এদের লজ্জা-শালীনতা- নৈতিক মূল্যবোধ কোন কিছুরই বালাই নেই।

০৬. ইভটিজিং এর শিকার কারা ঃ

ইভ টিজিংরূপী সহিংসতায় সচরাচার বেশি শিকার হয়ে থাকেন অল্প বয়সী নারীরা। বয়স জনিত নাজুকতার কারণে তারা বেশি উত্যক্তের শিকার হন। অন্যদিকে তাদের উপর এর প্রভাবও পড়ে মারাত্মক। তারা সহজে ঘাবড়ে যান।

শারীরিক আঘাতের চেয়ে ভয়াবহ আঘাত লাগে মনে। বখাটেদের নির্যাতন, ত্রাস সৃষ্টিজনিত মানসিক ক্ষতির কারণে কেউ কেউ আত্মহত্যা পর্যন্ত করে বসেন।

'পিংকী আমার প্রস্তাব শোনেনি। তাই রাস্তার মধ্যেই তাকে থাপ্পড় মারি। এরপরও যখন সে কথা শুনছিল না তখন তাকে গালিগালাজ করি এবং পুনরায় চড় মারি। আমার সাথে থাকা অন্যরা পিংকীর ওড়না ধরে টানাটানি করছিল। এর এক ফাঁকে পিংকী একজনকে ধাক্কা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে পালিয়ে যায়। এরপর কী হয়েছে বলতে পারি না'।

শ্যামলী আইডিয়াল টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণীর ছাত্রী নাসপিয়া আকন পিংকীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনাকারী বখাটে মুরাদ এভাবেই পুলিশের কাছে গত ২৪.০১.২০১০ তারিখে স্বীকারোক্তি প্রদান করে।

তবে নারীরাই যে কেবল বখাটেদের ইভ টিজিং এর শিকার হচ্ছেন এমনটি নয়। ইভটিজিং এর শিকার সব বয়সী নারী পুরুষই হতে পারেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মান্নান গত ৪.১১.২০১০ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক এ তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন এভাবে --

ছায়ানটের পার্শের রাস্তা দিয়ে হেঁটে আমার বৈকালিক ভ্রমণের ধানমন্ডি লেকের দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পিছনে কিছু একটার স্পর্শ অনুভব করি। ফিরে দেখি বিরাট ঢাউস এক কালো রঙের জীপ গাড়ী। চালকের আসনে বছর ১৮ বয়সের এক তরুণ। সাথে সমবয়সী আরও ৪ বন্ধু। প্রথমে শরীরটা হিম হয়ে এলো। আর একটু হলেই তো চাপা দিতো। গাড়ীটাকে হাতের ইশারায় দাঁড় করালাম। চালকের আসনে বসা বালকটি গাড়ীর আয়না নামিয়ে একগাল হেসে বললো, 'আংকেল কিছু মনে করবেন না। একটু মজা করলাম'। বুঝতে বাকি রইল না এটি ড্যাডির গাড়ী। প্রিয়তম 'সান' মজা করার জন্য গাড়ীটি নিয়ে বের হয়েছে। বুঝতে আমার অসুবিধা হয় না এরা হয়তো ধানমন্ডি এলাকার হাজার টাকা দামের কোন কোচিং সেন্টারে পড়ে। আমার বয়স এবং সামাজিক অবস্থান আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। তা না হলে এসব বাচালের শায়েস্তা করার ওষুধ আমার ঠিকই জানা ছিল। বুঝতে তো অসুবিধা হয় না এসব বাচালের ড্যাডী আর মাম্মিদের সময় হয় না তাদের প্রিয়তম 'সান'দের পারিবারিক ভাবে সঠিক শিক্ষা দেয়ার। এরা হচ্ছে এ প্রজম্মের বখে যাওয়া সন্তানদের প্রতিনিধি।

আরও দুটি উদাহরণ ঃ

ক. এবার থানার ওসিকে উত্যক্ত করার অভিযোগে নাসরিন (২৫) নামে এক গৃহ

www.pathagar.com

বধুকে গ্রেফতার করেছে শখিপুর থানা পুলিশ। টাঙ্গাইল জিলার শখিপুর থানার ওসি মোজাম্মেল হক মামুন জানান, শনিবার রাতে তার মোবাইল ফোনে এক মহিলা পর পর ৩৭ বার ফোন করেন। বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও ঐ মহিলা তাঁকে ফোন করতেই থাকে এবং নারী সংক্রান্ত বিষয়ে হুমকি দেয়। ওসি বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, ফোনকারী মহিলা উপজিলার কালিয়ান গ্রামের রায়হান মাস্টারের মেয়ে নাসরিন। রোববার সকালে তাকে পৌর এলাকার বাসা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার কাছে দেশি-বিদেশী ১৬টি মোবাইল ফোনের সিম পাওয়া গেছে। ধৃত গৃহবধু জানায় তার স্বামীর নাম আবদুল হাই। তিনি বিদেশে আছেন। এটা তার তৃতীয় স্বামী। ওসি আরও জানান, ঐ গৃহবধু কয়েকটি হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২২.১১.২০১০)।

খ. ফরিদপুরে মেয়ের হাতে টিজিংয়ের শিকার হয়েছে স্কুল ছাত্র। এ ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সালিস করে বিষয়টি মিমাংসা করার চেষ্টা হলেও টিজিংয়ের শিকার ছেলেটি সামাজিক ভাবে চরম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছে। ছেলেটির অভিযোগ, মেয়েটির পরিবর্তে সে ইভটিজিং করলে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হতো। ২৮ নভেম্বর শহরের পশ্চিম আলিপুরের আম্বিকাপুর সড়কে এ ঘটনা ঘটে। এখন পরিচিত মহলে চরম লজ্জাজনক অবস্থায় পড়েছে ছেলেটি। ওই দিন একটি বিয়ে অনুষ্ঠানে বর-কনের বিদায় দেখছিল পশ্চিম খাবাসপুর নিবাসী ফরিদপুর জিলা স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রটি। এ সময় পাশে এসে অকস্মাৎ তাকে জড়িয়ে জনসমক্ষে চুম্বন করে একই এলাকার সমবয়সী এক মেয়ে। এতে বিব্রত স্কুল ছাত্রটি মেয়ের পরিবারের কাছে অভিযোগ জানায়। এ নিয়ে পরের দিন রাতে সালিসি বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত একই এলাকার বাপ্পি ও মিন্টু ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, বৈঠকে মেয়েটিকে তিরস্কার করে চড়-থাপ্পড় দিয়ে এবং স্কুল ছাত্রটিকে বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়। স্কুলছাত্রটি তার প্রতিক্রিয়ায় জানায়, ঘটনার পর থেকে বন্ধুমহলে তাকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হচ্ছে। সে অভিযুক্ত হলে এর জন্য তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হতো। মেয়েটির মা জানায়, দুষ্টমির ছলে তার মেয়ে ছেলেটিকে চুম্বন করেছে। এ জন্য তাকে শাসিয়ে দেয়া হয়েছে। (দৈনিক নয়া দিগন্ত ৩.১২.২০১০)

০৭. ইভটিজিং এর কারণ ঃ

ইভ টিজিং এর কারণ সুনির্দিষ্ট ভাবে একটি - দুটি নয় । অনেকগুলো মৌলিক বিষয়ই সামষ্টিক ভাবে এ সামাজিক ব্যাধির জন্য দায়ী। তবে মৌলিক কারণগুলো নিম্নরূপঃ

ক. ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব ও উপেক্ষা,

খ. সন্তানের প্রতি মাতা-পিতা ও অভিভাবকগণের চরম উদাসীনতা,

গ. গৃহ ও বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষার ঘাটতি,

www.pathagar.com

ঘ. শিক্ষা ব্যবস্থায় ও পাঠ্যক্রমে নৈতিক শিক্ষার অভাব,

ঙ. মানুষের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও মানবতাবোধের অভাব,

চ. আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন,

ছ. প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া সমূহের দায়িত্বহীন ভূমিকা,

জ. চলচ্চিত্রসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অশ্লীলতা,

ঝ. সাইবার ক্যাফে সমূহের উপর রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণহীনতা,

ঞ. মোবাইল কোম্পানী সমূহের দায়িত্বহীন ভূমিকা,

ট. কর্মমুখী শিক্ষার অপ্রতুলতা,

ঠ. আইনের অপ্রতুলতা এবং আইনের প্রায়োগিক ব্যর্থতা,

ড. আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নেতিবাচক ভূমিকা,

ঢ. অপরাধীদের প্রতি রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা,

ণ. মাদক দ্রব্যের সহজলভ্যতা,

ত. বেকারত্ব।

৮.১. অপরাধের কারণ হিসেবে মাতা-পিতা ঃ

নিম্নোক্ত প্রকার মাতাপিতার সন্তানগণ অপরাধী হয়ে থাকে ঃ

ক. সংসারত্যাগী বা পলাতক মাতাপিতা ঃ এরা সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না করে পলাতক হয়েছেন। সন্তান এদের অপত্য স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

খ. অপরাধী মাতাপিতা ঃ এরা সন্তানকে পাপের মধ্যে রেখে বড় করেন। কখনওবা সন্তানের সহায়তায় পাপ করেন।

গ. অপকর্মে সহায়ক মাতাপিতা ঃ এরা সন্তানের অপরাধস্পৃহায় উৎসাহ দেন।

ঘ. অসচ্চরিত্র মাতাপিতা ঃ তারা নির্বিচারে সন্তানের সামনেই নানা অসামাজিক কাজ করেন ও কথা বলেন।

ঙ. অযোগ্য মাতাপিতা ঃ এরা সন্তানকে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দানে অমনোযোগী বা অপারগ।

আধুনিককালে শহরগুলোতে দেখা যায় যে, মা-বাবা উভয়ে ঘরের বাইরে কাজ করছেন। ফলে সন্তান-সন্ততি তাদের উপযুক্ত স্নেহ-শাসন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তারা আচরণে বিদ্রোহধর্মী হয়ে যাচ্ছে। এমনটিও দেখা যায় যে, মৃত্যু বা বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে কোন কোন সন্তান মা অথবা বাবাকে হারাচ্ছে। এ কারণেও তাদের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে সমস্যা দেখা দেয় এবং তারা অসংলগ্ন আচরণ তথা সমাজবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হয়। অধিকন্তু পারিবারিক পরিমন্ডলে সন্তানেরা যদি সর্বদা

www.pathagar.com

ঝগড়া বিবাদ, ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং অপরাধমূলক ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে তাহলে তাদের পক্ষে সহসা অপরাধী হয়ে উঠা অসম্ভব নয়।

৮.২ সুস্থ বিনোদন সঙ্কট ঃ

তরুণদের জন্য উপযুক্ত চিত্তবিনোদনমূলক ব্যবস্থা নেহায়েত অপ্রতুল। এজন্য খেলাধূলা, শরীর চর্চা এবং নানাবিধ সুস্থ বিনোদনধর্মী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এ সবের অভাবে তরুণকে যত্রতত্র রাস্তা-ঘাটে ঘুরতে ফিরতে এবং ছুটাছুটি করতে দেখা যায়। এ ধরনের বিশৃংখল ঘোরাফেরা তরুণ মনে সাময়িক আনন্দ দিলেও প্রকৃত পক্ষে তা একটি আদর্শ ও সুশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। তাদের জন্য উপযুক্ত সৎ সাহিত্য, চলচ্চিত্র ও বিনোদন কেন্দ্রেরও চরম সংকট রয়েছে আমাদের। আর এ কারণেও তরুণরা অসৎ সঙ্গে মেশে এবং একটি অনিয়মতান্ত্রিক পন্থার মধ্যে সময় কাটানোর কারণে তাদের চরিত্রে অনিয়ম এবং অসংলগ্নতার সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে তারা হয়ে উঠে অপরাধ প্রবণ।

৮.৩ ইন্টারনেট এর অপব্যবহার ঃ

মোবাইল ফোনের ইন্টারনেট সহ বর্তমান বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় এক কোটি। কিন্তু তাদের জন্য তেমন কোন নীতিমালা বা ব্যবহারের ওপর কোন বিধিনিষেধ (Filtering) নির্ধারণ করা হয়নি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বিভিন্ন দেশে সাইবার ক্যাফে ব্যবসা পরিচালনার জন্য সাইবার লঞ্চ ও নীতিমালা থাকলেও বাংলাদেশে এখনও তা প্রণীত হয়নি।

ফলে নিয়ম নীতিহীনভাবে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা সাইবার ক্যাফেগুলোতে ইন্টারনেট ব্যবহারের নামে চলছে রীতিমত পর্ণোগ্রাফির প্রদর্শনী। সার্ভিস চার্জ কম হওয়ায় এবং অন্যান্য অসৎ সুবিধা থাকায় উঠতি বয়সীরা এখন সাইবার ক্যাফের প্রধান গ্রাহক। অবাধ তথ্য প্রযুক্তির নামে অশ্লীল ওয়েবসাইটগুলো হয়ে উঠছে তাদের বিনোদনের প্রধান মাধ্যম। শিক্ষার্থীরা নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নানা অজুহাতে বেরিয়ে এসে সাইবার ক্যাফেতে ঢুকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পর্ণো ওয়েবসাইট ব্রাউজিং করছে। এখানে এক ভিন্ন নেশায় মত্ত হয়ে তারা ঘন্টার পর ঘন্টা এমনকি কেউ কেউ পুরোদিনই চ্যাটিংয়ে ব্যস্ত থাকছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রতি সপ্তাহে সর্বোচ্চ ২০ ঘন্টা ইন্টারনেট ব্যবহার করে। বন্ধুদের সাথে কথাবার্তা, ছবি আদান-প্রদান ছাড়াও অপরিচিতদের সাথেও এরা দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করে। এর ফলে পড়াশুনার প্রতি তাদের অমনোযোগিতা সৃষ্টিই শুধু নয়, ইভ টিজিং এবং বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়াসহ নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটছে।

৬৯ শতাংশ ছেলেমেয়ে স্বীকার করে যে, তাদের সঙ্গে ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ে মা-বাবার সর্বক্ষণ ঝগড়া লেগেই থাকে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি পারিবারিক সম্পর্কেরও অবনতি ঘটছে। এদের মধ্যে ৩৫ শতাংশ সারাক্ষণ ইন্টারনেটে বসে কী করে তা তাদের মা-বাবা এমনকি বন্ধুদেরকেও সচরাচর বলে না। (দৈনিক প্রথম আলো, ২৬.১১.২০১০)

www.pathagar.com

ফেসবুক ঃ

বেশি সময় ধরে ইন্টারনেট ব্যবহারের অন্যতম কারণ হলো -- সামাজিক যোগাযোগের জনপ্রিয় ওয়েবসাইট 'ফেসবুক' এ আসক্তি। ফেসবুক মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক গড়তে সাহায্য করছে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, দাম্পত্য সম্পর্ক ভাঙতেও এটি বড় ভূমিকা রাখছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পাঁচটি ডিভোর্সের অন্তত একটির পেছনে ফেসবুক ভূমিকা রাখছে বলে একটি জরিপে ধরা পড়েছে। ফেসবুকের মাধ্যমে স্বামী কিংবা স্ত্রী পরস্পরের অজান্তে এমন সব নারী কিংবা পুরুষের সঙ্গে একান্ত সম্পর্ক গড়ে তুলছেন যাকে 'অবিশ্বস্ততা' বলা যায়। এ অবিশ্বস্ততার ক্রমবর্ধমান বলি হচ্ছে তরুণ সমাজ।

আমেরিকান একাডেমি অব ম্যাট্রিমনিয়াল ল'ইয়ার্স দেশটিতে সংঘটিত ডিভোর্সের ওপর একটি গবেষণা জরিপ পরিচালনা করেছে। দেখা গেছে, ফেসবুক ব্যবহার করে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে প্রতারণা করার হার দিন দিন বাড়ছে। পরস্পরের অজান্তে ফেসবুকে খুঁজে পাওয়া কারও সাথে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলছেন। বিস্ময়কর হলেও সত্য, মার্কিন আদালতে ডিভোর্স আবেদনে বাদীর পক্ষের শতকরা ৬৬ জন আইনজীবী অনৈতিক সম্পর্কের প্রমাণ হিসেবে ফেসবুক থেকে নেয়া তথ্য ব্যবহার করছেন। এর সাথে আছে সামাজিক যোগাযোগের অন্য ওয়েবসাইট - 'মাইস্পেস'।

এ জরিপে আরও বলা হয়েছে ব্রিটেনেও প্রতি একশর মধ্যে ২০টি ডিভোর্সের ঘটনায় ভূমিকা রাখছে ফেসবুক। (দৈনিক ইত্তেফাক ২.১২.২০১০)

গবেষণায় দেখা যায়, অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে এসবের প্রভাব আমাদের দেশেও পড়ছে। বাংলাদেশে প্রায় ১২ শতাংশ ছেলেমেয়ে ফেসবুকে প্রতিনিয়ত যৌন উত্তেজনাকর তথ্য আদান-প্রদান অথবা আলাপচারিতা করে। ফেসবুকে পরিচয়ের মাধ্যমে তারা একাধিকবার যৌন কাজে লিপ্ত হয়েছে এবং অল্প বয়সে অনিয়ন্ত্রিত গর্ভধারণ ও গর্ভপাত করাতেও বাধ্য হয়েছে। (দৈনিক প্রথম আলো, ২৬.১১.২০১০)

৮.৪ মোবাইল কোম্পানীসমূহের ভূমিকা ঃ

১৩ থেকে ২৩ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীর ওপর চালানো এক বেসরকারী জরিপ রিপোর্ট গত ৮.৭.২০০৯ তারিখে দৈনিক নয়া দিগন্তে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে বিধৃত মোবাইল সম্পর্কিত ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে -------

জরিপের ১০০ শতাংশ শিক্ষার্থীরই মোবাইল আছে অন্তত একটি। ৪০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী দুটি করে সেট ব্যবহার করে। ৮০ শতাংশ দুই থেকে তিন বা এর অধিক সিমও ব্যবহার করে থাকে। ৫০ শতাংশ দৈনিক চার থেকে পাঁচ বা তার চেয়ে বেশি ঘন্টা সময় পার্টনারের সাথে কথা বলে। ৮০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী এতে কমপক্ষে দুই ঘন্টা ব্যয় করে। ৪০ শতাংশেরও বেশি ছাত্রছাত্রী মোবাইলের মাধ্যমে অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে ১৫ থেকে ১৬ বছর বয়সীও আছে। ৬০ শতাংশেরও বেশি ছাত্রছাত্রী মোবাইলে বিকৃত সেক্স করে থাকে।

এ দেশের অনেক মোবাইলই প্রবাসীদের পাঠানো। শেকড়ের টানে মালয়েশিয়ার রাবার

www.pathagar.com

বাগানে কর্মরত বা সুউচ্চ টাওয়ারে ঝুলন্ত বা মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমির লু তপ্ত কোন শ্রমিকের রক্তপানি করা টাকায় পাঠানো মোবাইল নিয়ে তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাইবোন কী করে, তা তারা জানতে পারেন না। দেশের তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে খেলায় মেতেছে মোবাইল কোম্পানীগুলো। ডিজুইস জেনারেশনের নামে নতুন এক প্রজাতির জন্ম দিয়েছে তারা। এতে বাড়তি সংযোজন এফ এম রেডিও। এগুলো ইভটিজিং এর মতো অপরাধে অবিরাম ইন্ধন যুগিয়ে চলছে।

৮.৫ শিল্পায়ন ও নগরায়ন ঃ

শিল্পায়নের ফলে নগরায়ন ত্বরান্বিত হয় এবং শিল্প নির্ভর নগর জীবনে কতিপয় সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এগুলোর মধ্যে আবাসিক সমস্যা অন্যতম। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং গোটা শহর জনাকীর্ণ হয়ে পড়ে। চরম আবাসিক সংকটের কারণে জনাকীর্ণ এলাকার কিশোরদের চলাফেরা, গল্পগুজব এবং নানা ধরনের মেলামেশা বৃদ্ধি পায়। একদিকে দারিদ্র অন্যদিকে অবাধ ও সারাক্ষণ দলবদ্ধ জীবনযাপন করতে গিয়ে অনেক সময় কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা জাগে। তাদের এই অপরাধ প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে দুঃসাহসিক অভিযান ও কাজকর্মকে কেন্দ্র করে। এ অবস্থায় তারা কখনও একাকী আবার কখনও বা ছোট ছোট দল বেঁধে নানা ধরনের অপরাধ কর্মে লিপ্ত হয়।

বাংলাদেশের শহর এলাকার মধ্যে রাজধানী ঢাকা শহরের চিত্র ভয়ঙ্কর। বস্তি আর রাস্তায় বেড়ে উঠা কিশোর-তরুণেরা সবকিছু এখানেই রপ্ত করে। এরা চলতে শিখলেই ছোট ছোট চুরি করে। একটু সাহস হলেই স্ট্রিটলাইট, ম্যানহোল, ইট, রড়ের টুকরো চুরি করে। পরবর্তীতে পরিবেশ-পরিস্থিতি এদেরকে ক্রমশ মাদকদ্রব্যের দিকে টেনে নেয়।

কখনও এরা পরিণত হয় রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাস-বাহিনী- যা হয়ে উঠে হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ তথা কোন দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের হাতিয়ার। এদের ব্যবহার করা হয় অস্ত্র বহনের কাজে। এমনকি মাঝে মধ্যে ওদের ব্যবহার করা হয় মানুষ মারার মতো ঘৃণ্য ও ভয়াবহ কাজে।

দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীদের সহযোগী হিসেবেও এরা কাজ করে থাকে। অপরদিকে ছিন্নমূল তরুণীরা নেমে পড়ে ভাসমান পতিতাবৃত্তিতে। কিন্তু এ-তো গেল দরিদ্রদের কথা।

ধনীর দুলালেরা নষ্ট হচ্ছে ঘুষখোর, উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপ, জুয়াড়ি, মাতা-পিতার অযত্ন, অবহেলা, উদাসীনতা, স্নেহহীনতা, বিত্তবৈভবের প্রাচুর্যের কারণে। তাছাড়া ড্রাগ, ভিসিআর, ডিশ এন্টেনার অনুপ্রবেশ, ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাও ঠেলে দিচ্ছে নগরের বিত্তবানদের সন্তানদেরকে অপরাধকর্মে।

৮.৬. অন্যান্য কারণ ঃ

সামাজিক অসাম্য, দুঃখ-দুর্দশা, তদারকীর ঘাটতি, অবিচার, আশৈশব দুর্ব্যবহার প্রাপ্তি, কু-সংস্কার ও কুসঙ্গ, প্রাকযৌন অস্থিরতা, প্রাক্-যৌন অভিজ্ঞতা, অসময়ে পিউবারটি (Puberty), অপছন্দকর কর্মস্থান, অতি আদর বা অনাদর, আর্থিক অসচ্ছলতা বা

www.pathagar.com

আর্থিক প্রাচুর্য, অনিদ্রা, পরাশ্রয়, বিমাতা বা দূর আত্মীয়ের গলগ্রহ হওয়া, মাতা বা পিতার মালিকের গৃহে বসবাস, মালিক - তনয় দ্বারা নিগ্রহ ও অবজ্ঞা, অপুষ্টি, ভেজাল আহার, শিক্ষালয়ে সতীর্থদের উপেক্ষা ও উপহাস, দ্বন্দ্বরত মন ও বিবিধ প্রদমিত মনোজট (complex) দেহ ও মনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

এগুলো তরুণদের উন্মাদ, নির্বোধ ও ইভ টিজিংসহ নানা অপরাধে অপরাধী করে তোলে যা জীবন প্রভাতে তাদের চরিত্রবান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার পথে প্রবল প্রতিবন্ধক।

৯. ইভটিজিং প্রতিরোধে করণীয় ঃ

আগেই বলা হয়েছে যে, মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর অধ্যায় হলো তারুণ্য। এটি এমন এক সময় যখন একজন ব্যক্তি বয়স ও বুদ্ধি- এ উভয় দিক থেকে ক্রমশ এগিয়ে যেতে থাকে বটে, তবে যথার্থ অর্থে বয়সী তথা প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান হয়ে উঠে না। প্রাকৃতিকভাবে জীবনের এ সন্ধিক্ষণটি হয় স্বাপ্নিক ও কৌতুহলোদ্দীপক। এ সময়ে সে জানতে চায়, জানাতে চায়। জানতে ও জানাতে গিয়ে যদি বাধাগ্রস্ত হয় বা হোঁচট খায় তাহলে সে মূক ও বিমূঢ় হয়ে পড়ে, বিভ্রান্তি তাকে অপরাধী করে তোলে, নিয়ে যায় সর্বনাশার অতল গহবরে।

অন্যদিকে যদি সে অবলীলায় জানতে পারে, জানাতে পারে, উত্তর পায়, মানসিক আশ্রয় ও অবলম্বন পায়, নৈতিক দীক্ষা ও প্রেরণা পায় তাহলে তার অগ্রগতি-অগ্রযাত্রাও হয়ে উঠে অনিবার্যভাবে সুন্দর, শাশ্বত ও সাবলীল।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোন মানুষই অপরাধী হয়ে জন্মায় না। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নানাবিধ কারণে আবেগ ও পরিবেশের নেতিবাচক প্রভাবে মানুষ অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে।

সুতরাং ইভ-টিজাররা পেশাদার অপরাধীদের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত হচ্ছে তা অনুসন্ধানপূর্বক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। এজন্য সবার আগে দরকার গ্রাম কিংবা শহর, পাড়া কিংবা মহল্লায় সর্বত্র ভাল পরিবেশ বজায় রাখতে শিক্ষিত সজ্জন ও অভিভাবক শ্রেণীর সম্মিলিত প্রয়াস। অধ্যয়ন, সৃজনশীলতা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করাও জরুরী। পরিবার, সমাজ ও স্কুলের পরিবেশ হওয়া দরকার আনন্দময় ও প্রণোদনাপূর্ণ।

৯.১. পরিবারের দায়িত্ব ঃ

কিশোর-তরুণদের কাদামাটির সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। শিল্পী কাদামাটিকে যেভাবে রূপ দিতে চান, সে রূপেই গড়ে তুলতে পারেন। বস্তুত, তারা কাদামাটির মতোই কোমল। পরিবার ও সমাজ-জীবনের পরিপার্শ্বের মধ্যে তারা বেড়ে ওঠে। সভ্যতার প্রথম সোপানই হলো পরিবার সংগঠন।

দয়া, মায়া, প্রেম, ভালবাসা অপরের প্রতি সৌজন্যবোধ, মানবতাবোধ সহনশীলতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তিগুলোর বিকাশের উপযুক্ত শিক্ষালয় হচ্ছে পরিবার। পরিবারকে বলা যায়, মানব জীবনের প্রধান বুনিয়াদ।

www.pathagar.com

তাই সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব বিকাশে এবং অপরাধ প্রতিরোধে একটি সুসংহত পরিবার এবং পারিবারিক দায়িত্ব অপরিসীম। অস্বীকার করার জো নেই যে, নৈতিক শিক্ষার ভিত এখানেই রচিত হয় যা আজীবন টেকসই হতে পারে। টিনএজ বা তারুণ্যের ইভ টিজিং প্রতিরোধ করার জন্য এভাবে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের বীজ রোপণ করে দিতে হবে। ইতিবাচক বীজই টিনএজ বা তারুণ্যের ইনিস্টিটিউচুয়াল ড্রাইভ বা জৈবিক প্রবৃত্তির উম্মাতাল ঢেউগুলো সামাল দেওয়ার শক্তি যোগাবে, অশুভকে না বলতে পারবে, স্খলনের পথ থেকে সরিয়ে আনতে পথ দেখাবে।

এ প্রসঙ্গে নিম্নে কয়েকটি দিকের ওপর আলোকপাত করা হল ঃ

ক. নিয়ন্ত্রণ ঃ কিশোর-তরুণদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা তাদের কার্যকলাপ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিবদ্ধ রাখে এবং 'সীমার বাইরের কাজ করলে তা অন্যায়ের পর্যায়ে পড়বে' - এ বোধ তৈরি হয়।

খ. বোধজ্ঞান ঃ তাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক মানের সৃষ্টি করতে হবে। স্বাভাবিক উচিত-অনুচিত, বড়কে সম্মান-ছোটকে স্নেহ, ভাল-মন্দের সাধারণ প্রভেদ ইত্যাদি তাকে বুঝতে দিতে হবে।

গ. সাহায্য ঃ মাতাপিতাকে প্রত্যেক সন্তানের আস্থাভাজন হতে হবে। তারা যাতে নিজের ও অন্যের উপকার করবার মানসিকতা অর্জন করতে পারে তার জন্য তাকে সাহায্য করতে হবে।

ঘ. বিশ্বাস ঃ কাকে বিশ্বাস করা উচিত এবং কাকে বিশ্বাস করা অনুচিত এসব সম্বন্ধে তাকে অবহিত করা প্রয়োজন।

ঙ. স্বাধীনতা ঃ একটি নিদিষ্ট গন্ডির মধ্যে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন এবং অপরিহার্য না হলে তাদের কোন কাজের প্রতিবন্ধক হওয়া অনুচিত।

চ. ভালবাসা ঃ তরুণরা যেন অনুভব করে যে, তাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতার অসীম ভালবাসা ও গভীর দরদ রয়েছে এবং এ ভালোবাসায় আছে তাদের প্রতি তাঁদের মাতাপিতার 'সমতা-নীতি'।

ছ. রক্ষা কার্য ঃ সন্তান যেন বিশ্বাস করে যে, মাতা-পিতা তাদের বিপদের বান্ধব, সর্বোপরি সবসময়ের অকৃত্রিম রক্ষাকবচ ।

জ. নিরাপত্তা ঃ কিশোররা যেন উপলব্ধি করে যে, তাদের ঘর তাদের জন্য সর্বোত্তম আশ্রয় ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান।

ঝ. সংযম ঃ ব্যবহার, কাজকর্মসহ বিভিন্ন বিষয়ে কতটা পর্যন্ত এগুলো উচিত, কী পরিমাণে একটি কাজ করা উচিত, কখন ও কেন একটি কাজ পরিহার করা উচিত - ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাথমিক পরিমিতিবোধ ও তৎসম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞান তাকে দিতে হবে।

ঞ. কিশোর তরুণদেরকে সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় বোঝাতে হবে। কথা অপেক্ষা ঘটনা ও দৃষ্টান্ত তাদেরকে প্রভাবিত করে বেশি। তারা অনুকরণ প্রিয়। সুতরাং,

www.pathagar.com

মাতাপিতাকে তাদের সামনে মিথ্যাচার, ভন্ডামী বা নৈতিকতা বর্জিত আচরণ হতে বিরত থেকে নিজেদেরকে অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করতে হবে। মাতাপিতা হবেন সন্তানের কাছে একজন সৎ ও সুন্দর মানুষের প্রোজ্জ্বল প্রতিভূ।

৯.২. শিক্ষালয়ের ভূমিকা ঃ

কিশোর- কিশোরীরা দিবসের একটি উল্লেখযোগ্য সময় ধরে বিদ্যালয়ে অবস্থান করে। বিদ্যালয়ের রীতিনীতি, আচার-শৃঙ্খলা, শিক্ষক- শিক্ষিকাদের ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গি, সিলেবাস -কারিকুলাম ইত্যাদি কিশোর-কিশোরীদের মানস গঠনে গভীর প্রভাব ফেলে। একটি বিদ্যালয়ের রীতিনীতি -আচার শৃঙ্খলায় যদি সভ্যতা, ভব্যতা, নিয়মানুবর্তিতা, সমতা ইত্যাদিসহ নানামুখী সুস্থ সংস্কৃতির নিয়ত চর্চা ও প্রাত্যহিক অনুশীলন ঘটে তাহলে কিশোর-কিশোরীরা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হতে বাধ্য। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের চরিত্র -মাধুর্য, চিন্তা-চেতনা, আচার-ব্যবহার, রুচি-লেহাজ, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি দ্বারা কোমলমতি শিক্ষার্থীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। সুতরাং শিক্ষক যদি চরিত্রবান না হন, সুন্দর স্বভাবের অধিকারী না হন, সমতা ও সমদর্শিতার গুণে গুণান্বিত হয়ে না উঠেন, সর্বোপরি শিক্ষার্থীর মনোরাজ্যে একটি নির্মল আসন প্রতিষ্ঠা করতে না পারেন তাহলে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর কাছ থেকে নিছক পাঠ্য পুস্তকের বাইরে জীবন গঠনের কোন দীক্ষা লাভ করতে পারবে না। শিক্ষক হলেন একটি বিদ্যাপীঠের প্রাণ, শিক্ষার্থীরা হলো স্পন্দন, আর অভিভাবকগণ হলেন হৃদপিন্ড।

সুতরাং, সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং আদর্শ ও চরিত্রবান শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন। পাশাপাশি স্কুল/মাদ্রাসার সিলেবাস-কারিকুলামকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব তরুণের মাঝে একগুচ্ছ অভিন্ন নৈতিক মূল্যবান মূল্যবোধ তৈরিতে সহায়ক হয়, হয় জীবনমুখী।

স্কুল কলেজে জীবন কেন্দ্রিক শিক্ষা ইভটিজিং বন্ধের একটি সফল উদ্যোগ হতে পারে। এক সময় শিশু শিক্ষায় যে নীতিকথা শেখানো হতো তা সারা জীবনের পাথেয় হতো। যেমন আদর্শলিপি ও বাল্যশিক্ষায় ছিল 'লম্ফ দিয়া চলিও না', 'সদা সত্য কথা বলিবে', 'মিথ্যা বলা মহা পাপ।' শিক্ষক সপ্তাহে একদিন অন্তত নীতিকথা শেখাতেন। এখন সেই শিক্ষা নেই বললেই চলে। সময় এসেছে, আবার সেদিকেই ফিরতে হবে আমাদেরকে।

অন্যদিকে কর্মমুখী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে ইভ টিজিং প্রতিরোধ করা যায়। সাধারণত লেখাপড়ায় অনগ্রসর শিক্ষার্থীরা অপকর্মের সাথে বেশি জড়িত হয়। 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা' - এ অমোঘ সত্যকে উপলব্ধি করে অনগ্রসরদের বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুললে তাদের বাজে কাজে সময় দেবার মানসিকতা থাকবে না। শিক্ষার্থী জীবন কেন্দ্রিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও কারিগরি শিক্ষা পেলে মানব সম্পদে পরিণত হবে। তার একাডেমিক শিক্ষা কম হলেও সে আত্মকর্মসংস্থান খুঁজে পাবে এবং বেকারত্ব ঘুচাতে পারবে।

www.pathagar.com

৯.৩ মাদক মুক্ত সমাজ ঃ

মাদকাসক্তির সঙ্গে বখাটেপনার রয়েছে গভীর সম্পর্ক। দেখা গেছে, মাদকাসক্তরাই চুরি, ছিনতাই, ইভ টিজিং ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। সম্প্রতি ইউএনডিপি-র অর্থায়নে পরিচালিত এক জরিপে সারাদেশে ৬,৭৯,৭২৮ জন ছিন্নমুল মানুষের হিসাব পাওয়া গেছে যাদের বয়স ২০ এর নিচে। এদের মাঝে লক্ষাধিক মাদকাসক্ত (দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৮.১২.২০০৯)। তাই মাদকের হাত থেকে আমাদের কিশোর ও যুব সমাজকে বাঁচানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অভিভাবকদের নিজ সন্তানের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সরকারকে মাদকের বিস্তার রোধে অনেক বেশি কঠোর হতে হবে।

৯. ৪ সুস্থ সাংস্কৃতিক ধারা ঃ

অসুস্থ সাংস্কৃতিক ধারা থেকে রক্ষা করতে হবে তরুণ সমাজকে। এর মূল দায়িত্ব নিতে হবে সাংস্কৃতিক কর্মীদের। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে, শিল্পকলা আর অশ্লীলতা এক নয়। মানুষের জীবনের গোপন বিষয়গুলোকে উম্মুক্ত করে দিলে সমাজ বেহায়াপনার দিকে ধাবিত হতে বাধ্য।

আমাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন নির্মাতাদের উন্নত রুচিবোধের পরিচয় দিতে হবে। তাঁরা যেভাবে বিজ্ঞাপনে নারীদের মেলে ধরেন তা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। প্রায়শ তা উদ্ভট ও রুচিহীন। স্বল্পবসনা নারীদের উদ্দাম নৃত্য অথবা বিস্কুট কিংবা চকলেটের প্রস্তাব দিয়ে প্রেম নিবেদনে সফল হওয়া অথবা ষোড়শীর শিশুসুলভ পোশাক আর লাফ-ঝাঁপ অথবা অকারণ দৈহিক অবয়ব প্রদর্শন ইত্যাদি সমাজকে কলুষিত করবেই। ছোট পোশাকই যদি সভ্যতার পরিচায়ক হয় তাহলে বলতে হবে আদিম যুগের লোকেরাই বেশি সভ্য ছিলেন। আমাদের নির্মাতা ও মডেলগণ তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হলে সমাজ উপকৃত হবে নিঃসন্দেহে।

আমাদের প্রিন্ট মিডিয়া ইভ টিজিং প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এমন কিছু পত্রিকা রয়েছে যেগুলোতে প্রতিদিনই অন্তত একটি অশ্লীল ছবি ছাপা হয়। মার্জিত ছবি ছাপানোর মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধে ভূমিকা রাখা সম্ভব।

৯. ৫ রাজনৈতিক স্থিরতা ঃ

রাজনীতি দেশের প্রতিটি অঙ্গ, স্তর ও প্রতিষ্ঠানে প্রভাব ফেলে। রাজনীতিতে যদি বিরামহীন অস্থিরতা, প্রতিহিংসা, বিষোদ্গার, হানাহানি ইত্যাদি বিরাজ করে তখন মন্দলোকগুলোর মন্দ কাজের বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। আমাদের রাজনীতিবিদদের আন্তরিক প্রচেষ্টায়ই কেবল সমাজ থেকে অস্থিরতা দূর হতে পারে। একটি শুদ্ধ ও সুসংহত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি অপরাধ মুক্ত সমাজের জন্য অপরিহার্য - যা ইভ টিজিং প্রতিরোধেও কার্যকর হতে পারে। পাশাপাশি অপরাধীরা যাতে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা না পায় সেদিকেও রাজনীতিবিদগণের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

১০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর অনুপম নির্দেশনা ঃ

প্রসংগত বাংলাদেশ সংবিধানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধানে

www.pathagar.com

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার সহ তাঁদের দেহ-জীবন-সম্পদ ইত্যাদির সুনাম ও মর্যাদা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করার কথাও বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে (এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে)।

অনুচ্ছেদ-২৮ (৪) ঃ নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান - প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

১১. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঃ

২০০৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে। এ নীতির প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নারীদের অধিকার ও সম্মান নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত মিলেনিয়াম সামিটে অংশগ্রহণকারী সিডও অপশনাল প্রোটোকলে স্বাক্ষরকারী দশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এ নীতিমালার লক্ষ্য হিসেবে 'নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ' ও 'নারীর প্রতি সকল নির্যাতন দূরীকরণ' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

অনুচ্ছেদ-৩.৩ ঃ "নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা।"

অনুচ্ছেদ-৫.১ ঃ "পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, যৌতুক ও নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করা। "

অনুচ্ছেদ-৫.২ ঃ "নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন এবং নতুন আইন প্রণয়ন করা ।"

www.pathagar.com

১২. ইভ টিজিং প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন ঃ

ইভ-টিজিং নামক অপরাধটি প্রতিরোধে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো উল্লেখ করা প্রয়োজন। এতদ্‌সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ বিষয়ে বর্ণনা, নির্দেশনা, শাস্তি ও সংশোধন-ব্যবস্থাপনার কথা বিধৃত হয়েছে।

১২.১. নারীর প্রতি যৌন নিপীড়ন বিরোধী হাইকোর্টের দিক-নির্দেশনা ঃ

একজন পুরুষ যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে পথে চলতে পারে, নারী যদি তার পথচলায় সেই আত্মবিশ্বাস না পায়, তাহলে সামাজিক অর্জনগুলো মুখ থুবড়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। আমাদের সমাজে যত দিন দুর্বৃত্তরা নারীকে লাঞ্ছিত করে, তার জীবন ধ্বংস করে পার পেয়ে যেতে পারে, তত দিন নারীর জন্য সামাজিক পরিসর নিরাপদ হবে না। যারা বখাটেদের অত্যাচারের শিকার, তাদের সুরক্ষা ও সহায়তা দেওয়া এবং অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া সমাজ ও রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব।

গত ১৪ মে, ২০০৯ তারিখে বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ মাহমুদ হোসেন বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী সমন্বয়ে গঠিত হাই কোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ নারীর প্রতি যৌন নিপীড়ন বিরোধী একটি দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। যৌন নিপীড়ন সম্পর্কে যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো আইন প্রণয়ন হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এ দিক-নির্দেশনা বাংলাদেশ সংবিধান এর অনুচ্ছেদ ১১১ অনুসারে আইন হিসেবে সকল সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যথারীতি বলবৎ ও কার্যকর হবে।

১. প্রসার ঃ

এই নির্দেশনা বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে সকল সরকারী এবং বেসরকারী কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য কার্যকর হবে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ক. যৌন নির্যাতন সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা;

খ. যৌন নির্যাতনের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা;

গ. 'যৌন নির্যাতন শাস্তিযোগ্য অপরাধ'-এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৩. নিয়োগদাতার কর্তব্য ঃ যেহেতু রাষ্ট্রীয় সংবিধান এবং আইন মেনে চলা সকল নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য এবং যেহেতু প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের একাধিক অনুচ্ছেদে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে বলা হয়েছে এবং যেহেতু সকল ধরণের জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে রাষ্ট্র দৃঢ় প্রত্যয় এবং যেহেতু সংবিধানে রাষ্ট্র এবং গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার এবং সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী বলা হয়েছে সেহেতু যৌন নির্যাতন ও যৌন নিপীড়নমূলক অপরাধের ঘটনাকে প্রতিরোধ এবং নিবৃত্ত করার জন্য একটি কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করা এবং প্রচলিত আইন ও সম্ভাব্য প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপের মাধ্যমে যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের উদ্দেশ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের উপর বর্তায়।

www.pathagar.com

৪. সংজ্ঞা ঃ

i) যৌন হয়রানি বলতে বোঝায় ঃ

ক. অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে) যেমন ঃ শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের প্রচেষ্টা।

খ. প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারও সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা।

গ. যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি।

ঘ. যৌন সুযোগলাভের জন্য অবৈধ আবেদন।

ঙ. পর্ণোগ্রাফি দেখানো।

চ. যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গি।

ছ. অশালীন ভঙ্গি, যৌন নির্যাতনমূলক ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্যক্ত করা, কাউকে অনুসরণ করা বা পেছন পেছন যাওয়া, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা।

জ. চিঠি, টেলিফোন, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরি, শ্রেণীকক্ষ, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কোনো কিছু লেখা।

ঞ. ব্ল্যাকমেইল অথবা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থির বা চলমান চিত্র ধারণ করা।

ট. যৌন নিপীড়ন বা হয়রানির কারণে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হওয়া।

ঠ. প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেওয়া বা চাপ প্রয়োগ করা।

ড. ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা করা।

ক-ড ধারায় উল্লিখিত আচরণসমূহ অপমানজনক এবং কর্মস্থলে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার প্রতি হুমকী হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ আচরণসমূহ বৈষম্যমূলক হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তার এই প্রতিবাদের কারণে কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষাগত উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা বা বৈরী পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

ii) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলতে বুঝায় যে কোন সরকারী বা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষ, যিনি প্রতিষ্ঠানের অন্যায় আচরণ দমনে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা বলবৎ করার ক্ষেত্রে ক্ষমতা রাখেন।

iii) শৃঙ্খলাবিধি বলতে বুঝায় সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন বা অধ্যাদেশ বা অধ্যাদেশের আওতাভুক্ত সকল বিধি যা সরকারী বেসরকারী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রণয়ন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৫. সচেতনতা ও জনমত সৃষ্টি ঃ

ক. সরকারি-বেসরকারি সব কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার বৈষম্য, যৌন হয়রানি এবং নির্যাতননিরোধ ও নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টিতে নিয়োগদাতা/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সচেতনতামূলক প্রকাশনার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে। এ বিষয়ে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতি শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভে শ্রেণীর কাজ শুরুর আগে শিক্ষার্থীদের এবং সব কর্মক্ষেত্রে মাসিক এবং ষান্মাসিক ওরিয়েন্টেশন ব্যবস্থা রাখতে হবে।

খ. প্রয়োজন হলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য অবশ্যই উপযুক্ত কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

গ. সংবিধানে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ এবং সংবিধিবদ্ধ আইনে নারী শিক্ষার্থী এবং কর্মে নিয়োজিত নারীদের যে অধিকারের বিষয়ে উল্লেখ করা আছে, তা সহজ ভাষায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

ঘ. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ব্যক্তিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রের নিয়োগকর্তারা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ এবং কার্যকরী মতবিনিময় করবেন।

ঙ. সংবিধানে বর্ণিত জেন্ডার সমতা এবং যৌন অপরাধ সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনাটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করতে হবে।

চ. সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত নিশ্চয়তাগুলো প্রচার করতে হবে।

৬. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ঃ সকল নিয়োগকর্তা এবং কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ যৌন হয়রানি প্রতিরোধের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে, অন্যান্য পদক্ষেপ ছাড়াও তাঁরা নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন ঃ

ক. নির্দেশনায় উল্লিখিত ৪ ধারা অনুযায়ী যৌন হয়রানি এবং যৌন নির্যাতনের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হয়েছে, তা কার্যকরভাবে প্রচার ও প্রকাশ করতে হবে।

খ. যৌন হয়রানি সংক্রান্ত যেসব আইন রয়েছে এবং আইনে যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের জন্য যেসব শাস্তির উল্লেখ রয়েছে, তা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

গ. কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষাক্ষেত্রের পরিবেশ নারীর প্রতি যেন বৈরী না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে এবং কর্মজীবী মহিলা ও নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ বিশ্বাস ও আস্থা গড়ে তুলতে হবে যে, তাঁরা তাঁদের পুরুষ সহকর্মী ও সহপাঠীদের তুলনায় অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকবেন না।

৭. শৃঙ্খলাবিধি কার্যক্রম ঃ এ নির্দেশনায় উল্লিখিত ৪ ধারা অনুযায়ী, যৌন হয়রানি এবং যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে যথাযথ শৃঙ্খলাবিধি প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে।

www.pathagar.com

৮. অভিযোগ ঃ যেসব আচরণ এ গাইডলাইনের অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন অশোভন আচরণ সম্পর্কে যদি অপরাধের শিকার নারী অভিযোগ করতে চায়, তা গ্রহণ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং তা প্রতিকারের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ক. অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় গোপন রাখতে হবে।

খ. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অভিযোগকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

গ. অপরাধের শিকার নিজে অথবা বন্ধু বা চিঠি বা আইনজীবীর মাধ্যমে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করতে পারে।

ঘ. অভিযোগকারী ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে অভিযোগ কমিটির নারী সদস্যের কাছে অভিযোগ জানাতে পারে।

ঙ. অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটির কাছে অভিযোগ দায়ের করার জন্য নিম্নে বর্ণিত ধারা ৯ অনুসরণ করতে হবে যা নিম্নরূপ।

৯. অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটি ঃ

ক. অভিযোগ গ্রহণের জন্য, তদন্ত পরিচালনার জন্য এবং সুপারিশ করার জন্য সরকারি-বেসরকারি সব কর্মক্ষেত্রে এবং সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযোগ গ্রহণের জন্য কমিটি গঠন করবে।

খ. কমপক্ষে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হবে, যার বেশির ভাগ সদস্য হবেন নারী। সম্ভব হলে কমিটির প্রধান হবেন নারী।

গ. কমিটির দুজন সদস্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে নিতে হবে, যে প্রতিষ্ঠান জেন্ডার এবং যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করে।

ঘ. অভিযোগ কমিটি সরকারের কাছে এ নীতিমালা বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত বাৎসরিক অভিযোগ প্রতিবেদন পেশ করবে।

১০. অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটির পরিচালনা প্রণালী ঃ সাধারণভাবে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগ কমিটির কাছে অভিযোগ গ্রহণকারী পেশ করতে হবে। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্য কমিটি ঃ

i) লঘু হয়রানির ক্ষেত্রে যদি সম্ভব হয়, অভিযোগ কমিটি সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষের সম্মতি নিয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেবে এবং এ বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

ii) অন্য সব ক্ষেত্রে অভিযোগ কমিটি বিষয়টি তদন্ত করবে।

iii) অভিযোগ কমিটি ডাকযোগে উভয় পক্ষকে এবং সাক্ষীদের রেজিস্ট্রার বিজ্ঞাপন প্রেরণ, শুনানি পরিচালনা, তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ এবং সব সংশ্লিষ্ট দলিল পর্যবেক্ষণের

www.pathagar.com

ক্ষমতা রাখবে। এ ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে মৌখিক প্রমাণ ছাড়াও অবস্থানগত প্রমাণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এ অভিযোগ কমিটির কার্যক্রম নিশ্চিত করতে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট অফিস সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবে। অভিযোগ কমিটি অভিযোগকারীদের পরিচয় গোপন রাখবে। অভিযোগকারীর সাক্ষ্য গ্রহণের সময় এমন কোনো প্রশ্ন বা আচরণ করা হবে না, যা উদ্দেশ্যমূলকভাবে নীচ, অপমানজনক এবং হয়রানিমূলক হয়। সাক্ষ্য গ্রহণ ক্যামেরায় ধারণ করতে হবে। অভিযোগকারী যদি অভিযোগ তুলে নিতে চায় বা তদন্ত বন্ধের দাবি জানায়, তাহলে এর কারণ তদন্ত করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে। অভিযোগ কমিটি ৩০ দিনের মধ্যে তাঁদের সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবে। প্রয়োজনে এ সময়সীমা ৩০ কার্যদিবস থেকে ৬০ কার্যদিবসে বাড়ানো যাবে।

যদি এটি প্রমাণিত হয় যে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে, তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হবে। অভিযোগ কমিটির বেশির ভাগ সদস্য যে রায় দেবে, তার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

১১. শাস্তি ঃ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে (ছাত্র ব্যতিরেকে) সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারে এবং ছাত্রদের ক্ষেত্রে অভিযোগ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী তাদের ক্লাস করা থেকে বিরত রাখতে পারে।

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে এবং সব সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রের শৃঙ্খলাবিধি অনুসারে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং যদি ওই অভিযোগ দন্ডবিধির যেকোনো ধারা অনুযায়ী অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট কোর্ট বা ট্রাইব্যুনালে পাঠিয়ে দেবে।

১২.২.১. ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ ঃ

ধারা ৭৬ ঃ মহিলাদিগকে উত্যক্ত করার শাস্তি ঃ

যদি কেউ রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বা সেখান হতে দৃষ্টিগোচরে স্বেচ্ছায় এবং অশালীনভাবে নিজদেহ এমনভাবে প্রদর্শন করে যা কোন গৃহ বা দালানের ভিতর হতে হউক বা না হউক, কোন মহিলা দেখতে পায়, অথবা স্বেচ্ছায় কোন রাস্তায় সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে কোন মহিলাকে পীড়ন করে বা তার পথরোধ করে, অথবা কোন রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে অশালীন ভাষা ব্যবহার করে বা অশ্লীল আওয়াজ, অংগভংগি বা মন্তব্য করে কোন মহিলাকে অপমান বা বিরক্ত করে, তবে সে ব্যক্তি ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা ২০০০ (দু হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা দন্ড অথবা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডনীয় হবে।

১২.২.২. চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান পুলিশ অধ্যাদেশ- ১৯৭৮ ঃ

www.pathagar.com

ধারা ৭৮ ঃ মহিলাদের উত্যক্ত করার শাস্তি ঃ

কেউ কোন রাস্তায় বা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে অথবা গৃহাভ্যন্তরে বা ঘরের বাইরে মহিলাদের দেখিয়ে বা দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজের অংগ প্রত্যংগ প্রদর্শন করলে অথবা রাস্তায় বা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য প্রকাশ্য স্থানে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মহিলার পথরোধ করলে বা তাকে চাপ দিলে অথবা অশালীন বাক্য বা শব্দে বা মন্তব্য করে বা অংগভংগী করে কোন মহিলাকে উত্যক্ত করলে ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা ২০০০ (দু হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডনীয় হবে।

১২.২.৩. খুলনা মেট্রোপলিটান পুলিশ অধ্যাদেশ- ১৯৮৫ ঃ

ধারা ৭৯ ঃ মহিলাদের উত্যক্ত করার শাস্তি ঃ

কোন ব্যক্তি রাস্তায় বা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে অথবা গৃহাভ্যন্তরে বা ঘরের বাইরে মহিলাদের দেখিয়ে বা দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজের অংগ-প্রত্যংগ প্রদর্শন করে অথবা রাস্তায় বা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য প্রকাশ্যস্থানে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মহিলার পথরোধ করে বা তাকে চাপ দেয় অথবা অশালীন বাক্য বা শব্দ বা মন্তব্য করে বা

অংগভংগী করে কোন মহিলাকে উত্যক্ত করে, তবে সে ব্যক্তি ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা ২০০০ (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা দন্ড অথবা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডনীয় হবে।

১২.২.৪. রাজশাহী মেট্রোপলিটান পুলিশ অধ্যাদেশ- ১৯৯২ ঃ

ধারা ৭৯ ঃ মহিলাদের উত্যক্ত করার শাস্তি ঃ

কোন ব্যক্তি কোন রাস্তা বা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে অথবা গৃহাভ্যন্তরে বা ঘরের বাহিরে মহিলাকে দেখিয়ে বা দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রদর্শন করলে অথবা রাস্তায় বা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে প্রকাশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মহিলার পথ রোধ করলে বা তার শরীরের কোন স্থান স্পর্শ করলে অথবা অশালীন বাক্য বা শব্দ বা মন্তব্য করলে, অঙ্গভঙ্গী করে তাকে উত্যক্ত করলে, তিনি ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা ২০০০ (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হবেন।

১২.৩. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ ঃ

ধারাঃ ১৪৪ - উৎপাত বা আশঙ্কিত বিপদের ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ আদেশ জারির ক্ষমতা ঃ

যে সকল ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা এই ধারার অধীন কাজ করিবার জন্য সরকার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিশেষ ভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত (অন্য কোন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের) মতে, এই ধারার অধীনে অগ্রসর হইবার মত যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে এবং আশু বা দ্রুত প্রতিকার বাঞ্ছনীয়,

সেই সকল ক্ষেত্রে এইরূপ ম্যাজিষ্ট্রেট লিখিত আদেশে ঘটনার মূল বিষয়বস্তু বর্ণনা করিয়া

www.pathagar.com

এবং ইহা ১৩৪ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে জারি করিয়া যে কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কাজ করা হইতে বিরত থাকিবার অথবা কোন নির্দিষ্ট সম্পত্তি তাহার দখলে কিংবা তাহার ব্যবস্থাধীনে লইবার নির্দেশ দিতে পারিবেন, যদি উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট বিবেচনা করেন যে, তাহার নির্দেশে আইন সংগতভাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির প্রতি বাধা, বিরক্তি বা ক্ষতি, অথবা বাধা, বিরক্তি বা ক্ষতির ঝুঁকি, অথবা মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তার প্রতি বিশদ অথবা জনশান্তির বিরক্তি বা দাঙ্গা বা মারামারি নিরোধে সম্ভাবনা আছে কিংবা নিরোধে সহায়তা করিবে।

১২.৪. বাংলাদেশ পেনাল কোড ঃ

৫০৯ ধারায় ইভ টিজিং অর্থে বলা হয়েছে, কোন নারীর শালীনতার অমর্যাদার অভিপ্রায়ে কোন মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি বা কোন কাজকে বোঝাবে। কাজ অর্থ স্কুল-কলেজগামী মেয়েদের রাস্তাঘাটে দেখে শিস দেওয়া, গান গাওয়া, চোখ বাঁকা করে তাকানো, কোন ব্যক্তি নারীর শালীনতায় অমর্যাদা করার অভিপ্রায়ে কোন মন্তব্য করা, কোন শব্দ বা অঙ্গভঙ্গি করা বা বস্তু প্রদর্শন করা এবং অনুরূপ মন্তব্য, শব্দ নারী শুনতে পায় বা বস্তু দেখতে পায় কিংবা কোন নারীর নির্জনবাসে অনধিকার প্রবেশ।

বাংলাদেশ সরকার গত ৯.১১.২০১০ তারিখে এক প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে ভ্রাম্যমান আদালত আইন, ২০০৯ এ একই আইনের ১৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আইনের ৯৩ তম সংযোজনীতে দন্ডবিধির এ ধারা (ধারা ৫০৯) যুক্ত করেছেন।

১২.৫. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ঃ

ধারাঃ ১০ - যৌন পীড়ন, ইত্যাদির দন্ড ঃ (১) কোন পুরুষ অবৈধভাবে তার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তার শরীরের যে কোন অঙ্গ বা কোন বস্তু দ্বারা কোন নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করেন তাহলে তার এ কাজ হবে যৌন পীড়ন এবং তজ্জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কিন্তু অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

(২) কোন পুরুষ অবৈধভাবে তার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোন নারীর শ্লীলতাহানি করলে বা অশোভন অঙ্গভঙ্গি করলে তার এ কাজ হবে যৌন হয়রানি এবং তজ্জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কিন্তু অন্যূন ২ (দুই) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০৬' সংশোধন করে এতে ১০ এর (ক) ধারা সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত নতুন এ ধারায় যৌন হয়রানিকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন নারীর বা শিশুর পথরোধ করে অথবা অশালীন কোন মন্তব্য বা শব্দ করে অথবা অশোভন অঙ্গভঙ্গি বা বস্তু বা চিত্র বা সাংকেতিক চিহ্ন বা চিত্র প্রদর্শন করে অথবা ইন্টারনেট বা টেলিফোন বা মোবাইল ফোন বা এসএমএস বা অন্য কোন মাধ্যম ব্যবহার করে বা আলোকচিত্র গ্রহণের মাধ্যমে কোন নারী বা শিশুকে উত্যক্ত করে বা অপমানজনক বা শালীনতার অমর্যাদা ঘটায় বা উক্ত নারী বা শিশু দেখতে পায় বা

www.pathagar.com

শুনতে পায়, তা যৌন হয়রানিমূলক অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে অনধিক সাতবছর এবং সর্বনিম্ন এক বছর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডের বিধান রাখা হচ্ছে।

১২.৬. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ঃ

ধারা - ৩৩২ ঃ

মহিলাদের প্রতি আচরণঃ কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে কোন মহিলা নিযুক্ত থাকিলে, তিনি যে পদমর্যাদারই হোক না কেন, তার প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্য কেহ এমন আচরণ করিতে পারিবেন না যাহা অশ্লীল কিংবা অভদ্রজনোচিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিংবা যাহা উক্ত মহিলার শালীনতা ও সম্ভ্রমের পরিপন্থী।

১২.৭. শিশু আইন, ১৯৭৪ ঃ

১৮ বছরের কম বয়সীদের প্রতি মাতা-পিতা ও অভিভাবকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টকরণসহ সন্তানের প্রতি অবজ্ঞা-অবহেলা-গাফলতির জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে।

ধারা ঃ ৩১- প্রধান পরিদর্শক, ইত্যাদির নিয়োগ ঃ

(১) সরকার প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটের জন্য একজন প্রধান পরিদর্শক এবং তার সহায়তাকল্পে সরকারি বিবেচনামতে উপযুক্ত সংখ্যক পরিদর্শক ও সহকারী পরিদর্শক নিয়োগ করবেন।

(২) প্রধান পরিদর্শক বা সহকারী পরিদর্শক, প্রধান পরিদর্শকের সেরূপ ক্ষমতা ও কর্তব্য থাকবে।

(৩) প্রত্যেক পরিদর্শক বা সহকারী পরিদর্শক, প্রধান পরিদর্শকের সেরূপ ক্ষমতা লাভ করবেন ও কর্তব্য পালন করবেন যেরূপ সরকার নির্দেশ দিবেন এবং প্রধান পরিদর্শকের নির্দেশানুযায়ী কাজ করবেন।

ধারা ঃ ৫৪- পিতামাতাকে জরিমানা ইত্যাদি প্রদানে আদেশ দেয়ার ক্ষমতা ঃ

(১) যেক্ষেত্রে কোন শিশু জরিমানাদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধে দন্ডিত হয়, সেক্ষেত্রে আদালত জরিমানার অর্থ পরিশোধের জন্য শিশুটির পিতামাতা বা অভিভাবককে নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) কোন পিতামাতা বা অভিভাবককে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী জরিমানা পরিশোধের আদেশ হলে তা ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান অনুসারে আদায় করা হবে।

ধারা ঃ ৬৩- ধর্ম সংক্রান্ত বিধান ঃ

(১) এ আইনের অধীনে শিশুকে যে প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট, অনুমোদিত আবাস অথবা উপযুক্ত ব্যক্তি অথবা অন্য ব্যক্তির নিকট শিশুকে সোপর্দ করা হবে তা নির্ধারণের জন্য আদালত শিশুর ধর্মীয় নাম বা আখ্যা নিরুপণ করবেন এবং এরূপ প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট, অনুমোদিত আবাস অথবা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনকালে শিশুর নিজ ধর্মে শিক্ষা-দীক্ষার জন্য যে সকল সুবিধা প্রদত্ত হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

(২) শিশুকে যেক্ষেত্রে এরুপ কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসের

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করা হয় সেখানে তার নিজ ধর্ম সংক্রান্ত শিক্ষা-দীক্ষার কোন সুযোগ-সুবিধা নেই, অথবা এরূপ কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করা হয় যিনি শিশুকে তার ধর্মমতে পালন করার জন্য কোন বিশেষ সুযোগ দিতে পারেন না। সেক্ষেত্রে এরূপ প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে এরূপ কর্তৃপক্ষ অথবা উপযুক্ত ব্যক্তি শিশুকে তার নিজ ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অনুযায়ী লালন-পালন করবেন না।

(৩) যেক্ষেত্রে প্রধান পরিদর্শকের দৃষ্টিগোচর করা হয় যে, (২) উপধারার বিধান ভঙ্গ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে তিনি প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট, অনুমোদিত আবাস অথবা উপযুক্ত ব্যক্তির জিম্মি হতে শিশুটিকে তার মতে অন্য কোন উপযুক্ত প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে বদলি করবেন।

উপরে বিধৃত বিদ্যমান আইন সমূহের নিরপেক্ষ ও যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আইনেই আইনের ভেতরে আইনের প্রয়োগ ও শাস্তি নিশ্চিত করার যথাযথ বিধান থাকা প্রয়োজন। পাশাপাশি আইনের অপপ্রয়োগ যাতে না ঘটে সেদিকেও খেয়াল রাখা জরুরী। ইতোমধ্যেই আইনের অপপ্রয়োগের কিছু খবর পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়েছে।

একটি উদাহরণ ঃ

নরসিংদী পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে নিয়মিত শিক্ষক নিয়োগের দাবীতে আবেদনপত্র জমা দিতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের ইভটিজিং মামলার হুমকির শিকার হয়ে গত রবিবার থেকে ক্লাস বর্জন করছে। শিক্ষার্থীদের লিখিত অভিযোগ থেকে জানা যায়, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিয়মিত শিক্ষকের জন্য তদবির না করে কম্পিউটার বিভাগের প্রধান আবুল কালাম আজাদের স্ত্রী মলি বেগম এবং তার নিকট আত্মীয় বিলকিস বেগমকে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। এতে শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ না হওয়ায় তারা নিয়মিত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা নিতে গত ২৭.১১.২০১০ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বরাবর আবেদন করেন। অধ্যক্ষ আবেদনপত্র জমা না নিয়ে তাদের গালিগালাজ করেন এবং এ ব্যাপারে কোন কথা বললে ইভটিজার বলে মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়ার হুমকি দেন। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে আরও বলেন, তোমাদের বিভাগে বিভাগীয় প্রধান ছাড়া সকল খন্ডকালীন শিক্ষক মহিলা হওয়াতে আমি খুশি। বেশি কথা বললেই ইভটিজার বানিয়ে মামলায় ফাঁসিয়ে দেব। এই ইভটিজিং মামলার হুমকিতে আতংকগ্রস্ত হয়ে খন্ডকালীন অযোগ্য শিক্ষিকাদের ক্লাস বর্জন করতে বাধ্য হয় বলে শিক্ষার্থীরা সাংবাদিকদের জানায়। (ইত্তেফাক, ৩০.১১.২০১০)

১৩. ইভটিজিং প্রতিরোধে ধর্ম ঃ

ইভ টিজিং এর মতো অপরাধ প্রতিরোধে ধর্মীয় সংস্কৃতির অনুশীলনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কেননা মানুষের শুধু শারীরিক সত্তা নয়, তার একটি মানস ও মনন রয়েছে। এ মনন বা মানসের বিকাশ দরকার এবং সেটা কেবল বস্তুগত নয়। এ মানস বিকাশ

www.pathagar.com

ধর্মের দ্বারা সম্ভব। ধর্ম মানবজীবনকে পরিপূর্ণ ও সৌন্দর্যমন্ডিত করে এবং ধর্ম হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ভিত্তি।

ধর্ম শব্দটি সংস্কৃত। ধৃ+মন = ধর্ম। এর অর্থ করা হয়, 'ধ্রিয়তে লোকো অনেন, ধরতি লোকংবা' অর্থাৎ যা লোককে ধারণ করে এবং লোক যা ধারণ করে চলে তাকেই ধর্ম বলা হয়। মহাভারতের মতে, 'ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহু,' যা ধারণ করে তা-ই ধর্ম। কারো কারো মতে, 'চোদনালক্ষণোইর্থো ধর্ম্মঃ' - লৌকিক ইষ্টভাল ও অনিষ্ট নিবৃত্তির উপায়কে ধর্ম বলে (জৈমিনি সূত্র,১/১/২)। ইংরেজিতে ধর্মকে বলে Religion । এ শব্দটি Religare থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ, বন্ধন। অর্থাৎ একটা আইনের বন্ধনের মধ্যে জীবন যাপন কে Religion বলে। কান্ট এর মতে, Religion is morality. ফিক্তের অভিমত হলো, Religion is konwledge । Emile Durkheim (1858-1917) এর ভাষায়, পবিত্র বস্তু এবং করণীয়-অকরণীয় কাজের প্রতি বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বিত রূপকে ধর্ম বলা হয়। (The Elimentary forms of Religious Life)

আরও সহজ করে এভাবে বলা যায়, ধর্ম মানবের জন্য স্রষ্টা প্রদত্ত আইন। মানুষকে জীবন চলার পথে কোনও না কোন প্রকার আইন মেনে চলতে হয়। আইন ছাড়া এ জগৎ এক মুহূর্তও চলতে পারে না। প্রতিটি দেশ একটি বিশেষ আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। জন্মলগ্ন থেকে মানুষ যে ঐশী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত তারই অপর নাম ধর্ম। ধর্মহীন মানুষ একটি অমানবিক জীব। সে যেমন নিজে বাঁচতে পারে না। তেমনই অপরকেও বাঁচতে দিতে পারে না। জনৈক ইংরেজ দার্শনিক এ অবস্থাটাকে এ ভাবে বর্ণনা করেছেন, A man without religion is like a horse without bridle.

এক কথায় মানব জীবনে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, নৈতিকতা - অনৈতিকতা ইত্যাদি বিচার-বিবেচনার এক সাবলীল ও সুষ্ঠু নির্ণায়ক নীতি বা বন্ধন হলো ধর্ম।

পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে যুগে যুগে যত ধর্ম এসেছে, যত ধর্মগুরু এসেছেন সবাই অন্যায়ের বিপক্ষে ন্যায়ের, নীতির ও মানবতার জয়গান গেয়েছেন। সততা, সাধুতা, সেবা, সংযম, সৌজন্য, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, সদাচার, দয়া, ক্ষমা, প্রেম, পরোপকার, পরমতসহিষ্ণুতা, বিনয়, বদান্যতা ইত্যাদি সব-ধর্মেরই সার কথা। সব ধর্মই তার প্রতিটি অনুসারীকে শৈশব-কৈশোর থেকে সৎপথে চলার, সুন্দরভাবে বাঁচার, সরলপথ অনুসরণ করার তাকিদ দিয়েছে।

সুতরাং, আশৈশব স্বধর্মের বিশুদ্ধ চর্চা ও যথাযথ অনুশীলন ব্যক্তির অপরাধস্পৃহা অবদমন সহ আত্মশুদ্ধির জন্য সহায়ক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও বলেছেন-

ধর্ম আমাদের অনেকের পক্ষেই সামাজিকতার একটা অঙ্গমাত্র। এমনকি সমাজে এমন লোক দেখিয়াছি যাঁহারা যথার্থ ধর্মনিষ্ঠাকে চিত্তের দুর্বলতা বলিয়া অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। এইরূপে ধর্মকে যদি আমাদের জীবনের এক কোণে সরাইয়া রাখি অথচ এই অবস্থায় ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্মশিক্ষা কী করিয়া অল্পমাত্রায় ভদ্রতা-রক্ষার

www.pathagar.com

পরিমাণে বরাদ্দ করা যাইতে পারে সে কথা চিন্তা করিয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠি, তবে সেই উদ্‌বেগ অত্যন্ত সহজে কী উপায়ে নিবারণ করা যাইতে পারে তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। তবু বর্তমান অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়া ব্যবস্থা চিন্তা করিতে হইবে। অতএব, এ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। (ধর্ম শিক্ষা, শিক্ষা, বিশ্বভারতী, আশ্বিন, ১৩৯৭)।

এখানে আমরা পবিত্র ইসলামসহ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধর্মে তরুণদের প্রতি অনুসরণীয় ধর্মীয় নৈতিক অনুশাসনের একটি রেখাচিত্র তুলে ধরছি।

১৩.১. ইসলাম ধর্ম ঃ

আঁধার ঘনিয়ে এলে আলোর প্রয়োজন তীব্রতর হয়। মানুষের সমাজ জীবন যখন পাপাচার, অন্যায়, অত্যাচার ও খুন-খারাবির অন্ধ আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিল ঠিক তখনই মানবতার মুক্তির দিশা নিয়ে আসে আল-ইসলাম।

বাংলাদেশের বেশীর ভাগ মানুষ মুসলিম। এ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম। আল কুরআন ও সুন্নাহর অনুশাসন হলো ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান উপজীব্য।

সন্তানদেরকে সঠিক প্রতিপালনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে ইসলাম। এ প্রসঙ্গে ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে - "প্রথম সাত বছর তাকে (সন্তানকে) মুক্ত রাখ, দ্বিতীয় সাত বছর তাকে শিষ্টাচার (আদব) শিক্ষা দাও এবং তৃতীয় সাত বছর তার সাথে গভীর সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোল।" (কুদূরী)

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ

"পিতার ওপর পুত্রের যেরূপ অধিকার আছে পুত্রের ওপরও পিতার তদ্রূপ অধিকার আছে। পিতার অধিকার হলো পুত্র শুধুমাত্র আল্লাহ্‌কে অমান্য করার আদেশ ব্যতীত তাঁর সকল আদেশ মেনে চলবে এবং পুত্রের অধিকার হলো পিতা তার একটি সুন্দর নাম রাখবে, তাকে উত্তম প্রশিক্ষণ দেবে এবং কুরআন শিক্ষা দেবে।" ('নাহজ্‌ আল বালাগা')

আমীরুল মুমেনিন তাঁর পুত্র হাসানকে বলেছেন ঃ

হে আমার পুত্র, আমার কাছ থেকে চারটি জিনিস এবং আরো চারটি জিনিস লিখে নাও এগুলো চর্চা করলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। বিষয়গুলো হলো, বুদ্ধিমত্তা সর্বোত্তম সম্পদ, মূর্খতা সব চাইতে বড় দুঃস্থতা, আত্মগর্ব সব চাইতে বড় বর্বরতা এবং নৈতিক চরিত্র সর্বোত্তম অবদান। হে আমার পুত্র, মূর্খ লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না, কারণ সে তোমার উপকার করতে গিয়ে অপকার করে ফেলবে। কৃপণের সাথে বন্ধুত্ব করো না, কারণ যখন তুমি তার প্রয়োজন অনুভব করবে তখন সে দৌড়ে পালাবে। পাপী লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না, কারণ সে তোমাকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে দেবে। মিথ্যাবাদীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না, কারণ সে তোমাকে দূরের জিনিস কাছের এবং কাছের জিনিস দূরের বলবে। ('নাহজ্‌ আল বালাগা')

ইসলাম অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগেই তাকে অংকুরে বিনষ্ট করতে চায়। এ কারণে

www.pathagar.com

ইসলামী শরিয়াত মানুষের নৈতিক সুরক্ষার্থে নিম্নলিখিত কর্মসূচী, বিধান ও মূলনীতির মাধ্যমে ব্যক্তির চারদিকে সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে দেয়, যার বিশুদ্ধ চর্চা তাকে পাপের দিকে আকর্ষণ ও পদস্খলন থেকে নিয়ত রক্ষা করতে সহায়ক হয়।

ক. ইসলাম আশৈশব ব্যক্তির সংশোধন, ব্যক্তির মন পবিত্র ও পরিশুদ্ধকরণ এবং তাকে সুন্দর ও নির্মলভাবে লালন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে উন্নত মহান চরিত্রে বিভূষিত করে তোলে। তার হৃদয়ে ঈমানের বীজ বপন করে তাকে কল্যাণমুখী বানিয়ে তার মধ্যে অপরাধ ও বিপর্যয় বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে দিতে চায়। আর প্রকৃত সঠিক ঈমান ও একনিষ্ঠ দৃঢ় প্রত্যয়-ই হচ্ছে সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং নির্লজ্জতা ও নিষিদ্ধ কাজ অবলম্বনের বিরুদ্ধে এক শক্ত প্রতিরোধ। কেননা সে নিঃসন্দেহে জানে ও বিশ্বাস করে যে, সে যা কিছুই করছে, আল্লাহপাক সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত আছেন।

খ. ইসলাম নিষিদ্ধ কাজ করা থেকে দূরে রাখার জন্য খারাপ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করে। সে খারাপ পরিণতি মানুষের সম্মুখে ভয়াবহরূপে চিত্রিত করে পেশ করা হয়েছে। যা স্বভাবতই মানব মনে এমন তীব্র ভীতির সঞ্চার করে যে, সে কিছুতেই সেই খারাপ কাজের দিকে পা বাড়াতে সাহস করে না।

গ. ইসলাম শরীয়াতী বিধি বিধানের মাধ্যমে সকল ভাল কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, পারস্পরিক কল্যাণ কামনা, সৎ কাজে আদেশ- অসৎ কাজে নিষেধ, ধৈর্য অবলম্বনের উপদেশ এবং সকল পাপ, সীমালংঘনমুলক কাজ, অন্যায়, জুলুম ও বিপর্যয় প্রতিরোধের নির্দেশ দেয়।

ঘ. ইসলাম যখন কোন কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, তখন সেই কাজের সুযোগ করে দেয় বা অনিবার্য করে তোলে যেসব পথ, তা- ও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেয়, সেই উপায়, পথ ও পন্থাকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যেসব প্রাথমিক অবস্থা ও কর্ম কান্ড সেসব নিষিদ্ধ কাজকে সহজ করে দেয়, সেগুলোও সাথে সাথে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

ঙ. ইসলাম যখন কোন জিনিস বা কাজ নিষিদ্ধ করে, তখন তদস্থলে একটা বৈধ-কাজের পন্থাও বাতলে দেয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ নিষিদ্ধ কাজটি পরিহার করে বৈধ কাজটির দ্বারা তার প্রয়োজন পূরণ করুক।

চ. মানুষের মন পবিত্রকরণ, আত্মা বিশুদ্ধকরণ এবং তাদেরকে পাপ ও অভিশপ্ত কাজে জড়িত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলামে অবশ্য পালনীয় দুটি ইবাদাত সর্বজন পরিচিত, মৌলিক এবং ব্যাপক প্রভাবশালী ইসলামী জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বের অধিকারী। এ দুটি ইবাদাত হলো - সালাত ও সিয়াম।

মূলত এ দুটি ইবাদাতই বিশেষ প্রশিক্ষণ স্বরূপ। যার চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে সকল প্রকার হীনতা-নীচতা থেকে মুক্ত করে কেবল এক আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্ বানানো।

www.pathagar.com

সালাতঃ সালাত মহান আল্লাহ্র সাথে তাঁর বান্দাহ্র এবং বান্দাহ্র সাথে তার মাবুদের প্রেমময়, গভীর ও পবিত্র সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মানব হৃদয়ে আল্লাহ্র ভয় এবং আল্লাহ্র কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের ভাবধারার সৃষ্টি করে।

পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বোয়াহা-র ১৩২ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, "আপনি (হে রাসূল!) আপনার পরিবারের লোকদের নামাযের আদেশ দিন"।

আবু দাউদ শরীফে নামায অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, " তোমাদের সন্তানকে সাত বছর বয়সে নামায পড়ার নির্দেশ দাও। "

সালাতে মানবদেহের প্রায় সবকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়োজিত হয়। দিন-রাত্রির চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচবারের সালাত আল্লাহ্ তা'আলা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে সব মানুষের ওপর ফরয করেছেন। এরই মাধ্যমে বান্দাহ্ ও আল্লাহ্র মাঝে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দুনিয়ার কোন মোহ সে সম্পর্ককে দুর্বল বা ছিন্ন করতে পারে না। বান্দাহ্ তখন ভুলে না যে, তার ওপর আল্লাহ্র হক সর্বাগ্রে এবং তাঁর ফরমানসমূহ কাজে পরিণত করেই মহামহিমের সেই অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা সম্ভব। মোদ্দা কথা, সারাদিনের কোন মুহূর্তেও মহান আল্লাহ্কে ভুলে না যাওয়াই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বড় সুফল ও মহামূল্যবান প্রাপ্তি। এরূপ অবস্থায় কোন অপরাধজনক কাজে অংশগ্রহণ করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ কারণেই সালাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার ঘোষণা হচ্ছেঃ

"নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে সর্বপ্রকারের নির্লজ্জ ও ঘৃণ্য কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখে"। - সূরা আল আনকাবুত ঃ ৪৫।

সিয়াম ঃ রমযানের মাসব্যাপী সিয়ামের প্রশিক্ষণমূলক অবদান অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ব্যাপক ও গভীর। সিয়াম মানব মনের যাবতীয় কুপ্রবৃত্তির ওপর শক্ত লাগাম লাগিয়ে দেয় এবং রোযাদারকে যাবতীয় অপকর্ম থেকে বিরত রাখে।

অপরাধ যে ধরনের ও যে প্রকৃতিরই হোক, তা হৃদয়ের কামনা, বাসনা, লোভ ও লালসা থেকে উৎসারিত হয়। আর এর উৎসে তিনটি প্রবল শক্তি নিহিত থাকে। প্রথম, লোভ-লালসা; দ্বিতীয়, যৌন স্পৃহা ও কু-প্রবৃত্তি এবং তৃতীয় হচ্ছে, অহমিকা-দাম্ভিকতা বোধ। সিয়ামের প্রবল প্রশিক্ষণমূলক প্রভাব রয়েছে এ তিনটি শক্তির ওপর।

এভাবে আল ইসলামের উপর্যুক্ত মূলনীতি ও বিধানাবলীর আলোকে মানব জীবনকে শৈশব-কৈশোর হতে সকল প্রকার অনাচার, পাপ ও পংকিলতা থেকে মুক্ত করা গেলে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অপরাধজনক কাজ থেকে দূরে সরে থাকবে। ইসলামের এ বিধানসমূহ প্রতিটি মানব সন্তানকে সেই লক্ষ্যে ক্রমশ প্রস্তুত করে তোলে।

ইসলামে আখলাক্ব, শিষ্টাচার, বিনয়, নম্রতা ও মানবতাবোধ সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলা যেতে পারে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির কারণে এখানে সেসব উল্লেখ করা হলো না।

১৩.২. হিন্দু ধর্ম ঃ

www.pathagar.com

হিন্দু ধর্মের প্রাথমিক যুগের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিদ্যা শিক্ষার মূল ছিল বেদ। বেদ মানেই বিদ্যা। তাদের প্রাচীন ফিলসফির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বেদ। অর্থাৎ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল এই বেদ।

শ্রীমদভগবদ গীতার স্কন্ধ ৭, অধ্যায় ৬ এ বলা হয়েছে ঃ

শ্লোক-১ ঃ প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনুষ্যজন্ম লাভ করে জীবনের শুরু থেকেই, অর্থাৎ, বাল্যকাল থেকেই, অন্য সমস্ত প্রয়াস ত্যাগ করে ভাগবত-ধর্ম অনুষ্ঠান করবেন। মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, এবং অন্যান্য শরীরের মতো অনিত্য হলেও তা অত্যন্ত অর্থপূর্ণ, কারণ মনুষ্য-জীবনে ভগবানের সেবা সম্পাদন করা সম্ভব। নিষ্ঠাপূর্বক কিঞ্চিৎ মাত্র ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করলেও মানুষ পূর্ণসিদ্ধি লাভ করতে পারে।

শ্লোক-২৪ ঃ অতএব দৈত্য কুলোদ্ভূত আমার বালক বন্ধুগণ, তোমরা সকলে এমনভাবে আচরণ কর যাতে অধোক্ষজ ভগবান তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হন। তোমাদের আসুরিক প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে শত্রুতা এবং দ্বৈতভাব রহিত হয়ে কর্ম কর। ভগবদ্ভক্তির জ্ঞান প্রদান করে সমস্ত জীবের প্রতি তোমাদের করুণা প্রদর্শন কর, এবং এইভাবে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হও।

১৩.৩. খ্রিস্ট ধর্ম ঃ

খ্রিস্ট সম্প্রদায়ের অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁদের শিক্ষা ছিল গির্জাকে কেন্দ্র করে। প্রতিটি গির্জা একটি কলেজ বা শিক্ষালয় ছিল। সেখানে যা পড়ানো হতো তার মূল ভিত্তি ছিল বাইবেল।

পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের 'হিতোপদেশ' অধ্যায়ে যিশু বলছেন ঃ

অতএব, তুমি ধার্মিকতা ও বিচার বুঝিবে, ন্যায় ও সমস্ত উত্তম পথ বুঝিবে।

কেননা প্রজ্ঞা তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিবে, জ্ঞান তোমার প্রাণের তুষ্টি জন্মাইবে,

পরিণামদর্শিতা তোমার প্রহরী হইবে, বুদ্ধি তোমাকে রক্ষা করিবে,

যেন তোমাকে উদ্ধার করে দুষ্টের পথ হইতে, সেই সকল লোক হইতে, যাহারা কুটিল বাক্য বলে,

যাহারা সরলতার পথ ত্যাগ করে, অন্ধকার মার্গে চলিবার নিমিত্ত,

যাহারা কুক্রিয়া সাধনে আনন্দিত হয়, দুষ্টতার কুটিলতায় উল্লসিত হয়,

যাহারা বক্র পথের পথিক, আপন আপন আচরণে বিপথগামী।

সে তোমাকে উদ্ধার করিবে পরকীয়া স্ত্রী হইতে, সেই চাটুবাদিনী বিজাতীয়া হইতে। (২ঃ ৯-১৪)

পবিত্র বাইবেলের নূতন নিয়মের 'ইফিষীয়' অধ্যায়ে যিশু আরও বলেছেন ঃ

সন্তানেরা, তোমরা প্রভুতে পিতামাতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা তাহা ন্যায্য।

"তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও", -- এ ত প্রতিজ্ঞাসহযুক্ত

www.pathagar.com

প্রথম আজ্ঞা - "যেন তোমার মঙ্গল হয়, এবং তুমি দেশে দীর্ঘায়ু হও।"
আর পিতারা, তোমরা আপন আপন সন্তানদিগকে ক্রুদ্ধ করিও না, বরং
প্রভুর শাসনে ও চেতনা প্রদানে তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুল। (৬ঃ১-৪)

১৩.৪. বৌদ্ধ ধর্ম ঃ

বৌদ্ধদের ইতিহাসে দেখা যায়, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেয়া হতো সেই শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে ছিল চরিত্র বা বৌদ্ধ ধর্মের নৈতিকতা। এর সাথে তাঁরা ভারতে প্রচলিত অন্যান্য বিদ্যাকেও শামিল করে নিয়েছিলেন।

১৪. সুপারিশমালা ঃ

১. **সমন্বিত ভূমিকা গ্রহণঃ** ইভ টিজিং প্রতিরোধে মাতা-পিতা, অভিভাবক, শিক্ষক, রাজনীতিক সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে। পরিবার, শিক্ষালয়, সমাজ, সরকার ও রাষ্ট্র সবাইকে অপরাধ প্রতিরোধে সংবেদনশীল ও সহানুভূতিশীল হতে হবে। সুস্থ তরুণ - মানস ও মনন গঠনে সংশ্লিষ্ট সবাইকে স্ব স্ব স্থান থেকে সমন্বিত প্রয়াস চালাতে হবে। মোদ্দা কথা, এটিকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে দেখতে হবে।

২. **সুষ্ঠু বিনোদন ঃ** প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশস্ত খেলার মাঠ থাকা উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বার্ষিক মিলাদ মাহফিল, বার্ষিক বিজ্ঞান মেলা, বই পড়া প্রতিযোগিতা, বিতর্ক উৎসব, দেয়ালিকা প্রকাশ, বিভিন্ন দিবস উদযাপন ইত্যাদি নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন। জাতীয় দৈনিক পত্রিকা গুলোতে তরুণদের জন্য সাপ্তাহিক বা মাসিক বিভাগ প্রকাশ এবং রেডিও ও টিভি চ্যানেল গুলোতে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন।

৩. **ধর্মচর্চা ঃ** ধর্মীয় নৈতিকতা তরুণ মনে পোক্তভাবে প্রোথিত হতে হবে। এ লক্ষ্যে আশৈশব ধর্মের বিশুদ্ধ চর্চা ও যথাযথ অনুশীলন করতে হবে। মসজিদের ইমাম, মন্দিরের ঠাকুর, গির্জার ফাদার, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

৪. **আইনের যথাযথ প্রয়োগ ঃ** ইভটিজিং প্রতিরোধে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। আইন সবার জন্য এবং সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগ করা জরুরী। পাশাপাশি আইনের অপপ্রয়োগ যাতে না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৫. **অভিভাকগণের জবাবদিহিতা ঃ** ১৮ বছরের কম বয়সী অপরাধীদের ক্ষেত্রে তাঁদের অভিভাবকগণকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে দেশে বিদ্যমান আইনের আলোকে ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদেরকে আইন-আদালতের আওতায় আনার ব্যবস্থাও করতে হবে।

৬. **সুশিক্ষক নিয়োগদান ঃ** শিক্ষকের দায়িত্ব হলো শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি-সামর্থ্য-

www.pathagar.com

চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা। শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার কারণ সমূহ অবগত হয়ে শিক্ষক এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন এবং শিক্ষার্থীর অধীত বিষয় সমূহে অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করবেন। শিক্ষকদের আদর-যত্ন, মায়া-মমতা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে তুলতে হবে। এজন্য প্রয়োজন বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগদান এবং বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের গুণগত মান নিশ্চিত করা এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে কিশোর- তরুণদের মানসিকতা অনুধাবন করার মত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।

৭. **নিরাপত্তা সেল গঠন ঃ** শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ে নিরাপত্তা সেল গঠন করা যেতে পারে। মেয়েদের স্কুল-কলেজের সামনে সাদা পোশাকধারী বা টহল পুলিশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. **ইন্টারনেট ব্যবহার ও মোবাইল কোম্পানীসমূহের ওপর নিয়ন্ত্রণঃ** ইন্টারনেট ব্যবহার, সাইবার ক্যাফে ব্যবসা পরিচালনা এবং মোবাইল কোম্পানীসমূহের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। এ লক্ষ্যে সুস্পষ্ট নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করা উচিত।

৯. **কাউন্সেলিং ঃ** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা অথবা ক্ষেত্রবিশেষে মনোবিজ্ঞানী বা মনোচিকিৎসকগণের মাধ্যমে কাউন্সেলিং সার্ভিস প্রদান করা যেতে পারে। এতে তরুণ-তরুণীদেরকে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে সমস্যা মুকাবিলার চেষ্টা করা যেতে পারে।

১০. **প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ঃ** তরুণ অপরাধীদের উন্নয়নের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উভয় উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা যায়। ইনস্টিটিউটগুলো হবে নিতান্তই তরুণ-বান্ধব। সেখানে তাদের আর্থিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১১. **প্রতিরোধ কমিটি গঠন ঃ** ইভটিজিং এর বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এজন্য অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিচারক, আইনজীবী, সাংবাদিক, সরকারি প্রতিনিধি নিয়ে প্রতি মহল্লায় প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

১৫. উপসংহার ঃ

অপার সম্ভাবনায় ভাস্বর আমাদের তরুণ জনগোষ্ঠী। মেধা ও মননে তারা পশ্চাদপদ নন। দেশের ভেতরে এমনকি দেশের বাইরেও তারা তাদের মহিমময় শক্তি, বুদ্ধি ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। দেশ ও জাতির ক্রান্তিকালে তারা জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করেননি।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমাদের এ গৌরবদীপ্ত তরুণ সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আজ নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার। নানা অপরাধে তারা নিজেদেরকে

www.pathagar.com

জড়িয়ে ফেলছেন। ইভটিজিং হতে শুরু করে নারীর সম্ভ্রমহানির মতো নানা অসৎ কাজে সম্পৃক্ততা তাদের একাংশের ভালে ক্রমশ কলঙ্কের তিলক এঁকে দিচ্ছে। মানবিক মূল্যবোধের ঘাটতির কারণেই মূলত এটি হচ্ছে। অভিশাপের এ ভয়াল থাবা থেকে তাদেরকে মুক্ত করতে হবে। এ জন্যে উপরের সুপারিশমালার আলোকে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। পাপ-পঙ্কিলতার কালো আঁধার থেকে মুক্ত হয়ে একরাশ উন্নত, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধে তারা উজ্জীবিত হয়ে উঠুন- এটিই সমগ্র জাতির ঐকান্তিক প্রত্যাশা। ■

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল, 'অপরাধ-তত্ত্ব', ডক্টর মোহাম্মদ সাদেক, 'অপরাধ ও সংশোধন',

২. বি.এল. দাস, 'অপরাধ বিজ্ঞান', কামরুল বুক হাউস, মে, ২০১০,

৩. ডক্টর মোহাম্মদ সাদেক, 'অপরাধ সংশোধন',

৪. গাজী শামছুর রহমান, 'অপরাধ বিজ্ঞান',

৫. ডা. মোহিত কামাল, মানব মনের গতিপ্রকৃতি, বিদ্যাপ্রকাশ প্রকাশনী, ২০০১।

৬. ডঃ সুকুমার বসু, 'অপরাধ ও অপরাধী',

৭. মওলানা আঃ রহীম, 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম',

৮. আহমদুল্যাহ মিয়া ও এ এস এম আতীকুর রহমান। কিশোর অপরাধ সংশোধনী প্রতিষ্ঠান থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত কিশোরদের বর্তমান অবস্থান উপর জরিপ। ঢাকা ঃ সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮। পৃঃ ৬

৯. ডা. মোহিত কামাল, 'মানবমনের উদ্বেগ ও বিষন্নতা', বিদ্যাপ্রকাশ প্রকাশনী, ২০০৫।

১০. রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, 'শিক্ষা,' বিশ্বভারতী-গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৯৭।

১১. মোহাঃ আবদুস সালাম, 'অপরাধ, শাস্তি, সংশোধনীমূলক প্রবেশন এবং মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীর সংশোধনমূলক কার্যক্রম', আলীগড় লাইব্রেরী, ঢাকা, আগষ্ট, ১৯৮৯।

১২. প্রদীপ কুমার রায়, 'ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা', বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৩. মোঃ সিদ্দিকুর রহমান ও মোঃ শাওকাত ফারুক, 'শিক্ষা ব্যবস্থা', আহমদ পাবলিশিং হাউস, মে,১৯৯৮।

১৪. ভক্তি প্রসাদ মল্লিক, 'অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩।

১৫. ডা. মোহিত কামাল, 'মনোসমস্যা মনোবিশ্লেষণ', অবসর প্রকাশনী, ২০০৫।

১৬. আলী ইবনে আবি তালিব, 'নাহজ্ আল বালাঘা' র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০০।

১৭. ডা. মোহিত কামাল, 'টিনএজ মন', তাম্রলিপি প্রকাশনী, ২০১০।

১৮. **Morales A., Yvonne F. And P.R. Munford.** The Juvenile Justice System and Minorities. Social Work, Boston: Allyn and Bacon INC, 1986 Pp.391-3

১৯. **Tappa Paul, Juvenile Deliquency.** New York: Mc Graw Hill Book Company, INC. 1949.p-17.

২০. **Ahmed, Salahuddin.** Studies in Juvenile Delinquency and Crime in East Pakistan. Dhaka: College of Social Welfare and Research Center, 1966. P. 19

২১. **All Port G.W.**, 1961: "Pattern of Growth in Personality". Holt, N.Y.

২২. **Havinghurst. R.J.**, 1953: "Human Development of Education,

www.pathagar.com

Longmans, N.Y.
২৩. **Ginsberg, H. & Opper S.** 1969: "Piaget's Theory of Intellectual Development", Prentice Hall, N.D.
২৪. **Walters, A. Bandura,** 1963: "Social Learning and Personality Development", Holt, Rinehart & Winston, N.Y.
২৫. **Boultwood and S.J. Curtis:** "A Short History of Educational Ideas", 5th edition, University Tutorial Press.
২৬. **Schuster, Clara, Shaw & Ashburn, Shirley, Smith:** "The Process of Human Development, A holistic Approach", Little Brown & Compay, U.S.A.
২৭. **Cameron, Margaret and Yngve Hofvander:** "Manual on Feeding Infants and Young Children", Oxford University Press.
২৮. **Papalia, Daniel, E. & Olds, Sally Wendkos:** "Human Development", McGraw Hill Book Co.
২৯. **Havinghurst, R.J.:** "Development Tasks and Education", (3rd ed.) N. Y., 1972.
৩০. **Smart, M.S. & Smart, L.S.:** "Families Developing Relationships", (2nd ed.) N. Y., Macmillan, 1972.
৩১. **W. Paul Tappan,** "Crime, Justice & Correction."

লেখক পরিচিতি : জনাব মুহাম্মাদ শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া।

লেখা পরিচিতি : প্রবন্ধটি ১৫ জানুয়ারী, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

কাশ্মিরের স্বাধীনতার আন্দোলন

ড. মাহফুজ পারভেজ

১.

বর্তমান বিশ্বে চলমান সবচেয়ে পুরনো স্বাধীনতার আন্দোলনের অন্যতম হল কাশ্মিরের মুক্তি সংগ্রাম। অর্ধ শতাব্দীরও অধিক সময় (১৯৪৭-২০১০) স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন-সংগ্রাম-তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন কাশ্মিরের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ। সময়ের প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার সংগ্রামকেই কেবল কাশ্মিরের স্বাধীনতার আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ঐতিহাসিকভাবে লক্ষ্যণীয় যে, বিশ্বের ইতিহাসে কাশ্মির ও ফিলিস্তিনের মতো অন্য কোন জনগোষ্ঠীকে এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হয়নি। এই দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে জনগোষ্ঠী দু'টি একদিকে যেমন নিজস্ব স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহা ও প্রত্যয়কে জাগ্রত রেখেছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়েছে। সময়ের ব্যবধানে ও দীর্ঘসূত্রিতায় আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরাশক্তিবর্গ এই মুক্তি ও স্বাধীনতার আন্দোলনকে বিভ্রান্ত, বিপদগ্রস্ত, বিপথগামী ও নিপীড়ন-নির্যাতন-শোষণ-বঞ্চনা-মানবাধিকার হরণ, হত্যা-ধর্ষণ, রক্তপাত ও বিভীষিকার আন্তর্জাতিক চারণভূমিতে পরিণত করেছে।

www.pathagar.com

কাশ্মির ও ফিলিস্তিনকে সে দেশ দু'টির সংখ্যাগরিষ্ঠ গণমানুষের ইচ্ছা বা কামনার অধীনে মুক্তি ও স্বাধীনতার ঠিকানায় পৌছার বদলে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তিধরেরা নিজেদের কব্জা ও অধীনে নিয়ে যেতে চাচ্ছে এবং এইভাবেই ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতার আন্দোলন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জর্জরিত ও রক্তাক্ত হচ্ছে। উল্লেখ্য, কাশ্মির ও ফিলিস্তিনের উদাহরণ এই প্রমাণও দিচ্ছে যে, মুসলিম হওয়ার কারণেই বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় বৈধ অধিকার এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তিও কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে যাচ্ছে- ন্যায়সঙ্গত দাবিও বছরের পর বছর ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। অথচ বিশ্বের প্রথম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার বুক চিরে খ্রিস্টান রাষ্ট্র পূর্ব তিমুরের প্রতিষ্ঠা কত সহজেই এবং কত স্বল্প সময় ও সংক্ষিপ্ত সন্ত্রাসী আন্দোলনের মুখেই করা হয়েছে।

কাশ্মিরের মুক্তি ও স্বাধীনতার আন্দোলনকে জটিল থেকে জটিলতর করে দিচ্ছে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরাশক্তি। কাশ্মিরের স্বাধীনতাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেছে নানা দেশ। ফলে কাশ্মিরীদের মূল আন্দোলন চাপা পড়ে যাচ্ছে এবং ভারতীয় আক্রমণে ও সামরিক আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে। এমনকি, কাশ্মিরের আপামর গণমানুষের সামগ্রিক ও সর্বাত্মক স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামকে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে ভারতীয় পক্ষ থেকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' এবং 'সন্ত্রাসবাদ' নামে অভিহিত করা হচ্ছে, যা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কাশ্মিরের জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতার আন্দোলন-সংগ্রাম এবং একে আবর্তিত করে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও শক্তি প্রয়োগ এবং অপরাপর আন্তর্জাতিক-আঞ্চলিক শক্তির রাজনৈতিক স্বার্থ ও ক্ষমতা বৃদ্ধির লড়াই একটি সাচ্চা স্বাধীনতা ও মুক্তির আন্দোলনের কি চরম ক্ষতি সাধন করছে, তা নিয়ে মুক্ত বিশ্ব বা দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশই নয়, বাংলাদেশও গভীরভাবে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন।[১] এই উদ্বেগ ও চিন্তার সঙ্গত ও যথার্থ কারণ : "কাশ্মির সমস্যা শুধু ভারত-পাকিস্তানের সমস্যা নয়, এটি দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক সমস্যা। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না করা গেলে দক্ষিণ এশিয়ার

১. কাশ্মির ইস্যুর গুরুত্বের বিষয়টি ও বাংলাদেশের নানা শ্রেণী ও পেশার নাগরিকগণের উদ্বেগ ও চিন্তার বহিঃপ্রকাশ নানা সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-আলোচনায় উঠে আসতে দেখা যায়। গত ৩ অকটোবর ২০১০, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাউথ এশিয়া ইয়ুথ ফর পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি সোসাইটি (এসএওয়াইপিপি) "কাশ্মির ইস্যু এবং দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতা : বাংলাদেশের তরুণ সমাজের ভাবনা" শীর্ষক এক সেমিনারের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিআইসি গত ২৭ নভেম্বর, ২০১০ তারিখে কাশ্মিরের সমস্যা নিয়ে সেমিনার আয়োজন করে।

www.pathagar.com

দেশগুলোকে চরম মূল্য দিতে হবে।[২] ফলে কাশ্মির প্রসঙ্গে আলোচনা ও তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা এবং সমাধান সূত্র খুঁজে বের করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.

দক্ষিণ এশিয়া তথা উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হিমালয়ের কোল ঘেঁষে অবস্থিত একদার ভূ-স্বর্গ কাশ্মির[৩] বর্তমানে জ্বলন্ত, অগ্নিগর্ভ– স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার রণক্ষেত্র। অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরে চলছে এই ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতার রাজনৈতিক, আদর্শিক ও সর্বাত্মক সংগ্রাম। একদিকে কাশ্মিরের ব্যাপক জনগোষ্ঠী যখন স্বাধীনতার প্রেরণায় উজ্জীবিত ও সংগ্রামরত তখন কাশ্মির প্রসঙ্গে তিনটি রাষ্ট্রীয় শক্তি নিজ নিজ স্বার্থে আগুয়ান। এরা হল : ভারত, পাকিস্তান ও চীন।[৪] এ সকল পক্ষ কাশ্মির বিষয়টিকে নাজুক ও অমীমাংসিত করে রেখেছে। কাশ্মিরের জনগণকে নিজের মুক্তি, স্বাধীনতা ও ভাগ্য উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে বাধা সৃষ্টি করছে।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ভারত সমগ্র কাশ্মিরের ৪৩ ভাগ এলাকা দখল করে রেখেছে, যার মধ্যে রয়েছে জম্মু, কাশ্মির উপত্যকা, লাদাখ এবং সিয়ানচেন হিমবাহ। পাকিস্তান অধিকার করে রেখেছে কাশ্মিরের ৩৭ ভাগ ভূ-খণ্ড যার মধ্যে রয়েছে, আজাদ কাশ্মির (রাজধানী মুজাফফরাবাদ) এবং উত্তরাঞ্চলীয় গিলগিট এবং বেল্টিস্তান (Baltistan)। অন্যদিকে চীনের দখলে রয়েছে কাশ্মিরের ২০ ভাগ এলাকা, যার নাম আকসাই চীন (Aksai Chin)। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের সময় চীন এটা দখল করে নেয়। এছাড়াও চীন ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানের কাছ থেকে পায় পার্বত্য ট্রান্স-কারাকোরামের

---

২. উক্ত সেমিনারের আলোকে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভাষ্য। দ্রষ্টব্য, প্রথম আলো, ৪ অকটোবর ২০১০, পৃষ্ঠা ১৯.

৩. Kashmir and Jammu-Imperial Gazetter of `India, Vol. 15. P.72 থেকে জানা যায়, কাশ্মিরের অবস্থান ৩২°১৭´ থেকে ৩৬°৫৮´ উত্তর এবং ৭৩°২৬´ থেকে ৮০°৩০´ পূর্বে। জম্মু হল সর্ব দক্ষিণ অংশ, যা পাঞ্জাবের ঝিলাম, গুজরাট, শিয়ালকোট ও গুরুদাসপুরের সন্নিকটে অবস্থিত। উত্তরে হিমালয়ের প্রায় ৮ হাজার ফুট উচ্চস্থান পর্যন্ত কাশ্মিরের বিস্তার যা পামিরের মালভূমির দিকে চলে গেছে। পুরো অঞ্চলটিই একটি অনিন্দ-সুন্দর উপত্যকা, যেখানে পাইন, ডক, ঝাউ, চিনার বৃক্ষ আর রডোড্রেনড্রান ফুলের ছড়াছড়িতে রঙিন। চিনাব আর ঝিলাম নদীর সঙ্গে অসংখ্য হ্রদ মিলেমিশে কাশ্মিরের নিসর্গকে স্বর্গীয় মহিমায় উদ্ভাসিত করেছে যা এখন রক্তাক্ত ও আক্রান্ত (আয়তন ৮০,৯০০ বর্গ মাইল)।

৪. A. Lamb, 1991, Kashmir : A disputed Legacy (1846-1990), Roxford Books.

www.pathagar.com

সাকসাম উপত্যকা।[৫] অবশ্য ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মিরের ভূ-খণ্ড দখল করে রেখেছে ১৯৪৭ সাল থেকে। আর ১৯৪৭ সালে উপনিবেশিক ইংরেজরা উপমহাদেশকে স্বাধীনতা দিয়ে চলে যাবার সময় কাশ্মিরকে সে দেশের জনগণের ইচ্ছা ও স্বাধীনতার অধীনে থাকার ব্যবস্থা না করে সংকটের ঘূর্ণাবর্তে ফেলে রেখে যায়। উপমহাদেশের অনেক সমস্যার মতোই কাশ্মির সমস্যাও ইংরেজ সৃষ্ট এবং ভারত কর্তৃক প্রলম্বিত। শুধু তাই নয়, কাশ্মির প্রসঙ্গে ভারত ১৯৪৭, ১৯৬৫ এবং ১৯৯৯ সালে ভয়াবহ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং সিয়ানচেন হিমবাহ নিয়ে পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে পারমাণবিক উত্তেজনাপূর্ণ যুদ্ধের বিভীষিকা ছড়িয়ে দেয়। আর কাশ্মিরের (দখলকৃত) অভ্যন্তরে প্রচণ্ড সামরিক আক্রমণ পরিচালনা করে।[৬] ফলে কাশ্মিরের সমগ্র ভূখণ্ডটি বিভক্ত এবং জনগোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং দখলদার ভারতের আগ্রাসনে কাশ্মিরের ব্যাপক অংশই দৃশ্যত পরাধীন ও নির্যাতিত হয়ে আছে।

[দখলদারিত্বের চিত্র]

দখলকারী	দখলকৃত অঞ্চল	জনসংখ্যা	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	অন্যান্য
ভারত	কাশ্মির উপত্যকা	৪ মিলিয়ন	৯৫%	৪%	-	-
	জম্মু	৩ মিলিয়ন	৩০%	৬৬%	-	৪%
	লাদাখ	০.২৫ মিলিয়ন	৪৬%	-	৫০%	৩%
পাকিস্তান	উত্তরাঞ্চলীয় কাশ্মির	১ মিলিয়ন	৯৯%	-	-	১%
	আজাদ কাশ্মির	২.৬ মিলিয়ন	১০০%	-	-	-
চীন*	আকসাই চীন	তথ্য অজ্ঞাত	তথ্য অজ্ঞাত	তথ্য অজ্ঞাত	তথ্য অজ্ঞাত	তথ্য অজ্ঞাত

*. কমিউনিস্ট শাসনের চীন দখলকৃত এ অঞ্চলে কোন বিদেশিকে প্রবেশ করতে দেয় না এবং এ সংক্রান্ত কোন তথ্যও প্রকাশ করে না। চীন এমনও দাবি করে যে, ভারতের অরুণাচল প্রদেশটি তার অংশ।

[সূত্র : উইকিপিডিয়া, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০১০ তারিখে প্রাপ্ত তথ্য]

---

৫. Kazi S. M. Khasrul Alam Quddusi, "Kashmir Issue : Historical Perspective and Youth-led Uprising, "Keynote Paper of Seminar organized by SAYPPS, University of Chittagong, October 3, 2010.

৬. Rekha Chowdhury, "The Second Uprising", Economic and Political Weekly, Vol. XLV, No.39, Sept. 25, 2010.

www.pathagar.com

৩.

কাশ্মির ভূখণ্ডে জনসমাজ গড়ে উঠেছে মুসলমিদের দ্বারা এবং রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক সত্তাও বিকাশ লাভ করেছে মুসলিমদেরই নেতৃত্বে। ফলে ঐতিহাসিকভাবেই কাশ্মির একটি মুসলিম প্রধান অঞ্চল এবং মুসলিম কর্তৃত্বাধীন এলাকা। যদিও ইংরেজ আমলে এই ধারায় ব্যত্যয় ঘটানো হয়। ইতিহাসের তথ্যানুযায়ী, আঠারো শতক পর্যন্ত কাশ্মির শাসন হয়েছে পশতুন-দুররানি শাসনের অধীনে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এসে এই মুসলিম শাসন আক্রান্ত হয়। ১৮১৯ সালে পার্শ্ববর্তী পাঞ্জাবের শিখ রাজা রনজিৎ সিং কাশ্মির দখল করে নেয়। ১৮৪৫-৪৬ সালের ইংরেজ-শিখ যুদ্ধের মাধ্যমে কাশ্মির 'লাহোর চুক্তি'-এর আওতায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দখলে আসে। অল্প দিন পরেই 'অমৃতসর চুক্তি'- এর আওতায় ব্রিটিশরা পার্শ্ববর্তী জম্মুর হিন্দু রাজা গুলাব সিং-এর কাছে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কাশ্মির বেঁচে দেয় এবং গুলাব সিংকে মহারাজা উপাধি দিয়ে জম্মু ও কাশ্মিরের শাসক পদে বসিয়ে দেয়।[৭] ফলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি অঞ্চলে হিন্দু রাজার কর্তৃত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু হিন্দু শাসন ও দখলদারিত্ব কাশ্মিরের মানুষ মেনে নেয়নি। তারা ইমাম উদ্দিনের নেতৃত্বে সংগ্রাম শুরু করে। ইংরেজ জেনারেল স্যার হেনরি লরেন্সের সহযোগিতায় হিন্দু ডোগরা বংশের সংখ্যালঘু রাজা সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মিরী মুসলিমদের দমন-পীড়ন শুরু করে এবং কাশ্মিরকে একটি নিপীড়নের জনপদে পরিণত করেন।[৮] ইমামউদ্দিনের পর গওহর রহমান স্বাধীনতার আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রামে (খণ্ডিত অর্থে সিপাহী বিদ্রোহ) গুলাব সিং ইংরেজদের সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে মুক্তিকামী যোদ্ধাদের নিধনযজ্ঞে মেতে উঠেন এবং এই ইংরেজ হিন্দু রাজশক্তির দ্বারা ১৮৬০ সালে গওহর রহমানের নেতৃত্বাধীন সংগ্রামকে দমন করেন।[৯] নেতৃবৃন্দ শহীদ হলেও কাশ্মিরী জনতা জম্মুর হিন্দু দখলদার শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন।

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের স্বাধীনতা লাভের সময় পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ৫৬২টি[১০] দেশীয় রাজ্য (Princely State) তিন ধরনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী হয় 'Indian Independence Act 1947'-এর আওতায় :

---

৭. ব্রিটিশ শিখ যুদ্ধের সময় গুলাব সিং প্রথমে নিরপেক্ষ এবং পরে জম্মু থেকে ইংরেজদের সাহায্য সহযোগিতা করে। দালালির পুরস্কার স্বরূপ তাকে মাহরাজা উপাধি ও কাশ্মির দেয় ইংরেজরা।

৮. Mridu Rai, 2000, The Question of Religion in Kashmir : Sovereignty, Legitimacy and Right, (1846-1947), Ph, Thesis, Columbia University.

৯. Kashmir and Jammu Imperial Gajttee of India, Vol.15, p. 96.

১০. দেশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে হায়দারাবাদ, জুনাগড়, কুচবিহার, ত্রিপুরা, জম্মু ও কাশ্মির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

www.pathagar.com

১. রাজ্য ইচ্ছা করলে ভারতের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে;
২. রাজ্য ইচ্ছা করলে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে; এবং
৩. রাজ্য ইচ্ছা করলে স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখে স্বতন্ত্র থাকতে পারবে।

কিন্তু বাস্তব অবস্থা হয় ভিন্নতর। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ১৯৪৭-এর ১৫ অগাস্টের পরপরই একের পর এক দেশীয় রাজ্য দখল করে নেয়। দেশীয় রাজ্যগুলো স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ ঘটাতে পারেনি। হায়দারাবাদ, জুনাগড়সহ অসংখ্য দেশীয় মুসলিম প্রধান রাজ্য স্বাধীন থাকতে কিংবা পাকিস্তানের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যবাহিনী দ্রুত আক্রমণ করে রাজ্যগুলো দখল করে নেয়। আধুনিক ইতিহাসে এমন জঘন্য দখলদারিত্বের ঘৃণ্য উদাহরণ বিরল।[১১]

কাশ্মির ছিল এমনই একটি বড় আকারের দেশীয় রাজ্য, যার সিংহভাগই ছিল মুসলিম- যারা পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু রাজা হিন্দু ছিলেন বলে তিনি জনতার গণতান্ত্রিক ইচ্ছাকে পদদলিত করে সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক মানসিকতায় ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ষড়যন্ত্র আঁচ করতে পেরে ১৯৪৭ সালের অকটোবর মাসে হিন্দু ডোগরা রাজার কবল থেকে স্বদেশের মুক্তির জন্য কাশ্মিরের জনগণ আন্দোলন গড়ে তোলেন। ২৭ অকটোবর রাজা জনদাবির বিরুদ্ধে ভারতের সঙ্গে 'Instrument of Accession'. চুক্তি স্বাক্ষর করেন।[১২] এ অবস্থায় তীব্র গণআন্দোলন ও অসন্তোষ তৎকালীন রাজা হরি সিং-এর পতন আসন্ন করে ফেলে। রাজার আহ্বানে ভারত তখন সৈন্য পাঠিয়ে কাশ্মির দখল করে নেয় এবং স্বাধীনতাকামীদের চরমভাবে দমন করতে থাকে। একজন গবেষকের ভাষায়, কাশ্মির প্রসঙ্গে পাকিস্তানের হস্তক্ষেপের কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু ভারত বেআইনীভাবে কাশ্মিরে সৈন্য পাঠিয়ে দেশটি দখল করে নেয়– যদিও সৈন্য পাঠানোর আগে পর্যন্ত কাশ্মির সরকারিভাবে ভারতে যোগ দেওয়ার কথা জানায়নি বা এ মর্মে কোন চুক্তিও স্বাক্ষর করেনি। (There was no Iron-clad legal evidence to unequivocally prove that Pakistan was officially involved. It would have been illegal for India to unilaterally intervene in an open, official capacity unless Jammu and Kashmir officially joined The Union of India, at which point it would be possible to send in its forces and occupy the remaining part.)[13] কিন্তু ভারত কোন আইনগত বৈধতা বা নীতি নৈতিকতার পরোয়া না করেই কাশ্মিরে সৈন্য পাঠিয়ে দেয় এবং জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিন্দু রাজার সহযোগিতায় দেশটিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। এহেন ষড়যন্ত্রমূলক, সাম্প্রদায়িক ও সামরিক বল প্রয়োগমূলক ভারতীয়

১১. মাহফুজ পারভেজ, 'ভারতের বৈরী আচরণ' সেমিনার স্মারক ২০০৮, বিআইসি, ঢাকা।
১২. A. Lamb, পূর্বোক্ত।
১৩. পূর্বোক্ত।

www.pathagar.com

তৎপরতার ফলে কাশ্মিরকে ঘিরে সঙ্কট ঘণীভূত হতে থাকে এবং গণতান্ত্রিক চেতনার মৃত্যু হয়। কিন্তু স্বাধীনতাকামী কাশ্মিরী জনগণ সূচনা থেকেই এর প্রতিবাদ এবং অব্যাহত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। আর ভারতের এহেন আগ্রাসনমূলক কার্যকলাপের ফলে কাশ্মির প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে।

৪.

কাশ্মির প্রসঙ্গে সৃষ্ট উত্তেজনায় উপমহাদেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। উপনিবেশিক শাসনের দীর্ঘ অন্ধকার কালের অবসান ঘটলেও কাশ্মিরকে ঘিরে নতুন উত্তেজনা দানা বেঁধে ওঠে। ভারত যখন কাশ্মির দখল করতে সৈন্য পাঠায়, তখন হাজার হাজার স্বাধীনতাকামী কাশ্মিরী প্রচণ্ড নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হয় এবং ভারতীয় সৈন্যদের অত্যাচার ও আক্রমণে বহু কাশ্মিরী দেশত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চলে আসতে থাকে। ফলে ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে কাশ্মির প্রসঙ্গে ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধে লিপ্ত হয়। প্রথম কাশ্মির যুদ্ধ নামে পরিচিত এই লড়াই ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়- ভারত সে সময় বিষয়টিকে জাতিসংঘে নিয়ে যায়। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৪৮ সালের ২১ এপ্রিল কাশ্মির প্রসঙ্গে ৪৭নং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং উভয় পক্ষকে অস্ত্র বিরতি করার জন্য আহ্বান জানায়। পুরো সঙ্কটকে পর্যালোচনা করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ভারত বা পাকিস্তান নয়- 'কাশ্মিরের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কাশ্মিরের জনগণের' বলে মত দেয় এবং গণতান্ত্রিক গণভোটের মাধ্যমে সে মতামতের ভিত্তিতে সঙ্কট নিরসনের সিদ্ধান্ত জানায়। ("The final disposition of the state of Jammu and Kashmir will be made in accordance with the will of the people expressed through the democratic method of a free and impartial plebiscite conducted under the auspices of The United Nations.")[14]

ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত মেনে নেয় এবং ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে অস্ত্র বিরতি কার্যকর করে। কিন্তু গণভোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কাশ্মিরের গণরায় গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অদ্যাবদি সম্ভব হয়নি। এর জন্য ভারতের অনীহা অন্যতম অন্তরায়। কারণ, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতিতে সঠিক রায় প্রদান করা জনগণের পক্ষে সম্ভব নয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘ গণভোটের মূল সিদ্ধান্তের আলোকে আরো কিছু উপ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু সেগুলো 'কাগুজে বাঘ' এর মতো তর্জন-গর্জন ছাড়া সমস্যার সমাধানে কোন কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেনি। ইত্যবসরে ১৯৬২ সালে চীন ও ভারত কাশ্মির ইস্যুতে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং

---

১৪. বিস্তারিত, Kazi S.M. Khasrul Alam Quddusi (2010). p.3

www.pathagar.com

পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের একাধিক ছোট-বড় যুদ্ধ হয়। এইসব যুদ্ধ এবং দখলকৃত কাশ্মিরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বর্বর আক্রমণে ১৯৪৭ থেকে ২০১০ পর্যন্ত প্রায় ২০ হাজার মানুষের মৃত্যু এবং গৃহহীন, উদ্বাস্তু ও দেশান্তরী হয় কমপক্ষে ৫ লাখ কাশ্মিরী। এখনও প্রতিদিন রক্তপাত ও মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে কাশ্মিরে।[১৫]

৫.

কাশ্মির প্রসঙ্গে বিভিন্ন পক্ষের অবস্থান পর্যালোচনা করা হলে দেখা যায়, কিভাবে একটি স্বাধীনতাকামী জনপদ ও জনগণকে বছরের পর বছর অবদমিত রাখা হচ্ছে এবং তাদের গণতান্ত্রিক ইচ্ছার বহি:প্রকাশ ঘটাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে আমরা ভারত, পাকিস্তান ও চীনের বক্তব্য ও অবস্থান পরীক্ষা করে দেখবো এবং কাশ্মিরের জনগণের স্বাধীনতার মূল দাবিটিকে বিভিন্ন পক্ষ কেমন করে নস্যাৎ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে- সেটা পর্যালোচনা করবো।

কাশ্মির প্রসঙ্গে ভারতীয় মনোভাব :[১৬]

- ভারত মনে করে, জম্মু ও কাশ্মিরের মহারাজার সঙ্গে ২৬ অকটোবর ১৯৪৭ সালে স্বাক্ষরিত Instrument of Accession' চুক্তি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন এবং ১৯৪৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা আইনের আওতায় বৈধ।
- পরবর্তীতে জম্মু ও কাশ্মিরের শাসনতান্ত্রিক পরিষদ মহারাজার Instrument of Accession' চুক্তিটিকে গ্রহণ করে এবং শাসনতান্ত্রিক পরিষদ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। ফলে কাশ্মিরের জনগণ ভারতের পক্ষে থাকার মত দিয়েছে।[১৭]
- ভারত মনে করে, জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণভোট অনুষ্ঠানের পরিস্থিতি কাশ্মিরে নেই। (সেই পরিস্থিতি যে, সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ভারতই দিনের পর দিন নষ্ট করে যাচ্ছে সেটা অবশ্য তারা স্বীকার করতে নারাজ।)
- ভারত দ্বি-জাতি তত্ত্ব মেনে নিয়ে পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দিলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মিরে এই নীতি মেনে নেয়নি– কারণ, ভারতের মতে, কাশ্মিরের ভূগোল ভারতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

---

১৫. সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা দ্রষ্টব্য। যুদ্ধের মধ্যে কারগিল ও সিনায়চেনে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। আর কাশ্মিরে মিছিল-মিটিং ও বাড়ি ঘর থেকে ধরে নিয়ে হত্যা-নির্যাতনের ঘটনা প্রচুর।

১৬. ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অব একস্ট্রারন্যাল আফেয়ার্স কাশ্মির সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে যে মনোভাব ও অবস্থান ব্যক্ত করেছে, এখানে তার সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে, দেখুন (www.meaindia.nic.in).

১৭. ভারতের এই দাবি অত্যন্ত বিতর্কিত এবং অস্বচ্ছ। কোথাও স্পষ্টত ভারতে অন্তর্ভুক্তির কথা চুক্তিতে নেই। তদুপরি শাসনতান্ত্রিক পরিষদের ক্ষেত্রে নানা প্রশ্ন রয়েছে। ভারত কর্তৃক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এমনটি করানো হয়েছে পরিষদের দ্বারা। যেমনভাবে সিকিমকেও পরে ভারত গ্রাস করে।

www.pathagar.com

- ভারত দাবি করে যে, সংবিধানের ৩৭০ ধারা অনুযায়ী কাশ্মিরকে যথেষ্ট স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হচ্ছে, ফলে স্বাধীনতার প্রয়োজন নেই।[১৮]
- ভারত এটাও দাবি করে যে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ২ জুলাই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে 'সিমলা চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয় তাতে সকল সমস্যা (কাশ্মিরসহ) উভয় দেশের দ্বি-পক্ষীয় সমঝোতায় নিষ্পন্ন করার কথা বলা আছে। ("All differences between India and Pakistan including Kashmir need to be settled through bilateral negotiations as agreed to by the two countries when they signed The Simla Agreement on 2 July, 1972."[19] অর্থাৎ ভারত কোন পর্যায়েই কাশ্মিরের জনমতকে মেনে নিতে বা গ্রাহ্য করতে রাজি নয়। কাশ্মিরের জনগণের মতকে সামনে আনার কোন পথই ভারত খোলা রাখেনি। এমনকি, জাতিসংঘ কর্তৃক গণভোটের বিষয়টিকেও প্রলম্বিত করতে করতে বর্তমানে নিজের অভ্যন্তরীণ ও পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বি-পক্ষীয় বিষয়ে পরিণত করেছে। ভারত এভাবেই কাশ্মির, কাশ্মিরের জনগণ ও তাদের স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক দাবিকে রাজনীতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে বছরের পর বছর দমন করে চলেছে।

কাশ্মির প্রসঙ্গে পাকিস্তানের মনোভাব[২০]

- পাকিস্তান মনে করে কাশ্মিরের মহারাজা জনসমর্থনহীন শাসক এবং ভারতের বংশবদ। কাশ্মির প্রসঙ্গে কোন চুক্তিতে উপনীত হওয়ার বৈধ অধিকার ও ক্ষমতা এই শাসকের নেই এবং জনগণ তাকে এমন ক্ষমতা তো দেইনি বরং তাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর আন্দোলন করেছে। ফলে মহারাজা কর্তৃক স্বাক্ষরিত 'Instrument of Accession', যার ভিত্তিতে কাশ্মিরকে ভারত দখল করেছে, সেটা অবৈধ এবং দালালির দাসখতমূলক চুক্তি বৈ আর কিছু নয়।
- কাশ্মির প্রসঙ্গে ভারত চরম বেঈমানী ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়েছে বলে পাকিস্তান মনে করে। কারণ হায়দারাবাদ ও জুনাগড়ের শাসকগণ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও জনগণ অধিকাংশ হিন্দু থাকায় শাসকরা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারেনি। ভারত সেগুলো দখল করে নেয়। কিন্তু কাশ্মিরের ব্যাপক জনগণ মুসলিম হলেও সংখ্যালঘু রাজার মতকে ভারত প্রাধান্য দিচ্ছে- যেমনটি হায়দারাবাদ বা জুনাগড়ের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়নি।

---

১৮. ভারতের এই দাবির হাস্যকর দিকটি সম্পর্কে সকলেই অবগত। কারণ, কাশ্মির এখন সেনা নিয়ন্ত্রিত। সেখানে বাইরের কেউ যেতে পারে না এবং স্থানীয় মানুষের জীবনও চলছে সেনা আইনে- গণতান্ত্রিক/মানবাধিকারের ভিত্তিতে নয়।

১৯. Kazi S.M. Khasrul Alam Quddusi (2010), p-4

২০. Aftab Sadar, The Kashmir Issue, Myth and Reality, Delhi, 2002.

www.pathagar.com

- পাকিস্তান মনে করে মহারাজার কোন কর্তৃত্ব ও বৈধতাই নেই। তিনি যে কাশ্মিরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা আইনসঙ্গত নয়, জনসমর্থিতও নয়। বরং ভারত ও মহারাজার ষড়যন্ত্র থেকেই কাশ্মির সমস্যার উদ্ভব।
- পাকিস্তান ঐতিহাসিক দলিল ও তথ্য প্রমাণের মাধ্যমে এটাও মনে করে যে, ভারত মহারাজার সঙ্গে চুক্তির আগেই কাশ্মিরে সামরিক হস্তক্ষেপ করেছে এবং পরবর্তীতে 'তথাকথিত' কাগজপত্রের ভিত্তিতে অত্যন্ত অন্যায় ও জবরদস্তি মূলকভাবে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাশ্মির দখল করেছে।
- কাশ্মিরের বর্তমান জনআন্দোলন ও স্বতস্ফূর্ত সংগ্রাম প্রমাণ করেছে যে, জনগণ ভারতের সঙ্গে থাকতে চায় না– ফলে কাশ্মির সমস্যা জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী করার পক্ষে পাকিস্তান।
- পাকিস্তানের মতে, কাশ্মিরী জনগণ আসলে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ভারত সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে এবং হিন্দু মহারাজার সাম্প্রদায়িক আবেগ ও ষড়যন্ত্রমূলক মানসিকতাকে কাজে লাগিয়ে অঞ্চলটিকে দখল করে রেখেছে। পাকিস্তান কাশ্মিরের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ জনআন্দোলনরূপে স্বীকার করে।
- পাকিস্তান দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করে যে, ভারত কাশ্মিরে কেবল স্বাধীনতাকেই দমন করছে না– হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণের মাধ্যমে চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে, যা বিশ্বের বিবেকবান মানুষের নিন্দা ও প্রতিবাদ করা উচিত।
- পাকিস্তানের মতে, ভারত কাশ্মির দখলের ক্ষেত্রে উপমহাদেশ স্বাধীন হওয়ার নেপথ্যে কার্যকর দ্বি-জাতি তত্ত্ব মানেনি- জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সিদ্ধান্ত পালন করেনি।
- পাকিস্তান মনে করে, কাশ্মিরে সময় সময় যে নির্বাচন হচ্ছে, সেটা বৈধতাহীন ও জনগণের সমর্থনবিহীন। কারণ ৭০-৮০ ভাগ জনগণই ভোট বয়কট ও বর্জন করে।

কাশ্মির প্রসঙ্গে চীনের মনোভাব[২১]

- চীন সরকার কাশ্মিরের উত্তর দিকের সীমান্তকে মেনে নেয়নি। চীন মনে করে সেখানে কিছু অংশের মালিক সে।
- চীন কারাকোরাম ও আকসাই চীন অঞ্চলের মতো অরুণাচল ও হিমাচল প্রদেশের কিছু অংশকে নিজের বলে দাবি করে।
- ১৯৬৩ সালে ট্রান্স কারাকোরামে চীন পাকিস্তানের সঙ্গে সীমানা বিষয়ক সমঝোতা করলেও ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সংঘাত বিদ্যমান রেখেছে।

---

২১. পূর্বোক্ত।

www.pathagar.com

কাশ্মিরীদের মনোভাব[২২]

- জম্মু ও কাশ্মির কখনোই ভারতের অধীনে ছিল না, এমনকি অঞ্চলটি ব্রিটিশ উপনিবেশিক শক্তির অধীনেও ছিল না। ঐতিহাসিকভাবেই স্বাধীন ও স্বশাসিত ছিল।
- কাশ্মিরকে ভারত-পাকিস্তান এবং সামান্য হলেও চীন কর্তৃক অধিকার করে রাখা অন্যায়। কাশ্মিরকে মূল ভৌগোলিক আকার ও আয়তনে কাশ্মিরীদের অধীনে স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়াই সঙ্কট নিরসনের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত।
- মহারাজা রাজধানী থেকে পালিয়ে গিয়ে ভারতের সঙ্গে যে চুক্তি করেন, তা আইনগতভাবে ভিত্তিহীন ও জনগণের সামান্যতম সমর্থনবিহীন। মহারাজার চুক্তি করার কর্তৃত্ব নেই।
- কাশ্মিরে শাসনতান্ত্রিক পরিষদ কর্তৃক ভারতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিছক সাজানো নাটক। কাশ্মিরের কেউই তা মানেনি- গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মিরের জনগণকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার প্রদানই ন্যায়সংগত কাজ ছিল- যা ভারতের চাপে ও অসহযোগিতায় হতে পারেনি। তবে কাশ্মিরী জনগণ দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের স্বাধীনতার কথা এবং ভারতের সঙ্গে না থাকার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে।
- কাশ্মিরের জনগণের স্বাধীনতার আন্দোলন আইনগত ও রাজনৈতিকভাবে বৈধ। এর সঙ্গে জঙ্গিবাদ বা অন্য কিছুর সম্পর্ক নেই। ভারত বরং গণআন্দোলনকে ক্ষুদ্র গন্ডিতে ব্যাখ্যা করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

৬.

কাশ্মিরের বর্তমান পরিস্থিতি এই ২০১০ সালে অত্যন্ত অগ্নিগর্ভ। ভারত নানা আলোচনার ফাঁদে এবং নির্বাচনের প্রহসনের মাধ্যমে সঙ্কট সমাধানে ব্যর্থ হচ্ছে। অন্য দিকে কেবলমাত্র ১৯৯০-১৯৯৯ সালের মধ্যে ১০ হাজার স্বাধীনতাকামী নিহত হয়েছে। ধর্ষিত হয়েছে ১৫ হাজার নারী। গৃহহীন ও আটক হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। ১৯৪৭ থেকে হিসাব করা হলে সেই সংখ্যা উদ্বেগজনক।[২৩] ভারতীয় বিশ্লেষক স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, "ভূ-স্বর্গ এখন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় অবরুদ্ধ এক উপত্যকা। ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে কাশ্মিরের অধিবাসীদের সাম্প্রতিক প্রতিবাদ এবং তৎসহ আন্দোলন ভয়াবহতার এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে- রক্তাক্ত হয়েছে কাশ্মিরের নাগরিক জীবন।"[২৪]

এ কথা ঠিক যে, কাশ্মির সমস্যা নতুন নয় এবং সমস্যাটির সমাধান হচ্ছে না । বিশেষ করে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সমস্যা জিইয়ে রাখছে সামরিক শক্তি প্রয়োগ ও

---

২২. পূর্বোক্ত।
২৩. Human Rights Watch Report 2001.
২৪. পুষ্পল গঙ্গোপাধ্যায়, দেশ, ২ অকটোবর ২০১০.

www.pathagar.com

জনগণের রক্তের বিনিময়ে। ভারত সরকারের দেয়া জোড়াতালির সমাধানের বদলে কাশ্মিরের মানুষ চাইছে পূর্ণ এবং স্বচ্ছ স্বাধীনতা। সরকারের অনেক রকম প্রলোভনের মতো ২০১০ সালে ঘোষিত হয়েছে ৮ দফা শান্তি প্রস্তাব। অস্ত্রধারী ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর উপর পাথর ছোড়ার দায়ে গ্রেফতারকৃত কাশ্মিরী যুবক-যুবতীদের মুক্তি, নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত ১০৮ জনের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ, নিরাপত্তা বাহিনীর চেকপোস্ট এবং ব্যাঙ্কারের সংখ্যা কমানো– এমন অনেক উপাদানই রয়েছে এই আটটি প্রস্তাবে। তবে শান্তি প্রস্তাবের দু'টি দিক সর্বাক্ষেপা গুরুত্বপূর্ণ : ১. কাশ্মিরের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যথাযথ আলোচনার জন্য থাকবে একটি নতুন আলোচনাকারী দল এবং ২. কেন্দ্রের নির্দেশে সংযুক্ত কমান্ড কাশ্মিরের উপদ্রুত ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা খতিয়ে দেখবে।[২৫]

এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, কাশ্মিরী জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশই এখন ইন্ডিয়ার সঙ্গে থাকতে নারাজ। মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ ও তার দল কম জনসমর্থন নিয়ে যাই বলুক না কেন, জনপ্রিয় দল হুররিয়াত কনফারেন্সের নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানি কাশ্মিরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করেন না। স্বাধীনতার তীব্র আন্দোলনরত কাশ্মিরের পরিস্থিতি গিলানির বক্তব্যকেই সত্য বলে প্রমাণিত করেছে। গত ছয় দশকে কাশ্মির নিয়ে অন্তত শতাধিক আলোচনা চক্র হলেও ফল হয়নি কিছুই। এসকল বাতকা বাত মানুষের মধ্য থেকে স্বাধীনতার স্পৃহা লুপ্ত করতে পারেনি– যেমন পারেনি সামরিক আক্রমণ। তাহলে সমাধান কোন পথে? বলা বাহুল্য, কাশ্মিরের স্বাধীনতাই হল একমাত্র সমাধান। আনন্দের বিষয় হলো, কোন ভারতীয় বিবেকের কাছে সৎ থেকে অবশেষে বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে, স্বায়ত্তশাসন বা অন্য কিছু নয় আজাদি বা পূর্ণ স্বাধীনতাই চাইছেন কাশ্মিরের জনগণ। এ রকম একটি মূল্যায়নকে উপসংহার হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে :[২৬]

বিগত ষাট বছরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের পর গঠিত ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র স্বাধীন কাশ্মিরের উপর দখল কায়েম করতে চায়। কাশ্মিরের মহারাজা জনচাপ সামলাতে না পেরে ভারতের পক্ষে চলে যান এবং ১৯৪৭ এর ২৬ অকটোবর ভারতে শর্ত সাপেক্ষে অন্তর্ভুক্তি বা 'Instrument of Accession'-এ সই করেন যা জনগণ মেনে নেয়নি। জাতিসংঘ (১৯৪৮ সালের ২১ এপ্রিল) কাশ্মিরের জনগণের মতামত অনুযায়ী কাশ্মিরের ভবিষ্যত নির্ধারিত হবে মর্মে গৃহীত সিদ্ধান্তটিও বাস্তবায়ন করা যায়নি। এজন্য গণভোট অনুষ্ঠান করা যায়নি। অন্যদিকে ১৯৪৭-এ ভারতভুক্তির পর থেকেই শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে কাশ্মিরী জাতিসত্তার স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়, সেই আন্দোলনের চাপেই ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মিরকে ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০

২৫. বিস্তারিত, পূর্বোক্ত।
২৬. রুদ্র সেন, দেশ, ২ অকটোবর, ২০১০

www.pathagar.com

ধারায় কয়েকটি বিশেষ সুবিধা প্রদান করে- জনগণ যাকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। এতে স্বাধীনতার বদলে কাশ্মিরীরা পায় খানিকটা স্বায়ত্ত্বশাসন- যা আসলে কাশ্মিরী জনতার স্বাধীনতার দাবিকে প্রশমিত করার ষড়যন্ত্র মাত্র। কাশ্মিরীদের স্বাধীনতার আন্দোলন ও জনদাবিকে অবদমিত করে রাখার দমনমূলক নীতি থেকে ভারত কখনও সরে আসেনি। সেনা পাঠিয়ে, নির্বাচনের নামে প্রহসন চালিয়ে, রাজ্যে পুতুল সরকার বসিয়ে আসলে সামরিক শাসনই চালানো হচ্ছে কাশ্মিরে। যতবার স্বাধীনতার পক্ষে আন্দোলন দানা বেঁধেছে, ততবারই চলেছে সেনা আগ্রাসন। পুলিশি নির্যাতন, মানবাধিকার লংঘন, গুম, খুন, ভূয়া সংঘর্ষ সাজিয়ে খুন, গুলিবর্ষণ ও গণহত্যা। আর বারবারই কাশ্মিরের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে গণআন্দোলনে 'আইন শৃংখলার সমস্যা' বা সন্ত্রাসবাদ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।' আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের বলা হয়েছে 'পাক-মদদপুষ্ট জঙ্গি।' এতেও আন্দোলন থামেনি। উপত্যকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, যারা কাশ্মিরী জনগণের স্বাধীনতার আন্দোলনকে সমর্থন করতো তাদের শাসনক্ষমতার লোভ দেখিয়ে আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছে। যেমন, ন্যাশনাল কনফারেন্স, যার নেতা ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহকে কাশ্মিরী জনতার কাছে নেতা হিসাবে দাঁড় করানো হয়- যদিও ব্যাপক জনগণের মধ্যে তাকে নিয়ে আপত্তি রয়েছে। যে স্বাধীনতার দাবি নিয়ে শেখ আবদুল্লাহর উত্থান, সেই মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে গিয়ে কাশ্মিরী জনতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তাঁর পুত্র ফারুক ও পৌত্র ওমর আবদুল্লাহ। এঁরা বিভিন্ন সময় রাষ্ট্র ক্ষমতা ভোগ করেছেন এবং কাশ্মির উপত্যকায় ভারত রাষ্ট্রের শোষণের প্রতিনিধিতে পরিণত হয়েছেন। প্রতিবারের মতো এবারও এঁরা আন্দোলনকারীদের 'পাকপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে আন্দোলন বন্ধ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। আন্দোলনকারীদের উপর বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আক্রমণ যেমন, পুলিশি হামলা, গ্রেফতার, নির্বিকার হত্যাকে সরাসরি সমর্থন জানিয়েছেন।

ফারুক-ওমর সশস্ত্রবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন-এর মত গণতান্ত্রিক অধিকার খর্বকারী, স্বৈরাচারী আইন সরাসরি সমর্থন করে কাশ্মিরী জনতার মুখ বন্ধ করতে চাইছেন। স্বাধীনতাকে গুরুত্ব না দিয়ে কিছুটা স্বায়ত্তশাসন দিয়ে, কাশ্মিরের আইন-শৃংখলার অবনতির দোহাই দিয়ে, স্বাধীনতাকামী হুররিয়াত কনফারেন্স ও অন্যান্য বিরোধী ও আন্দোলনকারী নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় বসে আন্দোলনের মূল দাবিকে চাপা দিতে চাইছেন। কিন্তু স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোনভাবে কাশ্মির সমস্যার সমধান সম্ভব নয়। ■

লেখক-পরিচিতি : ড. মাহফুজ পারভেজ- কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক এবং অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম।

লেখা পরিচিতি : প্রবন্ধটি ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপনা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

১. ভূমিকা (Introduction)

ইসলাম মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা (The only Complete code of life)।[১] মানব জীবনের এমন কোন দিক বিভাগ নেই যার জন্যে ইসলাম সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা পেশ করেনি।[২] পৃথিবী নামক এ গ্রহে মানুষ এমনি আসেনি। একটি পরিকল্পনার আওতায় আল্লাহ্ এখানে মানুষ পাঠিয়েছেন। এখানকার জড় জগতের যে পরিবেশ, তা দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় নয়। একটি সমন্বিত আইন (Uniform Order)-এর আওতায় সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা মেনেই সবকিছু চলছে। এ একই ব্যবস্থাপনার রজ্জুতে বাঁধা আছে মহাকাশের বিশাল আকৃতির অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র। মহাশূন্যের মহা সমুদ্রে এগুলো ভাসছে নিজ নিজ কক্ষপথে কত শত কোটি বছর ধরে কে না জানে। কিন্তু একের পথে আরেকটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। একটার সাথে আরেকটার সংঘর্ষও হচ্ছে না। তাই জড়জগত সুশৃংখল ব্যবস্থাপনার এক জীবন্ত উদাহরণ হয়ে আছে জ্ঞান বুদ্ধি আর বিবেকের অধিকারী মানুষের কাছে।

---

১. নিঃসন্দেহে (মানুষের) জীবন বিধান হিসেবে আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা। (সূরা ৩ : আলে ইমরান-১৯)।

২. আমি (আমার) গ্রন্থে বর্ণনা বিশ্লেষণে কোন কিছুই বাকী রাখিনি। (সূরা ৬ : আল আনআম-৩৮)।

www.pathagar.com

জড়জগতের এ একই বিধান শাসন করছে প্রাণীর দেহজগতকে। তাই ছোট বড় প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য-ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্নায়ুতন্ত্রী এবং সংখ্যাহীন জীবকোষ একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বিত ব্যবস্থাপনার গ্রন্থিতে থেকে কাজ করে বলেই প্রাণীর দেহ সত্তা বাঁচার সংগ্রামে নিয়োজিত থাকতে পারে। এখানেও একটির সাথে অপরটির, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষের সাথে বড় ছোট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিবর্তে সংযোগ ও সহযোগিতারই এক অনন্য ব্যবস্থাপনার জীবন্ত উদাহরণ দেখা যায়।

জড়জগত আল্লাহর নিরংকুশ কর্তৃত্ব-শৃংখলা এবং শক্তির যে অনাবিল উদাহরণ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে আছে, মানুষের আচরণগত জীবনেও আল্লাহ একই ধরনের ব্যবস্থাপনা ও শান্তির পরিবেশ কায়েম করতে চান। তাই মানুষের সামগ্রিক জীবনের জন্য বিধান দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের জীবনের ক্রিয়া-কর্মে, আচার-আচরণে একমাত্র আল্লাহরই নিরংকুশ কর্তৃত্ব বা ব্যবস্থাপনা চলবে। সমস্ত সুসংগঠিত কার্যাবলীর জন্যই ব্যবস্থাপনা একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। সকলের জন্য মানবাধিকার, ন্যায় ও ইনসাফ নিশ্চিতকরণ এবং পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনে সফলতা লাভে ইসলামী ব্যবস্থাপনা অনুসরণের বিকল্প কিছু নেই। ইসলামে ব্যবস্থাপনা একটি পরিকল্পিত ধারণা। সংগঠনের চাবিকাঠি হলো ভালো ব্যবস্থাপনা।

২. ব্যবস্থাপনার অর্থ (Meaning of Management)

ইংরেজী Management শব্দটি ল্যাটিন Maneggiare শব্দ থেকে উদ্ভূত[৩] যার বাংলা হচ্ছে ব্যবস্থাপনা। ব্যবস্থাপনা হলো কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলীকে পরিচালনা করা।[৪] ব্যবস্থাপনা এমন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যা প্রতিটি সংগঠন/প্রতিষ্ঠানেই পরিব্যাপ্ত। একটি দেশের প্রধান ব্যক্তি থেকে শুরু করে একজন সাধারণ মানুষের জীবন ও কর্মপ্রবাহে ব্যবস্থাপনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

ইংরেজী Management শব্দের বর্ণমালা লম্বভাবে (Vertical) ব্যাখ্যা এবং নিম্নোক্ত ইতিবাচক শব্দ গঠন করে ব্যবস্থাপনার কাঙ্ক্ষিত ভাবধারা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করা যায়-

M- Ministrate সেবা করা-সাহায্য করা, Motivation প্রেষণা, Morality নৈতিকতা, Merit মেধা, Manage নিয়ন্ত্রণ করা। সেবা প্রদান, ব্যবস্থাপনা পরিচালনার মৌল উপাদান হলো নৈতিক শক্তি, দক্ষতা ও মেধা।

A- Ability যোগ্যতা, Acquire অর্জন করা, Abide by পালন করা-মেনে চলা, Attention মনযোগ, Adhere to লেগে থাকা। ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মর্তাদের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব থাকে বিধায় তাদের আইন-বিধি সময়মত সঠিকভাবে

৩. ড. এম এ মান্নান ও ড. মো. আতাউর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচিতি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ প্রকাশিত, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ-৫।

৪. ড. আনোয়ার হোসেন ও মো. জাকির হোসেন, ব্যবস্থাপনা নীতি, স্কুল অব বিজনেস, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, জানুয়ারী-১৯৯৬, পৃ.-৩।

www.pathagar.com

প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করার মত যেমন যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, তেমনি কাজে মনোযোগীও হতে হবে।

N- Neutral নিরপেক্ষ, Nursing লালন পালন, Nourish পরিচর্যা, Novelty (নতুনত্ব) নিরপেক্ষভাবে দায়িত্বপালন এবং পরিচর্যার মাধ্যমে সকলের সেবা এবং সকলের জন্য প্রতিযোগিতার সমান সুযোগ সৃষ্টি করাই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য।

A- Approach নিকটবর্তী হওয়া, Appraisal মূল্যায়ন, Assert অধিকার দাবী করা, Accountability জবাবদিহিতা

G- Good governance, সুশাসন-ভাল ব্যবস্থাপনা, Gear up গতিবেগ বাড়ানো

E- Ethics নীতি, Eagerness আগ্রহ

M- Modify বদলে দেয়া, Maintenance রক্ষণাবেক্ষণ

E- Excellence উত্তমভাবে করা, উৎকর্ষ সাধনে অদম্য, Energetic উদ্যমী

N- Negotiate আলাপ-আলোচনা, Neat সুবিন্যস্ত, Nice চমৎকার, Normalise নিয়মানুগ করা Neutrality নিরপেক্ষতা বজায় রাখা

T- Tact কৌশল, Truthfulness সত্যবাদিতা, Trust বিশ্বাস, Trustworthiness বিশ্বাসযোগ্যতা, Tolorance সহিষ্ণুতা Transparent স্বচ্ছ। বিশ্বাসযোগ্যতা, সহিষ্ণুতা এবং লাগসই বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ করার ক্ষমতা ব্যবস্থাপনার সুনাম বাড়িয়ে দেয়। বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব হলে সন্দেহ ও অবিশ্বাস মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

৩. ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা (Definition of Management)

বিভিন্ন লেখক ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। ব্যবস্থাপনার কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

১. লুইস এ.এলেন এর মতে, ব্যবস্থাপক যা করেন তা-ই ব্যবস্থাপনা। (Management is what a manager does.)[৫]

২. এল এপলী এর মতে, ব্যভস্থাপনা হলো অন্য লোকদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেয়া।' (Management is essentially an act of getting things done through the afforts of other people.)[৬]

৩. আধুনিক পাশ্চাত্য ব্যবস্থাপনার জনক হিসেবে পরিচিত হেনরী ফ্যায়ল[৭] (Henry

---

৫. Louis A. Allen, Management and Organization (Tokyo : McGraw-Hill, 1958) p-4।

৬. উদ্ধৃত ব্যবস্থাপনার ধারণা ও মূলনীতি (প্রবন্ধ), প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল,বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইউস্টিটিউট প্রকাশিত, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বোর্ড বাজার, গাজীপুর, ১০ জুন ২০০৪, পৃ-৩৩।

৭. হেনরী ফ্যায়ল ছিলেন ফ্রান্সের শিল্পপতি। সাধারণ ব্যবস্থাপনা নীতির ওপর তাঁর দৃঢ় পর্যবেক্ষণ ফরাসী ভাষায় 'শিল্প ও সাধারণ পরিচালনা (Administration, industrial & generale) নামে বই আকারে ১৯৯৬ সালে প্রথম জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

Fayol ১৮৪১-১৯২৫) এর মতে, ব্যবস্থাপনা হলো পূর্বানুমান এবং পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করা। (To manage is to forecast and plan, to organise, to command, to coordinate and control.)[৮]

৪. জর্জ আর টেরীর মতে, 'ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া যা মানুষ ও অন্যান্য সম্পদসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করে, ঐ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা, সংগঠন, প্রবৃত্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যাদি সম্পাদন করে'। (Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, performed to determine and accomplish the objectives by the use of people and resources.)[৯]

৫. ড. এম. এ. মাননান ও ড. মো. আতাউর রহমানের মতে, পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মানবীয় ও অমানবীয় সম্পদের ব্যবহার করে পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণের দ্বারা কার্য সম্পাদনের অবিরাম প্রক্রিয়াকে ব্যবস্থাপনা বলা হয়।[১০]

মূলতঃ ব্যবস্থাপনা একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। এর পূর্ব নির্দ্ধারিত অনেকগুলো বিষয় থাকে। আর এ উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মানবীয় এবং বস্তুগত সম্পদসমূহের দ্বারা পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কার্য সম্পদন করা হয়।

৪. ইসলামী ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা (Definition of Islamic Mangement)

ব্যবস্থাপনার সাথে ইসলামী শরীয়াতের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কুরআনুল কারীমে ব্যবস্থাপনা বুঝায় এমন শব্দের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ বলেন, إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ এ আয়াতাংশে[১১] ব্যবহৃত তুদীরা-ইদ্যরা শব্দ থেকে ব্যবস্থাপনা শব্দ এসেছে। ইসলামী ব্যবস্থাপনার কতিপয় সজ্ঞা নিম্নরূপ :

ড. মো. গোলাম মহিউদ্দিনের মতে, ইসলামী ব্যবস্থাপনা বলতে পরিকল্পনা, সংগঠন, নেতৃত্ব এবং সংগঠনের কর্মীবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ও এর সকল সম্পদ ব্যবহারের এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝায় যার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত বিধান এবং মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদর্শিত নির্দেশনা, সে সাথে জবাবদিহিতার

---

৮. Henri Fayol, General and Industrial Management, Sir Isaac Pitman and sons, London, 1949. উদৃত ড. শহীদ উদ্দিন আহমদ, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর ১৯১৭, পৃ. ২৭-২৮।

৯. G.R Terry, Principles of Management, Richard d. Irwin Inc, Homewood, Illinois, 1975 পৃ. ৪।

১০. ড. এম এ মাননান ও ড. মো. আতাউর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচিতি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ প্রকাশিত, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ.৬।

১১. সূরা-২ : আল বাকারা-২৮২।

www.pathagar.com

মনোভাব, বিশ্বস্ততা এবং দক্ষতা ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জন করা। (Islamic management is the process of planning, organizing, leading and controlling the effects of organizational members and of using all other organizational resources depending upon the guidance of Allah (swt) and His Prophet (saw) with an accountable mentality, integrity and skill to achieve the predetermined objective.)[১২]

ড. মো. আতাউর রহমানের মতে, ইসলামী ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা ইসলামী শরী'আহ প্রদর্শিত নিয়মাবলী এবং মূলনীতির ভিত্তিতে অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়া হয়। (Islamic Management is a process of getting things done by others by applying only the rules and principles prescribed by the Islamic Shariah)[১৩]

ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আতাহার এর মতে, Islamic management is defined as management that follows the rules and regulations of Islam to achieve the halal objectives of organization through group efforts and co-operations of the organisational members.[১৪]

৫. ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Management)

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

১. ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্যভিত্তিক।

২. ব্যবস্থাপনা কোন কিছু করতে সাহায্য করে।

৩. ব্যবস্থাপনা অন্যের প্রচেষ্টার দ্বারা, সহায়তায় এবং অন্যের মাধ্যমে কার্যসম্পাদন করে থাকে।

৪. ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতার জন্য বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করা দরকার।

৫. ব্যবস্থাপনা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নয় বরং ব্যবস্থাপনা একটি কার্য।

৬. ব্যবস্থাপনা কম্পিউটারের বিকল্প নয় বরং কম্পিউটার ও প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার সহায়ক।

৭. ব্যবস্থাপনা দলগত প্রচেষ্টার সাথে জড়িত।

৮. মানুষের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বিশেষ।

৯. ব্যবস্থাপনা অস্পর্শনীয়।

---

১২. ড. মো. গোলাম মহিউদ্দীন, ইসলামিক ম্যানেজমেন্ট, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০০৯, পৃ. ২।

১৩. ড. মো. আতাউর রহমান, ইসলামিক ম্যানেজম্যান্ট এন্ড বিজনেস (ট্রেনিং প্রবন্ধ) পৃ. ১।

১৪. ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আতাহার, ইসলামিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড বিজনেস, নকশা পাবলিকেশন্স, চকবাজার, চট্টগ্রাম, মে ২০০৭, পৃ. ৭।

www.pathagar.com

১০. যারা ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করে তারা সাধারণত মালিকের মত নয়।[১৫]

৬. **ইসলামী ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য** (Characteristics of Islamic Management)

বিভিন্ন ইসলামী ব্যবস্থাপনা বিশারদ ইসলামী ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করেছেন। ইসলামী ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. কুরআন এবং সুন্নাহ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (Quran and sunnah based Management)

২. সততা (Honesty)

৩. হালাল উদ্দেশ্যাবলী (Halal objectives)

৪. হালাল কার্যপ্রণালী, পদ্ধতি, টুলস এবং কৌশল ব্যবহার (Use of halal procedures, methods, tools and techniques).

৫. ইসলামের নিয়মাবলী, বিধি-বিধানের অনুসৃতি (Following rules and regulations of Islam.)

৬. গ্রুপ প্রচেষ্টা ও গ্রুপ সহযোগিতার উপর জোরদান (Emphasis on group efforts and group Coopenation.) ব্যবস্থাপনা একটি দলভুক্ত লোকের পারস্পরিক অথবা একাধিক দলভুক্ত লোকের পারস্পরিক কার্যাবলীর সাথে বিশেষভাবে জড়িত। কারণ কোন লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য বিভিন্ন দল পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করে এবং ব্যবস্থাপনা এসব কাজকে এমনভাবে সংগঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করে যে, সমস্ত কাজ পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়।

৭. মানুষকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচনা (Recognising human as the most important and valuable resource)

৮. সর্বোত্তম পন্থায় পরিকল্পনা গ্রহণ (Best way of planning)

৯. দক্ষতার সাথে সংগঠিতকরন (Efficient means of organizing)

১০. সময়মত সুষ্ঠু পরিচালনা (Better direction in time)

১১. সমন্বয় সাধনের সঠিক প্রচেষ্টা (Making coordinated efforts)

১২. সফল নেতৃত্ব (Successful leadership)

১৩. শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক (Good labour-management relations)

১৪. সমাজ কল্যাণমূলক লক্ষ্য নির্ধারণ (Social welfare orientated goal)

১৫. জবাবদিহিতা (Accountability)

ইসলামী ব্যবস্থাপনার অত্যন্ত সুপরিচিত বিষয় হচ্ছে জবাবদিহিতা। প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে নিজ নিজ পরিসর ও কর্মক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে

---

১৫. ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ২৯।

www.pathagar.com

জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামে এ জবাবদিহিতার ৪টি পর্যায় রয়েছে- ১. নিজের বিবেকের কাছে (To self) ২. জনগণের কাছে (to the people) ৩. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে (to hierarchy) ৪. আল্লাহর কাছে (To Allah) জবাবদিহিতা। ইসলাম সবাইকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসে। এই চতুর্বিধ জবাবদিহিতার কারণ হচ্ছে- ইসলামের দৃষ্টিতে কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব, শাসনক্ষমতা, ব্যবস্থাপনা একটি আমানাত।

এ প্রসংগে একটি মশহুর হাদীস হচ্ছে নিম্নরূপ :

তোমরা জেনে রেখ তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং যিনি ব্যবস্থাপক এবং মানুষকে পরিচালনা করছেন, তাকে তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। পুরুষ বা পরিবার প্রধান তার পরিবারের লোকদের উপর তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্ব করেন সুতরাং তাকে পরিবারের অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী হচ্ছেন ঘরের গৃহকর্ত্রী এবং সন্তানদের তত্ত্বাবধায়িকা তাকেও জবাবদিহি করতে হবে।[১৬]

দায়িত্ব থেকে জবাবদিহিতা উদগত হয়। ইসলাম সবাইকে Accountable করতে চায়। এজন্যই মানুষের প্রতি মুহূর্তের কাজ রেকর্ড হচ্ছে। কিরামান কাতিবীন এ রেকর্ড করছেন। কুরআন বলছে, 'এরা (হচ্ছে) সম্মানিত লেখক। যারা জানে তোমরা যা কিছু করছো।'[১৭]

১৬. দৃশ্যমানতা, স্বচ্ছতা (Transparency)

স্বচ্ছতা হচ্ছে তথ্যে সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার। কোন সিদ্ধান্ত বা কাজের ফলে যারা প্রভাবিত হয় তাদের সে সিদ্ধান্ত বা সম্পর্কিত সকল বিষয় জানা, বুঝা, প্রয়োজনে সংগ্রহে রাখার সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করাই হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা।

ইসলাম একটা দৃশ্যমান ব্যবস্থাপনা (Transparent management) চায়। তবে সবকিছু বলে দিতে হবে এমনটিও নয়। যা গোপন করার মত নয় তা গোপন করা হবে না। হযরত উমার ফারুক (রা.) মসজিদে নববীতে খোতবা দিচ্ছিলেন সে অবস্থায় তাকে প্রশ্ন করা হয়। তাই ইসলামী ব্যবস্থাপনা মানুষের প্রশ্ন করার অধিকার থাকবে।

১৭. দক্ষতা ও ডেডিকেশন (Efficiency and Dedication)

প্রতিটি কাজ দক্ষতার সাথে করতে হবে। স্বর্ণযুগের মুসলিমরা অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। দক্ষ ও উত্তম মানের ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বা সহযোগী হওয়ার আর কোন বিকল্প নেই।

১৮. মাশাওয়ারা-পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (Consultation Management) পরামর্শ করা ও পরামর্শ দান।

ইসলামী ব্যবস্থাপনা Participative- অংশগ্রহণ মূলক। আল্লাহর ঘোষণা-

---

১৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) বর্ণিত হাদীস। সহীহ আল বুখারী-১/২০৪, জুম'আ অধ্যায়।
১৭. সূরা ৮২ আল ইনফিতার : ১১-১২।

www.pathagar.com

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ.

অর্থ- তারা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে।[১৮] অর্থাৎ যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদনে পারস্পরিক পরামর্শই হয় তাদের কর্মপন্থা। 'হে (রাসূল) সকল কাজকের্ম তাদের (সহকর্মীদের) সাথে পরামর্শ করুন, অতপর (সে পরামর্শের ভিত্তিতে) আপনি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করুন।'[১৯]

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যবস্থাপনায় এ নীতিটি অনুসৃত হতে হবে। ইসলাম সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে সকলের সাথে পরামর্শক্রমে যৌথভাবে কোন কিছু করার বা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পরে তাতে কারো দ্বিমত পোষণ করা চলে না।

১৯. ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার (Proper use of power)

২০. ন্যায্য বেতন/মজুরী ও ভাতা নির্ধারণ (Fair wages and benefits)

২১. সর্ববিধ প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা (Utmost efforts and sincerity)

২২. সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ (Maximize utilization of resources).

২৩. সর্বোচ্চ মানের নৈতিকতা, সদাচরণ এবং নীতির অনুসৃতি (Maintaining high morality and ethics).

২৪. প্রতিযোগিতামূলক কর্মপরিবেশ সৃষ্টি (Creating Competitive environment).

২৫. ইসলামের সীমার মধ্যে থেকে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা (Freedom of thinking and performing within the framework of Islam).

২৬. বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management) : ইসলামী ব্যবস্থাপনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Scientific basis) রয়েছে।

২৭. হিকমত বা উত্তম কৌশল (Hikmah) : উত্তম কৌশল ইসলামী ব্যবস্থাপনার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর রহমত ও বারাকাহ তারাই প্রাপ্ত হন যারা উত্তম কৌশল নিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা করেন। বাস্তবতাকে মূল্যায়ন করেই কৌশল নির্ধারণ করতে হয়।

২৮. নেককাজে প্রতিযোগিতা সাধারণ কৌশল হিসেবে বিবেচিত (Competition is a common strategy in good deeds) : ইসলামী ব্যবস্থাপনায় ভাল কাজে প্রতিযোগিতা একটি কমন স্ট্রাটেজি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২৯. চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালীন কল্যাণ লাভ (Ultimate

---

১৮. সূরা ৪২ আশ্ শূরা : ৩৮।
১৯. সূরা-৩ : আলে ইমরান-১৫৯।

www.pathagar.com

aim and objective is to have blessings and pleasure of Allah in here and hereafter) : ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থাপনায় ইহকালীন কর্মকাণ্ডের জন্য পরকালীন মুক্তি বা শাস্তির এমন দ্ব্যর্থহীন বা দৃঢ় ঘোষণা দেয়া হয়নি। ইসলামে সুকৃতি বা হালাল ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডের জন্য ইহকালীন কল্যাণের সুসংবাদের পাশাপাশি পারলৌকিক জীবনেও আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার প্রাপ্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

৭. ইসলামী ব্যবস্থাপনা ও প্রচলিত ব্যবস্থাপনার পার্থক্য (Contrasts of Islamic Management with Conventional Secular Management)

পার্থক্যের ভিত্তি	ইসলামী ব্যবস্থাপনা	প্রচলিত ব্যবস্থাপনা
১. সংজ্ঞা (Definiton)	ইসলামী ব্যবস্থাপনা বলতে বুঝায় এমন ব্যবস্থাপনাকে যেই ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানের বৈধ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে ইসলামের নিয়ম পদ্ধতি সমূহ অবলম্বন এবং দলগতভাবে প্রতিষ্ঠানের সকল সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়।	প্রচলিত ব্যবস্থাপনা বলতে বুঝায় এমন ব্যবস্থাপনাকে যেখানে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণে দলগতভাবে প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়।
২. প্রকৃতি (Nature)	ইসলামী ব্যবস্থাপনা ধারণ করা হয়েছে ইসলামের নিয়মকানুন এবং নৈতিকতার আলোকে।	প্রচলিত ব্যবস্থাপনা ধারণ করা হয়েছে প্রচলিত নিয়মনীতি ও পুঁজিবাদী এবং ধর্মহীনতার দর্শনের আলোকে।
৩. ভিত্তি (Basis)	ইসলামী ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হল আল-কুরআন, আস্-সুন্নাহ এবং ইজতিহাদ।	প্রচলিত ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হল মানব রচিত তথ্য এবং ধর্মহীন দর্শন।
৪.লক্ষ্য-উদ্দেশ্যাবলী (objectives)	ইসলামী ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে সন্তুষ্ট করা। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাঁর দাসত্ব এবং পার্থিব সকল কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করা।	প্রচলিত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হলো সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের মাধ্যমে মালিক পক্ষকে সন্তুষ্ট করা।
৫. শিকড়/মূল এবং সংযোগ (Root and linkage)	ইসলামী ব্যবস্থাপনার মূল এবং আনুসংগিক বিষয়গুলোর গভীর সম্পর্ক রয়েছে জবাবদিহীতা তথা পরকালীন জীবনের সাথে।	প্রচলিত ব্যবস্থাপনা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর সম্পর্ক ধর্মহীনতা এবং বস্তুবাদী জীবনের সাথে।
৬. ইসলামে	ইসলামী ব্যবস্থাপনাকে এর	এই জাতীয় কোন অনুমোদন

www.pathagar.com

অনুমোদনের পর্যায় (Recognition in Islam)	যথার্থতার ভিত্তিতে 'ইবাদাত হিসাবে অনুমোদন করা হয়।	প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় নেই।
৭.দর্শন (Philosophy)	ইসলামী ব্যবস্থাপনার দর্শন হলো ইহকলীন পরকালীন জীবনের সমন্বয় সাধন করা।	প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় এধরনের কোন সমন্বয়ের ব্যবস্থা নেই। প্রচলিত আধুনিক ব্যবস্থাপনা পার্থিব কেন্দ্রিক হওয়ায় মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোকে অবহেলা করা হয়। অহীর জ্ঞান অনুসৃত না হওয়ায় এবং মানব রচিত বিধান অনুসৃত হওয়ায় এমনটি ঘটে।
৮. উপায়-উপকরণ (Ways and means)	ইসলামী ব্যবস্থাপনা শরীয়াতের বিধানের আওতাধীন, তাই লক্ষ্য অর্জনের উপায় উপকরণগুলোও শরীয়াসম্মত হয়েথাকে।	আধুনিক ব্যবস্থাপনা মেকিয়াভেলীর নীতিতে বিশ্বাসী। এ ব্যবস্থাপনায় লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কোন পদ্ধতিই বৈধ। অর্থাৎ Ends justify the means.
৯. যোগ্যতা (Qualification)	ইসলামী ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিগত দক্ষতা-ইসলামিক যোগ্যতা অপরিহার্য।	প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় কেবল প্রযুক্তিগত যোগ্যতা অপরিহার্য্য।
১০. সিদ্ধান্তগ্রহণ (Decision making)	শরয়ী বৈধতার শর্তে সংখ্যাধিক্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংখ্যাধিক্যের মতামতের প্রয়োজন হয় না, এখানে বৈধ/অবৈধ এর ভিত্তি নেই।
১১. এক নায়কত্বের সুযোগ (Scope of Autocracy)	ইসলামী ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে একনায়কত্বের সুযোগ নেই।	প্রচলিত ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে একনায়কত্বের ব্যবহার হতে পারে।
১২.নিয়ন্ত্রণ (Controlling)	ইসলামী নৈতিকতা এবং নিয়মনীতির সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। লোকবল সব সময় আশ্বস্ত এবং অধিক বিনয়ী, সুতরাং তারা প্রকৃতিগতভাবে স্বনিয়ন্ত্রিত।	নিয়ন্ত্রণ অধিকতর জটিল এবং প্রথাগত, এখানে কোন নৈতিক বা আদর্শগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নেই।
১৩.নৈতিকতা Morality	ইসলামী ব্যবস্থাপনা ইসলামী নৈতিকতার সাথে একীভূত, সংযুক্ত।	প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় নৈতিকতাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

www.pathagar.com

৮. ইসলামী ব্যবস্থাপনার মৌলিক উদ্দেশ্যাবলী

১. মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, হাক্কুল 'ইবাদকে প্রতিষ্ঠা এবং তা আল্লাহর নির্দেশের ভিত্তিতে হওয়া।

২. মানুষের মৌলিক মর্যাদা (basic dignity) কে এক্ষেত্রে সামনে রাখতে হবে। মানুষের basic dignity সমান। তাকওয়া ছাড়া মর্যাদার বেশ-কম নেই।

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقٰكُمْ –

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি যে সর্বাধিক মুত্তাকী।[২০]

৩. আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা (Establishing Justice and Equity)

اِنَّ اللهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ আল্লাহ 'আদল (ন্যায়পরায়ণতা) ও সদাচরণের আদেশ দিচ্ছেন।[২১]

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও 'আদলে (Justice) পরিপূর্ণ।[২২]

اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى সুবিচার কর (be just), সুবিচার তাকওয়ার নিকটবর্তী।[২৩]

আমি অবশ্যই আমার রাসূলদেরকে কতিপয় সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ (মানুষদের কাছে) প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ (justice) প্রতিষ্ঠা করে।[২৪]

৯. বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management)

সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনার কাজকর্ম সম্পাদনের পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management) বলে। কোন প্রকার আন্দাজ-অনুমান, পুরাতন পদ্ধতি, সেকেলে যন্ত্রপাতি, অদক্ষ কৌশল প্রভৃতি ব্যবহার করে নয় বরং সম্পূর্ণ পরিকল্পিত উপায়ে, নতুন পদ্ধতিতে, আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারপূর্বক দক্ষ কৌশল প্রয়োগ করে কর্মীদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় এমন প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলা হয়।

মার্কিন নাগরিক এফ ডব্লিউ টেলরকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রবক্তা বলা হয়।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিমালা (Principles of Scientific Management)

১. পুরাতন রীতিনীতির পরিবর্তে বিজ্ঞান সম্মত নিয়মের প্রবর্তন (Science, not rule of thumb)
২. বিরোধ সৃষ্টির পরিবর্তে দলীয় কার্যের মধ্যে সৌহার্দ্য আনয়ন (Harmony, not discord)

---

২০. সূরা ৪৯ আল হুজুরাত : ১৩।
২১. সূরা ১৬ আন নাহল : ৯০।
২২. সূরা ৬ আল আনআম : ১১৫।
২৩. সূরা ৫ আল মায়িদাহ : ৮।
২৪. সূরা ৫৭ আল হাদীদ : ২৫।

www.pathagar.com

৩. ব্যক্তির প্রচেষ্টার পরিবর্তে পরস্পরের মধ্যে সহাযোগিতা (Cooperation, not individualism)
৪. নিয়ন্ত্রিত উৎপাদনের পরিবর্তে সর্বাধিক উৎপাদন (Maximum output in place of restricted output)
৫. প্রতিটি ব্যক্তির সার্বিক দক্ষতা ও উন্নয়ন অর্জন (The development of each man to his greatest efficiency and prosperity)

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য (Objectives of Scientific Management)

১. কারবার প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতার পরিমাণ সর্বাধিক করা।
২. উৎপাদন কার্যে স্বল্প ব্যয় এবং অপচয়-অপব্যয় কমানোর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা।
৩. প্রতিষ্ঠানে যাতে চিরাচরিত পদ্ধতির পরিবর্তে ভবিষ্যতে সর্বদাই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রবণতা এবং আগ্রহ সৃষ্টি হয় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৪. কার্যসম্পাদন দক্ষতা তথা উৎপাদনশীলতার উপর ভিত্তি করে শ্রম বিভাজন করা।
৫. কারবার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সৃষ্টি করা।
৬. কারবার প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মীর কর্মক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং সেই লক্ষ্যে তাদের প্রত্যেকের দক্ষতা ও সম্ভাবনার উন্নয়ন সাধন করা।

প্রচলিত ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য

(Difference between Conventional and Scientific Management)

প্রচলিত ব্যবস্থাপনা	বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা
১. অপরিকল্পিতভাবে ব্যবস্থাপনা কার্যসম্পাদিত হয়।	১. সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবস্থাপনা কার্যসম্পাদিত হয়।
২. এ পদ্ধতি অদক্ষতা নির্ভর।	২. এই পদ্ধতি দক্ষতা নির্ভর।
৩. প্রচলিত পদ্ধতি অনুসৃত হয়।	৩. আধুনিক ও সর্বশেষ উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসৃত হয়।
৪. কর্মদক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়না।	৪. কর্মদক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।
৫. কর্মীদের মধ্যে হানাহানি সৃষ্টির আশংকা থাকে।	৫ কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে।
৬. কর্ম বন্টনের কোন পরিকল্পনা থাকে না।	৬. শ্রম বিভাজনের চমৎকার নির্দেশনা আছে।
৭. কর্মী নিয়োগের কোন উন্নত পদ্ধতি নেই।	৭.সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করে কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।
৮. গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই।	৮. উপযুক্ত গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়।
৯. দক্ষ ও অদক্ষ উভয় শ্রমিককে একই হারে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।	৯. দক্ষ ব্যক্তিদের উচ্চহারে এবং অদক্ষদের নিম্নহারে মজুরীর ব্যবস্থা করা হয়।

চিরাচরিত গতানুগতিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির স্থলাভিষিক্ত হয়েছে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা। সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি, মানুষের কল্যাণ সাধন ও সেবা প্রদান বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার

www.pathagar.com

প্রধান উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানিক কল্যাণ লাভ করা সহজ হয়। ইসলামী ব্যবস্থাপনা মূলত : বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা।

১০. ইসলামে ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব (Importance of management in Islam)

ইসলামে ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামে ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ নিম্নরূপ :

১. দক্ষতা সুনিশ্চিতকরণ (Ensures efficiency)
২. প্রতিষ্ঠানের/সংগঠনের সফলতা (Institutional Organizational success)
৩. উৎপাদনমুখী মানবীয় প্রচেষ্টা (Productive human effort)
৪. সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার (Optimum utilization of resources)
৫. প্রযুক্তির ব্যবহার (Use of technology)
৬. জীবনযাত্রার মানউন্নয়ন (Improvement of standard of living)
৭. শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক (Good labour-management relations)
৮. বড় ধরনের উৎপাদন (large scale production)
৯. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি (Employment opportunity)
১০. সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচী (Corporate social responsibility) বাস্তবায়ন
১১. শৃংখলা আনয়ন/প্রতিষ্ঠা (Establishment of discipline)
১২. পরিবেশ সংরক্ষণ (Maintaining environment)
১৩. নৈতিকতার উন্নয়ন (Improving ethics)
১৪. যথাযথ পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ (Ensuring proper planning and control).

১১. ইসলামী ব্যবস্থাপনার মূলনীতি (Principle of islamic management)

কিছু মানুষের প্রচেষ্টার দ্বারা বিশেষ প্রক্রিয়া বা পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে কোন কাজ সম্পাদন করে নেয়াকেই ব্যবস্থাপনা বলা হয়। মানবীয় কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা একটি ছোট কর্মক্ষেত্র থেকে বৃহত্তর পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় সংগঠন পর্যন্ত বিস্তৃত। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অণু যেমন আল্লাহ্ পাকের ব্যবস্থাপনার আওতা থেকে মুক্ত নয় তেমনি মানুষ এবং মানবীয় কোন সংগঠন তাঁর ব্যবস্থাপনা থেকে নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। আল্লাহ্ প্রদত্ত ব্যবস্থাপনাকে প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে খলীফা[২৫] বা প্রতিনিধি করে এ পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে মূলনীতি হিসেবে এটা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে সব

---

২৫. মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি, খালিফা। খলিফা হিসেবে মানুষ হলো পৃথিবীর শাসক, ব্যবস্থাপক, পরিচালক। তবে তার ব্যবস্থাপনা কর্তৃত্ব মৌলিক নয় বরং আল্লাহ্ হতে অর্পিত। মানুষ এ অর্পিত ক্ষমতাকে আল্লাহর পক্ষ থেকেই ব্যবহার করে বলে তাকে খলিফা বলা হয়েছে। অন্য কথায় মানুষ প্রকৃত মালিক আল্লাহর প্রতিনিধি বা ট্রাস্টি। আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে নিজের খলিফা বানিয়ে একদিকে যেমন অনন্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন, অন্যদিকে তেমনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুসারে পার্থিব ব্যবস্থাপনার বিরাট দায়িত্বও মানুষের উপর অর্পিত হয়েছে।

www.pathagar.com

কিছুর মালিক আল্লাহ। তাই ব্যবস্থাপনায় আইনগত কর্তৃত্ব থাকবে তাঁরই। মানুষ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে যাবতীয় দায়িত্বপালন করবে। ইসলামী ব্যবস্থাপনার সর্বজনীন কাঠামোগত মূলনীতি পেশ করে সূরা আন নিসার ৫৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ – فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ–

অর্থ : তোমরা যারা ঈমান এনেছ, আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের আর তোমাদের মধ্যেকার কর্তৃত্বশীলদের। অতএব তোমাদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তার মীমাংসার জন্য আল্লাহর এবং রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো- যদি তোমরা আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো।[২৬]

এ আয়াত থেকে ইসলামী ব্যবস্থাপনার ৬টি মূলনীতি স্পষ্ট হয়ে উঠে :

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য শর্তহীন ও নিরংকুশ।

২. কর্তৃত্বশীলদের আনুগত্য শর্তসাপেক্ষ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের অধীন।

৩. কর্তৃত্বশীলদেরকে আল্লাহর অনুগত হতে হবে।

৪. ব্যবস্থাপক ও পরিচালিতদের মধ্যে মতপার্থক্যের সুযোগ রয়েছে।

৫. সৃষ্ট বিরোধের মীমাংসার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আইনই হবে চূড়ান্ত।

৬. উর্ধ্বতন ও অধ:স্তনদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া থাকতে হবে।

ইসলামে ব্যবস্থাপনার নীতিমালা (Principles of Management in Islam)

আমরা জানি, ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। কাজেই ইসলামে ব্যবস্থাপনার কিছু নীতিমালা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ আল্লাহ তাআলা ইসলামকে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা দান করেছেন বলে ঘোষণা করেছেন।[২৭] এছাড়া রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁর সাহাবীগণের আমল এবং পরবর্তীকালে শতাধিক বৎসরকাল যাবৎ পৃথিবীর অনেক দেশেই ইসলামী শাসন, ব্যবস্থাপনা কাঠামো, রাজনীতি এবং প্রশাসন ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। শুধু তাই নয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁর চার খলিফা এবং অন্যান্য অনেক শাসকের আমলে অত্যন্ত দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। কাজেই সে সময়কার ব্যবস্থাপনা নীতিমালাও ছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিমালা। ইসলামী ব্যবস্থাপনার সেই নীতিগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

---

২৬. সূরা ৪ আন নিসা : ৫৯।

২৭. কুরআন বলছে : আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম।, আর তোমাদের ওপর আমার (প্রতিশ্রুত) নিয়ামাতও আমি পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের জন্য জীবন বিধান হিসাবে আমি ইসলামকেই মনোনীত করলাম। সূরা ৫ : আল মায়িদা-৩

www.pathagar.com

১. দক্ষতা ও সততা (Efficiency and Honesty) : প্রত্যেক ব্যবস্থাপককে হতে হবে অত্যন্ত দক্ষ, জ্ঞানী, সৎ, সত্যবাদী, আল্লাহভীরু এবং কর্মঠ। হাদীসে আছে "চৌকস ও দক্ষ কর্মীকে আল্লাহ ভালবাসেন।"[২৮] কুরআনের ঘোষণা হলো- হযরত ইউসুফ (আ.) বলেন, "দেশের অর্থভাণ্ডার আমার নিকট সোপর্দ করুন, আমি হেফাজতকারী ও জ্ঞানী।"[২৯] যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি কখনও সমান হতে পারে?

২. দেশপ্রেমিক (Patriot) : প্রত্যেক ব্যবস্থাপক এবং সকল কর্মকর্তাকে দেশপ্রেমিক হতে হবে। অন্যথায় প্রতিষ্ঠান ও দেশের স্বার্থবিরোধী পণ্য উৎপাদন, বিক্রয়, চুক্তি সম্পাদন বা এগুলো থেকে বিরত থাকা সবই ঘটতে পারে। একটি আরবী প্রবাদে আছে "দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।"[৩০] সকল ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। দেশপ্রেমে ঘাটতি থাকলে অনৈতিক কর্মকাণ্ড, দেশবিরোধী, জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ হয়ে যেতে পারে যা ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষতিকর।

৩. উপযুক্ত পদে সঠিক ব্যক্তি নিয়োগ (Right man in the right place) : প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তিকে (তিনি যে ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ) উপযুক্ত পদে নিয়োগ করতে হবে এবং তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ইমামতির দায়িত্ব পালন করে গেছেন, যাঁর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট তাঁকে আযান দিতে নিয়োগ করেছেন, যিনি খুব সাহসী, বীর যোদ্ধা ও কৌশলী তাকে সেনাপতি নিয়োগ করা হয়েছে। এগুলো সবই উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত পদ দান নীতির উদাহরণ।

৪. নিয়মানুবর্তিতা (Discipline) : ব্যবস্থাপনাকে কড়াকড়িভাবে নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে হবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমাদান মাসে নির্দিষ্ট সময়ে রোযা রাখা, জিলহজ্ব মাসে হজ্ব ইত্যাদি বিধান ইসলামে নিয়মানুবর্তিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যখনই কোন বিশৃংখলা পরিদৃষ্ট হতো তখনই হযরত জিবরাঈল (আ) কে পাঠিয়ে আল্লাহ তাঁর রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীদের তা শিখিয়ে দিতেন। কাজেই ইসলামী ব্যবস্থাপনা অফিসে নিয়মিত উপস্থিতি, অবস্থান, পরিত্যাগ, অর্পিত দায়িত্ব যথারীতি পালন প্রভৃতি ব্যাপারে অত্যন্ত নিয়মানুবর্তি।

৫. শ্রম বিভাজন (Divison of Labour) / কর্ম বিভাজন (Division of work) : শ্রম বিভাজন ইসলামী ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি। পারদর্শী ব্যক্তিদের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ কাজের ভার চাপানো যাবে। সামর্থ্যের অতিরিক্ত

---

২৮. সহীহ মুসলিম।

২৯. সূরা ১০ : ইউসুফ-৫৫।

৩০. বাংলাদেশে এটিকে হাদীস বলে চালিয়ে দেয়া হয়। এদেশে এটি একটি অতিপ্রচলিত সুন্দর বাক্য। আসলে এটি হাদীস নয়। -ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা, আস্‌সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদাহ, মে ২০০৬, পৃ. ৩৫৪।

www.pathagar.com

কার্যভার কাউকেই দেয়া যাবে না। কুরআনের সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে "কারো উপর সাধ্যাতীত বোঝা (সামর্থ্যের অতিরিক্ত কিছু) চাপানো ঠিক নয়।[৩১] হায়সামী থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, "নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না।"

৬. আদেশ ও নির্দেশনার ঐক্য (Unity of command and unity of direction) : প্রতিটি কর্মকর্তাকে অবশ্যই তাঁর উর্ধ্বতন নির্বাহীর আদেশ ও নিষেধ পালন করে চলতে হবে। কালামে পাকে মানুষকে বহুবার সীমালংঘন না করার জন্য বলা হয়েছে এবং নবীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবাধ্য না হবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদীসে বলেন, "কুরআন এবং হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে কোন কাফ্রী ক্রীতদাসও যদি তোমাদের নির্দেশ দেয় তথাপি তোমরা তার অবাধ্য হয়ো না।"[৩২]

৭. কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ (Centralization and Decentralization) : ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ ইসলামী ব্যবস্থাপনার আরেকটি অন্যতম প্রধান নীতি। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রাদেশিক গভর্ণরদের কাছে পর্যাপ্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন এবং স্থানীয় সমস্যার সমাধান স্থানীয়ভাবে করার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। এমনকি, সংগৃহীত যাকাতের অর্থ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এলাকাতেই খরচের ব্যবস্থা করা হতো। তবে জনস্বার্থ বিরোধী কোন সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিধান ছিল।

৮. প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থের অগ্রাধিকার (Preference of Organization Interest) : ইসলামী ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে অবশ্যই ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থ প্রাধান্য পেলে প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে। সূরা আল বাকারা এবং সূরা আল কাসাস-এ মালিক ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থকে বড় করে দেখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ ইসলাম মনে করে যে মালিক ও প্রতিষ্ঠান যদি রক্ষা না পায় তাহলে কর্মচারিগণও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কালামে পাকে বিশ্বাস ভঙ্গ ও অর্পিত কাজ ঠিকভাবে না করা এবং জিনিস বিনষ্ট করাকে খেয়ানতের সমতুল্য অপরাধ বলা হয়েছে।

৯. মজুরি (Remuneration/pay and benefits) : ইসলামে শ্রমিক-কর্মীদের মজুরি সম্পর্কে যত সুন্দর বিধান আছে আজ পর্যন্ত কোন অর্থনীতি এতো সুন্দর ব্যবস্থা নির্দেশ করতে সক্ষম হয়নি। সূরা বনি ইসরাঈল, সূরা আল হাশর, সূরা আন্ নাহল, সূরা আল হাদীদ প্রভৃতি সূরায় এবং সহীহ আল বুখারী, জামে আত্ তিরমিযী, সুনান

৩১. সূরা ২ আল বাকারা : ২৩৩।
৩২. সহীহ মুসলিম, ইয়াহইয়া, বিন হুসাইন থেকে বর্ণিত।

www.pathagar.com

ইবনে মাজাহ্ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে ব্যবস্থাপনা ও মালিক পক্ষের সাথে মজুরি চুক্তি/স্কেল নির্ধারণ, ন্যায্য মজুরি, অন্যান্য সুবিধা, অবসর ভাতা, সঞ্চয় তহবিল প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য নির্দেশাবলী রয়েছে। যথারীতি বেতন ও মজুরি না দিলে মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাশরের দিন শ্রমিকের পক্ষ হয়ে আল্লাহর দরবারে মালিকের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

১০. হিজরত ও পদোন্নতি (Hijrat & Promotion) : শ্রমিক-কর্মীদের চাকরিতে নিয়োগের পরে দীর্ঘদিন তাদের একই পদে থাকতে বাধ্য করা যাবে না। আবার জোর-জবরদস্তি করে চাকরি করতেও বাধ্য করা যাবে না। কোন কর্মী হিজরত করে অন্য দেশে উচ্চ বেতনে চাকরি নিয়ে যেতে চাইলে তাকে সে সুযোগ দিতে হবে। অনেক সময় বেকারত্বের তাড়নায় দিশেহারা কর্মী বাধ্য হয়ে বন্ড দিয়ে চাকরি নেয় এবং নির্দিষ্ট সময় ভাল বেতন বা সুযোগ পেলেও যেতে পারে না। একে যুল্মের সাথে তুলনা করা চলে।

১১. সবার জন্য ন্যায়বিচার (Justice for all) : ইসলামী ব্যবস্থাপনার আরেকটি প্রধান মূলনীতি হলো- সর্বত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণে প্রেরণ, অন্যান্য সুবিধা বন্টন প্রভৃতি ব্যাপারে কর্মীতে কর্মীতে কোনরূপ বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। সূরা আন্ নিসাতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বিশেষ তাকিদ দিয়ে বলা হয়েছে, "তোমরা যখন লোকদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করবে তখন অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে।"[৩৩] সূরা আল মায়িদায় বলা হয়েছে, "বিশেষ শ্রেণীর লোকদের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কোন রকম অবিচার করতে উদ্বুদ্ধ না করে।"[৩৪] সূরা আন্ নিসায় আরো বলা হয়েছে, "ন্যায়বিচার করতে হবে যদি তা পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়ের বিরুদ্ধেও যায়। পক্ষদ্বয় ধনী বা গরীব যাই হোক না কেন, তাদের উভয়ের চাইতে আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার অনেক বেশি, অতএব আপনি কখনো ন্যায় বিচার করতে নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করবেন না।।"[৩৫]

১২. ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা (United efforts) : ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার উপর ইসলামী ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। দলবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং সংঘবদ্ধ হয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোকে ইসলাম বাধ্যতামূলক করেছে। সূরা আলে ইমরানে এবং সূরা আন্ নিসাতে এ ব্যাপারে বিধান রাখা হয়েছে। ইসলামী ব্যবস্থাপনা বিশ্বাস করে যে, ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাবৃন্দ যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকে কার্য সম্পাদন করে তবে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই যে কোন অবস্থায়

---

৩৩. সূরা ৪ আন নিসা : ১৩৫।
৩৪. সূরা ৫ আল মায়েদা : ৮।
৩৫. সূরা ৪ আন নিসা : ১৩৫।

www.pathagar.com

সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকতে বলা হয়েছে এবং পরস্পর বিছিন্ন না হতে বলা হয়েছে।

১৩. শ্রমের মর্যাদা (Dignity of Labour) : ইসলামী ব্যবস্থাপনা কোন কাজকেই হেয় মনে করে না। সকল কাজই ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যবান যদি তা অবৈধ না হয়। শ্রমিককে আল্লাহ খুব ভালবাসেন। হাদীসে বলা হয়েছে, "শ্রমিক আল্লাহর বন্ধু।" যে শ্রমিককে আল্লাহ বন্ধু বলেছেন তার শ্রম কখনও অমর্যাদাকর হতে পারে না। ইসলামে তাই ব্যবস্থাপনার সকল স্তরের কাজকেই মর্যাদাকর বলা হয়েছে। হাদীসে শ্রমের মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে আরো বলা হয়েছে, "কর্মীর সবচেয়ে মঙ্গলজনক উপার্জন হলো তার নিয়োগকর্তার জন্য শ্রদ্ধা ও যত্ন নিয়ে কাজ করা।"

১৪. ক্ষমা প্রদর্শন (Forgiveness) : ইসলামের আরেকটি মহান শিক্ষা হলো, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করে দিতে হবে। শ্রমিক-কর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার জন্য নিয়োগকর্তার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করেন, 'হুজুর খাদেম কর্মচারীদের অপরাধ কতবার ক্ষমা করবো? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চুপ করে রইলেন। ঐ সাহাবী পুনরায় তাই জিজ্ঞেস করলেন। তখন মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন, কর্মচারীদের প্রতিদিন সত্তর (৭০) বার হলেও ক্ষমা করে দিও। কারণ সে যে তোমার ভাই।[৩৬] অন্য আরেকটি হাদীসে আছে, শ্রমিক-কর্মীদের অপরাধ অসংখ্যবার ক্ষমা করা মহত্ত্বের লক্ষণ। হাদীসে আছে- "অসদাচরণকারী নিয়োগকর্তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[৩৭] রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু বলেই দায়িত্ব শেষ করেননি, তিনি বাস্তবায়ন করেও দেখিয়ে গেছেন। তাঁর অধীনে একজন কর্মী সুদীর্ঘ ১০ বছর চাকরি করলেও কোনদিন তিনি তাকে ভর্ৎসনা পর্যন্ত করেননি।[৩৮]

১৫. জবাবদিহিতা (Accountability) : ইসলামী ব্যবস্থাপনায় সকল স্তরের কর্মীদের মধ্যে জবাবদিহিতার আদর্শ সৃষ্টি হতে হবে। তার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা সঠিকভাবে পালনের ব্যাপারে তাকে যে কৈফিয়ত দিতে হবে, এ অনুভূতি

---

৩৬. জামে আত্ তিরমিযী; উদ্ধৃত : ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী-১৯৮৪, পৃ. ৮১-৮২।

৩৭. আবু দাউদ শরীফ।

৩৮. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) দীর্ঘদশ বছর পর্যন্ত মহানবীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খিদমাত করেছে এবং ছায়ার মত তাঁর পাশে রয়েছেন। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি তাঁর নিকট কোন কৈফিয়ত তলব করেননি এবং কাজের দরুন তাঁকে কখনো ভর্ৎসনাও করেননি। উদ্ধৃত : দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল-২০০১, পৃ. ৪৯৭।

www.pathagar.com

থেকেই জাবাবদিহিতার বিষয়টি এসে যায়। জবাবদিহিতার চাপ না থাকলে কর্মীদের মধ্যে শৈথিল্য চলে আসতে পারে। কাজেই ইসলাম আত্ম ও আনুষ্ঠানিক জবাবদিহিতা বাধ্যতামূলক করেছে। সূরা বনি ইসরাঈলে বলা হয়েছে যে, তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করবে। প্রতিশ্রুতি (ওয়াদা) সম্পর্কে তোমাদের যে জবাবদিহি করতে হবে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।[৩৯] সূরা যিলযালে জবাবদিহিতা সম্পর্কে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, অতএব যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ কোন ভাল কাজ করবে (সেদিন) তাও সে দেখতে পাবে। (ঠিক তেমনি) কোন মানুষ যদি অণু পরিমাণ খারাপ কাজও করে তাও সে (সেদিন তার চোখের সামনে) দেখতে পাবে।[৪০] ইসলামী ব্যবস্থাপনা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুটি শর্ত আরোপ করেছে : ১. কার্য স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং ২. সর্বপ্রকার সুবিধার ব্যবস্থা। কাজেই জবাবদিহিতা দাবি করার অধিকারও ইসলাম সংরক্ষণ করে।[৪১]

১৬. আন্তরিকতা (Sincerity) : আন্তরিকতা ইসলামী ব্যবস্থাপনার এক অনন্য মূলনীতি।

১৭. কর্মের স্বাধীনতা (Freedom of work) : ইসলামী ব্যবস্থাপনায় কর্মের স্বাধীনতা স্বীকৃত। এজন্যই ইসলামী ব্যবস্থাপনায় কর্মীরা স্বতোৎসারিত হয়ে ব্যক্তিক উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত হয়।

১৮. অংশগ্রহণ (Participation) : অংশগ্রহণের চেতনা ইসলামে সুস্পষ্ট। সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ হলেই ইসলামী ব্যবস্থাপনা সাফল্য লাভ করে।

১৯. দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা (Taking responsibility) : প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং টার্গেট অর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলাতে হয়, এজন্য দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা ইসলামী ব্যবস্থাপনার অন্যতম মূলনীতি।

২০. মিতব্যয়িতা (Economy) : মিতব্যয়িতার সাথে কর্মসম্পাদন ইসলামী ব্যবস্থাপনার অন্যতম যৌক্তিক নীতি। ইসলাম ইসরাফ ও তাবজীর পরিহার করতে বলেছে। ইসরাফ (Overuse) হলো অপচয়, অপরিমিত ব্যয়, বাহুল্য ব্যয়, অমিতব্যয়, বিনা প্রয়োজনে কোন কিছু ব্যয় করা, নষ্ট করা (Wastage)। ইসরাফ (Israf) হলো হালাল খাতে এমন ব্যয় যা প্রয়োজনাতিরিক্ত। বৈধ কাজেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করা। আল কুরআন ইসরাফ ও বিলাসবহুল ভোগকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছে। আল্লাহ্ বলেন, খাও, পান কর, ইসরাফ করো না, কারণ তিনি (আল্লাহ্) ইসরাফকারীদের পছন্দ করেন না।[৪২] আর তাবজীর (Tabzir) (Misuse) মানে

৩৯. সূরা ১৭ বনী ইসরাইল : ৩৪।
৪০. সূরা ৯৯ যিলযাল : ৭-৮।
৪১. ড. এম এ মাননান ও ড. মো. আতাউর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।
৪২. সূরা ৭ আল আরাফ : ৩১।

www.pathagar.com

অপব্যয়, হালাল সম্পদ হারাম কাজে ব্যয় করা, অশ্লীল কাজে ব্যয় করা, ইসলামের ক্ষতিসাধনে ব্যয় করা। অপব্যয় করা ইসলামে হারাম। ইসরাফের তুলনায় তাবজীরের ক্ষতি ব্যাপক। এজন্যই তাবজীরকারীদের শয়তানের ভাই চলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'তাবজীরকারীরা হচ্ছে শয়তানের ভাই; আর শয়তান হচ্ছে তার মালিকের বড়োই অকৃতজ্ঞ।[৪৩]

২১. তাওয়াক্কুল (Tawakkul) : তাওয়াক্কুল ইসলামী ব্যবস্থাপনার অন্যতম মূলনীতি। আল-কুরআনে আল্লাহতে বিশ্বাসী মুমিনকে বলা হয়েছে, তোমরা যদি মুমিন হও তবে আল্লাহর উপর ভরসা কর। আয়াতটি হচ্ছে : 'অতপর তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো, মুমিনদের তো আল্লাহ তা'আলার ওপরই ভরসা করা উচিত।[৪৪] তাওয়াক্কুল মানে কর্মবিমুখতা নয়, নিষ্ক্রিয়তা নয়। তাওয়াক্কুল হতে হবে পক্ষীকুলের মত। ওরা ঘরে বসে থাকে না, আল্লাহর উপরই পরিপূর্ণ ভরসা রাখে। সকল উপায় উপকরণ ব্যবহার করে সেগুলোর সাফল্যের ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়াই হচ্ছে প্রকৃত তাওয়াক্কুল।[৪৫]

২২. বিশ্বাসযোগ্য অনুমান (Predictabitity) : বিশ্বাসযোগ্য অনুমান ইসলামী ব্যবস্থাপনার অন্যতম মূলনীতি। প্রতিষ্ঠানের কর্মী, সেবাগ্রহীতা ও অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের কাছে প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী, নীতিমালা, কর্মপদ্ধতি, আদর্শ প্রভৃতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এসব ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

১২. ইসলামী ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী (Functions of Islamic Management)

বিভিন্ন খ্যাতনামা ব্যবস্থাপনা বিশারদ ব্যবস্থাপনার কার্যকে বিভিন্নভাগে ভাগ করেছেন। তবে সব লেখকই প্রধানত: ব্যবস্থাপনার চার ধরনের কার্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ব্যবস্থাপনার কার্যকে ৪টি শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। এগুলোকে ব্যবস্থাপনার মূলকার্য বলা যেতে পারে। কাজগুলো হলো : পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণ। কেউ কেউ কর্মীসংস্থান (Staffing), মূল্যায়ন (Evaluation), প্রেষণা (Motivating) এবং যোগাযোগ (Communicating) কে আলাদাভাবে কার্য হিসেবে দেখিয়েছেন। ব্যবস্থাপনা জ্ঞান সংগঠিত করার জন্য ব্যবস্থাপকদের কার্যগুলো সহযোগী কাঠামো হিসেবে কাজ করে। সমস্ত নতুন ধারণা সমূহ, গবেষণালব্ধ জ্ঞান অথবা কৌশলগুলো ব্যবস্থাপনায় কার্যসমূহের সকল শ্রেণীকরণে সহজেই ফেলা যেতে পারে।

---

৪৩. সূরা ১৭ বনী ইসরাইল : ২৭।
৪৪. সূরা ৫ আল মায়েদা : ১১।
৪৫. আল মুখতারু মিন কুনুযিস সুন্নাতিন নবাবিয়্যাতি, পৃ. ১২।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীকে নিম্নোক্ত ছইলে দেখানো যেতে পারে

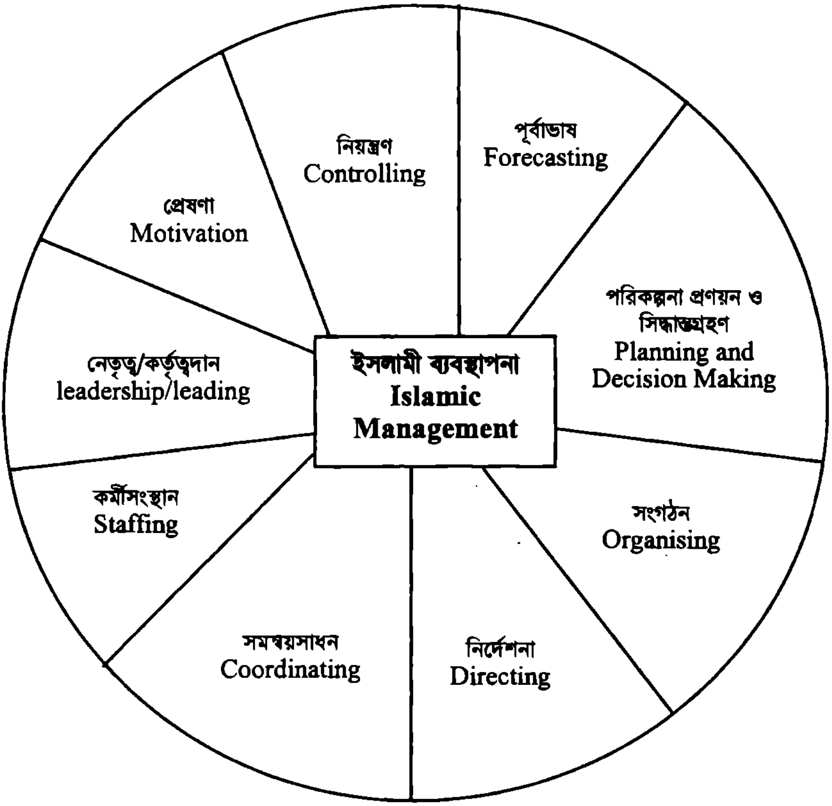

১২.১ পরিকল্পন বা পরিকল্পনা প্রণয়ন (Planning)

পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার একটি মৌলিক কাজ। পরিকল্পনা ছাড়া ব্যবস্থাপনার কথা ভাবাও যায় না। পরিকল্পনা বলতে ভবিষ্যতে কি করা হবে এর একটি প্রক্রিয়াকে বুঝায়। উল্লেখ্য যে, পরিকল্পনা (Plan) হলো পরিকল্পনের (Planning) ফল। পরিকল্পনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিকল্পনা হলো, ভবিষ্যতে কি হবে কিভাবে করা হবে এবং তা কে করবেন সে সম্পর্কে আগাম সিদ্ধান্ত নেওয়া। ড্যান স্টেইনহফ (Dansteinhoff) এর মতে, পরিকল্পনা হলো লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা এবং তা অর্জনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নেয়া। (Planning is preparing for the future of the firm by establishing objectives

www.pathagar.com

and the method of achieving them).[৪৬] পরিকল্পনা পুরো সংগঠনের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ। সমন্বিত (Consistent) এবং উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনার দ্বারাই কেবল উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব। পরিকল্পনা দ্বারা একটি সংস্থা/সংগঠনের কার্যপ্রবাহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় এবং সকল কর্মী সে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত কার্য সম্পাদন করতে পারে। যে কোন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে ঐ কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার উপর।

পরিকল্পনার গুরুত্ব : সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজেই সফলতা আসেনা। কি ব্যক্তি জীবনে, কি সমাজে, কি ব্যবসায়ে, কি রাষ্ট্রীয় কাজে সর্ব ক্ষেত্রেই পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম, পরিকল্পনার গুরুত্বসমূহ নিম্নরূপ :

- পরিকল্পনা দিক নির্দেশনা দেয়।
- পরিকল্পনা মিতব্যয়িতা অর্জনে সহায়তা করে।
- পরিকল্পনা পরিবর্তিত অবস্থার মুকাবিলা করে।
- পরিকল্পনা মান নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তর : পরিকল্পনার প্রণয়নে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়। যেমন-

১. ভিশন (Vision) : স্বপ্ন (ambiton), কেন প্রতিষ্ঠানটি তৈরি হয়েছে, কি করতে চায়।

২. মিশন (Mission) : প্রতিটি সংগঠিত দলভিত্তিক কাজের একটি মিশন থাকে। ভিশনে পৌছার জন্য বর্তমানে যা করণীয় তাই মিশন।

৩. উদ্দেশ্য (objectives) : উদ্দেশ্য হলো কোন কাজের চূড়ান্তরূপ। একটি সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য থাকে এবং সে উদ্দেশ্যে পৌছার জন্য প্রতিটি বিভাগেরই আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য থাকে।

৪. কৌশল (Strategy) : কৌশল হলো, লক্ষ্য অর্জনের উপায়। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিশেষ বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করে কখন কোন কৌশল প্রয়োগ করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হয়। এটি হচ্ছে Sense of priorities- লক্ষ্যে পৌছাতে হলে কি কি করতে হবে।

৫. নীতি (Principle) বা পলিসি (Policy) : নীতি বা পলিসি হল একটি সাধারণ বিবরণ যা কোন কিছু করার বা না করার নির্দেশনা দেয়। পলিসি লিখিত অথবা অলিখিত উভয়ই হতে পারে। তবে লিখিত হওয়াই ভাল। নীতির বৈশিষ্ট্য হলো স্থান, কাল, পাত্র ভেদে এরূপ নির্দেশিকার সফল প্রয়োগে ফল প্রাপ্তির নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে।

---

৪৬. উদ্বৃত ড. এম.এ. মাননান ও ড. মো. আতাউর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।

www.pathagar.com

৬. বিধি (Rules) : বিধিও এক ধরনের পরিকল্পনা। এটা হচ্ছে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন বিশেষ ও নির্দিষ্ট কার্যক্রম নেয়া হবে তা নির্ধারণ করা।
৭. কার্যপ্রণালী (Work System) : কার্যপ্রণালীও পরিকল্পনা। কারণ এটি ভবিষ্যতে কাজ সম্পাদনের জন্য উত্তম প্রণালী ঠিক করে দেয়।
৮. বাজেট (budget) : পরিকল্পনা যখন সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয় তখন তা হয়ে যায় বাজেট।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পরিকল্পনা

আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী। তিনি সুপরিকল্পিতভাবে বিশ্ব চরাচর সৃষ্টি করেছেন এবং পরিকল্পনা মাফিক ধ্বংস করবেন। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানবজাতি পরিকল্পনা বিষয়ক ধারণা মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকেই পেয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আছে : সমগ্র আসমান ও জমিন আল্লাহ তাআলা ছয়দিনে ছয় পর্যায়ে সৃষ্টি করেছেন এবং আসমানসমূহকে স্তরে স্তরে সজ্জিত করেছেন। তিনি সৌরজগতকে যথাস্থানে স্থাপন করেছেন, দুনিয়ার ভারসাম্য রক্ষার জন্য স্থানে স্থানে নদী-নালা, সাগর, পাহাড়-পর্বত ও বনভূমি স্থাপন করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই রাত, দিন, সূর্য ও চাঁদকে পয়দা করেছেন, (এদের) প্রত্যেকেই (মহাকালের) কক্ষপথে সাঁতার কেটে যাচ্ছে।[৪৭] এসব কিছুই সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফসল। পরিকল্পনা মাফিক আসমান ও জমিনের নীলনক্সা তৈরি করে এগুলোকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সমগ্র সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সহজেই বুঝায় যায় যে, প্রতিটি বস্তুই পরিকল্পনা মুতাবিক তৈরি, যার ফলে প্রকৃতির কোথাও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অবকাশ নেই।

বিশ্ব চরাচরের সব কিছুই পূর্ব পরিকল্পিত। কি উদ্দেশ্যে পৃথিবীসহ সৌরজগত সৃষ্টি করা হয়েছে, কখন পৃথিবী বা সৌরজগতের জন্য কি ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন এবং সে পরিবর্তন কিভাবে কিরূপ পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে, কখন বিশ্ব ধ্বংস হবে, শেষ বিচারের পর কোথায় কার বাসস্থান হবে ইত্যাদি বিষয় আল্লাহ তায়ালা পরিকল্পনা মাফিক নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ পরিকল্পনা প্রণয়নে পূর্ণ জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সবকিছু একসাথে সৃষ্টি করেননি- ধাপে ধাপে তিনি এগিয়েছেন এবং এগুচ্ছেন। তিনি স্থায়ী পরিকল্পনার পাশাপাশি নমনীয় (flexible) পরিকল্পনাও প্রণয়ন করেন। নমনীয় পরিকল্পনার বিষয়গুলো ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

কুরআনে হযরত ইউসুফ (আ) এর ভাষায়

'(ইউসুফ) বললো, (এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও সে সম্পর্কে তোমাদের করণীয় হচ্ছে), তোমরা ক্রমাগত সাত বছর উত্তম চাষাবাদ করবে। (এ সময় প্রচুর ফসল হবে) অতপর ফসল তোলার সময় আসলে তোমরা যে পরিমাণ ফসল তুলেত চাও তার মধ্য থেকে সামান্য অংশ তোমরা খাবারের জন্য রাখবে, তা বাদ দিয়ে বাকী অংশ শীষ সমেত রেখে দেবে। (এতে করে ফসল নষ্ট হবে না)। এরপর আসবে সাতটি কঠিন

---

৪৭. সূরা-১১ : আল আম্বিয়া-৩৩।

www.pathagar.com

(খরার) বছর যা এর আগের কয় বছরের গোটা সময়ই খেয়ে যাবে।। কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত যা তোমরা তুলে রাখবে। এরপর আসবে একটি বছর, যখন মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে।[৪৮] কি চমৎকার পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনা ইউসুফ (আ) এর মুখে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন।

১২.২ সংগঠন (Organising)

সংগঠন হল একটা সংস্থার পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য ব্যবস্থাপনার সে অংশ যা মানুষের জন্য একা উদ্দেশ্যমূলক কাঠামো প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত।

সংগঠন একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো, যা ঐ সংগঠনে কর্মরত প্রতিটি ব্যক্তির ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্যের নির্দেশনা দান করে। ডেন স্টেইনহফের মতে, পরিকল্পনা ও লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে জনবল ও বস্তুগত সম্পদ সন্নিবেশিত করে কর্ম ও কর্তৃত্বের একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়ন করাই হলো সংগঠন। (Organizing is designing a formal structure of tasks and authority in which people and material resources are arranged to carry out plans and objectives.)[৪৯] সংগঠন হলো একটি বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্মিলিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ সম্পর্ক সৃষ্টি, ব্যক্তিবর্গের কার্যাবলীকে সনাক্ত করার পর এগুলোর শ্রেণীবদ্ধকরণ বা বিভাগীকরণ (Departmentation), প্রত্যেকের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্টন (Delegation of Authority), কর্তৃত্ব কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ, তত্ত্বাবধান পরিসর (Span of supervision) নির্ধারণ এবং লক্ষ্যার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের সমন্বয় সাধন।

সংগঠন প্রক্রিয়ায় মূলত: চারটি পদক্ষেপ জড়িত :

১. প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ও তৎসংশ্লিষ্ট পলিসি ও পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে যে সব কাজ সম্পাদন করতে হবে সেগুলো চিহ্নিত করে শ্রেণীবিন্যাসকরণ।

২. প্রাতিষ্ঠানিক যে সব সম্পদ রয়েছে এবং যে সব পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলী পরিচালনা করতে হবে, তা বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন কার্যাবলীর বিভাগীকরণ।

৩. প্রয়োজন মুতাবিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে কর্তৃত্ব অর্পণ এবং

৪. অর্পিত কর্তৃত্বের সমন্বয় সাধন।

১২.৩ নির্দেশনা (Direction)

নির্দেশনা বা পরিচালনা ব্যবস্থাপনার তৃতীয় প্রধান কাজ। অন্যকথায় নির্দেশনা ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। নির্দেশনা বা পরিচালনা ছাড়া সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব নয়। নির্দেশ শুধু উর্ধ্বতন ব্যক্তি অধীনস্থদের দিতে

---

৪৮. সূরা-১২ : ইউসুফ-৪৭-৪৯।

৪৯. ড. এম এ মাননান ও ড. মো. আতাউর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

www.pathagar.com

পারেন। একটি প্রতিষ্ঠানে সর্বস্তরে, সর্বক্ষেত্রে সঠিক নির্দেশনা প্রয়োজন। নির্দেশনার ধরন, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সঠিকভাবে জেনেই নির্দেশনা দান করতে হয়। অন্যথায় নির্দেশনা ফলপ্রসূ হয় না। নির্দেশনা মানব সম্পর্কিত কাজ, নির্দেশনার প্রবাহ নিম্নমুখী, নির্দেশনা সর্বস্তরে পরিলক্ষিত, এর পরিধি ব্যাপক। নির্দেশনা মৌখিক অথবা লিখিত, সাধারণ অথবা নির্দিষ্ট, আনুষ্ঠানিক অথবা অনানুষ্ঠানিক যে কোন ধরনের হতে পারে। নির্দেশ সংগঠনের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন, পারস্পরিক সম্পর্ক, দায়দায়িত্ব ইত্যাদির ইঙ্গিত করে। নির্দেশনা বলতে তদারকীও বুঝানো হয়ে থাকে। আদর্শ নির্দেশনার গুণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. **নির্দেশ সব সময়ই উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাজ :** নির্দেশ সব সময়ই উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরে
নেমে আসে।

২. **নির্দিষ্টতা ও স্পষ্টতা :** নির্দেশ সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

৩. **নির্দেশ পূর্ণাঙ্গ অথবা সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন :** পূর্ণাঙ্গতা নির্দেশনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

৪. **নির্দেশ লিখিত হওয়া উচিত :** নির্দেশ লিখিত হওয়াই ভাল। লিখিত নির্দেশের পক্ষেই যুক্তি বেশি।

৫. **যৌক্তিকতা :** নির্দেশ অবশ্যই যুক্তিসংগত হতে হবে।

৬. **সঠিক সময়ে সঠিক নির্দেশ :** নির্দেশ সময় বিবেচনা করে দিতে হবে।

৭. **সংক্ষিপ্ততা :** নির্দেশ সংক্ষিপ্ত হলে ভাল হয়।

৮. **অগ্রগতি লক্ষ্য রাখা :** নির্দেশ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ইসলামে পরিচালনার ব্যবস্থা (Direction in Islam)

ইসলামে ব্যবস্থাপনার তৃতীয় কার্য পরিচালনার ব্যাপারে কিছু বিধি-বিধান ও ইংগিত প্রদান করা হয়েছে। এ সমস্ত বিধি-বিধান মেনে চলা হলে পরিচালনা কার্য বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে এবং প্রতিটি নির্দেশ সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেবে। ইসলামে পরিচালনা কার্যের প্রধান দিকগুলো সম্পর্কে নিচে আলাকপাত করা হলো :

১. গণতান্ত্রিক পরিবেশ (Democratic Environment) : সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নির্দেশ প্রদান করতে হবে।

২. প্রাঞ্জল ভাষা (Simple Language) : নির্দেশ দানের ভাষা হতে হবে অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সহজ, বোধগম্য, উন্নত এবং সত্যিকার অর্থে কল্যাণাকাঙ্খী। কুরআন-হাদীসে মানুষ ও মুসলিমদের প্রতি যে সর্বজনীন এবং বিশেষ নির্দেশ এসেছে তা অতি চমৎকার ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকরণের অথচ সবার কাছে হৃদয়গ্রাহী।

৩. প্রতিপালনকারীর সামর্থ্য (Capacity of doer) : ইসলামে প্রতিপালনকারীর

www.pathagar.com

সামর্থ্য বুঝে নির্দেশ প্রদানের তাকিদ প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ কালামে পাকে বার বার উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কারো উপর কোন যুল্‌ম করতে চান না। আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না।[৫০] কোন কাজের নির্দেশ দেয়ার পরে যদি ঘটনাক্রমে তা পালন করা কর্মীর জন্য কষ্টসাধ্য হয়, তাহলে অবশ্যই তাকে সহায়তা করতে হবে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

৪. পূর্ণ আস্থা (Complete faith) : ইসলাম আল্লাহর দেয়া বিধান প্রতিপালনের নির্দেশ প্রতিটি মানুষকেই দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের মাধ্যমেই তা করতে বলা হয়েছে। মানুষের মধ্যে প্রত্যয় সৃষ্টির জন্য নানাভাবে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। জান্নাতের চমৎকার বর্ণনা দিয়ে এবং জাহান্নামের কঠোর শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমেও মানুষের মধ্যে তাঁর লক্ষ্যের প্রতি প্রত্যয় সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। আধুনিক ব্যবস্থাপনা ইসলামের এ কৌশল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৫. অবশ্য পালনীয় (Compulsory Practices) : আধুনিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা দানের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে একটি হলো আদর্শরীতি অনুসরণ (Standard practices)। ইসলামে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য মানুষকে কতকগুলো কার্য অবশ্য পালনীয় করা হয়েছে। নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম করার হুকুম সাধারণতভাবে নেই। যেমন- নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি। এ সমস্ত বিধান ও নির্দেশ পালনে সুস্থ কোন মানুষ অস্বীকার করলে তাকে কঠোর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

৬. ব্যাখ্যাকরণ পদ্ধতি (Explaining why) : ব্যাখ্যাকরণ পদ্ধতি নামে নির্দেশ দানের যে একটি পদ্ধতি আধুনিক ব্যবস্থাপনা দিয়েছে, তাও ইসলাম থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কুরআন এবং হাদীসে মানুষকে তার ইহ ও পরকালীন কল্যাণের জন্যই কতকগুলো নির্দেশ পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে। এমন কোন কাজই মানুষকে করতে বলা হয়নি যার কোন উপযোগিতা নেই। বিনা কারণে আল্লাহর দেয়া জীবন ও সময় ব্যয় করলে এর জন্য মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে বলে ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে।

৭. সর্বজনীন ভাষা (Acceptable language) : নির্দেশ দানের সময় ভাষা হতে হবে অত্যন্ত সুখশ্রাব্য। কোন কটু বা অশ্রাব্য ভাষায় নির্দেশ প্রদান করা যাবে না। মধুর ভাষায় নির্দেশদাতার প্রতি কর্মীগণ বিতশ্রদ্ধ হয় কম-এমনকি নির্দেশ যদি অপছন্দ হয় তবুও মারমুখো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না। পক্ষান্তরে, ভাল কাজের নির্দেশও যদি কর্কশ ভাষায় দেয়া হয়, তাহলে কর্মীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে এবং তারা ব্যবস্থাপনার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে।

---

৫০. সূরা ২ আল বাকারা : ২৮৬।

www.pathagar.com

১২.৪ ব্যবস্থাপনার X (এক্স) এবং Y (ওয়াই) তত্ত্ব

বিবেচ্য বিষয়	তত্ত্ব 'X'	তত্ত্ব 'Y'
মানুষ সম্পর্কে ধারণা	মানুষ অলস, কাজের প্রতি অনীহ, উচ্চাকাংখা নেই, দায়িত্বহীন, ফাঁকিবাজ, উদ্যমী নয়, কর্মবিমুখ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক।	মানুষ কর্মে উৎসাহী, সৃজনশীল, আত্মসম্মানবোধ রয়েছে, দায়িত্ব সচেতন, আত্মবিকাশ উন্মুখ, আত্মনির্দেশনা, আত্মশৃংখলা বোধসম্পন্ন, কাজে আন্তরিক, কর্মপরায়ণ, কাজই যেন জীবন, শিখতে আগ্রহী।
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	কাজ আদায় করা।	সৃজনশীলতা ও কর্মক্ষমতাকে ব্যবহার করা, ভালভাবে মটিভেট করে কাজ আদায়, দায়িত্বপালনে আগ্রহ সৃষ্টি।
পদ্ধতি	জোর খাটান, ভয় দেখান, চাপ প্রয়োগ, প্রলোভন প্রদান, খবরদারী করা, নির্দেশ দান, নিয়ন্ত্রণে রেখে কাজ করানো, শাস্তি প্রদান।	কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদান, প্রোৎসাহন ও পুরস্কার, ভুল সংশোধনের সুযোগ প্রদান, উৎসাহ প্রদান, আত্মবিকাশে সহায়তাদান, দায়িত্ব বণ্টন।

১২.৫ ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব (Leadership in Management)

নেতৃত্ব শব্দটির অর্থ ব্যাপক। Leadership শব্দটি এসেছে Lead থেকে– যার অর্থ পথ দেখানো (To guide), চালিত করা (To conduct), আদেশ করা (To direct) ইত্যাদি। যিনি নেতৃত্ব দেন তাকে বলা হয় নেতা (Leader)। যে কোন সংগঠনের / প্রতিষ্ঠানের নেতা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত লোকজনের সামগ্রিক দলটিকে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করেন। নেতা সকলকে তাঁর কাজ দ্বারা প্রভাবিত করেন। তাই নেতৃত্বকে একটি কলা (Art) বলা যেতে পারে। আর সংগঠনের কার্য সম্পাদন এবং দলীয় লক্ষ্যসমূহের জন্য লোকদেরকে প্রভাবান্বিত করাই হল নেতৃত্বদান। বস্তুত; এটা ব্যবস্থাপনার আন্তব্যক্তিক দিক নিয়ে কাজ করে। এটা বোধগম্য যে, নেতৃত্বদান প্রেষণা, নেতৃত্বের ধরণ, অ্যাপ্রোচ এবং যোগাযোগ অন্তর্ভুক্ত করে। কুরআন বলছে :

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا

এবং আমরা একজনকে অপরের উপরে মর্যাদায় উন্নত করি যাতে নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে।[৫১]

ইসলামে নেতৃত্বের আসন অনেক উপরে। সামষ্টিক জীবনে নেতৃত্বের ভূমিকা বেশি।

---

৫১. সূরা ৪৩ আয্ যুখরুফ : ৩২।

www.pathagar.com

নেতৃত্ব সমীকরণ L = f (L-f-s)

L = Leadership
f = function
L = leader
f = follower
S = Situation

সমীকরণটির অর্থ দাঁড়ায় নেতৃত্ব হচ্ছে নেতা, অনুসারী এবং অবস্থাভেদে নেতার কাজ।

নেতৃত্বের দক্ষতা- (Ledership Skill)

১. কারিগরী দক্ষতা (Technical skills)
২. মানবীয় সম্পর্ক দক্ষতা (Human Relations Skills)
৩. ধারণাগত দক্ষতা (Conceptual Skills)

নেতৃত্বের রীতি (Styles of leadership)

বিভিন্ন মনীষী নেতৃত্বের বিভিন্ন রীতির কথা বলেছেন। এফ.ই.ফিডলার এর মতে নেতৃত্ব দুই রীতির। যেমন- ১. কার্যমুখী নেতৃত্ব (Task orientated leadership) ২. কর্মচারী ও আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্কমুখী নেতৃত্ব (Interpersonal relationship)

ব্যবস্থাপনা বিশারদ লিকার্ট চার ধরনের নেতৃত্ব সম্বন্ধে বলেছেন। যেমন-
১. শোষণমূলক স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব, ২. কল্যাণকামী স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব,
৩. পরামর্শমূলক নেতৃত্ব, ৪. অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব,

অধিকাংশ মনীষী নেতৃত্বের তিনটি মৌলিক রীতির উপর জোর দিয়েছেন। যেমন-
১. নেতৃত্বের প্রেষণা ভিত্তিক ধরন (Motivational style of leadership orientated leader)
২. নেতৃত্বের ক্ষমতা ভিত্তিক ধরন (Power style of leadership)
৩. নেতৃত্বের পূর্বাভিমুখী ধরন (Orientation style of leadership)

নেতৃত্বের ধরন / রীতি

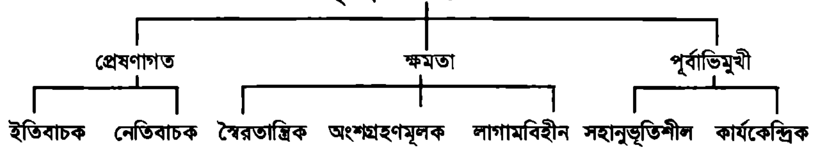

ইসলামে নেতৃত্ব সবিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আল্লাহভীরুতা, গণতান্ত্রিক সমঝোতা, প্রত্যাশী না হওয়া, বৈষম্যহীনতা, জবাবদিহিতা, কথা-কাজে সামঞ্জস্যতা, পক্ষহীনতা এবং দুর্বলের উপর অন্যায়-না করা ইসলামী নেতৃত্ব রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

নেতৃত্ব সম্পর্কিত তত্ত্বসমূহ (Theory of leadership)

১. নেতৃত্বের গুণভিত্তিক তত্ত্ব (The trait theory of leadership)
২. পরিস্থিতিভিত্তিক তত্ত্ব (Situational Leadership theory)
৩. আচরণভিত্তিক তত্ত্ব (Behavioural theory of leadership)
৪. নেতৃত্বের উদ্দেশ্যমুখী তত্ত্ব (Path-goal theory of leadership)

www.pathagar.com

নেতৃত্বের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী

হযরত আলী (রা.)[৫২]	আল ফারাবী[৫৩]	ইমাম গাযযালী[৫৪]	জাতিসংঘ[৫৫]	পল এইচ এপলবি[৫৬]
১. আল্লাহভীরুতা ২. ন্যায়পরায়ণতা ৩. সৎ ও সৎকর্মের প্রতি আস্থাশীলতা ৪. ক্ষমাশীলতা ৫. সুবিচার ও ইনসাফকারী ৬. জনগণের অভিযোগ শ্রবণকারী ৭. জনগণের আস্থাভাজন ৮. আত্মনিয়ন্ত্রণকারী ৯. ‘ইবাদাতকারী ও আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী	১. বুদ্ধিমত্তা ২. উত্তম স্মৃতি শক্তি ৩. বাগ্মিতা ৪. দৃঢ়তা ৫. ন্যায়বিচার প্রীতি ৬. উচ্ছল, প্রাণবন্ত ও সপ্রতিভ ভাবভঙ্গি ৭. সত্যবাদিতা ৮. মিথ্যা বর্জন ৯. সম্পদের প্রতি আসক্তি না থাকা চাই	১. বুদ্ধিমত্তা ২. স্মৃতিশক্তি ৩. বাগ্মিতা ৪. দৃঢ়তা ৫. ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি অনুরাগী-ন্যায়বিচারক ৬. প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব ৭. সত্যবাদিতা ৮. ধৈর্য ৯. বিনয় ও নম্রতা ১০. হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা পরিহার করা ১১. সংকীর্ণতা পরিহার করা ১২. একরোখা স্বভাব পরিহার করা ১৩. শত্রুতা পরিহার করা	১. সৎ ও নিঃস্বার্থপর ২. মেধাবী ৩. কর্মঠ ও সুদক্ষ ৪. বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ৫. নিরপেক্ষতা ৬. কর্তব্যপরায়ণতা	১. চারিত্রিক দৃঢ়তা ২. স্বীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্যবোধ ৩. দায়িত্বগ্রহণের আগ্রহ ও জবাবদিহিতার মনোভাব ৪. উত্তম শ্রোতা ও সমস্যার সমাধানকারী ৫. সংবেদনশীলতা ৬. সাংগঠনিক শক্তির উপর আস্থাশীলতা ৭. হুকুমকারী প্রভুরূপী নন বরং সুপারিশকারী ৮. উত্তম সহযোগী ৯. অন্যের মতামতগ্রহণ

১২.৬ প্রেষণা (Motivation)

ব্যবস্থাপনায় প্রেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রেষণা ছাড়া মানুষ কাজ করতে চায় না। প্রেষণা হলো মানুষকে কোন কাজে উদ্বুদ্ধকরণ। এটি এমন একটি শক্তি যা কোন

৫২. হযরত আলী (রা.), একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক চিঠি, মনজুর আহসান অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩।

৫৩. আল ফারাবী, কিতাব আল সিয়াসাহ্ আল মাদানিয়াহ, পৃ. ৩৯।

৫৪. আল গাযযালী, আল মুসতাসফা (১৯৩৭) পৃ. ১৩৯।

৫৫. A Hand Book of Public Administration, জাতিসংঘের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৬১)

৫৬. পল.এইচ.এপলবি, Public Administration for a Welfare State এ টি এম শামসুদ্দীন অনূদিত, ঢাকা, NILG, ১৯৬৪, পৃ. ৫১।

www.pathagar.com

ব্যক্তিকে বিশেষ কোন কাজের দিকে টেনে নিয়ে যায়। প্রেষণার তারতম্যের জন্য সংগঠনে কোন কর্মী কাজে মনোযোগী, শৃংখলাপরায়ণ এবং উদ্যোগী আবার কোন কর্মী কাজে অমনোযোগী, বিশৃংখল, নিরুদ্যম হয়। প্রেষণার মূল হলো মানুষের প্রয়োজন বা অভাব। মানুষের অভাব বা প্রয়োজনবোধ অনেক ধরনের হতে পারে। অভাব পূরণের জন্য মানুষের যে ব্যগ্রতা তাই হলো প্রেষণা। অর্থাৎ মানুষের আচরণকে যা প্রভাবিত করে তাকেই প্রেষণা বলা যেতে পারে।

প্রেষণার ইসলামী মডেল (Islamic Model of Motivation)

সার্বজনীন ও কল্যাণকর জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য যে সব ব্যবস্থার ঘোষণা দিয়েছে তা এক বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আজও কোন বিশেষজ্ঞ দিতে পারেননি।

পার্থিব জীবনে চলার পথে মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা যে অফুরন্ত সম্পদ জল, স্থল, অন্তরীক্ষে মওজুদ করে রেখেছেন তা নিয়ে সে প্রেষণা লাভ করতে পারে। আবার কাউকে পার্থিব সম্পদ কম দেয়ার পরেও সে আখিরাতের অজস্র পুরস্কার পাওয়ার আশায় একাগ্রচিত্তে ইসলামী বিধান অনুসরণ এবং অর্পিত দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারে। সেদিক হতে প্রেষণা প্রদান সংক্রান্ত আল্লাহর বিধান জাগতিক বিধান হতে ভিন্নতর। শিল্প ও কারবারের ব্যবস্থাপকগণ তাদের অধঃস্তন কর্মচারীদের জন্য আর্থিক, অ-আর্থিক অনেক কিছু প্রদানে প্রলোভন দেখিয়েও অত্যন্ত সীমিত সময়ের জন্য উৎসাহিত রাখতে পারেন। অথচ আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত সীমিত নিয়ামত ভোগ করে দীনদার কর্মীগণ অতি বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করে থাকে। ইসলামের সৌন্দর্য এখানেই নিহিত। কি সেই শাশ্বত ইসলামের মডেলের আলোচ্য বিষয়? এর উপাদানগুলোই বা কি? এটি কি শুধু ব্যবস্থাপকদেরই প্রেষণা দান করতে পারে নাকি সকল স্তরের কর্মীদেরই প্রেষণাদাতা? এটি কি সীমিত সময়ের জন্য নাকি স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য? এইসব প্রশ্নের জবাব নিম্নের প্রদত্ত মডেল হতে জানা যাবে। মডেলটি হযরত ইমাম গাযযালী (রহ.)[৫৭] এবং হযরত ইমাম শাতিবী (রহ.)[৫৮] কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উদ্ভাবন করেছেন বলে জানা যায়। এটিকে মৌলিক চাহিদা বৃক্ষ মডেল (Basic Needs tree model) নামেও অভিহিত করা যায়। যার আরবী নাম আশ্ শাজারাতুল হাজাতিয়াতিল আসাসিয়াহ।'

এই মডেলে মানবীয় প্রয়োজনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ তার মৌলিক চাহিদাকে অবলম্বন করে বিভিন্ন কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করে। এই চাহিদার তীব্রতার উপর উক্ত চাহিদা পূরণের প্রেষণার প্রকৃতি নির্ভর করে। নিম্নে উল্লিখিত

---

৫৭. আল-গাযযালী, আল মুসতাসফা (১৯৩৭) প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩৯-১৪০।
৫৮. ইমাম শাতিবী, Al-Muwafaqat fiusul al shariah, vol-2, p. 177.

www.pathagar.com

মডেলের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

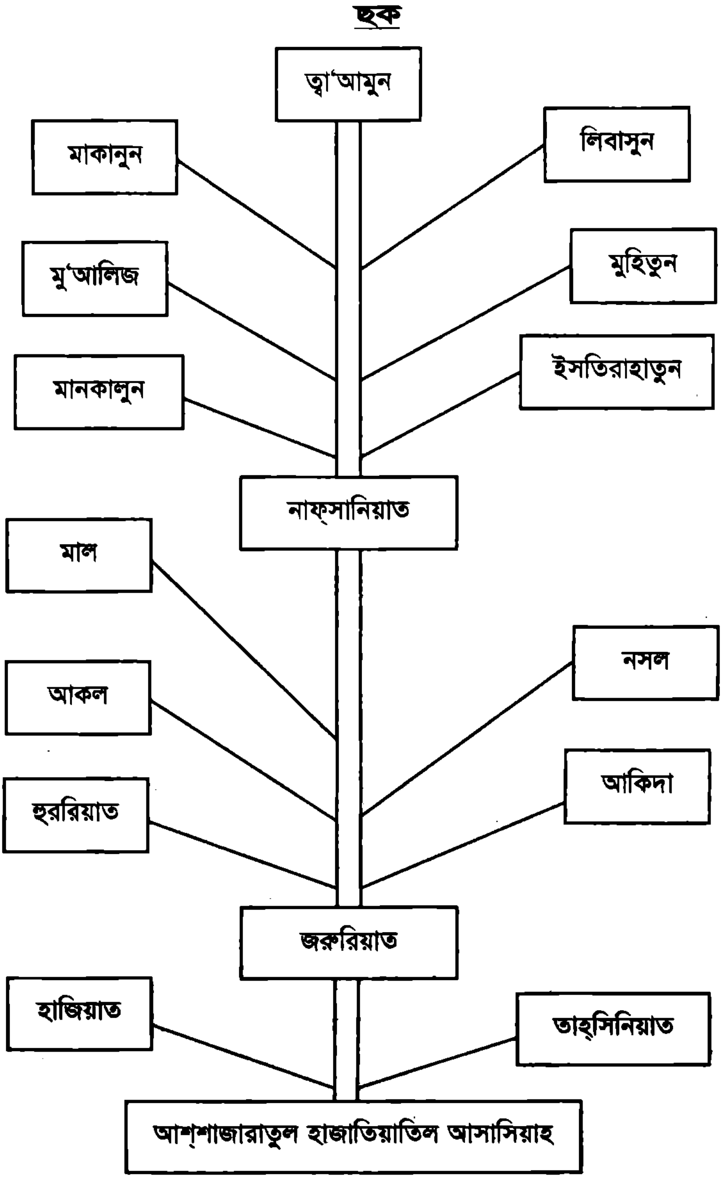

www.pathagar.com

চাহিদা বৃক্ষ (আশ্ শাজারাতুল হাজাতিয়াহ) : এই মডেলে মানুষের মৌলিক চাহিদাকে একটি বৃক্ষরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ একজন মানুষকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে অসংখ্য অভাবের মুকাবিলা করতে হয় এবং তার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হয়। অন্যথায় মানব জীবন বিশৃংখলাপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এজন্য মৌলিক চাহিদা বৃক্ষকে ভারসাম্যমূলকভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। আরবীতে একে আশ্ শাজারাতুল হাজাতিয়াতিল আসাসিয়াহ (মৌলিক চাহিদা বৃক্ষ) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। মানুষের মৌলিক চাহিদাকে প্রধানত: তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- জরুরিয়াত (অবশ্য প্রয়োজনীয়), হাজিয়াত (আরামদায়ক) এবং তাহসিনিয়াত (সৌন্দর্যবর্ধক)। নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো :

১. জরুরিয়াত (Zaruriat-Basic Needs/Necessities) : মৌলিক চাহিদা তাকে বলে যার অভাবে মানুষ বাঁচে না বা অত্যন্ত কষ্টে বাঁচতে হয়। একান্ত আবশ্যকীয়, যা একান্তই অপরিহার্য, যা না হলে মানুষের চলেই না, বস্তু জগতের সামগ্রিক অগ্রগতিতে যা একান্তই অপরিহার্য। একে আবার নিম্নে উল্লিখিত ৬টি উপ-বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে :

ক. নাফসানিয়াত বা দৈহিক বা জৈবিক চাহিদা (Nafs-Life itself/Protection of life Physiological needs) : সাধারণত: দশ প্রকারের অভাবকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন- ত্বয়ামুন (খাদ্য), লিবাসুন (বস্ত্র), মাকানুন (বাসস্থান), মুআলিজ (চিকিৎসা), মুহিতুন (পরিবেশ), মানকালুন (পরিবহন) এবং ইসতিরাহাতুন (বিশ্রাম) অবসর, বিশুদ্ধ পানীয়, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া এবং শান্তি-স্বস্তি-নিরাপত্তা ইত্যাদি যা মানুষের জীবন ধারণের সাথে সম্পৃক্ত। এই সব অভাব পূরণ করা যে কোন মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করার জন্য অত্যন্ত জরুরী।

খ. মাল/সম্পদ (Mal-property-wealth-Resources) : ন্যূনতম পরিমাণ সম্পদ থাকা এবং সংরক্ষণ করা প্রতিটি মানুষের জীবনের জন্য অতি প্রয়োজন। সম্পদ নাফসানিয়াতের অভাব পূরণে সহায়তা করে। তাই এই সম্পদ অর্জনের জন্য মানুষ প্রেষণা অনুভব করে থাকে। ইসলামে হালাল বা বৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানোকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

গ. আকল/শিক্ষা (Aql-Intellect/Reason, Education) : শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা। শিক্ষা বা জ্ঞানার্জনের চাহিদা মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য শিক্ষার্জনের জন্য মানুষ প্রিয়জনদের ছেড়ে দূর-দূরান্তে গমন করে থাকে। জ্ঞানার্জনের জন্য মানুষ গবেষণা কার্যে সারাজীবন অতিবাহিত করে এবং দেশ-বিদেশে সুনাম কুড়িয়ে থাকে। ইসলামে জ্ঞানার্জনকে ফরয করা হয়েছে-কি পুরুষ কি নারী সবার জন্য।

ঘ. হুররিয়াত/স্বাধীনতা (Hurriat-Freedom) : স্বাধীনতা ছাড়া মানুষকে পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করতে হয়। স্বাধীনভাবে চলাফেরা, কথাবার্তা, কাজ করা

www.pathagar.com

প্রভৃতির জন্য মানুষ প্রাণপণ সংগ্রাম করে থাকে। স্বাধীনভাবে বাঁচার প্রেষণা হতেই এর উৎপত্তি। স্বাধীনতার জন্য মানুষ যুদ্ধ করছে, চাকরি পরিত্যাগ করছে, জেলে কষ্ট ভোগ করছে, এমনকি এই অপরাধে নির্বাসনে যাচ্ছে। ইসলামে স্বাধীনতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়। আল্লাহ পাক মানুষকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই তাকে সর্বদা স্বাধীনই দেখতে চান। ধর্মীয় ও জাতীয় স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করাকে ইসলাম সর্বাপেক্ষা মর্যাদা দিয়ে থাকে।

ঙ. নসল/পারিবার গঠন (Nasl-Family formation-Protection of posterity) : পরিবার গঠনের ক্ষমতা, বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, বংশধারা সংরক্ষণ করা, বন্ধুত্ব অর্জন, আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন, পারিবারিক সমৃদ্ধি ও শান্তি অর্জন ইত্যাদির চাহিদা এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে পারে খুব কম। তাই ইসলাম বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে অত্যাবশ্যক করেছে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীকে কঠোর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার যে সুতীব্র আকাঙ্খা (প্রেষণা) প্রতিটি সামর্থবান মানুষ অনুভব করে তা দ্বারাই পৃথিবীতে সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রয়েছে।

চ. আকিদা/দীন/বিশ্বাস (Protection of Faith, Deen, Idology, Beliefs/values) : ঈমান/দীন, আদর্শ। আকিদা বা বিশ্বাস বা মূল্যবোধ জরুরিয়াতের সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা মৌলিক বিষয়। এই বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য একজন মানুষ সারা পৃথিবীতে ইসলামের মহান বাণী পৌছানের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। আবার বিশ্বাসী মানুষগুলো তাদের ঈমান বা বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এতই তীব্র প্রেষণা অনুভব করেন যে, কোন চক্রান্তই তাদেরকে সেই বিশ্বাস থেকে টলাতে পারে না। এমনকি প্রাণ গেলেও আল্লাহর সার্বভৌমত্বে কাউকেও আঘাত হানতে না দিতে তারা বদ্ধপরিকর। তাই ইসলামে ঈমান/আকিদা বা বিশ্বাসের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কুরআন এবং হাদীসে আল্লাহ এবং তাঁর বিধানাবলীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস আনয়ন ও সংরক্ষণ করার জন্য কঠোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

২. হাজিয়াত (Hajiat-Requirement-Comforts) : প্রয়োজনীয়তা যা মানুষের জীবনকে সহজ ও আরামদায়ক করে এবং কষ্ট ও নষ্ট থেকে রক্ষা করে। হাজিয়াত বা স্বাচ্ছন্দ্যের প্রত্যাশা মানুষের দ্বিতীয় প্রধান প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে। অত্যাবশ্যকীয় অভাব পূরণের পরেই মানুষ একটু সুখের প্রত্যাশা করে। শান্তিতে, নিরাপদে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার অভাব পূরণ হওয়া ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব, সুস্থ-অসুস্থ নির্বিশেষে সকল মানুষেরই কাম্য। এজন্য যার যা আছে তা অপেক্ষা কিছুটা হলেও আরামপ্রদ বা স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন পছন্দ করে। অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা পূরণের পূর্বে কেউই বিলাসবহুল জীবনের জন্য উৎসাহী হয় না। ইসলামে হাজিয়াতের ব্যাপারে জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে। পরিবারের সকল সদস্যদের সুখে-শান্তিতে রাখার জন্য যেমন পরিবার প্রধানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তেমনি কারবার প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীর

www.pathagar.com

সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা বিধান করা উচ্চ ব্যবস্থাপনা বা মালিক পক্ষের উপর অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সাধ্যমত স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ইসলাম কখনও শান্তি, স্থিতি এবং স্বচ্ছন্দ্য জীবনযাত্রা প্রণালীকে নিরুৎসাহিত করেনি বরং নানাভাবে উৎসাহিত করেছে। উপরন্তু আরামদায়ক কোন জিনিস ভোগ হতে আত্মাকে নিবৃত্ত রাখলে এই অপরাধের জন্য কঠোর জবাবদিহির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

৩. তাহসিনিয়াত (Tahsiniat-Beautification) : সৌন্দর্যবর্ধক প্রয়োজন যা মানব জীবনকে সুন্দর, পরিপাটি ও কল্যাণময় করে। তাহসিনিয়াত বা সৌন্দর্যের জন্য চাহিদা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এটি চাহিদা বৃক্ষের সর্বশেষ শাখা। সৌন্দর্য সকল সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষই ভালবাসে। আর সেই কারণেই সে সৌন্দর্যের জন্য উচ্চ প্রেষণাসহ কাজ করে। শিল্প-কারখানায় প্রতিটি কর্মী তার উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নয়ন, উন্নত পদ্ধতিতে ফাইল-পত্র সংরক্ষণ, কল-কারখানা ও যন্ত্রপাতি পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সর্বোপরি পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা সৌন্দর্যবর্ধক প্রক্রিয়ার মধ্যেই পড়ে। কারখানায় উল্লিখিত অবস্থা নিশ্চিত করার জন্য কর্মীর মধ্যে যে উদ্দীপনা আবশ্যক তা উচ্চ প্রেষণা সম্বলিত কর্মীর মাঝেই পাওয়া যায়।

ইসলাম মানবীয় সৌন্দর্যের চাহিদাকে অবজ্ঞা তো করেই না বরং উৎসাহিত করে। ইসলাম সুন্দর জীবন ব্যবস্থা, আল্লাহ তাআলা নিজে সুন্দর এবং আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দর মানুষ ছিলেন বলে ইসলামে সৌন্দর্যের মর্যাদা সর্বদাই ঊর্ধ্বে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কারো চুল এলোমেলো দেখলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং তাকে শয়তানী আচরণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইসলাম তিনটি কারণে উপযুক্ত বস্ত্র পরিধানের নির্দেশ দিয়েছে :

ক. আব্রু আচ্ছাদান

খ. আবহাওয়াগত দুর্বিষহতা থেকে আত্মরক্ষা এবং

গ. সৌন্দর্য বর্ধন।

সৌন্দর্য বর্ধক পোশাক পরিধান করলে, অফিস, কারখানা, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকলে মন প্রফুল্ল থাকে এবং কার্যে প্রেষণা লাভ করা যায়।

উপরে ইসলামের প্রেষণা মডেলের মৌলিক চাহিদা বৃক্ষটির আলোচনা হতে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এত ব্যাপক এবং ভারসাম্যমূলক প্রেষণা মডেল এটিই প্রথম। এ মডেলের কার্যকারিতা একাধারে ব্যক্তি, পারিবারিক ও সমাজ জীবনে যেমনি, শিল্প কল-কারখানা, অফিস-আদালত তথা রাষ্ট্রীয় জীবনেও তদ্রূপ প্রযোজ্য।

ইসলামী মডেলের মূল্যায়ন (Evaluation of Islamic Model)

ইসলামী প্রেষণা মডেল নি:সন্দেহে একটি ভারসাম্যমূলক প্রেষণা মডেল। প্রেষণা সংক্রান্ত এই পর্যন্ত যতগুলো মডেল মানুষের গোচরে এসেছে ইসলামী মডেলের মত

www.pathagar.com

এত ব্যাপক ব্যাখ্যা কোন মডেলে নেই। সেদিক হতে এটিকে চিরন্তন প্রেষণা মডেল (Universal motivation model) বলা যেতে পারে। ইসলাম একটি শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হেতু এর প্রেষণা মডেল সর্বজনগ্রাহ্য হবে এটাই স্বাভাবিক।

এ মডেলে অন্যান্য পশ্চিমা লেখকদের প্রদত্ত মডেল অপেক্ষা কতকগুলো নতুন প্রেষণা উপাদান সংযুক্ত হয়েছে। পশ্চিমা লেখকদের প্রদত্ত কোন মডেলেরই বয়স ৫০ বছরের অধিক নয়। অথচ ইসলামী প্রেষণা মডেলটি আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে প্রদত্ত। যদি ইসলামী মডেলে প্রেষণার উপাদানে কোন ঘাটতি পরিলক্ষিত হতো তা হলেও কথা ছিল। তা হয়নি বরং একবিংশ শতাব্দীতে এসেও পশ্চিমা মডেলে প্রেষণার প্রধান প্রধান দিকগুলোও সন্নিবেশ করা সম্ভব হয়নি। সেদিক থেকে ইসলামী মডেল অনেক উন্নত ও সার্বজনীন।

পশ্চিমা প্রেষণা মডেলে কতকগুলো উপাদান সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত রয়েছে। যেমন- বিশ্বাস (আকিদা), সৌন্দর্য (তাহসিনিয়াত), পরিবেশ (মুহিতুন) প্রভৃতি। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা যদি জানতে পার আগামীকাল রোজ-কিয়ামাত হবে তথাপি আজ একটি বৃক্ষ রোপণ করো। পরিবেশ রক্ষা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ইঙ্গিত এত গুরুত্ব দিয়ে আজও কেউ বলতে পারেননি। অথচ আজ মানুষ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য এবং পরিবেশ দূষণের ছোবল হতে বাঁচার জন্য ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের বাঁচানোর জন্য দারুণ উদ্বেগের সাথে আকুল আবেদন জানাচ্ছে।

ইসলামী মডেলে উল্লিখিত আরেকটি বিষয় পরিবার কাঠামো গঠন (নসল) সম্পর্কে না বলে পারা যায় না। ইসলামী মডেলে এই বিষয়টির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পারিবারিক বন্ধন না থাকলে মানবিক মূল্যবোধ, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অন্যের প্রতি সহানুভূতি, সামাজিক সম্প্রীতি কিছুই থাকে না। ফলে সমাজ ব্যবস্থায় সার্বিক অবক্ষয় নেমে আসে। পশ্চিমা বিশ্ব যার বাস্তব শিকার। তাই ইসলামী মডেলে বর্ণিত পারিবারিক কাঠামো অক্ষুণ্ন এবং শক্তিশালী রাখার ব্যবস্থা করার জন্য পশ্চিমা দেশগুলোতে সম্প্রতি আবার চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায় যে, ইসলামী প্রেষণা মডেল অতুলনীয়, সর্বজনীন ও ভারসাম্যমূলক
একটি মডেল।

১২.৭ নিয়ন্ত্রণ (Controlling)

ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণ হলো কর্ম সম্পাদনের পরিমাপ এবং ফলাফলের মূল্যায়ন। সঠিক অর্থে নিয়ন্ত্রণ বলতে ঐসব কাজকে বুঝায় যার দ্বারা আদর্শ নির্ধারণ, কাজের ফলাফল নির্ণয় এবং পরিমাপ করা যায়, কাজের ফল মূল্যায়ন করা যায় এবং কাজের ফলকে পরিকল্পনা মাফিক সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনবোধে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেয়া যায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা তা

www.pathagar.com

নিশ্চিতকরণের জন্যে নিয়ন্ত্রণ হল অধস্তনদের কার্যাবলীর পরিক্ষাকরণ। তাই লক্ষ্য এবং পরিকল্পনার বিপরীতে নিয়ন্ত্রণ কার্যফল পরিগণনা করা, কোথায় ধ্বনাত্মক বিচ্যুতি বিদ্যমান তা দেখানো এবং বিচ্যুতি সংশোধনের জন্যে কার্য স্থিরীকরণ, পরিকল্পনা অর্জন নিশ্চিত করণে সাহায্য করে থাকে। সফল নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করতে হয়। নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ন্ত্রণমানকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নির্ধারণ করতে হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রণ (Controlling in Islam)

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ধার্য করা হয় এবং তা অর্জনের জন্য যে সমস্ত কার্যাবলী নির্ধারণ করা হয় সেগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও তদারক করে দেখার উপর ইসলামী ব্যবস্থাপনা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। কারণ ইসলামী ব্যবস্থাপনা বিশ্বাস করে যে জনশক্তিকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত করার পরে তাদের প্রচেষ্টায় কিছু বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হতে পারে, তাদের মধ্যে নানা প্রলোভন কাজ করতে পারে এবং বিভিন্ন অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে কর্মীগণ ব্যবস্থাপনার আশু হস্তক্ষেপ বা পরামর্শ বা সহায়তা কামনা করে। নিয়মিত নিয়ন্ত্রণ কার্যের মাধ্যমে এসব অসুবিধা বিদূরিত হয়ে কার্য সম্পাদনের পথের সকল বাধা অপসৃত হয় এবং কার্যের স্বাভাবিক গতি ফিরে আসে।

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় আনুষ্ঠানিক (Formal) এবং অনানুষ্ঠানিক (Informal) উভয় প্রকার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাই দেখা যায়। ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের বৈধ উপায়গুলোর সবই, ইসলামী ব্যবস্থাপনায় স্বীকার করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ উপায়সমূহের মধ্যে সালাত (নামায) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর। সকল সময় আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ফলপ্রসূ হয় না। ফলে অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়ে থাকে। নামায এরূপই একটি অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। অফিস চলাকালীন সময়ে যতবার উচ্চ থেকে নিম্ন পর্যন্ত সকল ব্যবস্থাপক নামাযে হাজির হন ততবারই তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে যোগাযোগের সুযোগ হয়। এ সময় আল্লাহর আনুগত্যের কাছে সবাই এতই অসহায়ত্ব নিয়ে হাজির হয় যে, অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে অধঃস্তনদের সমস্যা শ্রবণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এভাবে সকল সাধারণ সমস্যা তাৎক্ষণিক সমাধান নিশ্চিত হয়। এছাড়া নিম্নে নিয়ন্ত্রণের আরো কয়েকটি দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে :

১. নিয়ন্ত্রণ নিয়মিত হতে হবে। নিয়মিত ও সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কর্মীদের সঠিকভাবে উৎপাদন ও সেবা কর্মে নিয়োজিত থাকতে সহায়তা করে। মানুষের ভাল-মন্দ কার্যের হিসাব রাখার জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছেন, তারা হচ্ছেন 'কিরামান

www.pathagar.com

কাতেবীন' সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ।[৫৯]

২. নিয়ন্ত্রণ অত্যধিক কড়া বা অতি শিথিল কোনটিই হওয়া উচিত নয়। মধ্যম পন্থায় নিয়ন্ত্রণ কার্য সমাধা করা উচিত। অধঃস্তনদের কার্যের হিসাব অতি ঘন ঘন এবং কড়াকড়িভাবে নিলে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। আবার নাম মাত্র খবরা-খবর নিলে তাদের মধ্যে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে শৈথিল্য দেখা দিতে পারে। কুরআন এবং হাদীস মধ্যম পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে।

৩. নিয়ন্ত্রণ কার্যের সাথে যে বিচ্যুতির প্রসঙ্গটি জড়িত তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকতে হবে। কর্মীদের ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য প্রতিষ্ঠানের কাজের কোন ক্ষতি হলে সে জন্য কর্মীর শাস্তির প্রশ্ন আসতে পারে। এক্ষেত্রে ইনসাফের ভিত্তিতেই এবং অন্যের জন্য ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তবে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে গিয়ে কোন ক্ষতি হলে তার সব দায় প্রতিষ্ঠানই বহন করবে।

৪. ইসলাম আত্ম-নিয়ন্ত্রণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। আত্ম-নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ ভীতি নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়। কুরআন এবং হাদীসে নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আমানতদারী, দায়িত্বশীলতা প্রভৃতি গুণাবলী কর্মীদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

৫. সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য ইসলামী ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের সম্ভাব্য সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা বলেছে। স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রেখে নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি আরোপ করায় এ ব্যবস্থাপনা বিশ্বাস করে না। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সব রকম নিয়ামত দিয়েছেন বলে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব গ্রহণের ওয়াদা করেছেন।[৬০]

৬. সার্বিক ও চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ সর্বোচ্চ শীর্ষ ব্যবস্থাপক করবেন। এতে সকল স্তরের কর্মীদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি হয়। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই সকল বিচার কার্য সমাধা করতেন এবং সকল অভিযোগ শ্রবণ করতেন। নিম্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের মধ্যে যদি কোন শৈথিল্য বা অদক্ষতা থাকে তাহলে এ ধরনের শীর্ষ-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা তা দূরীভূত হয়। সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপকও চূড়ান্ত হিসাব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকেন। নবীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরে খলীফাবৃন্দও তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করতেন। হযরত উমার ফারুক (রা.) বলতেন "ফোরাতের তীরে যদি কোন কুকুরও অভুক্ত অবস্থায় মারা যায় এজন্যও আমাকেই দায়ী থাকতে হবে।"[৬১] বিচার দিনের ভীতি থেকে তিনি অর্ধেক জাহানের শাসক হয়েও সরেজমিনে নাগরিকদের দুঃখ-দুর্দশা দেখতে বের হতেন।

---

৫৯. ৮২ সূরা আল ইনফিতর : ১০-১২।

৬০. ৯৯ সূরা যিলযাল : ৭-৮।

৬১. উদ্ধৃত আবদুন নূর, লোক প্রশাসন, সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০০৬, পৃ. ৮৩।

www.pathagar.com

৭. ইসলামী ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণের বেলায় যে বিষয়ে হিসাব গ্রহণ করা হবে বা যে কার্য তদারক করা হবে সে সম্পর্কে কর্মীকে পূর্বাহ্নেই জ্ঞাত করাতে হবে। অন্যথায় নিয়ন্ত্রণ কার্য ফলপ্রসূ হয় না। আল্লাহর বিধান থেকেই এ ধারণা ব্যবস্থাপনায় গ্রহণ করা যায়। মানুষকে কোথায়, কোন ব্যাপারে কি প্রশ্ন করা হবে তা পূর্বাহ্নেই প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। মানুষকে এসব প্রশ্নের জবাব প্রস্তুত করে নেবার উপযুক্ত সময়ও দেয়া হয়েছে। যাকে সে সুযোগ দেয়া হয়নি তার কোন হিসাব দিতে হবে না। যেমন-শিশু, পাগল ইত্যাদি।

সুতরাং দেখা যায় যে, ইসলামী ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত মানের এবং যুক্তিসংগত। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ লাভ করার যোগ্য ব্যক্তিদেরই কেবল এই কার্যের আওতায় নিয়ে আসা হয়। যাদের কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা পূর্ণভাবে ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করা যায় না, যাদের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দেয়া যায় না, তাদের উপর নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায় না। আরোপ করলে ব্যক্তির উপর যুল্‌ম হতে পারে। ইসলামী ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণ পরবর্তী সময়ের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করে।

১৩. মানসিক চাপ, টেনশন ব্যবস্থাপনা (Stress, Tension Management)

মানসিক চাপ (stress) শব্দটি ল্যাটিন শব্দ (Strainger to draw light) থেকে এসেছে। যার বাংলা প্রতিশব্দ ক্লেশ বা দুর্দশা (distress) এবং ইংরেজী strain শব্দটির অর্থ জোর করা বা খুব চেষ্টা করা।

চাপ হচ্ছে একটি অস্থিরময় বা অস্বস্তিকর অবস্থা। এই অবস্থা তখনই সৃষ্টি হয় যখন ব্যক্তি তার চাহিদাগুলো যথাযথভাবে পূরণ করতে পারে না বা পূরণে ব্যর্থ হয়। চাপ হচ্ছে এক প্রকার শক্তি। এটা এমন এক বেদনাদায়ক ও অসহনীয় অবস্থা, যা ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবন ধারাকে ব্যাহত করে। সামাজিক পরিস্থিতি- সম্পর্ক বা ঘটনাবলী যখন মানুষের মনে কোনো দ্বন্দ্ব হতাশা বা অনাকাঙ্খিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তখনই 'চাপের' সৃষ্টি হয়। 'চাপ' কোন শারীরিক বা মানসিক উৎস হতে সৃষ্টি হয়, যার প্রকাশ ঘটে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচরণের মাধ্যমে। মানসিক চাপ বলতে কোনা কারণে ব্যক্তির স্নায়ুতন্ত্রে এমন অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত চাপ বুঝায় যা ব্যক্তিকে উত্তেজিত, অস্থির, বিচলিত বা অবসাদগ্রস্ত করে। তাছাড়া মানসিক চাপ বলতে এমন এক মানসিক অবস্থা বুঝায় যা ব্যক্তির ক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি সৃষ্টি ও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। আধুনিক ব্যস্ত, চঞ্চল ও কোলাহলপূর্ণ জনজীবনে অস্থিরতা, মানসিক চাপ, টেনশন ও উত্তেজনার নানাবিধ কারণ আছে।

কারণ সমূহ নিম্নরূপ :

১. দুশ্চিন্তা (Anxiety)

২. ভাবের দোদুল্যমানতা (Mood swings)

৩. অবসাদ (Depression)

৪. ক্রোধ প্রবণতা (Irritabality)

www.pathagar.com

৫. নিশি আতংক (Night terror)
৬. স্নায়ুবিক দুর্বলতা (Nervous weakness)
৭. বিরক্তিবোধ করা (Worrying)
৮. সংশয় (Confusion)
৯. স্মৃতিভ্রম (Forgetfulness)
১০. ক্ষীণ মনোযোগ (Poor concentration)
১১. বিষণ্নতা (frustration)
১২. একাকীত্বভাব (Loneliness)

মানসিক চাপ মানসিক যন্ত্রণাসহ স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। মানসিক চাপ চূড়ান্ত পর্যায়ে একটি স্বাস্থ্যগত সমস্যা ও জীবনের ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

মানসিক চাপের উৎস

ব্যর্থতা (Frustration)
দ্বন্দ্ব (Conflict)

ব্যক্তিজীবনে মানসিক চাপের উৎসসমূহ

সামাজিক বৈষম্য
প্রাকৃতিক কারণ
দরিদ্রতা
শারীরিক ত্রুটি
অপ্রত্যাশিত ঘটনা

মানসিক চাপ প্রশমনের উপায় (How to manage stress)

রিলাক্স
'ইবাদাত
ব্যায়াম
কুরআন অধ্যয়ন
মেডিটেশন
প্রশান্তি

মানসিক চাপ উত্তরণে স্বাস্থ্যের ভূমিকা

স্বাস্থ্যকে আমরা শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য হিসেবে ভাগ করতে পারি। কঠোর পরিশ্রম ও বুদ্ধিভিত্তিক কাজ করার জন্য যেমন ভাল স্বাস্থ্য ও সুস্থতা আবশ্যক, তেমনি ব্যক্তি, পরিবার ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভুত সমস্যা মুকাবিলা করার জন্যও উত্তম স্বাস্থ্য তথা সুস্থ শরীর আবশ্যক।

মানসিক স্বাস্থ্য বলতে চিন্তাভাবনার ভারসাম্য বুঝায়। চিন্তা-চেতনা ও আচরণে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে মানসিক ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। সাধারণত নিম্নোক্ত অবস্থার উপর মানিসক স্বাস্থ্য বহুলাংশে নির্ভর করে–

www.pathagar.com

১। ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র ও মুল্যবোধ,
২। পেশাগত ও পারিবারিক অঙ্গীকার,
৩। সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন ও পরিশ্রম করে হালাল রোজগারের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ,
৪। জীবন ও সমাজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি,
৫। ব্যক্তির অহংবোধ তথা জীবন ধারণ বৈশিষ্ট্য,
৬। জীবন দর্শন,
৭। পরকালীন জবাবদিহিতায় বিশ্বাস।

১৪. সময় ব্যবস্থাপনা (Time Management)

বস্তুবাদীরা বলে 'টাইম ইজ মানি'। তাই তারা সময়কে টাকা উপার্জনের সুযোগ হিসেবে দেখে। ইসলাম বলে সময় হলো জীবনকাল মানে হায়াত। জীবন নিয়ে ভাবে না অনেকেই। জীবনের কখন সূচনা, কোথায় গন্তব্য তাও জানে না বহু লোক। মানুষ জীবন যাপন করে কিন্তু জীবনের আদ্য প্রান্ত জানার চেষ্টা করে না। জীবনে মানুষ অনেক কিছু পেতে চায়, ভোগ করতে চায়, বিলাস চায়, জীবনে মানুষ নিরাপত্তা-অধিকার-সুখ-শান্তি-সৌন্দর্য-সাফল্য চায়।

কিন্তু মানুষ যা যা চায় সেগুলোর সঠিক পরিচয়ই অনেকের জানা নেই। সেগুলো পাওয়ার পথ সম্পর্কে বিভ্রান্ত অনেকেই। মানুষ যা যা পেতে চায় সেগুলো সাময়িক পেতে চায়, নাকি স্থায়ীভাবে পেতে চায়, সে বিষয়ে মানুষের সিদ্ধান্ত নেই।

মানব দেহের দুটি অংশ। একটি দেহ, অপরটি আত্মা। মানব দেহকে জীবন্ত রাখে রূহ (Spirit) বা জীবন (Life)।

একজন মানুষকে জীবন্ত দেখা গেলেও তার জীবন বা রূহ দেখা যায় না। মূলতঃ রূহ দেখা যাবার জিনিস নয়। রূহ সম্পর্কে মানুষকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।

তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে। তুমি বলো, রূহ আমার প্রভুর একটি নির্দেশ আর তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে সামান্যই।[৬২]

এই রূহ, আত্মা বা জীবন হলো আল্লাহর নির্দেশ। এটা একটা বিমূর্ত বিষয়। প্রত্যেকের রূহ আল্লাহর এক একটা নির্দেশ। রূহ মূর্ত হয় বা প্রকাশ পায় মানুষের দেহের মধ্যে। রূহ বা জীবন বিহীন দেহ মৃত।

মানুষের রূহের মৃত্যু হয় না। মানুষের রূহ (Spirit/Life) অমর। পৃথিবীর জীবনে মানুষের যে মৃত্যু হয়, সে মৃত্যু হয় দেহের, রূহের নয়। মূলত রূহের হয় ইন্তিকাল, আর দেহের হয় মৃত্যু। ইন্তিকাল মানে স্থানান্তর (Transfer) অর্থাৎ দেহ থেকে রূহ বা জীবন স্থানান্তরিত হয়ে যায়। দেহ থেকে রূহ স্থানান্তর হয়ে গেলেই দেহ হয়ে পড়ে মৃত।

কুরআন অধ্যয়ন করলে জানা যায়, মানুষের জীবন বা রূহের কয়েকটি ইন্তিকাল হয়।

---

৬২. ১৭ সূরা বনী ইসরাইল : ৮৫।

www.pathagar.com

এর সর্বশেষ ইন্তিকাল হয় জান্নাতে বা জাহান্নামে। জান্নাত ও জাহান্নামই মানুষের সর্বশেষ গন্তব্যস্থল (Ultimate destination)

কুরআন মাজীদ বা হাদীস পড়লে জানা যায় যে মানব জীবনের (রূহের) সৃষ্টি থেকে নিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছা পর্যন্ত মোট ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। একটি অধ্যায় থেকে আরেকটি অধ্যায়ে রূহ স্থানন্তরিত হয়। এগুলো হলো :

১. আলমে আরওয়াহ : রূহের জগত,

২. আরহামে উম্মাহাত : মাতৃগর্ভ

৩. হায়াতুদ দুনিয়া : পৃথিবীর জীবন-জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পৃথিবীর জীবন।

৪. আলমে বারযাখ : অন্তরাল জগৎ

৫. ইয়াওমুল কিয়ামাত/ কিয়ামাতকাল/ হাশর

দুনিয়ার জীবনটি মানুষের জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের সমষ্টিমাত্র। সময় ও জীবন একাকার। নির্ধারিত সময়ে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় অনিবার্য। বিদায় সময় সচেতনতা অপরিহার্য। সময় সচেতনতা ও সাফল্য অনেকটাই সমানুপাতিক।

দুনিয়ার জন্য নির্ধারিত সময়কে পরকালের সাথে তুলনা করে কুরআনে কোথাও কয়েকটি ঘণ্টা একটি সকাল বা একটি বিকাল ইত্যাদি শব্দ দ্বারা দুনিয়ার জীবনের সময় গুরুত্ব অনুধাবন করে সিরিয়াস হওয়ার জন্য তাকিদ দিয়েছে।

সমাজে যারা উঁচু পর্যায়ে অবস্থান করেন তাঁরা সময় সংকটে ভোগেন। নেতৃবৃন্দের গণসংযোগ, নির্বাহীদের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিতে সময়ের ভারসাম্য রক্ষায় সমস্যা সৃষ্টি হয়। ইসলাম এ ব্যাপারে বহুল আলোচিত ব্যক্তিত্বের মডেল। ওয়ারাফানা লাকা জিকরাক 'আমিই তোমার স্মরণকে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি'[৬৩] হিসেবে মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দিয়ে তাঁর সময়কে পরিকল্পিত ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে বলেছে, ফাইযা ফারাগতা ফানসাব 'অতপর যখনি তুমি অবসর পাবে তখনি তুমি ('ইবাদাতের) পরিশ্রমে লেগে যাও।'।[৬৪] অর্থাৎ একটি অংশ শেষ করেই আরেকটি কাজ শুরু করে দিন। পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া এমনটি কখনই সম্ভব নয়। অবসর সময় বুঝাতে কুরআনে ফারাগ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যাদের পূর্ব পরিকল্পনা থাকে না তারা সময়কে ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে পারে না। ফলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হয়ে উঠে না। এদের ব্যাপারেই মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন আল্লাহর দেয়া দুটি নেয়ামত ব্যবহারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকা খেয়েছে। একটি হলো তার সুস্থতা অপরটি তার অবসর সময়।

জীবনের সময় নির্ধারিত বলেই প্রয়োজন হলো সময়ের যথার্থ ব্যবহার, সময়ের বাজেটিং। কোন কাজের জন্য কতটুকু সময় প্রয়োজন। কখন শুরু করে, কখন শেষ করতে হবে, কোন কাজটি অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য ইত্যাদি বিবেচনায় নিতে হবে।

---

৬৩. সূরা ৯৪ আল ইনশিরাহ : ৪।

৬৪. সূরা ৯৪ আল ইনশিরাহ : ৭।

www.pathagar.com

এছাড়াও প্রয়োজন কাজের মূল্যায়ন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ। নষ্ট সময়ের জন্য আফসোস করে সময় আরও ব্যয় করার চাইতে সামনে যেন আর সময় নষ্ট না হয় তার সিদ্ধান্তই জরুরী।

এছাড়া সময়কে ঘিরে রয়েছে শয়তানের চক্রান্ত। শয়তান চায় মানুষ বেহুদা সময় কাটাক, অলস সময় কাটাক। নিজের জরুরী কাজ সম্পর্কে ভুলে থাকুক। আড্ডাবাজি, ধান্ধাবাজি ইত্যাদিতে মানুষকে লাগিয়ে দিয়ে শয়তান মানুষের সময়কে নষ্ট করতে তৎপর থাকে। কর্মপরিকল্পনার কথা শয়তান ভুলিয়ে দিতে পারে। ফলে জীবনে আসে শেষ সময়ের তাড়াহুড়া যা হলো শয়তানের প্রডাক্ট। সচেতন মানুষ তাই এপয়েন্টমেন্ট ডায়রী সংরক্ষণ করেন। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ভিত্তিতে পরিকল্পনা করে কাজের সময় বন্টন করেন। এমনকি দৈনিক কাজের জন্য আগাম সময় বন্টন করে ক্রমান্বয়ে সম্পাদন করে থাকেন। ফলে তারা অনেক সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন।

সময় নষ্ট করা থেকে বাঁচতে হলে কথাবার্তা সংরক্ষণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে চুপ থাকল সে বেঁচে গেল। এই হাদীসটি আমল করে শুধু অপ্রয়োজনীয় কথা পরিহার করে অনেক সময় বাঁচিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ সমাধা করা যায়। টিভি, মোবাইল মানুষের বহু সময় নষ্ট করছে। দৈনিক এক ঘণ্টা সময় বাঁচিয়ে বছরে ৩৬৫ ঘণ্টা বাড়তি সময়ে একটি বিরাট কাজ সম্পাদন করা যেতে পারে। এ সময়ে কুরআন অধ্যয়ন করা যেতে পারে, কুরআনের কয়েকটি সূরা মুখস্থ করা যেতে পারে, একটি আন্তর্জাতিক ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা যেতে পারে। যেমন মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবী হযরত যায়িদ বিন সাবিত (রা.) এক দিনে একটি আন্তর্জাতিক ভাষা শিখে নিয়েছিলেন। একটি ডিপ্লোমা ডিগ্রী বা কোন ডিগ্রী নেয়ার জন্য এ সময়টুকুয় পড়াশুনা যথেষ্ট কাজ দিতে পারে।

সময়ের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে ইসলাম জোর তাকিদ দিয়েছে। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মানুষ যিনি সময়ের মূল্য দানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পেশ করেছেন। তাঁর ৬৩ বছরের জীবন কালের কর্মপরিধির বিস্তার এবং সকল ক্ষেত্রে সাফল্যের উদাহরণ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি যথার্থই বলেছেন, 'এমন কোন একটি সকাল আসেনা যখন একজন ফেরেশতা ঘোষণা করেন না যে, হে বনী আদম, আমি একটি নতুন দিন এবং আমি তোমার কাজের সাক্ষী। সুতরাং আমার সর্বোত্তম ব্যবহার করো। শেষ বিচারের দিনের আগে আমি আর কখনো ফিরে আসব না।'

সময় স্রোতের মতই বয়ে যায়। সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সময়ের কসম খেয়ে বলেছেন সময়ের বিচারে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।[৬৫] কেউ কেউ তো সময় নষ্টকারীকে তুলনা করেছেন সেই বরফ বিক্রেতার সাথে যার বরফ বিক্রয়ের

---

৬৫. ১০৩ সূরা আল আসর : ১-২।

www.pathagar.com

আগে গলে পানি হয়ে যাচ্ছে। আর মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিটির পরিচয় তুলে ধরে বলেছেন যার দুইটি দিন একই রকম যায় নি:সন্দেহে সেই ক্ষতিগ্রস্ত। তাই গতকালের অবস্থার চাইতে আজকের অবস্থা অধিক ভাল করার জন্য প্রয়োজন হল সিদ্ধান্তের আর সময়ের বাজেট অনুযায়ী প্রচেষ্টার।

দুনিয়ার সময় নির্ধারিত। কখন তা শেষ হবে তা কারোরই জানা নেই। মন আমার দেহ ঘড়ি সন্ধান করি কোন মিস্ত্রী বানাইয়েছে। বাউল কবি অবশেষে মিস্ত্রীর সন্ধান না পেলেও দেহ ঘড়ির ডিজিটাল প্রমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত সময় এলেই সব শেষ। সেজন্য প্রয়োজন অনেক অর্জন ও বর্জন যা পরকালের পাথেয় হতে পারে। যেন সেখানে পৌছে কেউ না বলে যে আমি অল্প কালই ছিলাম। আর আফসোস করে বলবে, হায় আমি যদি হায়াত (সময়) কে কাজে লাগানোর ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতাম।[৬৬]

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষকে যত নিয়ামাত দিয়েছেন সময় তার অন্যতম। এ সময়ই উন্নতি অবনতির সোপান। এখানে যাদের হার হয়েছে তারা আর শির উঁচিয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

উপসংহার (Conclusion)

ইসলামী ব্যবস্থাপনা বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী ব্যবস্থাপনা একটি স্বতন্ত্র ও দ্রুত সম্প্রসারণ মান পাঠ্য শৃঙ্খলা। আজ সারা বিশ্বে মুসলিমরা আবার জেগে উঠেছে। পাশ্চাত্যের দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে রয়েছে কুফুরী, দ্বন্দ্বসংশয় যা আমাদের কোমলমনা ছাত্র-ছাত্রীদের মনে চিন্তার নৈরাজ্য সৃষ্টি করে তা আমরা আর হুবহু গ্রহণ করতে পারিনা। আমরা যেমন মুসলিমের জাতির পিতা হযরত ইববরাহীম খলিলুল্লাহর নাম মুছতে প্রস্তুত নই- তেমন ব্যবস্থাপনার পিতা হিসাবে ফেয়লের নাম বারংবার আওড়াতে হই বিরক্ত। কেননা সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার জন্মই হয়েছে ইসলামের কোলে। ইসলামের সুদীর্ঘ প্রশাসনিক ইতিহাসে সুস্পষ্ট রয়েছে ইসলামী ব্যবস্থাপনার দিক-নির্দেশনা। আধুনিক কালের ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলে ইসলামী শিক্ষার সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রায়োগিক দৃষ্টান্তের মিল খুঁজে পাওয়া যায় ব্যাপকভাবে। উদাহরণস্বরূপ ফেয়লের ব্যবস্থাপনার ১৪ নীতিতে রয়েছে ইসলামী শিক্ষার সুস্পষ্ট ছাপ। উপরন্তু ইসলামী ব্যবস্থাপনায় রয়েছে বিশেষ অতিরিক্ত কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ নীতি যথা- সততা ও দক্ষতা, দেশপ্রেম, সঠিক স্থানে সঠিক লোক নিয়োগ, শ্রমের মর্যাদা, ব্যয় সাশ্রয়, জবাবদিহিতা ও তাওয়াক্কুল যা ব্যবস্থাপনা ধারণায় সর্বজনীনতা আনয়ন করে। ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন পরিকল্পন হতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিটিই ইসলাম সমর্থিত এবং এই সকল ফাংশন ইসলামী শিক্ষার আওতাবহির্ভূত নয় বরং এ সকল ফাংশনের সমর্থনে অসংখ্য কুরআন-হাদীসের দলিল পেশ করা যায়। ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে প্রভাবশালী ফাংশন নেতৃত্ব।

---

৬৬. সূরা আল বালাদ, ৮৯ : ২৪।

www.pathagar.com

আর এই নেতৃত্বের বাস্তবানুগ ফর্মুলা দিয়েছে ইসলাম। নেতৃত্বকে ফলপ্রসু করার জন্য প্রয়োজন দৃষ্টান্ত স্থাপন। ইসলামের নেতৃত্ব কৌশলে Examplary বা উদাহরণ সৃষ্টির আবশ্যকতা রয়েছে সর্বপ্রথম। ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন ইসলামের এই দৃষ্টান্তমূলক আদর্শের কারণে এই দীনের দাবি মানুষের হৃদয়ে আজও আসন গেড়ে বসে আছে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত থাকবে। আধুনিক ব্যবস্থাপনার চিন্তাবিদগণ পরামর্শভিত্তিক ব্যবস্থাপনার ওপর জোর তাকিদ দিয়ে থাকেন। অথচ এই মাশআরাভিত্তিক ব্যবস্থাপনার কথা কুরআনে আল্লাহ তা'আলা প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে ঘোষণা দিয়েছেন এবং রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনে তার বাস্তবায়নের দৃষ্টান্ত রয়েছে ভুরি ভুরি। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুদ্ধ ব্যবস্থাপনায় রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ও অনুসরণীয় কৌশল যা আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক কারবার ব্যবস্থাপনার জটিল সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রয়োগের দাবি রাখে। তাঁর প্রতিটি যুদ্ধে ছিল অপেক্ষাকৃত স্বল্প মানবসম্পদ ও রসদ সামগ্রী কিন্তু অনুপম অনুপ্রেরণামূলক কৌশলের কারণে বিজয় তাঁর পদচুম্বন করে। স্বল্প লোকবলের সুদৃঢ় সাংগঠনিক কাঠামো ও টিম স্পিরিট-ভ্রাতৃত্ব সকল যুগের ব্যবস্থাপনার জন্য অনুপম আদর্শ। ■

লেখক-পরিচিতি : ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম- বিশিষ্ট ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ এবং প্রাবন্ধিক।
লেখা পরিচিতি : প্রবন্ধটি ১৯ মার্চ, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত হয়।

www.pathagar.com

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সপ্ত-কন্যা রাজ্যে অগ্নিগর্ভ স্বাধীনতার আন্দোলন

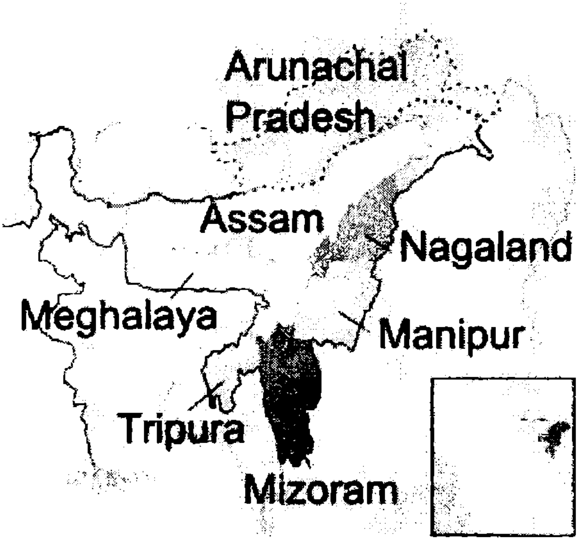

১.

'দেশের অবস্থা কেমন দেখছেন'-*প্রথম আলো* বিশেষ সাক্ষাতকারে বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন:

www.pathagar.com

"বাংলাদেশের সঠিক অবস্থা অনুধাবণের জন্য শুধু ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই জনপদের দিকেই দৃষ্টি না দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দৃষ্টি দিতে হবে।
এই বিস্তীর্ণ এলাকার ভূ-রাজনৈতিক এবং কৌশলগত অবস্থানের প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার সঠিক অনুধাবন যথার্থ হবে। হিমালয়ের পাদদেশের নেপাল ও ভূটান, উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি প্রদেশ, বাংলাদেশের পশ্চিমের পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যার একাংশ, এমনকি অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশে শুধু এই কয় মাসে নয়, কয় বছরে যে ঘটনাপ্রবাহের বিন্যাস ঘটে চলেছে, তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গে বাংলাদেশও আন্দোলিত হচ্ছে। সমগ্র এলাকার দিকে দৃষ্টি দিয়ে আজকের বাংলাদেশের অবস্থা পর্যালোচনা করা দরকার। সমগ্র এলাকা অশান্ত, উদ্বিগ্ন, অনিশ্চয়তার মুখে। কোথাও মাওবাদীদের চক্রান্ত কোথাওবা সর্বহারা বা জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর অনাকাঙ্ক্ষিত জিঘাংসা।...আইন-শৃঙ্খলা নির্বাসিত হয়েছে। জনজীবন পর্যুদস্ত হয়েছে। এক ধরনের অনিশ্চয়তা চারদিকে গ্রাস করেছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অবস্থা কেমন হতে পারে?"[১]

২.

ভারত প্রসঙ্গে সে দেশেরই একজন ব্যতিক্রমধর্মী গবেষক সম্পূর্ণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছেন যে:

"The political ideology of the Republic of India should be defined in terms of a 'civilization-state' rather than a 'nation-state.'"[2]

বস্তুতপক্ষে, ভারতের রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারক ও রাজনীতিবিদগণ জাতি-রাষ্ট্র বা (nation-state) বলতে মনে করেছেন:

"কারণ রাষ্ট্র কেবল 'জাতি'র দাবিই পূরণ করে। এই ধারণার যৌক্তিক পরিণতি হচ্ছে, 'একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় বয়ানের (majority state discourse) সৃষ্টি।"[৩]

'জাতি' বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠের রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য ও উগ্রতার উদাহরণ কাশ্মির, পাঞ্জাব এবং উত্তর-পূর্বের সাতটি পার্বত্য রাজ্যের অধস্তন এবং নির্যাতিত-অবহেলিত পরিস্থিতির মধ্যে প্রতীয়মান হয়। যাকে ভারতীয় রাজনীতিকরা বৈধতা ও যৌক্তিকতার মাধ্যমে প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী। ১৯৯৩ সালের জানুয়ারিতে বোম্বেতে ব্যাপক মুসলিম নিধনের পরপরই আন্তর্জাতিক *টাইম* ম্যাগাজিনে প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে ব্যাল থ্যাকারে ভারতে

---

১. এমাজউদ্দীন আহমদ সংবর্ধনা গ্রন্থ, ঢাকা: সংবর্ধনা কমিটি, ফেব্রুয়ারি, ২০১১.

২. Ravinder Kumar, *India: A Nation-state or a civilization-state*, Occasional Papers, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi, 1989, p. 39.

৩. আমেনা মোহসীন, "রাষ্ট্র, উপ-রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ এবং উপ-আঞ্চলিকতাবাদ: মুখোশের অন্তরাল থেকে উন্মোচন", *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৬৫, আগস্ট ১৯৯৭, পৃ. ৪.

www.pathagar.com

'জাতি' বলতে একমাত্র হিন্দুদেরকেই বুঝিয়েছেন এবং দ্বিতীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন:

"ওরা এদেশের আইন কানুন মেনে নিতে চায় না। ওরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ মানতে নারাজ। আমার মাতৃভূমিতে তারা শরিয়া আইন কার্যকর করতে চায়। হ্যাঁ, এটা হিন্দুদের মাতৃভূমি।

প্রশ্ন: কিন্তু মুসলমানরা তো বোম্বে ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে?

উত্তর: যেতে দিন। যদি না যায় তবে লাথি মেরে পাঠিয়ে দিন। পাকিস্তান যদি মনে করে যে এখানে মুসলমানদের হয়রানি করা হচ্ছে তা হলে দয়া করে ওদের সবাইকে নিয়ে যাক।

প্রশ্ন: এটা কি হিন্দু জাতি প্রতিষ্ঠার পক্ষে একটি পদক্ষেপ?

উত্তর: আমাদের কোন নতুন পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই। এটা একটা হিন্দু রাষ্ট্র।"[৪]

উল্লেখ্য, শুধু আজকের ব্যাল থ্যাকারেই নয়, ভারতীয় আদি নেতাদের[৫] কাছে 'জাতি' ছিল সংস্কৃতিগতভাবে সমধর্মী একটি জনগোষ্ঠী। হিন্দুরা নিজেদের ধর্মকে সংস্কৃত মনে করে এবং তাদের মতে, হিন্দুস্তানে বসবাস করলে হিন্দু সংস্কৃতি চর্চা বাধ্যতামূলক। মিশ্র ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিবাহ, হিন্দু আচার-আচরণ, পোষাক ও জীবনাচার গ্রহণে ভারতের মুসলামনসহ অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ এ কারণেই বাধ্য হচ্ছে। জাতিগঠনের এই প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক নেতারা আধিপত্যশী সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে জাতির আদর্শ হিসাবে ধরে নিয়ে নিয়েছিলেন এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো 'মূলধারা'র আধিপত্যশীল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিজেদেরকে আত্মস্থঃ করে নেবে–এটাই চেয়েছিলেন। এ ধরনের নির্মাণের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী নেতারা জাতি ও রাষ্ট্রকে সমার্থক হিসাবে গণ্য করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী নেতারা জাতীয় পর্যায়ে, প্রাধান্যশীল সম্প্রদায়ের পরিচয় ছাড়া অন্য কোন পরিচয় গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।[৬] অথচ মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন ছাড়া সমগ্র ভারতে শত-সহস্র এবং 'শুধু উত্তর-পূর্ব ভারতেই ২১৭টি Scheduled tribe আছে।'[৭]

এ কথা মনে রাখা দরকার যে, যদিও গণতন্ত্র, উদারতা, নিরপেক্ষতার কথা ভারতীয়

---

৪. কবীর চৌধুরী, "সংস্কৃতি, ধর্ম, সুশীল সমাজ", *প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ভাষণ সংকলন*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৬, পৃ. ১৭৪.

৫. গান্ধী-নেহরু প্রমুখেরা বাহ্যত সুশীল, উদার, ন্যায়ভিত্তিক ও নিরপেক্ষতার কথা নরম ভাষায় বলে ভারত রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া পরিচালনা করলেও বাস্তবে তার রূপ উগ্র হিন্দুত্ববাদী এবং সমগ্র জাতিসত্ত্বাই এককভাবে হিন্দুত্বের কর্তৃত্বাধীন।

৬. বাংলাদেশেও শেখ মজিবুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের বাঙালী হয়ে যাওয়ার জন্য বলেছিলেন। বিস্তারিত, মাহফুজ পারভেজ, *বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি*, ঢাকা: সন্দেশ, ১৯৯৯.

৭. আমেনা মোহসীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪.

www.pathagar.com

সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে, তথাপি ভারতীয় সংবিধানে এ সকল উচ্চ রাজনৈতিক আদর্শের অর্থ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তত্ত্বগত বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা রক্ষিত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, তাত্ত্বিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ বোঝালেও ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে সকল ধর্মের মানুষের নিজ নিজ ধর্মের প্রচার ও স্বাধীনতাকে বোঝানো হয়েছে–যদিও তা হিন্দু আগ্রাসন ও আক্রমনের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। মজার ব্যাপার হল, 'হিন্দুত্ব' কে এক্ষেত্রে 'খ্রিস্টবাদ' এবং 'ইসলাম'-এর মতো একটি একক একীভূতকারী 'কনফর্মিস্ট' ধর্ম হিসাবে দেখা হয়েছে এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ যে, ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার সুযোগ রাখা হয়েছে 'সংখ্যাগুরুর শাসন'–এই গণতান্ত্রিক মূলনীতির আওতার মধ্যে–যেখানে 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' বোঝাতে সকলের সামনে এবং সকলের উপরে 'হিন্দুত্ব' এসে আরোপিত হয়। ফলে অন্য ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-সংস্কৃতি ও জাতিসত্ত্বাগত মানুষের অবস্থা সহজেই অনুমেয় এবং এর প্রতিক্রিয়াও ভারতের বিভিন্ন স্থানের নিপীড়িত বিভিন্ন ধরনের সংখ্যালঘুর আর্ত চীৎকার ও হাহাকারের মধ্যে পরিস্ফুট।

বস্তুতপক্ষে, ভারতের আধিপত্যশীল জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ হিন্দুত্বের বাইরের অন্যান্য সংখ্যালঘুর ধারণাকে দেশের জন্য প্রাসঙ্গিক বলে গ্রহণ করে না। ক্ষেত্র বিশেষে ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের কিঞ্চিত স্বীকৃতি দেওয়া হলেও রাষ্ট্র-কর্তৃক বার বার বলা হয়েছে যে, ভারতে জাতিগত বা এথনিক-সংখ্যালঘু নেই–সকলেই ভারতীয় এবং হিন্দু জাতিত্বের অধীন। এভাবে হিন্দু ঐতিহ্য রাষ্ট্র এবং জাতি প্রসঙ্গে একটি বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত স্থান লাভ করে এবং সকল জনগোষ্ঠীর ওপর চেপে বসে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, যদিও ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম সিডিউলে বেশ কিছু আঞ্চলিক ভাষার একটি তালিকা রয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ৩৫০-এর 'ক' "ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নিশ্চয়তা" দিয়েছে। আবার একই সঙ্গে অনুচ্ছেদ ৩৫১-এ উপস্থাপন করা হয়েছে যে:

"Union (Indid) 'promote the spread of the Hindi language...as a medium of expression for all the elements of the composite culture...by the drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily, on other languages."[8]

এভাবেই হিন্দুত্বের প্রতীক সংস্কৃত ভাষা, যা কিনা ঐতিহ্যগতভাবে একটি ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণীয় অভিজাতদের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল তা 'যৌগিক সংস্কৃতি'র প্রকাশের মাধ্যমের প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে সমগ্র জাতিসত্ত্বার ওপরে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত হলো–মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত বিষয়ের গবেষক

৮. বিস্তারিত ভাষ্যের জন্য, 'ভারতীয় সংবিধান' দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

কমল মিত্র ছানয়।[৯]

জাতিত্ব ও হিন্দত্ব সংক্রান্ত ভারতীয় ধারণার আধিপত্য ও কর্তৃত্বশীল তত্ত্ব ও প্রয়োগ অ-হিন্দু অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিণত করেছে এবং নির্যাতন নিপীড়ণে শিকারের বিষয়বস্তু বানিয়েছে। কাশ্মির যার বাস্তব উপমা। একইভাবে ভারতের বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলোকেও উপ-উপনিবেশের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রখ্যাত ভারতীয় পণ্ডিত ই.জি ভার্গেসির মতে:

"...read Indian history as it is taught and you will scarcely know that Northeast exists."[10]

অগ্নিগর্ভ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভারতের পরিস্থিতি আলোচনা-পর্যালোচনা করা হলেই উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা অনুধাবণ করা সম্ভব হবে। রাষ্ট্র ও আইন, নীতি ও প্রতিষ্ঠান কীভাবে জনতার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত কাজ করছে, তার চিত্রটিও রাষ্ট্র ও রাজনীতির চরিত্র অনুধাবনে সাহায্য করবে। এবং ভারতের রাষ্ট্র, রাজনীতি ও রাজনীতিবিদগণের আচরণ কেমন করে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল, তা দেখা যাবে।

৩.

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রেক্ষাপটে নাগারাই প্রথম বিদ্রোহ করে।[১১] তারা ভারতীয় রাষ্ট্রে অঙ্গীভূত হতে অস্বীকার করে এবং ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এরই আগে ১৯৪৭ সালের জুন মাসে নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল (এনএনসি) গঠিত হয়। এ সংগঠনটি নাগা জনগোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধিরূপে নাগা-হিলে একটি গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য ভারতের প্রতি দাবি জানায়। নিজেদের রাজনৈতিক ভাগ্য গণতান্ত্রিকভাবে বেছে নেওয়ার লক্ষ্যে নাগাদের মতোই কাশ্মিরিরাও কাশ্মির-উপত্যকায় গণভোটের দাবি জানিয়েছিল। জনগণের পক্ষ থেকে উত্থাপিত উভয় দাবিই ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার অগ্রাহ্য করে। নাগা প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে, যখন ভারত এ দাবি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন এনএনসি-এর উদ্যোগে ১৯৫১ সালের মে মাসে নাগা জনপদে একটি স্বতস্ফুর্ত গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এ গণভোটের মাধ্যমে নাগা স্বাধীনতার পক্ষে সম্পূর্ণ সমর্থন প্রকাশিত হয়।

---

৯. Kamal Mitra Chenoy, "Armed Forces in North-East India," in Rnabir Samaddar (ed) *Cannons into Ploughshares: Militarization and Prospects of Peace in South Asia*, New Delhi: ASPBAE, 1995.

১০. E. G. Verghese, *India's Northeast Resurgent: Ethnicity, Insurgency, Governance, Development*, Delhi: Konark Publishers Pvt. Ltd, 1996, p. 280.

১১. বিস্তারিত দেখুন, ড. মাহফুজ পারভেজ, "নাগাল্যান্ডঃ হেড-হান্টার না বিপ্লবীদের দেশ?", দৈনিক আমার দেশ, ১১ জানুয়ারি, ২০১১.

www.pathagar.com

চাষাবাদ পদ্ধতির আধুনিকায়নের অভাবে ভূমির উর্বরতা হ্রাসের পাশাপাশি পাহাড়ি এলাকায় দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মিজো পার্বত্য অঞ্চলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। ১৯৫৯ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'mantam' –এ অঞ্চলের তীব্র অসন্তোষকে এক সন্ত্রাসী মাত্রা দেয়। দুর্ভিক্ষের আগমন সম্পর্কে পূর্বেই সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও সরকার ও প্রশাসনের তরফ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা দেখানো হয়েছে বলে মিজোরা অভিযোগ করে। ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের মুখে মিজোনেতা লালডেঙ্গা 'মিজো ন্যাশনাল ফেমিন ফ্রন্ট' বা এমএনএফএফ গঠন করেন। ১৯৬৩ সালে দুর্ভিক্ষ শেষ হলে এমএনএফএফ পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে 'মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট' বা এমএনএফ নাম ধারণ করে এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে প্রচারণা চালায়। পরবর্তীতে এ সংগঠন ক্রমবর্ধমান ভারতীয় অবহেলা ও নির্যাতনের মুখে স্বাধীকারের দাবিতে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়।

বাঙালীদের অভিবাসন এবং এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের প্রতিক্রিয়াহীনতাই আসামের ক্ষেত্রে অসন্তোষের সবচেয়ে গুরুতর কারণ। এ ব্যাপারে গবেষক সঞ্জয় হাজারিকা, যিনি নিজেও একজন অহমীয়া, চিহ্নিত করেছেন যে:

" The migration question does not stand on its own as a single issue but is intractably tied up with other pro which are represents of broader and deeper concerns: the identify, of cultural survival, of control over land and other resources, of human tolerance and the ability to live peacefully with other linguistic and other religious groups."[12]

অভিবাসনের এ হার এতই বিশাল ছিল যে, তা দেশজ অহমীয়া জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে রূপান্তিরিত করার আশঙ্কা সৃষ্টি করে। ফলে আসামের অন্যতম বৃহৎ ট্রাইবাল-গোষ্ঠী 'বোডো'-দের স্বতন্ত্র 'বোডোল্যাণ্ড'-এর দাবি–আশি দশকের শেষ দিকে এসে আসাম সঙ্কটে আরো জটিলতা সৃষ্টি করে। ভূমি মালিকানার যথাযথ দলিলপত্র নেই–এ অজুহাতে বোডো জনগোষ্ঠীর শত বছরের অধিকারে থাকা ট্র্যাডিশনাল-ভূমি থেকে উপজাতি জনগোষ্ঠীকে ভারত সরকার উচ্ছেদ করেছে বলে বোডোরা তীব্র প্রতিবাদ ও অভিযোগ জানিয়েছে। অ-উপজাতীয়দের হাতে বোডোরা বড় আকারের ভূমিবিচ্ছিন্নতার শিকার হচ্ছে বলেও তারা বিক্ষুব্ধ। এছাড়া ভাষা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান নীতিতেও তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে বলে ক্রমেই অধিকার রক্ষার্থে আন্দোলন মুখর হচ্ছে।

---

১২. Sanjoy Hazarika, "Crisis and conflict: Migration, Ethnicity and Politics- The Case of Assam and Bangadesh", Paper presented at the First Dialogue on *Interactions with Indian Bordering States*, organized by the BISS, Dhaka, Feb. 19-20, 1997.

www.pathagar.com

যদিও মণিপুর সব সময় স্বাধীন ছিল না-তথাপি নিজেদের আলাদা রাজনৈতিক এক দীর্ঘ ইতিহাস তাদের ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তাদের স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি মঞ্জুর না হওয়াটা মণিপুরের জন্য এক গভীর আঘাত এবং তীব্র বেদনার কারণ। এছাড়াও ভারতের একটি প্রদেশ হিসাবে পুরোপুরি মর্যাদা পেতে মণিপুরকে ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির পরেও আরো ২৩ বছর অপেক্ষা করতে হয়। মণিপুরী ভাষা-যার আছে ১৫০০ থেকে ২০০০ বছরের প্রাচীন সাহিত্য-তা ১৯৯২ সালের আগ-পর্যন্ত ভারতের সংবিধানের অষ্টম সিডিউলে অন্তর্ভূক্ত হয় নি। মণিপুর ভূমি ও রাজস্ব বিধানের অধীনে একদিকে মণিপুরীদের জন্য পাহাড়ি অঞ্চলে ভূমি কেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে-অন্যদিকে বহিরাগতদের যে কেউ অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুদ্র ইম্ফল উপত্যকায় জমি অধিগ্রহণ করতে পারে। সেবাখাতে বৈষম্য এবং বিপুল পরিমাণে অন্যান্য প্রদেশের ভারতীয়-বহিরাগতদের অভিবাসন মণিপুরের অসন্তোষের বড় কারণ।[১৩]

ত্রিপুরীয়দের জন্যও অভিবাসনই প্রধান সমস্যা হয়ে আছে। ভারতের সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়ার তিন দশকের মধ্যে তারা নিজভূমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। ত্রিপুরায় বাঙালি অভিবাসীরা মূলত চাষাবাদ করত। এরাই পরে প্রদেশের ওপর ভীষণ চাপের সৃষ্টি করে। কারণ পার্বত্য প্রদেশটির পুরো ভূমি এলাকার মাত্র শতকরা তিরিশ ভাগ বসবাস ও আবাদযোগ্য জমি। প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক প্রণীত, পাহাড়ি অঞ্চলের নতুন নতুন এলাকাকে 'রিজার্ভ ফরেস্ট' বা আরএফ-এ পরিণত করার নতুন নীতি এ পরিস্থিতিকে আরো খারাপের দিকে নিয়ে যায়। এর ফলে কেবল জুমচাষের আওতাধীন এলাকাই কমে গেল না-পাশাপাশি ত্রিপুরীরা বনজ সম্পদ সংগ্রহ ও বিক্রির যে সনাতন অধিকার ভোগ করত, তা থেকেও বঞ্চিত হলো। এর ফলে ১৯৪৭ সালের পর তিন দশকের মধ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষকগোষ্ঠী শেকড়বিহীন দিনমজুরে পরিণত হয়। উপরোক্ত কারণগুলোর সঙ্গে ভাষাও একটি ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। ত্রিপুরীয়রা এখন তাদের ভাষা Kokhoro কে মানসম্পন্ন করতে এবং একে একটি উপভাষা বা dialect থেকে একটি বিজ্ঞানসম্মত-ব্যকরণভিত্তিক ভাষায় রূপান্তরের চেষ্টা চালাচ্ছে, যেন তারা একে জাতীয়তা নির্মাণের একটি উপাদান হিসাবে ব্যবহার করতে পারে।[১৪]

৪.

উত্তর-পূর্ব ভারতের সেভেন-সিস্টার্স বা সাত-বোন রাজ্যের মানুষের ওপর দখলদারি এবং দখলদারিত্বের জোরে সহজাত নির্যাতনকে ভারত রাষ্ট্রের কেন্দ্রিয় শাসকগোষ্ঠী তথাকথিত আইনি সিল-মোহর দেয় ১৯৫৮ সালে ১১ সেপ্টেম্বর। দেশটির সরকারি

---

১৩. E. G. Verghese, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬-৭.

১৪. Subir Bhaumik, *Insurgent Crossfire: North-East India*, London: Lancer Publishers, 1996, p. 77-86.

www.pathagar.com

বাহিনীগুলোকে এ অঞ্চলে হত্যা-ধর্ষণ-নির্যাতনসহ সব ধরনের নিপীড়নের অপরাধ থেকে আগাম দায়মুক্তির ব্যবস্থা রেখে প্রণীত আইনটি ভারতের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এদিনটিতেই জারি করেন। ১১ সেপ্টেম্বর জারি করা হলেও পেছনের সময়ে করা রাষ্ট্রীয়-সন্ত্রাসী-অপরাধ থেকে সরকারি পেটুয়া বাহিনীকে আইনগত সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ওই বছরের ২২ মে থেকেই আইনটি কার্যকর বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। প্রথমে মাত্র দুইটি রাজ্যকে আইনের আওতাভুক্ত করা হলেও পরে নানা সময় ও সুযোগে অন্যান্য রাজ্য এবং এর বাইরেও দখলকৃত কাশ্মিরেও এ নিবর্তনমূলক আইন জারি করা হয়। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের (!) দাবিদার দেশটিতে এখনও এই আইন জারি আছে–শুধু জারিই নয়, ৫২ বছর ধরে কার্যকরও রয়েছে। এত দীর্ঘ বছর একটানা এহেন অগণতান্ত্রিক আইনের আওতায় শাসিত একটি কালা-কানুনের দেশকে গণতান্ত্রিক বলাটাও হাস্যকর এবং বিরাট প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়। সাত-বোন রাজ্যগুলো এবং কাশ্মিরের স্বাধীনতাকামী জনতাসহ দেশ ও বিদেশের মুক্তিকামী-গণতান্ত্রিক মানুষ সঙ্গত কারণেই এহেন নিবর্তনমূলক, কালা-আইনের বিলোপ কামনা করেন। যদিও গণতান্ত্রিক ভারত' (!) যথারীতি এই আইনটি চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই আইনের বলেই মানুষের স্বাধীনতাকে প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত করছে।

১৯৫৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর ভারতের কেন্দ্রিয় পার্লামেন্ট এই আইনটি, যার অফিসিয়াল নাম 'আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট' বা 'সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন' গ্রহণ করে। মাত্র সাত ঘণ্টায় জন্ম নিয়েছিল এমন একটি ভয়ানক আইন। প্রস্তাবিত আইন সম্পর্কে ভারতীয় পার্লামেন্টের নিম্নসভা বা লোকসভা-য় আলোচনা হয়েছিল মাত্র তিন ঘণ্টা আর উচ্চসভা বা রাজ্যসভা-য় চার ঘণ্টা। আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিলে তেমন কোনও আলোচনাই হয় নি আইনটি নিয়ে। হাতেগোনা কয়েকজনের বিরোধিতা চাপা দিয়ে এক তরফাভাবে এহেন নির্মম আইন গ্রহণ করে ভারতের কেন্দ্রিয় সরকার। পার্লামেন্ট বা সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর অতি দ্রুত রাষ্ট্রপতি ১১ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষর দিয়ে এটির পূর্ণাঙ্গতা সম্পন্ন করেন। কিন্তু আগের রাষ্ট্রীয়-সন্ত্রাস ও নির্যাতনকে বৈধতা দেওয়ার প্রয়োজনে ১১ সেপ্টেম্বরে জারিকৃত বা জন্ম নেওয়া আইনটিকে জন্মের অনেক আগে থেকেই, ওই বছরের ২ মে থেকে কার্যকর বলে গণ্য করা হয়। ফলে সেই পঞ্চাশের দশক থেকে–যখন উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন-সম্পদ-জনপদের ওপর দখলদারিত্ব শুরু করেছিল ভারত–সেই তখন থেকেই সব সামরিক অভিযান, হামলা, হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন, অপহরণ, গ্রেফতারসহ সব ধরনের নির্যাতনকে 'আইনি বৈধতা' দেয় ভারতের কেন্দ্রিয় সরকার। অর্থাৎ, উত্তর-পূর্ব ভারতের সাত রাজ্যে এবং পরবর্তীকে কাশ্মির ও পাঞ্জাবে সরকারি বাহিনীগুলো যা করেছে এবং করছে–সবই বৈধ, আইন সঙ্গত, গণতান্ত্রিক কাজ। ভারতীয় রাষ্ট্র কর্তৃক সন্ত্রাস ও আইনি নির্যাতনের, তা-ও গণতন্ত্রের ধ্বজ্বা ধারণ

www.pathagar.com

করে, এমন নিষ্ঠুরতার উদাহরণ আদিম ও মধ্যযুগেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।[১৫]
১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের পার্লামেন্টে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাগা পাহাড়ি এলাকায় ভারত-বিরোধী বিক্ষোভ দমন করার জন্য 'সাময়িক পদক্ষেপ' হিসাবে এ আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু তারপর কেটে গেছে পাঁচ দশকেরও বেশি সময়। সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেও স্থানীয় মানুষ তথাকথিত গণতন্ত্রের দেশে আইনগত ন্যায়বিচার পাচ্ছে না।[১৬] এখনও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিরাট অংশকে এই আইনের আওতায় 'গোলযোগপূর্ণ' এলাকা হিসাবে দেখিয়ে আইনটি কার্যকর করা হচ্ছে, জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ কর্তৃক নিন্দিত হয়।[১৭] সামরিক আইনের চেয়েও কঠোর এহেন নিবর্তনমূলক আইনের ভেতর দিনে নির্যাতিত হয়ে দিন অতিক্রম করছে ওই অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী-স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, আটকাদেশ, নির্বাসন ও জোর করে ঘরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া–এসবের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার আকুতি জাগিয়ে রেখেছে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সাত-রাজ্যের জনতা। প্রয়োগের পর থেকেই আইনটি ক্রমে ক্রমে উগ্র ও রুদ্ররূপ ধারণ করে। ২০০৭ সালের ১২ জানুয়ারি খোদ ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, তারা দুনিয়ায় প্রথম প্রচলিত নিয়মের বাইরের আরেক প্রকার যুদ্ধ চালাচ্ছে সেখানে। তারা এটাকে 'সাব-কনভেনশনাল ওয়ারফেয়ার' বা 'অপ্রচলিত যুদ্ধাবস্থা' বলছে। ওই অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ তাদের ক্ষত-বিক্ষত-রক্তাক্ত জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে

---

১৫. ড. মাহফুজ পারভেজ, "কাশ্মিরের স্বাধীনতার আন্দোলন", সেমিনার পেপার, বিআইসি, ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১১.

১৬. ১৯৮০ সালের ১০ অক্টোবর ওই অঞ্চলের একটি মানবাধিকার সংগঠন ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে এই আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থে একটি মামলা দায়ের করে। কিন্তু দীর্ঘ সতের বছর ধরে সর্বোচ্চ আদালত বিষয়টি নিয়ে নীরব থাকে। জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ ১৯৯৭ সালে ভারতের মানবাধিকার পরিস্থিতির কঠোর সমালোচনা করলে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট ১৯৮০ সালের মামলাটির একটি দায়সারা গোছের রায় দেয়। রায়ে আদালত কিছু অধিকারের বর্ণনা করে, আদালতের মতে যা নাগরিকদের থাকা 'উচিত'। কিন্তু কোনও অধিকার বলবৎ করার জন্য কোনও ব্যবস্থা সুপারিশ করে নাই আদালত। ভারতের কেন্দ্রিয় সরকার ও শাসকগোষ্ঠী এতেও খুশি হয় নাই। ২০০১ সালের আগস্টে কেন্দ্রিয় সরকার তার দমন অভিযান অব্যাহত রাখতে সুপ্রিম কোর্ট থেকে নিজের পক্ষে আরও একটি রায় নিয়ে নেয়। যেই রায়ে আদালত সশস্ত্র বাহিনীকে বিশেষ অনুমতি দেয় যে তারা সন্দেহভাজন যে কাউকে আটক ও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। বিস্তারিত, দেখুন, Human Rights Watch Report, 2010.

১৭. জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ ভারত বিষয়ক প্রতিবেদনে উক্ত আইনের পর্যালোচনা করে জানায় যে, সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইনের মাধ্যমে মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে ভারত। মানুষের জীবন-ধারণের অধিকার, নির্যাতন থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার, নিবর্তনমূলক আটকাদেশের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের অধিকার এবং সুষ্ঠু বিচারের অধিকারের মতো প্রত্যাখানের অযোগ্য সব মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। বিস্তারিত, দেখুন, Human Rights Watch Report, 2010.

www.pathagar.com

জানে যে, তথাকথিত অপ্রচলিত যুদ্ধাবস্থা মানে হল, তাদের বিরুদ্ধে পুরো রাষ্ট্রশক্তি নিয়ে যুদ্ধে নেমেছে একটি শক্তিশালী ও সুসজ্জিত বিপুলায়তনের সেনাবাহিনী–অথচ সেই যুদ্ধকে সারা দুনিয়ায় 'যুদ্ধ' হিসাবে জানতে দেওয়া হচ্ছে না![১৮] বর্তমানে এ সকল অঞ্চলে 'অপারেশন অল-ক্লিয়ার' বা 'প্রতিপক্ষ সাফাই অভিযান', 'ড্রাগনেট অভিযান' বা 'টর্নেডো অভিযান' পরিচালনার নামে ভারতীয় সামরিক বাহিনী চরম অমানবিক আক্রমন করছে সাধারণ মানুষজনকে। ভারত নামক রাষ্ট্রের এহেন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হচ্ছে উত্তর-পূর্বে সাত-রাজ্য আর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কাশ্মির। এসব অঞ্চলে মাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে । কারণ, সরকারি সশস্ত্র বাহিনী কোনরূপ গণতান্ত্রিক বা সভ্য আইনের তোয়াক্কা না করেই কথিত এই আইনের জোরে জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। 'সন্ত্রাসী' বা 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' খোঁজার নাম করে ঘরে ঘরে জোরপূর্বক প্রবেশ, তল্লাশী, গুম, খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, লুটতরাজ করছে অবলীলায়। প্রসঙ্গত, কাশ্মিরে ভারতীয় সরকারি বাহিনীর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে ২০ হাজার মানুষ, ধর্ষিতা হয়েছে ১৫ হাজার নারী, গৃহহীন হয়ে দেশান্তরিত হয়েছে ৫ লাখ অধিবাসী।[১৯] উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রেক্ষাপটে সেই তালিকা আরও ভয়াবহ। পার্বত্য-অরণ্যের গভীরে ভারতীয় রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরনের সরকারি পেটুয়া বাহিনীর পাশবিক, অমানবিক ও জঘন্য নির্যাতনের সকল চিত্র গণমাধ্যম পর্যন্ত এসে পৌছায় না।

৫.

আমাদের দক্ষিণ এশিয় আঞ্চলিক মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, সুবিশাল হিমালয় পর্বতমালা এশিয়া মহাদেশের দুই অঞ্চল–মধ্য এশিয়া আর দক্ষিণ এশিয়াকে–আলাদা করে এগিয়ে গেছে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। পূর্বে যেতে যেতে গঙ্গা/পদ্মা নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চল বা বাংলাদেশ পার হয়ে বক্ষ্মপুত্র নদের ওপাশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ দিকে–হিমালয় এখানে অনেক নিচু নিচু পর্বতমালা আর পাহাড়ের আকারে বিস্তৃত হয়েছে গারো-মেঘালয়-মিজো-নাগা-অরুণাচল প্রভৃতি পাহাড়ের স্থানীয় নামে। পর্বতমালা আর পাহাড়রাজি এখানে আলাদা হয়ে আছে নানা উপত্যকায়। আর উপত্যকাগুলো ছুঁয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা অসংখ্য নদী। যে নদীগুলো বাংলাদেশের ওপর দিয়ে গিয়ে মিশেছে দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরে। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এ অঞ্চলে থিতু হয়েছে মানুষের নানা গোষ্ঠী। নানা অঞ্চল থেকে আসা নানা রকমের মানুষ। নতুনেরা আর পুরাতনেরা মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। নানা মানব-গোষ্ঠীর জীবনাচার-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য লেনদেনের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে বৈচিত্র্যময় মানব সমাজ। নৃতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক আর সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিচিত্রতায়

---

১৮. আতাউর রহমান রাইহান, "দক্ষিণ এশিয়ায় দখলকৃত 'সাতবোন' অঞ্চল: আইনি নির্যাতনের বায়ান্ন বছর", *চিন্তা*, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১০.

১৯. Human Rights Watch Report, 2010.

www.pathagar.com

অনন্য-অপরূপ উত্তর-পূর্ব ভারতের 'সাতবোন রাজ্য'-অনাদী কালের ভৌগোলিক ইতিহাসে বাংলাদেশের নিকট-প্রতিবেশী তারা।[২০] কিন্তু আজকের ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্রে এ অঞ্চলের একটি বিশাল অংশ ভারত প্রজাতন্ত্রের সাতটা রাজ্যে বিভক্ত হয়ে 'পার্বত্য সাতবোন' নামে ভারত রাষ্ট্র ও রাজনীতির দখলে। অথচ ইতিহাসের সবসময়ই এ অঞ্চলের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে আর্য আগ্রাসনকারীরা দখল নিলেও তারা ব্রহ্মপুত্র পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত উত্তর-পূর্ব ভারতে পৌছাতে পারে নি। সবশেষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আগ্রাসনকারীরা এই বাধা পেরিয়ে অঞ্চলটি দখল করে এবং ইংরেজদের হাত ধরে তাদের (ব্রিটিশদের) ত্যাজ্য অঞ্চল হিসাবে আর্য উত্তরাধিকারী বর্তমান ভারতের কেন্দ্রিয় রাজনৈতিক শক্তি হাজার হাজার বছরের ব্যর্থতার অবসান ঘটিয়ে এখানে দখলদারিত্ব কায়েম করে।

সাম্প্রতিক ইতিহাসের পাঠে দেখা যায়, উনিশ শতকের শুরুর দিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মনিপুর ও আসাম অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করে বার্মার শাসকরা। এই ঘটনা ভারতের তৎকালীন দখলদার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের জন্য একই সঙ্গে উদ্বেগ ও সুযোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মনিপুরের দুর্বল রাজা গম্ভীর সিংহের সাথে সখ্যতা গড়ে ইংরেজরা এ অঞ্চলে পা রাখার জায়গা পায়। ইংরেজরা মনিপুরীদের নিয়ে যুদ্ধ করে বার্মিজ সৈন্যদের হটিয়ে দেয় এবং ১৮২৮ সালের ইয়ান্দাবুর চুক্তির মাধ্যমে আসামকে ব্রিটিশ-ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এরপর আসামকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের বাদ-বাকি জায়গা কব্জা করার ঔপনিবেশিক-রাজনৈতিক-সামরিক তৎপরতা চালায় নতুন দখলদার ইংরেজরা। যে মনিপুরীগণ ইংরেজকে এ অঞ্চলে আসার পথ করে দিয়েছিল, তারাই প্রথম গর্জে ওঠে ইংরেজদের বিরুদ্ধে, যখন দেখতে পায় যে, ইংরেজরা বন্ধুবেশে আসলে দখলদার-আগ্রাসী শক্তি। ১৮৯১ সালের যুদ্ধে আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীকে রুখে দিতে পারে নাই স্বাধীনতাপ্রিয় মনিপুরীরা। তবে ইংরেজদেরকে সরাসরি শাসনের সুযেগ দেয় নাই মনিপুরীরা। স্বাধীনতাকামী মানুষ ইংরেজ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করলে ইংরেজরা রাজাকে সুকৌশলে হাত করে নেয় এবং বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে। ফলে মনিপুরী রাজারাই ইংরেজ শাসনের অনুগত থেকে এ অঞ্চল শাসন করতে থাকেন। একমাত্র আসাম ছাড়া বাদ-বাকি অঞ্চলের রাজারা মৈত্রী চুক্তির মাধ্যমে ইংরেজের আনুগত্য মেনে নিয়ে স্বশাসিত দেশীয় রাজ্য হিসাবে নিজেদের স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রাখেন।[২১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন-ইংরেজবিরোধী জোটের পক্ষে জাপানি বাহিনী পূর্ব

---

২০. Schendel, Willem van (2007): The Bengal Border: Beyond State and Nation in South Asia (London: Anthem Press).

২১. www. history.com

www.pathagar.com

এশিয়া থেকে ভারতের ইংরেজ শক্তিকে আক্রমনের উদ্দেশ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য-অরণ্য পথে অগ্রসর হয়। জাপানিরা ভারতের উত্তর-পূর্ব দোরগোড়ায় অবস্থিত কোহিমা পর্বতমালা ও মনিপুরের ইম্ফল পর্যন্ত এসে পৌঁছে যায়। পরে মার্কিনীরা হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আনবিক বোমা হামলা চালালে অগ্রসরমান জাপানিরা ভারতে প্রবেশ না করেই সেখান থেকে পিছু হটে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে উক্ত পরিস্থিতিতে সাতবোন অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশলগত গুরুত্ব সারা দুনিয়ার কাছে পরিস্কার হয়ে যায়। (পরবর্তীতে পরিস্কার হয়, এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক, খনিজ ও নৈসর্গিক গুরুত্ব।) ফলে ইংরেজ-ভারতে তৎপর কেন্দ্রিয় ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের লোভাতুর চোখ এ অঞ্চলের কৌশলগত-সামরিক ও অন্যবিধ গুরুত্বকে তখন থেকেই গোপনে নজর রাখতে থাকে। যুদ্ধের পর দিল্লি আর পিণ্ডির কাছে ক্ষমতা দিয়ে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তি নিরাপদে সরে যাওয়ার মতলবে উপমহাদেশের বহু অঞ্চলের মতো কাশ্মির আর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকেও নস্যাৎ করে কিংবা সঙ্কটে ফেলে রেখে দিয়ে যায়। ভারত অসংখ্য দেশীয় রাজ্য দখলের ধারায় মনিপুর, ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বের সকল রাজ্যকে গ্রাস করে নিজের অধীনে নিয়ে আসে। কিন্তু ভারতের দখলদারিত্বের পর দিন থেকেই সেসব রাজ্যে প্রতিবাদ এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম সূচিত হয়। যে কারণে ভারত সেখানে আইন করে সামরিক শক্তির ব্যবহারের ব্যবস্থা রেখেছে। সারা ভারত এক ধরনের আইনে চললেও সাতবোন রাজ্য চলছে সামরিক অস্ত্রের দ্বারা।

৬.

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে সম্প্রদায়গুলো এবং কাশ্মিরিরা যে আজ অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, তার জন্য প্রথমত ও প্রধানত কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের গভীর অবহেলা, নির্যাতন ও বিচ্ছিন্নতা কাজ করছে–যা দেশটির রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও শাসনের একচোখা নীতি-পদ্ধতির কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণেই এক অহমীয়া লেখকের লেখনীতে নয়াদিল্লী আবির্ভূত হয় 'সৎমা হিসেবে'[২২]। ফলে সশস্ত্র সংগ্রামের আশ্রয় নেওয়াটা সম্প্রদায়গুলোর কাছে সম্পূর্ণ বৈধতাই শুধু দেয় না, বরং একে তারা প্রয়োজনীয় কর্মপন্থারূপে মনে করে। প্রসঙ্গত, ভারতের সবচেয়ে বেশি এইডস রোগির বাস নাগাল্যান্ডে–সবচেয়ে বেশি মদ্যশালা, নাইটক্লাব ও দেহ ব্যবসার ব্যবস্থাও রয়েছে সেখানে। বিদেশী পর্যটক ও ভারতীয় পর্যটক–যারা জীবন ও যৌবনের রোমাঞ্চ ও উত্তেজনাকে বেশ করে উপভোগ করতে চান, তারা হালে এক দৌড়ে চলে যাচ্ছে নাগাল্যান্ডে। উত্তর-পূর্ব ভারতের আশঙ্কাজনক রাজনৈতিক ও সশস্ত্র পরিস্থিতির সমান্তরালে স্বাস্থ্য ও যৌন বিষয়ক ঝুঁকির প্রসঙ্গটিও তুলে ধরেছেন গবেষক সঞ্জয় হাজারিকা : উত্তর-পূর্ব ভারত বর্তমানে

২২. For details, see, Sanjoy Hazarika, *Strangers of the Mist: Tales of War and Peace from India's Northeast*, London: Penguin Books, 1994.

www.pathagar.com

মায়ানমার/বার্মার মাদক ব্যবসায়ীদের জন্য এক নতুন পথে পরিণত হয়েছে। মনিপুরে মাদকাসক্তদের জন্য একটি কেন্দ্র আছে। নাগাল্যান্ড-মায়ানমার এবং মিজোরাম-মায়ানমার সীমান্ত এলাকায় কমপক্ষে তেরোটি হেরোইন কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ এলাকায় সম্প্রতি এইডসও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর জন্য অবাধ যৌনাচার এবং মাদকাসক্তদের ব্যবহৃত দুষিত সূঁচই দায়ী। এভাবেই নিরীহ জনতা রাষ্ট্রের দ্বারা সৃষ্ট সন্ত্রাসের নানামুখী আক্রমন ও ক্ষতির শিকার হচ্ছে।[২৩]

বিশেষজ্ঞদের মতে: উত্তর-পূর্ব ভারত নিয়ে ভারতীয় বর্ণবাদী রাজনীতিবিদগণ কিরূপ সশস্ত্র খেলা খেলছেন, সে ব্যাপারে জনগণকে শিক্ষিত করে তুলে ও তথ্য প্রচার করে, সুধী ও সচেতন সমাজ আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেন। মানুষের অধিকারের ইস্যুগুলোর ব্যাপরে এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে আরও বেশি তথ্যের আদান-প্রদান এবং প্রচার হওয়া জরুরি। ইলেকট্রনিক মিডিয়া এ প্রেক্ষাপটে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। ভারতের এ আন্দোলনগুলোর সাথে পার্শ্ববর্তী চীন ও মায়ানমারের যোগাযোগ রয়েছে। আন্দোলনকারীরা এ রাষ্ট্রগুলোর এলাকা ব্যবহার করছে এবং রাষ্ট্রের তরফ থেকে সরাসরি সামরিক সাহায্যও পেয়েছে। ভারতের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা উপরাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদকে মোকাবেলা করার জন্য যে কোনও উপআঞ্চলিক সমঝোতা প্রক্রিয়ায় তাই এ রাষ্ট্রগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। সামরিক পর্যায়ে এ অঞ্চলের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর মধ্যে অধিক সহযোগিতার এবং অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট সীমান্ত ব্যবস্থাপনা নীতিমালার প্রস্তাবও এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক নয়। যদিও ভারতের সামনে কোনও সাধু প্রস্তাবই উপস্থাপন করা দুরূহ। [২৪]

তবে, সমাধানটিকে অবশ্যই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পর্যায়ে শুরু করতে হবে। এ ধরনের একটি প্রচেষ্টায় অবশ্যই এলাকার/অঞ্চলের জনগণ ও অভিবক্তাদের (protagonist) দর কষাকষির জন্য এক টেবিলে বসানোর প্রচেষ্টা থাকতে হবে। অন্য কথায়, যে কোনও সমঝোতাই হতে হবে সংশ্লিষ্ট জনগণের ঐকমত্যের ওপর ভিত্তি করে, রাজনৈতিক এলিটদের ঐকমত্যের ওপর ভিত্তি করে নয়। 'সমঝোতা' কিছুতেই একটি আরোপিত বা প্রদত্ত ক্যাটাগরি হতে পারে না। সর্বোপরি, এ সত্যের উপলব্ধি এবং স্বীকৃতি থাকতে হবে যে, উপরাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদী মানে সন্ত্রাসবাদী নয়।

---

২৩. সঞ্জয় হাজারিকা, *Strangers of the Mist: Tales of War and Peace from India's Northeast* (Penguin Books,)

২৪. For details of a military view, see, Colonel D. R. Mendiratta, "Insurgent Assam", *Indian Defense Review*, Vol. 10(3), New Delhi: Lancer Publication & Distributor, July-Sept., 1995; Lt. Colonel AKM Rafiqul Islam, "Sub-National Conflicts: The Principal Threat to the Security of South Asian States", *Military Papers*, Issue 9, Dhaka, AHQMT DTE, Sept., 1996.

www.pathagar.com

এ প্রেক্ষাপটে বলা চলে, এ ইস্যুটিকে সমাধানের জন্য যেকোনও 'কনভেনশন' স্বাক্ষর করা হলে সেটি কিছুতেই সন্ত্রাসবাদ দমনের একটি কনভেনশন হতে পারে না, যেমনটি হয়েছে সার্ক কনভেনশনের ক্ষেত্রে। তাই লক্ষ্য থাকতে হবে:

১. উত্তর-পূর্ব ভারতের (এবং অবশ্যই কাশ্মিরসহ ভারতের সকল উপজাতীয়তাবাদী-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক) বিদ্যমান সকল আন্দোলনের দাবি-দাওয়া-ইস্যুসমূহের বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে যৌক্তিকতা নিরূপণ করা;

২. উপরাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন না-করে এসব আন্দোলনকে 'সন্ত্রাসবাদের লেভেল' দেওয়ার হিংসাত্মক-রাষ্ট্রীয় দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করা;

৩. সামরিক হস্তক্ষেপের নামে জনগণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়-সন্ত্রাসের ঐতিহাসিক রক্তপাত ও দমন নীতি পরিহার করা; এবং

৪. স্থায়ী ও চূড়ান্ত সমাধানের লক্ষ্যে ভারতের সংগ্রামরত উপরাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের অন্তরাল থেকে ঘনীভূত-স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ ও অবয়বটিকে উন্মোচিত করা।

লেখক-পরিচিতি : ড. মাহফুজ পারভেজ- কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক এবং অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম।

লেখা পরিচিতি : প্রবন্ধটি ১৬ এপ্রিল, ২০১১ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক গণবিস্ফোরণ : গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ

আজিজুল হক বান্না

ভূমিকা-প্রাসঙ্গিকতা

মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে সাম্প্রতিক গণবিস্ফোরণ এবং তার গতি-প্রকৃতি নিয়ে বিশ্লেষণ সময়ের দাবী। এসব দেশের জনগণ ধর্মীয় বিচারে মুসলমান এবং জাতিগত নৃ-তাত্ত্বিক বিবেচনায় আরব ও আফ্রিকী। উপরন্তু বৈশ্বিক অর্থনৈতিক, সামরিক ও স্ট্র্যাটেজিক দিক দিয়ে গণবিস্ফোরণ-তাড়িত এসব আরব-আফ্রিকী দেশ সমূহের অফুরন্ত তেল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ আধিপত্যবাদী বিশ্ব শক্তিগুলোর লোভ ও লুণ্ঠনের প্রবৃত্তিকে অদম্য করে তুলেছে। তেল হচ্ছে শিল্প বিপ্লবের চালিকা শক্তি। পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশের কাছে তাই তেলের দখল নেবার উদগ্র লালসাকে কেন্দ্র করে তারা সংঘাত ও দখলদারিত্বের মধ্যযুগীয় রক্তপাতের উদ্ধত অন্তহীন দৃশ্যপট তৈরী করে রেখেছে।

কিউবার বিপ্লবের নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো তাঁর সাম্প্রতিক এক রাজনৈতিক নিবন্ধে লিখেছেন : "তেল বৃহৎ ইয়াঙ্কি বহুজাতিক সংস্থার প্রধান সম্পদে পরিণত হয়েছে। এই শক্তি-সম্পদ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে ওরা নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করেছে। একই অস্ত্র ব্যবহার করে তারা কিউবা বিপ্লবকেও খতম করতে চেয়েছিলো। তাই প্রথমবার দেশে সার্বভৌম আইন রূপায়িত হওয়ার সময় কিউবায় তেলের জোগান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো।"

www.pathagar.com

[ন্যাটোর ধান্ধা : ফিদেল ক্যাস্ত্রো, অনুদিত-পুনর্মুদ্রিত, দৈনিক গণশক্তি, কলকাতা, ৫ মার্চ, ২০১১]

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি এবং এ অঞ্চলের ওপর ইঙ্গ-মার্কিন ইউরোপীয় শক্তিজোটের প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্য-প্রকৃতি ও কৌশল এবং তা বাস্তবায়নের গতিধারা অনুধাবন না করলে মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক গণবিস্ফোরণের মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয়তঃ মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার এ দেশগুলো দীর্ঘকাল ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা রাজনৈতিকভাবে অধিকৃত হয়েছে, সামরিকভাবে নিপীড়িত হয়েছে এবং অর্থনৈতিকভাবে হয়েছে লুণ্ঠিত এবং সাংস্কৃতিকভাবে হয়েছে বিপন্ন। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির অর্থনৈতিক ক্ষয়িষ্ণুতা এবং রাজনৈতিক দুর্বলতার দৃশ্যমান উপসর্গের সাথে উপনিবেশ-শাসিত দেশগুলোর জনগণের স্ব-শাসিত হবার তীব্র আকাংখা থেকে গড়ে ওঠা মুক্তি-চেতনা, জাতিগত মর্যাদা, রাষ্ট্রিক সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে পর্যায়ক্রমিক সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের মুখে এক সময় ইউরোপীয় লুণ্ঠনপ্রিয় দুর্বত্ত শক্তি হাত গুটিয়ে নেয়। তবে সেটাও ছিল তাদের কৌশলগত পশ্চাদপসারণ । ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থে মধ্যপ্রাচ্য সহ আফ্রিকার দেশগুলোর মানচিত্রকেও পুনর্বিন্যাস করে অখন্ডত্বকে খন্ডিত করে সংঘাত-সন্দেহের বীজ দীর্ঘস্থায়ীভাবে জিইয়ে রাখে। আরব-উত্তর আফ্রিকীয় গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্য-সংঘাতকে লালন ও অবলম্বন করে তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সত্তায় অনেকগুলো নয়া রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। বলা যায়, ইঙ্গ-মার্কিন ইউরোপীয় শক্তি বলয়ের ঔরসেই অনেক ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ও শাসক পরিবারের উদ্ভব ঘটে। যা ইসলামের বৃহত্তর উম্মাহ কনসেপশন কিংবা বৃহত্তর ইসলামী মুসলিম আইডেন্টির অবিভাজ্য ঐক্য-চেতনার মূলে কুঠারাঘাত হেনেছে। স্থানীয় নৃ-তাত্ত্বিক-গোত্রীয় ও ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদকে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সুদূরপ্রসারী স্বার্থেই ব্যবহার করে এসেছে। ইউরোপীয় শক্তির সহায়তায় তুর্কী খেলাফত বিকল ও বিপর্যস্ত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৌগোলিক অবয়বে জন্ম নেয়া নয়া রাষ্ট্রগুলোর শাসকরা তাদের শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে প্রধানত দুটো পন্থা অনুসরণ করেন। এক. তারা রাজতান্ত্রিক- স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ধারা অনুসরণ করে শাসনশক্তি অব্যাহত রাখার কৌশল গ্রহণ করেন। দুই. এসব গণবিরোধী, বিলাসপ্রিয় স্বৈরশাসকরা পুরনো ঔপনিবেশিক শক্তির প্রশ্রয় ও মদদ নিয়ে তাদের লাঠিয়াল বরকন্দাজের ভূমিকা পালন করে আসছেন। এসব শাসকদের অনেকেই পারিবারিক উত্তরাধিকারকে শাসন কতৃত্বে কায়েম মোকাম করে রাখার ব্যবস্থাও পাকাপাকি করেছেন।

কয়েকদশক আগে মধ্যপ্রাচ্য, উপ-সাগরীয় ও উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহে তেল-গ্যাসের অফুরন্ত মজুদ আবিস্কৃত হওয়ায় এসব দেশের শাসকরা ক্ষমতাকে চিরস্থায়ীভাবে কুক্ষিগত করে রাখার অবলম্বন ও লালসার ভিত্তি খুঁজে পায়। এই সুবাদে পাশ্চাত্যের লুণ্ঠনপ্রিয় পুরনো দুর্বৃত্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথেও তাদের নিবিড় অর্থনৈতিক ও

www.pathagar.com

সামরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এতে জনগণের মুক্তির প্রত্যাশা ও স্বাধীনতার আকাংখাকে অবদমিত করে রাখার কার্যকর ও অপ্রতিরোধ্য সুযোগ হস্তগত করে নেয় এসব মুসলিম দেশের শাসকরা। ফলে দেশীয় শাসকদের স্বৈর শাসনের উৎপীড়ন- নিগ্রহ ও স্বৈরতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি সমূহের অভিভাবকত্বে জনগণের জন্য বেপরোয়া-অপ্রতিরোধ্য এবং প্রতিকারহীন যন্ত্রণায় পরিণত হয়েছে।

এদিকে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর একক বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যমনি হিসেবে আমেরিকার দানবীয় কূটিল আবির্ভাব এবং তার সাথে ইউরোপীয় সমরশক্তির সখ্যতা বিশ্বে যে ভারসাম্যহীন অবস্থা তৈরী করেছে, তার কুফল প্রধানতঃ বইতে হচ্ছে মুসলিম প্রধান দেশসমূহকে। তবে এই সাথে খৃষ্টীয় পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধী ক্রুসেডীয় প্রতিহিংসার জ্বালাও তারা অঘোষিতভাবে বাস্তবায়ন করতে শুরু করেছে।

স্নায়ুযুদ্ধকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কোন সুযোগ নিয়ে মুসলিম দেশগুলো সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারেনি। অথচ এ সময়টিই ছিল মুসলিম বিশ্বের আত্মনির্ভরতা অর্জন করে বৈশ্বিক পর্যায়ে ভূমিকা রাখার মাহেন্দ্রক্ষণ। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বলয়ের পতনে মুসলমানদের আদর্শিক, রাজনৈতিক ও সমরনৈতিক ভূমিকা বিশেষ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। ইতিবাচক পরিকল্পনার বদলে এটা ছিল তাদের নেতিবাচক অনিবার্যতার দায়। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলোপের সুফল তো মুসলমানরা পায়ইনি। বরং একক বিশ্বব্যবস্থায় তারাই ভিকটিম হয়েছে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন ও দখলদারিত্ব উৎখাতে আফগান ও ভূ-মন্ডলীয় ইসলামি সমরশক্তির যুথবদ্ধ প্রতিরোধ যুদ্ধ সোভিয়েত রাশিয়ার মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়। কিন্তু এর সুফল বা কৃতিত্ব আফগান জনগণ বা মুসলিম বিশ্ব নিতে পারেনি। বরং আফগান মোজাহিদদের সশস্ত্র প্রতিরোধের সুফল এককভাবে আত্মসাত করেই ইউরো-মার্কিন শক্তি একক বিশ্ব ব্যবস্থার মহাঅধিপতি হয়ে বসেছে। কার্যতঃ স্নায়ুযুদ্ধে বিভক্ত বিশ্বের একটি পক্ষের অঘোষিত মার্সিনারী হিসেবে অপরিকল্পিত ভাবাবেগে মুসলিম বিশ্বের জনগণের আদর্শিক সমরশক্তি ব্যয়িত হয়েছে বলে মনে করা যায়। এর পরবর্তী অধ্যায়ে একক বিশ্ব ব্যবস্থার ঘনীভূত সমীকরণ করপোরেট পুঁজির নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণাবাদী রাজনীতির গিনিপিগ হতে হয়েছে মুসলমানদেরই। কার্যতঃ মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ও অমিত অর্থনৈতিক শক্তি বৈরী শক্তির কাছেই জিম্মি হয়েছে। কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার বদলে পশ্চিমা পূঁজিবাদী সমরনৈতিক দানবীয় শক্তি মুসলমানদেরকেই চানমারীর লক্ষ্যবস্তু বানায়। এর সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক-সমরনৈতিক ভিত্তি দান করে হান্টিংটনের বিতর্কিত 'সভ্যতার সংঘাত' বা ক্লাশ অব সিভিলাইজেশন তত্ত্বের ধান্দা। এরই ধারাবাহিকতায় মার্কিন বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র টুইন টাওয়ার্সে তথাকথিত বিমান হামলার নাটকীয় ঘটনার দায়ে ইসলামী বিশ্বকে সরাসরি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। প্রেসিডেন্ট বুশ এর নাম দিলেন 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অন্তহীন যুদ্ধ'। সন্ত্রাসের সংজ্ঞা কী, সন্ত্রাসী কারা,

www.pathagar.com

কিভাবে তাদের উদ্ভব, তা জানার কোন সুযোগও রইলো না। একদশক ধরে চলমান সন্ত্রাসের নির্ঘণ্টের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে যখন ইরাকে ১০ লাখ এবং আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইয়েমেন, সুদান, সোমালিয়া সহ মুসলিম বিশ্বে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে এবং এসব দেশে যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভিন্ন কৌশলে আধিপত্য বিস্তারের বাহানায় যুদ্ধ-সংঘাতের ঘূর্ণাবর্ত তৈরী করেও তেমন কোন সাফল্য পাচ্ছে না, তখন তারা বিধ্বস্থ ইমেজ পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বাকী বিশ্বে প্রভাববলয় তৈরীর অজুহাতে গণজাগরণের গণতান্ত্রিক আকাংখাকে পুঁজি করে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তিউনিসিয়া, মিশর, লিবিয়া, ইয়েমেন, বাহরাইন, সিরিয়াসহ আরব উপ-সাগরীয় অঞ্চল থেকে শুরু করে উত্তর আফ্রিকার দেশে দেশে গণ অভ্যুত্থানের সুযোগে মিত্রশক্তির অভিনয়ে সাম্রাজ্যবাদ আর এক নয়া ফ্রন্ট খুলেছে। জনগণের মুক্তি, স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক আকাংখার জাগরণে স্বৈর শাসকদের পতন ঘটলেও বৈশ্বিক স্থিতাবস্থায় কোন পরিবর্তননের ধারা সূচিত হচ্ছে না। পুরনো স্বৈর শাসকদের ঘটা করে বিদায় জানিয়ে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের নয়া মুখোশ পরা শাসকদের কাছেই মধ্যপ্রাচ্যের যুব-জনতার ভাগ্যকে জিম্মি রাখার টোপ ফেলা হচ্ছে। তিউনিসিয়া ও মিসরের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, যা কিনা দৃশ্যতঃ গণ-বিস্ফোরণের ফল বলে মনে করা হচ্ছে, তার ফসল এবং পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রণ নবীন গণতন্ত্রী শক্তির হাতে থাকছে কিনা, সে প্রশ্নের মীমাংসায় অস্পষ্টতা রয়েছে। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে ভবিষ্যৎপিয়াসী তরুন যুব-জনতার দৃশ্যমান দুর্বার গণতান্ত্রিক উদ্দীপনের গতি-প্রকৃতি আশাবাদের মধ্যস্তা করলেও তার গন্তব্য নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধউত্তর কালে মধ্যপ্রাচ্য ও আরব বিশ্ব জুড়ে জাতীয়তাবাদী স্বকীয়তা ও তথাকথিত স্বাধীনতার যে আঞ্চলিক দোলাচল তৈরী হয়েছিল, তাকে পশ্চিমাশক্তিগুলো শুধু কার্যকরভাবে আত্মসাতই করেনি। তারা এর সার্বিক সুফল আত্মসাতের মধ্য দিয়ে তাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য আধিপত্য বহাল রাখার নয়া নিশ্চয়তা নিয়েছে। একবার পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা আরব-অনারব মুসলমানদের জাতীয়তাবাদের মোহে অন্ধ করে এক্সপ্লয়েট করেছিল। এবারে তারা গণতন্ত্র ও মুক্তি এবং মানবাধিকারের ললিপপ ধরিয়ে দিয়ে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে কার্যকর ,শিক্ষিত, সৃজনশীল জনশক্তিকে এক্সপ্লয়েট করার কুশলী খেলায় অনেকটা সফল। আশার কথা, পশ্চিমাদের মদদ ও প্রশ্রয়ে যে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা আসবেনা, সেই সত্যাটি উপলব্ধির ধারা ও সূচিত হয়েছে। এখানেই আশাবাদের ভিত্তি রয়েছে। ইরাকেও তারা একনায়ক সাদ্দাম হোসেনের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র, মুক্তি ও স্বাধীনতার নামে পুরোদস্তুর যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। জনগণের 'অধিকার হরন' এবং বিশ্ব শান্তি 'বিপন্ন' করার অপরাধে সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে সাম্রাজ্যবাদের অবাধ্য শাসকদের শিক্ষা দানের কৌশলেও তেমন উদ্দেশ্য সিদ্দী হয়নি। লিবিয়ার গাদ্দাফী কিংবা সুদানের বশিরও এ থেকে শিক্ষা নিয়ে সোজা পথে আসেননি। তাই তাঁদের ওপর সাম্রাজ্যবাদ

www.pathagar.com

চড়াও হয়েছে। এখন তাঁদের পালা চলছে। তিন দশকে মিসরের স্বৈরশাসক হোসনি মোবারকের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় যুব-জনতার গণতান্ত্রিক বিস্ফোরণের বাতাবরণে তাঁকে ক্ষমতার দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পতনের পর হোসনি মোবারকের মুখে তালা দিয়ে দেওয়া হয়। হৃদরোগে আক্রান্ত মোবারকের বিচারের আয়োজনও চলছে। অথচ মোবারক ফিলিস্তিনী-আরবদের ভাগ্যের বিনিময়ে তাঁর ক্ষমতার যৌবনের পুরো সময় ও সুযোগটাই ব্যয় করেছেন মার্কিন অভিভাবক ও তার দোসর যুদ্ধবাজ-বর্ণবাদী ইসরাইলের জন্য। তিনি ইসরাইলের স্বীকৃতির নামে আরব ও মুসলিম বিশ্বে নিষিদ্ধ দেশটির সাথে ক্যাম্পডেভিড শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছেন। চুক্তি সম্পাদন করার সময় থেকে মোবারকের বিদায়ের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন ওই অঞ্চলে ইসরাইল-যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশম্যান। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে আমেরিকা ও তার ইউরোপীয় মিত্রদের নয়া আধিপত্যবাদী রণনীতি বাস্তবায়নের অভিঘাত শুরু হয়েছে। এই অভিঘাতের মুখে নব জাগ্রত আরব আফ্রিকী যুব-জনতা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণে কতটা সংগ্রামী ভূমিকা পালন করতে পারবে, তার ওপরই ভবিষ্যৎ ইতিহাস নিরূপিত হবে। তিউনিসিয়ায় থেকে মিসর ও লিবিয়ায় গনজাগরণের কাঁপন দৃশ্যমান। এসব দেশে 'রেজিম চেঞ্জ' বা শাসক পরিবর্তনের দাবীতে সোচ্চার স্থানীয় যুব-জনতার উত্থান একক ও মৌলিক উপাদান নয়। নেপথ্য অনুঘটকদের নীল নকশা বাস্তবায়নের উপাদান বা সহায়ক শক্তি এর পেছনে সক্রিয়। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্য, আরব ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে গণ বিস্ফোরণের দৃশ্যমান রাজনৈতিক নান্দনিকতা গণতান্ত্রিক বিশ্ব, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বকে আবিষ্ট ও উদ্দীপ্ত করেছে, তার গন্তব্য নির্ধারিত ও সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এর ফলাফল নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থাকবেই।

তবে মানব ইতিহাসে যেমন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব কোন স্থবির বিষয় নয়, বরং এটা এক চলমান সংগ্রামের রূপায়ন। সে কারণে গণ বিপ্লব বিপথগামী করার শক্তি যতো অপ্রতিরোধ্য ও ধূরন্দরই হোকনা কেন, ব্যাপক মানুষের মুক্তির অগ্রযাত্রা অবিরাম গতিতে চলতেই থাকবে।

তিউনিসিয়া-মিসরে গণজাগরণ

মিসরের দীর্ঘকালীন স্বৈরশাসক হোসনি মোবারকের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সময়ের যুব-জনতার সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু মার্কিন প্রশাসনের কাছে কাংক্ষিতই ছিল না। এই আন্দোলনকে দৃশ্যমান পর্যায়ে উপনীত করার ক্ষেত্রে মার্কিন সরকারের নেপথ্যচারী ভূমিকাও ছিল।

অনেকেরই মনে থাকার কথা, মিসরে শাসক পরিবর্তনের গন আন্দোলনকে মার্কিন প্রশাসন দ্বিধাহীনভাবে অতি দ্রুত এবং প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়েছে। জনগণের গণতান্ত্রিক অভিপ্রায়ের প্রতি এটাকে মার্কিন সরকারের নৈতিক দায়বদ্ধতা হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিশেষ করে ইরাক, আফজানিস্তান, পাকিস্তান, ফিলিস্তিন সহ মুসলিম বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যবাদী, লুটেরা ও হিংস্র ভূমিকার মাধ্যমে তার যে নেতিবাচক

ইমেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ওবামা প্রশাসন তাকে মুছে দিতে চেয়েছে। যদিও দীর্ঘ তিন দশক ধরে মার্কিন সামরিক, রাজনৈতিক ও ভূ-মন্ডলীয় স্বার্থেই হোসনি মোবারকের মতো একজন গণবিরোধী এক নায়ককে তারা প্রশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়ে রক্ষা করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক সময়কার কৃতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার একদা বলেছিলেন ঃ "যুক্তরাষ্ট্রের কোন বন্ধু নেই; যুক্তরাষ্ট্রের আছে কেবলমাত্র স্বার্থ।"

প্রেসিডেন্ট ওবামা বলেছিলেন ঃ

"Egyptians have inspired us, and they have done so by putting the lie to the idea that justice is best gained by violance .... It was the moral force of non-violence ...... that bent the arc of history toward justice." [Holiday, March 6, 2011]

মিসরের জনগণের অহিংস গণতান্ত্রিক আন্দোলন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করলেও ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, মিন্দানাওসহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ন্যায়সংগত আন্দোলন তাদেরকে কখনও প্রভাবিত করতে পরেনি। মার্কিন জাতীয় স্বার্থ এবং সাম্রাজ্যিক হিসাব নিকাশের বাইরে তারা কখনও এক পাও নড়েনি। হোসনি মোবারকের শাসনকালকে আমেরিকা-ইসরাইলের জন্য 'স্বর্ণযুগ' বললেও কম বলা হবে। মধ্যপাচ্যে হোসনি মোবারক শুধু আমেরিকার বিশেষ মিত্র ও কৌশলগত পার্টনারই ছিলেন না। মিসর হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার পররাষ্ট্র ও সামরিকতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু এবং আরব বিশ্বের সাংস্কৃতিক রাজধানী। আমেরিকার প্রভাব ও মধ্যস্ততায়ই হোসনি মোবারক ইসরাইলের সাথে তার দখলীকৃত ভূমি ফেরৎ পাবার বিনিময়ে ক্যাম্পডেভিড চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। মিসরই একমাত্র আরব দেশ, যে ইসরাইলকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দিয়েছে। এজন্য মিসরকে আরবলীগ থেকেও বহিস্কৃত হতে হয়েছিল। মিসরের স্বীকৃতি, সমর্থন ও বহুমাত্রিক সহযোগিতা ইসরাইলকে শুধু রক্ষাই করেনি। ইসরাইল মিসরের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশীর সমর্থন পাওয়ায় ফিলিস্তিনীদের ভূমি দখল এবং তাদের ওপর অব্যাহত গণহত্যা চালিয়ে আসতে পারছে। ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধে মার্কিন বিশ্বাসঘাতকতায় ইসরাইলের কাছে মিসর সহ আঞ্চলিক আরব রাষ্ট্রগুলোর মার খাবার পর লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফী একবার দুঃখ করে বলেছিলেন, 'মিসর এমন এক দেশ, যার নেতা নেই। আর লিবিয়া এমন একদেশ, প্রকৃত অর্থে যার দেশ নেই।' মিসরের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ লিবিয়ার নেতা গাদ্দাফী বহুবার আরব ঐক্যের প্রেরণায় মিসরের সাথে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এমনকি এই উদ্দেশ্যে মিসর সীমান্তে জনগণের লং মার্চও হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সে পরিকল্পনা ইউটোপিয়ান হিসেবে ব্যর্থ হয়েছে। মিসরের সাথে অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও সামরিকভাবে যৌথ কমান্ড গঠন করে গাদ্দাফী ইসরাইলকে মোকাবিলা করার দুরন্ত স্বপ্নও দেখেছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন স্বার্থের শিখন্ডী ইসরাইলের ঔদ্ধত্য নিয়ন্ত্রণ করে আরব ফিলিস্তিনীদের

www.pathagar.com

সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণে তাকে বাধ্য করানো সম্ভব হলে আরব, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় ইঙ্গ-মার্কিন ইউরোপীয় হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রগুলো অকার্যকর হয়ে যাবে, গাদ্দাফী এটা বুঝতেন। কিন্তু বিভক্ত আরব ঐক্য, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা এবং তেল নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের বাজপাখি কূটনীতির ফলে ইসরাইল মার্কিন এখনও মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রক শক্তি। মার্কিন বামপন্থী সমাজ বিশ্লেষক নওম চমস্কি বলেছেন ঃ "ইসরাইল হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার একটি সামরিক ছাউনী।" সুতরাং আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্য নীতিতে ইসরাইল, তেল স্বার্থ এবং নররূপে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য রক্ষার স্বার্থই প্রাধান্য পেয়ে আসছে।

সাম্প্রতি উইকিলক্ যেসব মার্কিন তথ্য ফাঁস করেছে, তাতে আমেরিকা হোসনি মোবারককে উৎখাতের আন্দোলনে মিসরীয়দের গোপন ইন্ধন দেবার কথা জানা যায়। লন্ডনের 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' এ নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করে। দৃশ্যতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হোসনি মোবারকের সরকারকে প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়ে এসেছে। একইভাবে সৌদী আরবও শেষপর্যন্ত হোসনি মোবারকের প্রতি দৃঢ় সমর্থন দিয়েছে। কিন্তু মিসরের ক্ষমতার রাজনীতিতে যারা পরিবর্তন আনতে চেয়েছে তেমন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সম্ভাব্য শক্তিকে পেছন থেকে সমর্থন ও ইন্ধন দিয়ে মোবারক বিরোধী আন্দোলনে আমেরিকা তাৎপর্যপূর্ণ সমর্থন দিয়েছে। কায়রোতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্গরেট স্কোবি ২০০৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে একটি গোপন বার্তা পাঠান। ওই বার্তায় তিনি জানান, মিসরে সরকার বিরোধীদের একটি অংশ মোবারককে উৎখাতের পরিকল্পনা করছে।

২০১১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে তারা এটি করতে চায়। আর এ পরিকল্পনায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন এক ভিন্ন মতাবলম্বী তরুন নেতা। তার সংগঠনটির নাম 'এপ্রিল ৬ মুভমেন্ট'। আন্দোলনকারীরা মিসরে প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার ব্যবস্থার বদলে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করতে চান। এতে ঐ তরুণ নেতা আমেরিকানদের সহায়তা চেয়েছেন বলে রাষ্ট্রদূত স্কোবি মার্কিন প্রশাসনকে জানান।

ফাঁস হওয়া মার্কিন নথী অনুযায়ী মার্কিন প্রশাসনের সর্বাত্মক সহযোগিতা পান ওই তরুন মিসরীয় নেতা। ওই সময় ওই তরুন নেতা কায়রোর মার্কিন দূতাবাসের সহযোগিতায় নিউইয়র্কে তরুন মিসরীয় নেতা-কর্মীদের এক সম্মেলনে যোগদান করেন। তখন দূতাবাস থেকে ওয়াশিংটনকে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, ওই নেতার পরিচয় যেন গোপন রাখা হয়, তা নাহলে দেশে ফেরার পর তার সমস্যা হবে।

এদিকে মিসরে হোসনি মোবারক সরকার উৎখাতের আন্দোলন শুরুর প্রাক্কালে ভিন্নমতাবলম্বী ওই নেতাকে মিসরের নিরাপত্তা বাহিনী আটক করে। তবে তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কায়রোর ওপর ওয়াশিংটন সরাসরি চাপ প্রয়োগ করে। হোসনি মোবারকের বিরুদ্ধে সোস্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মূল নেতৃত্ব দিয়েছে এই 'এপ্রিল-৬ মুভমেন্ট'।

www.pathagar.com

ফেসবুক ও টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ইন্টারনেট-ওয়েব সাইট ব্যবহার করে তারা মোবারক উৎখ্যাতের আন্দোলনের পক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলে। সিএনএন এবং তার আরবীয় সংস্করণ আল-জাজিরা আন্দোলনকারীদের ইন্টারনেট বার্তা, স্লোগান, আবেদনগুলোকে সংগ্রহ ও সমন্বিত করে সরকার পরিবর্তনের আন্দোলনকে বেগবান ও সফল করার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। ফলে কোন কেন্দ্রীয় বিকল্প রাজনৈতিক দল বা নেতৃত্ব ছাড়াই মিসরে বিপুল ক্ষমতাধর স্বৈরশাসককে বিদায় নিতে হয়েছে। এতে অবশ্য মার্কিন নির্দেশনায় মিসরের সেনাবাহিনী মোবারকের দিক থেকে শেষ মুহূর্তে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সেনাবাহিনী আন্দোলনকারীদের দমনে নিষ্ঠুরতার বদলে সহযোগি সখ্যতার আচরণ করেছে। তৃতীয়তঃ ওয়াশিংটন হোসনি মোবারকের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছে যে, তাঁর চলে যাবার সময় হয়েছে। দীর্ঘকালীন স্বৈরশাসক জনগণের বিরুদ্ধে যে সব অপরাধ করেছেন, তার সবটাই মোবারক নিজের প্রয়োজনে করেছেন, তাও নয়। আমেরিকা-ইসরাইলের স্বার্থেও তাঁকে অনেক কাজ করতে হয়েছে। মোবারক বিরোধী জনগণের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে সংঘবদ্ধ জনমতের বৈপ্লবিক অহিংস অভিব্যক্তিতে সমন্বিত করে আন্দোলনের একটা অভিমুখ তৈরী করা হয়। যার সাথে মিসরের গণতন্ত্রকামী বিপুল শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সমর্থন একটি কেন্দ্র বিন্দুতে এসে মিলিত হয়। শেষপর্যন্ত নীল তীরের দেশ মিসরের রাজধানী কায়রোর ঐতিহাসিক তাহরির স্কোয়ারে জনসমুদ্রের দীপ্ত উচ্চারণঃ 'মোবারক তুমি বিদাও হও'। এ স্লোগান তার বিদায়ের ইতিহাস তৈরী করেছে। মোবারকের পরে কে এবং কী, এই ধ্রুব রাজনৈতিক প্রশ্নের জবাব জানা না থাকলেও মিসরের জনগণের অভিশাপের দীন দীর্ঘকালের স্বৈরশাসক মোবারকের বিদায়ের প্রাপ্তিকেই জনশক্তির বিশাল অর্জন হিসেবে দেখা হয়।

প্রথমদিকে সেনাবাহিনী মোবারকের নির্দেশে কাজ করেছে। আন্দোলন দমাতে কারফিউ জারি করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর আচরণ দেখে জনগণ আরও সংঘবদ্ধ ও বেপরোয়া হয়ে রাজপথ কম্পিত করেছে। আন্দোলনে ঘেরাও হওয়া মার্কিন 'মিত্র' প্রেসিডেন্ট মোবারকের সাথে হোয়াইট হাউস থেকে প্রেসিডেন্ট ওবামা কথা বলেননি। মার্কিন প্রশাসন হঠাৎ করে গণতন্ত্রপ্রেমী হয়ে উঠে। মোবারক সরকারকে কঠোর সতর্কবার্তা দিয়ে- গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ না করা, গণতান্ত্রিক সংস্কার, মানবাধিকার রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ক কথা বলে প্রেসিডেন্ট ওবামা ও তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন মধ্যপ্রাচ্য, আরব-উত্তর আফ্রিকা সহ তামাম দুনিয়ার নবজাগ্রত তরুণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবীদের কাছে নতুন বার্তা পাঠাতে চেয়েছেন। তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট বেন আলী আন্দোলনের প্রথম প্রহরেই মার্কিন ও পশ্চিমা মিত্রদের বার্তা অনুধাবন করে সঞ্চিত অর্থ নিয়ে সস্ত্রীক দেশ ছেড়েছেন। কিন্তু হোসনি মোবারক দেশ ছাড়ার সুযোগও পাননি। মিসরের গণতন্ত্র বা জনগণের অধিকার কি রূপ পাবে, তা নির্ভর করে প্রধানত

www.pathagar.com

সেনাবাহিনী কতটা গণতন্ত্র পছন্দ করবে এবং হোয়াইট হাউস মিসরীয়দের জন্য কী ধরনের গণতন্ত্র উপহার দিতে চায়, তার ওপর।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটনের সাম্প্রতিক ভাষা কৌতুহলোদ্দীপক। গত ১২ এপ্রিল, ২০১১ হিলারী ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসলামী বিশ্ব ফোরামের-বৈঠকের উদ্বোধনী ভাষণে বলেন "আরব ভূ-খন্ডে পরিবর্তনের ধারা সূচিত হচ্ছে।" একই সাথে তিনি আরব অঞ্চলে মিথ্যা আখ্যানের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার জন্য আরব তরুনদের প্রশংসা করেন। তবে আরব বিশ্বের সংস্কার প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নেবার জন্য হিলারী আহ্বান জানান। তিনি আরব নেতৃবৃন্দকে ওই অঞ্চলের নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতি দ্রুত সাড়া দেয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন। হিলারী বলেছেনঃ "কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো ঐতিহাসিক গণ অভ্যুত্থানের ফলে ওই অঞ্চলে সত্যিকারের পরিবর্তানের সুযোগ তৈরী হয়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্বের ৩০ টিরও বেশী মুসলিম দেশের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে হিলারী এসব কথা বলেছেন। হিলারী বলেছেনঃ 'আরব তরুণরা বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি মেনে নেবে না এবং তারা উন্নত জীবন যাপনে আগ্রহী।'

উল্লেখ্য, এই সম্মেলনে এর আগে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার ও-আই-সি মহাসচিব ইকমালোদ্দীন ইসানোগলু ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধ সহ মুসলিম বিশ্বের সমস্যা সমাধানে যুক্তরাষ্ট্রকে আরও সক্রিয় হবার আহ্বান জানান। তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়া পুনরুজ্জীবিত করার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, এটি মুসলিম বিশ্বের ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

হিলারী ক্লিনটনের ভাষায় সংস্কার, গণতন্ত্র, মুসলিম বিশ্বের জনগণের জন্য 'উন্নত জীবনের' বর্ণনা খুবই উদ্দীপক। কিন্তু ওয়াশিংটন ও তার পাশ্চাত্য মিত্ররাই মুসলিম বিশ্বে তাদের লুটেরা চৌর্যবৃত্তি টিকিয়ে রাখতে স্বৈরাচার-একনায়কদের লালন করে আসছে। মুসলিম বিশ্বের যে সব শিক্ষিত তরুনরা ইউরোপ-আমেরিকায় উন্নত জীবনের অন্বেষণে পাড়ি দিয়েছেন, তাদের প্রতি পাশ্চাত্যের সরকার ও সমাজের বৈরী বিদ্বিষ্ট ও বৈষম্যমূলক আচরণ ও দৃষ্টিভংগি বদলানোর ঔদার্য যারা দেখাতে ব্যর্থ, তাদের মুখে যতো উদ্দীপ্ত কথাই উচ্চারিত হোক, তা মুসলিম বিশ্বের তরুনদের বিমোহিত করলেও দীর্ঘদিন আকৃষ্ট করে রাখতে পারবে না। সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপ-আমেরিকায় অভিবাসী মুসলিম নারী-পুরুষ এক অসহিষ্ণু সাংস্কৃতিক অনাচারের শিকার। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশের সরকার প্রধানরা পর্যন্ত মুসলিমদের বহু সংস্কৃতি ধারন ও লালনের অধিকার অস্বীকার তাদের ওপর সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ চাপিয়ে দিতে চাইছেন। ফ্রান্সে মুসলিম নারীদের প্রকাশ্যে নেকাব পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে অমান্যকারীর ওপর জরিমানা ও ধার্য করে নতুন আইন করা হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের বিভেদ সংঘাত ও অনৈক্যের উপাদানগুলোকে ব্যবহার করেই আমেরিকা ও তার মিত্ররা 'নিওকলোনিয়ালিজমের' থাবা বিস্তার করছে। সুতরাং

www.pathagar.com

একদিকে যেমন স্বৈরশাসকের পরিবর্তনে গণতন্ত্রকামী শক্তির প্রতি পশ্চিমা বিশ্ব প্রকাশ্য সমর্থন-সোহাগ বিতরণ করছে, অন্যদিকে তারা খোলস বদলানো পরিশীলিত ভৃত্যদের ক্ষমতায় বসিয়ে তাদের আর্থ-রাজনৈতিক আধিপত্য বহাল রাখার অগ্রাধিকারের গ্যারান্টি আদায় করে নিচ্ছে। মিসরে বা তিউনিসিয়ায় স্বৈর শাসকের বিদায়ে জনগণের উল্লাস ও বিজয়ের ফসল সাম্রাজ্যবাদী দানবদের জন্যই জনগণ ঘরে তুলতে পারবেনা। সাম্রাজ্যবাদীদের নয়া প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নয়া শাসকদের স্থিতাবস্থা ভাংতে চাইলে তাদের নির্দয়ভাবে অবদমন করা হবে। মিসরের অন্তবর্তীকালীন সেনাবাহিনীর সরকার যার সূচনা করেছেন। আন্দোলনকারীদের ওপর নির্যাতন, গ্রেফতার এবং গুলিবর্ষণের ঘটনা নতুন করে মিসরে ঘটতে শুরু করেছে। জনগণের গণতান্ত্রিক উচ্ছ্বাস যৌক্তিক পরিণতিতে নিতে হলে সে ধরনের সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব দরকার, তা না থাকলে উচ্ছ্বাসের তোড়ে বা বাইরের ইন্ধন সমর্থনে ক্ষমতার দৃশ্যপটে বাহ্যিক পরিবর্তন এনে দীর্ঘস্থায়ী লাভ হয় না।

গত ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১১ লন্ডনের 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' এক রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে, মিসরে 'নতুন মোবারকের উত্থানের আশংকা রয়েছে। 'বর্তমানে মিসরের অন্তবর্তী সরকারের শীর্ষ ব্যক্তি ফিল্ডমার্শাল মোহাম্মদ তানতাবি (৭৬) নয়া পোষাকে শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসতে চাইতে পারেন। তিনি সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবেও আলোচিত। মধ্যপন্থী গণতন্ত্রী মোহাম্মদ এলবারাদী কিংবা পশ্চিমা ঘেঁষা আরব লীনা মহাসচিব আমর মুসার যেকোন একজনকে সেনাবাহিনী বিশ্বাস করতে না পারলে তাদের পুরনো বিশ্বস্ত ফিল্ডমার্শাল তানতাবিকে সিভিলিয়ান গণতন্ত্রের পোষাক পরিয়ে আবার শাসন ক্ষমতায় নিয়ে আসা হতে পারে। মোবারকের পদত্যাগ নিশ্চিত করতে রাজপথে গণতন্ত্রপন্থীদের শক্তি প্রদর্শন তথা জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শনের তৎপরতা সহ্য করা হলেও সেনাবাহিনী অন্তবর্তীকালীন সময়ে তাদেরকে সংযমী করে রাখতে চায়। আন্দোলনকারীরা মনে করেন, মোবারকের পতন তাদের আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণ করলেও তাদের আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। আর এজন্য তাদের রাজপথে বা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু তাহরির স্কোয়ারের জমায়েত অব্যাহত রাখা দরকার। তাহরির স্কোয়ারের সমাবেশে গত ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে আন্তর্জাতিক আইনের অধ্যাপক মোহাম্মদ ফউদ-সদালা বলেন, 'বিপ্লব শেষ হয়ে যায় নি। আমরা চাইনা সেবানাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করুক।' সেনাবাহিনীর বর্তমান প্রধান জেনারেল সামি আনান (৬৩) নিজেও প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে পারেন। ৪ লাখ ৬৮ হাজার সদস্যের সশস্ত্রবাহিনীর চীফ অব স্টাফ পদাধিকার বলেই মিসরের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তবে সংস্কারের লক্ষ্যপূরণ না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে আনেদালনের সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। মিসরের সবচেয়ে সংগঠিত ইসলামী আদর্শবাদী দল মুসলিম ব্রাদারহুড ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা 'আল ওয়াসাত' নামের একটি দলকে মিসরের আদালত স্বীকৃতি দেওয়ায় সেনাবাহিনীর মাইন্ডসেট নিয়ে নানা জল্পনা চলছে। পশ্চিমারা চায়না

www.pathagar.com

বলেই নোবাহিনীও ব্রাদারহুডকে ক্ষমতার রাজনীতিতে বড়ো ধরনের সুযোগ করে দিতে চাইবে না। এখন পর্যন্ত মুসলিম ব্রাদারহুডকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এর আগে চারবার আবেদন করেও তারা স্বীকৃতি পেতে ব্যর্থ হয়। সর্বশেষ ২০০৯ সালে তারা স্বীকৃতি পেতে ব্যর্থ হয়।

ব্রাদারহুড সাম্প্রতিক গণআন্দোলনে নিউক্লিয়াসের ভূমিকা পালন করলেও তারা দৃশ্যমান কেন্দ্রীয় ভূমিকায় না এসে সাইডলাইনে অবস্থান নেয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাস্তবতা এবং মোবারক বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে জনগণের কাছে কোন ভূল বার্তা না যায়, ব্রাদারহুড সে ব্যাপারে সতর্ক ছিল। তারাও মোবারকের পদত্যাগকে প্রাথমিক মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করে। শাসন ক্ষমতায় মুসলিম ব্রাদারহুড ফিরে আসতে পারে, এমন আশংকা তৈরীর কারণে মিসর ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিরূপ সমালোচনা আছে।

পাশ্চাত্যে এবং খোদ মিসরে ইসলামী ব্রাদারহুড নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচারনা চালানো হয়েছে। জাতীয় স্বার্থ ও ইসলামী শরিয়ার ব্যাপারে নিরাপোষ হওয়ায় পশ্চিমারা ব্রাদারহুডের ব্যাপারে ভীত। একই কারণেই মিসরের সেনাবাহিনীও ব্রাদারহুডকে সহ্য করতে চায় না। মিসরীয় সেনাবাহিনী শুধু পশ্চিমা সামরিক প্রশিক্ষণ ও কালচারই ধারণ করছে না। সেনাবাহিনী বিপুল পরিমাণ মার্কিন সহায়তারও ভাগীদার। এছাড়া মিসরীয় সেনাবাহিনী প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দেশের লাভজনক অনেক ব্যবসায়ী প্রকল্পেও যুক্ত। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম জন অধ্যুষিত মিসরকে ইসরাইলের বন্ধু হিসেবে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করার পেছনে সেনাবাহিনীর সবিশেষ ভূমিকা আছে। মার্কিন লেজুড়বৃত্তি থেকে সেনাবাহিনী বেরিয়ে না আসলে তারা ইসরাইলের বিরুদ্ধে কখনও জনমতের প্রতিধ্বনি করতে পারবে না। ইসরাইলের কাছ থেকে হরানো গোলান হাইটস ফিরে পাওয়া ছাড়া মিসর শান্তি চুক্তির আর কোন বিনিময় পায়নি। তবে ইসরাইল মার্কিন অক্ষের পক্ষে স্থিতাবস্থা রক্ষা করার বিনিময়ে মিসর কয়েকশ ডলারের মার্কিন বাজেট পেয়ে থাকে। এর বিনিময়ে মিসর ইসরাইলের গ্যাস চাহিদার বৃহদংশ মিটায় এবং ইসরাইলের পক্ষে ফিলিস্তিনী মুক্তি সংগ্রামীদের ওপর নজরদারি সহ নানা অন্তর্ঘাতে সহায়তা দিয়ে আসছে। তবে মিসর ইসরাইলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ফিলিস্তিনীদের পক্ষ নিতে শুরু করেছে।

মিসরের হোসনি মোবারক সরকারের পতন ইসরাইলকে উদ্বিগ্ন করলেও ইসরাইলের সাথে শান্তি চুক্তি রক্ষার অংগীকার পুর্নব্যক্ত করতে হয়েছে অন্তবর্তী সরকারকে। মিসরে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি ফিরে আসার ফলে মার্কিন ইসরাইল অক্ষের স্বার্থহানি চাইবে না ওয়াশিংটন। মোবারকের পতনের পর মিসরের সুয়েজক্যানেল হয়ে ইরানের একটি যুদ্ধজাহাজ সিরিয়া গমন করলে ইসরাইল আমেরিকা তোলপাড় সৃষ্টি করে। ইরান-সিরিয়া-তুরস্ক নয়া আঞ্চলিক মেরুকরন আমেরিকা-ইসরাইলী অক্ষকে শংর্কিত করে তোলে। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে উৎখাতে ব্যাপক আন্দোলন

www.pathagar.com

চলছে। ইরানে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে পশ্চিমারা প্রমোট করতে চেয়েও সফল হতে পারেনি। শিয়া জন অধ্যুষিত বাহরাইনে এবং সুন্নী ইয়েমেনেও চলছে শাসক পরিবর্তনের দাবীতে আন্দোলন। মধ্যপ্রাচ্যে শাসক ও ভুগোল পরিবর্তনের সাম্রাজ্যবাদী খেলা চলছে নেপথ্যে। লিবিয়ার শাসক গাদ্দাফীর ব্যাপারে পশ্চিমারা যতোটা নির্দয় ও অসহিষ্ণু, বাহরাইন ও ইয়েমেরন স্বৈর শাসকদের ব্যাপারে ততোটাই দূর্বল ও সহনশীল। মার্কিন রননীতির এই দ্বৈততা তাদের প্রতি পরিবর্তনশীল আবর জনমতকে আবারও হতাশ ও সতর্ক করেছে। দীর্ঘমেয়াদে এই জনসচেতনতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি স্বৈরশাসনের দোষ কিংবা গণবিরোধী ভূমিকার জন্য হোসনি মোবারকের পক্ষ ত্যাগ করতো, তাহলে জনমত প্রীত ও আশ্বস্ত হতে পারতো। কিন্তু তারা বোতলের লেবেল বদলিয়ে জনমতকে ধূলো দিয়ে শাসক পদে নতুন গোলাম চাইছে। আমেরিকানরা চাতুরীর মাধ্যমে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত গণতান্ত্রিক অভ্যুদয়কে হাইজ্যাক করে তাতে সাম্রাজ্যবাদী রং লাগিয়ে দিয়েছে। মিসর কিংবা মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার কোন দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক শক্তির নিজস্ব শক্তি ও কর্ম-কৌশলে ক্ষতার পট পরিবর্তন ঘটানোর সামর্থ নেই। দীর্ঘকাল স্বৈর শাসনের নিপীড়নে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তি বিকশিত হতে পারেনি। সামাজিক ও রাজনৈতিক-শক্তির উত্থান সাম্রাজ্যবাদী বৃত্ত অতিক্রম করে জাতীয়তাবাদী বা ইসলামী ধারার শক্তি নিয়ে ইরানের মতো আবির্ভূত হতে পারছে না। এই সীমাবদ্ধতা যতোদিন থাকবে, ক্ষমতার পটপরিবর্তনের সুফল ততোদিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার এজেন্টরাই ভোগ করবে। .

সুতরাং মিসরের অন্তবর্তী সরকার ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেও সে সরকার কতটা গণতান্ত্রিক ও জাতীয় স্বার্থে আপোষহীন হতে পারবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। বর্তমান মিসরীয় সরকারও অতীতের মোবারক সরকারেরই ধারাবাহিকতা। সেনাবাহিনী রাজপথের আন্দোলনের বাতাবরণে ইতিহাস তৈরীর অংশীদার হলেও তারা নিজেরা কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী স্বৈরশাসক উৎখাত সহগামী ভূমিকা পালন করেনি। এ ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা গতানুগতিক। তবে পশ্চিমা 'মিত্ররা' সেনাবাহিনীকে গ্রীন সিগন্যাল দেবার পরই তারা সক্রিয় হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থার সাবেক প্রধান নোবেল বিজয়ী মিসরীয় নাগরিক মোহাম্মদ আল বারাদী বলেছেন ঃ "সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও গোলযোগপূর্ণ অঞ্চল মধ্যপ্রাচ্য। যেখানে ইসরাইলের সাথে হামাস, হিজবুল্লাহ, সিরিয়া, ইরান, এরদোগানদের তুরস্ক, সব সময় বাদানুবাদ লেগেই থাকে। যে কোন সময় অস্বাভাবিক কিছু ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক। মিসর এসব থেকে মুক্ত। তাই উচিৎ ছিল, শক্তিশালী অর্থনীতির সাথে সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন। কিন্তু মোবারক তার পরিবারের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী করলেও দেশের ব্যাপারে ছিল একবারে উদাসীন। এমনকি জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে

www.pathagar.com

ইসরাইলের সাথে চুক্তি করেছিল দয়াশীল। .... আমি যখন মোবারকের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করলাম, তখনই আমি ইরান ও মুসলিম ব্রাদারহুডের (ইখওয়ানুল মুসলিম) দালাল হয়ে গেলাম।

'.... মোবারক যদি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হতেন, এবং তার প্রতি দেশের মানুষের সমর্থন থাকত, তাহলে তিনি কোনো প্রকার সংঘর্ষ ছাড়াই ইসরাইলের ওপর চাপ দিতে পারতেন। কারণ ইসরাইল তেল ও গ্যাস সহ অনেক ক্ষেত্রে মিসরের ওপর নির্ভরশীল। ..... ক্ষমতা ধরে রাখতে মোবারক ইসরাইলের আনুগত্য করে গাজায় সবকিছু তিনি বন্ধ করেছেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলেছেন ঃ গাজা যেন এক ছাদহীন জেলখানা। যা মোবারক ছাড়া ইসরাইলের পক্ষে করা কখনো সম্ভব হতো না। ... আমি মনে করি, মুসলিম ব্রাদারহুডকে নিষিদ্ধ করা ছিল তাদের প্রতি সরকারের প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ।.....'

[সাক্ষাৎকার, নয়া দিগন্ত, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১১]

মিসরের বিশ্বখ্যাত দৈনিক আল আহরাম-এর সাবেক সম্পাদক মুহাম্মদ হাসনাইন হেইকল অপর এক সাক্ষাৎকারে দাবী করেছেন ঃ "দেখুন, আমি মনে করি, যারা তাহরির স্কোয়ারে আন্দোলন করছে, তারাই প্রকৃত আন্দোলনকারী। কারণ আপনারা দেখেছেন, তারা একখানা রুটি দুইজনে ভাগ করে খেয়েছে। এখানে রাতে অবস্থান করছে। সরকার বিরোধী আন্দোলনের গতি বারাচ্ছে। এমনকি সর্বশেষ নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিলিয়ে দিচ্ছে।

'.... মিসর মধ্যপ্রাচ্যে অন্যতম বৃহৎ শক্তি। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি বজায় রাখতে হলে আমেরিকার অবশ্যই মিসরকে প্রয়োজন। একারণে আমেরিকা মোবারক পরবর্তী সরকারের সাথেও সম্পর্ক গভীর করার চেষ্টা করবে বলে আমি মনে করি। আর সে ক্ষেত্রে ইসরাইল আমেরিকাকে বেশী উদ্বুদ্ধ করবে। কারণ মধ্যপ্রাচ্যে মিসর ছাড়া আলোচনার আর কোন মাধ্যম নেই। তাছাড়া সামরিক দিক দিয়েও অন্যদের থেকে মিসরকে ইসরাইল কিছুটা ভয় পায়।"

[সাক্ষাৎকার। নয়া দিগন্ত, ৭ ফেব্রুয়ারী ২০১১]

কিউবার সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো সম্প্রতি এক রাজনৈতিক নিবন্ধে লিখেছেন ঃ "আরব বিশ্বের ইসলামি সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের কারণে এখানে রাষ্ট্র নিজের ন্যূনতম দায়িত্ব পালন করার বদলে নির্মম ভূমিকা নিয়েছে। বাস্তবে যে কারণে দেশগুলো স্বাধীন হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এখানে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা জারী রয়েছে। এর জন্য রাষ্ট্র, বিশ্ব বাণিজ্য এবং অর্থনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর নির্দেশ চাপিয়ে দিতে সুবিধা হয়েছিল।" [ন্যাটোর ধান্দা, ফিদেল ক্যাস্ট্রো, গণশক্তি কলকাতা, ৫ মার্চ ২০১১]

মালয়েশিয়ার প্রখ্যাত চিন্তাবিদ চন্দ্র মুজাফফর [ন্যায়সংগত বিশ্বের জন্য আন্তর্জাতিক আন্দোলন-এর সভাপতি] লিখেছেন ঃ "আমরা জানিনা, আগামী দিন আর মাসগুলোতে

www.pathagar.com

মিসরের বিপ্লব কী রূপ নেবে। তবে এর আগে শুধু মিসর নয়, বিশ্বের মানুষের এই বিপ্লব উদযাপনের অধিকারও যুক্তি রয়েছে। আমরা একটি জাতির আত্মার মুক্তি প্রত্যক্ষ করলাম।"

[কাউন্টার কারেন্টস ডট অর্গ, নয়া দিগন্ত, ৪ মার্চ ২০১১]

গত ১৪ মার্চ ২০১১, দৈনিক সংগ্রাম-এ নিয়মিত কলাম 'সমকাল সংলাপ' 'যুব গণ অভ্যুত্থান এবং সাম্রাজ্যবাদের খোলস বদলানো রাজনীতি' শীর্ষক রাজনৈতিক কলামে উল্লেখ করেছিলাম ঃ "সাম্রাজ্যবাদের দন্ত নখর ও তার বিস্তার এবং গতি প্রকৃতি চিনে নিতে মুসলিম বিশ্ব যখন প্রস্তুত হচ্ছে, তখন আরব-আফ্রিকার নব বিপ্লবী শক্তিকে আগ বাড়িয়ে বরাভয় দিয়ে মার্কিন ও তার সহযোগি পশ্চিমা মিত্ররা তাদের রং বদলিয়ে 'ত্রাতার' মুখোশে আবির্ভূত হয়েছে। এর পাশাপাশি তারা বিপ্লবী চেতনা এক্সপ্লয়েট করে নতুন লিখণ্ডী শাসক বসানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মুসলিম বিশ্বের সামরিক ও রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় তাত্ত্বিকরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী গোলাম একনায়ক শাসকদের সাথে সখ্য গড়ে নিজেরা লাভবান হয়েছেন। জনগণের মুক্তির জন্য সাম্রাজ্যবাদী শৃংখল মোচনের জন্য যে দৃঢ় সংগ্রাম প্রয়োজন, তা থেকে নিজেরা যেমন বিরত থেকেছেন, তেমনি জনগণকেও অসচেতন রেখেছেন। এর মাশুল দিচ্ছে জনগণ। আরব মধ্যপ্রাচ্য আফ্রিকা জুড়ে যে গণজাগরণের দ্যুতি দৃশ্যমান, তাকে ধারণ করার সামর্থ চলমান রাজনীতির নেই। তারপরও জনগণ রাজনীতিকদেরকে পেছনে ফেলে পরিবর্তনের প্রত্যাশায় আগুয়ান। বাংলাদেশেও যুগ-চাহিদা ও তারুন্যের ক্ষুধা নিবৃত্তির রাজনীতি অনুপস্থিত।"

'মধ্যপ্রাচ্য নতুন রাজনৈতিক যুদ্ধের শুরু' [প্রথম আলো, ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১১] শীর্ষক নিবন্ধে সাংবাদিক সামির আমিন (মধ্যপ্রাচ্য) লিখেছেন ঃ "আরব বিশ্বে যা ঘটেছে, তার নাম সামাজিক বিদ্রোহ। বিকল্প সৃষ্টির সম্ভাবনা ধরে এসব বিদ্রোহ। ... পূঁজিবাদ এসব আন্দোলনকে সফল হতে দেবে না। ..... বাস্তবতা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রই মোবারককে টিকিয়ে রেখেছিল। যখন দেখলো, তাঁকে রাখার চেয়ে বিদায় দিলেই বেশী লাভ, তখন তারা সেটাই করেছে।" সামির আমিন মনে করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানী মডেলে মিসরে ইসলামী সামরিকতন্ত্রের ককটেল প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

তাঁর মতে, মুসলিম ব্রাদারহুডকে 'উদার' করে সামরিক সহায়তায় নয়া শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি আমেরিকানদের মাথায় রয়েছে। কিন্তু এর বিপরীতে গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতার সাথে সমন্বয় করতে হলে মুসলিম ব্রাদারহুডকেও সংস্কারের ধারা মেনে নিতে হবে। রাজনীতিতে কৌশলগত পরিবর্তন ও বিন্যাস কমিউনিস্টদেরও করতে হয়েছে।

সামির আমিন আর একটি চমকপ্রদ তথ্য উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি ব্রাদারহুড ও সেনাবাহিনীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন প্রসঙ্গে তার নিজস্ব সমীকরণ তুলে ধরেছেন। সামির আমিন লিখেছেন ঃ

www.pathagar.com

"মোবারক কার্যতঃ মিসরীয় সমাজের সাব কন্ট্রাক্টরী তুলে দিয়েছিলেন মুসলিম ব্রাদারহুডের হাতে। তিনি তিনটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে এদের প্রতিষ্ঠা করেছেন ঃ বিচার বিভাগ, শিক্ষা ব্যবস্থা ও টেলিভিশন। কিন্তু সামরিক শাসকরা এগুলো ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজেদের হাতে রেখেছিলেন এবং সেটাই তারা এখনো চান। মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব এখানেই। আমেরিকা এই মামুলি অন্তর্দ্বন্দ্বকে কাজে লাগায়। এবং উভয়কে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে উভয়কেই বশে রাখে। ..... দীর্ঘ মেয়াদে মধ্যপ্রাচ্যের পথটা এখনো অনিশ্চিত। সামরিক বাহিনীর মতো মুসলিম ব্রাদারহুডও মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আধিপত্য এবং ইসরাইলের সঙ্গে সখ্য যেমন আছে, তেমনটা বজায় রাখার পক্ষে। এরা সবাই যেমন পরিতৃপ্তির সাথে ফিলিস্তিনের বাদবাকী অংশেও ইসরাইলের উপনিবেশ কায়েম হতে দিচ্ছে, তাতে এদের কাছ থেকে আশা করার আর কিছু থাকে না।" [সামির আমিন মিসরীয় অর্থনীতিবিদ, ওয়ার্ল্ড সোস্যাল ফোরাম এর পুরোধা, এক্সিস অব লজিক-এ প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, প্রথম আলো, ২০.০২.১১]

মিসরের সালাফী নেতা কামাল হাবিব (৫৩) বলেছেন ঃ "What we had been trying to achieve for 40 years by force, the people managed to do in 18 days without the use of force." [The Economist, April 18, 2011]

কিন্তু দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসকের বিদায়ের নোটিশটা যে ওয়াশিংটনে তৈরী হয়েছে, সেটা মিসরের সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনি। বিশেষ করে স্বৈরশাসকদের শক্তি প্রয়োগ করে জনমনে ভীতি তৈরীর যে অস্ত্র, সেই সামরিক বাহিনী যখন পক্ষ বদল করে স্বৈরাচারের বিদায় চায়, তখন স্বৈরাচারকে বোতলবন্দী দানব না হয়ে উপায় থাকে না। মিসরের গণ আন্দোলনের সহজ ও শান্তিপূর্ণ সফলতা আরব ও উত্তর আফ্রিকার মার্কিন বিরোধী দুষ্ট শাসকদের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনকে উস্কে দিয়েছে। যার নিয়ন্ত্রণ মার্কিনীদের হাতেই রয়েছে। প্রেসিডেন্ট ওবামা হোসনি মোবারককে 'অর্ডারলি ট্রানজিশনের' নিয়ম মেনে ক্ষমতা থেকে নিস্ক্রান্ত হবার বার্তা দেবার পর সেখানে গণ আন্দোলন হলেও তার বিদায় নেওয়া ছাড়া বিকল্প ছিল না।

মার্কিন শ্রী আংটির মাজেজায় সেনাবাহিনীকে হুকুম বরদার দানব হিসেবে ব্যবহার করে হোসনি মোবারক দোর্দন্ড প্রতাপে দেশ শাসন করেছেন। শ্রী আংটি হাত থেকে ঘসে পড়ায় তার মাজেজা নিঃশেষ হয়ে যায়। তামাম স্বৈরশাসকদের বেলায়ই এটা হয়ে থাকে।

মিসরে স্বৈরশাসকের বিদায়ের পরবর্তী রাজনৈতিক দৃশ্যপট আন্দোলনকারীদের সামনে পরিষ্কার ছিল না। ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক রোড় ম্যাপ কেউ উপস্থাপনও করেনি। টাইম সাময়িকী'র ভাষ্যকার তাই লিখেছেন ঃ

"Cairo's unsettled spring- Mubarak is gone. But Egyptians

www.pathagar.com

have no idea who or what comes next": joe klein, Time 18 April, 2011"

বিগত ১লা এপ্রিল ২০১১ কায়রোর তাহরির স্কোয়ারে আন্দোলনকারীরা আবার জড়ো হয়েছিলন। উদ্দেশ্য, "to remind the military Government that they were still there and hoping for a clearer path to democracy and because it was fun."

বাস্তবিকই আন্দোলনকারীরা এখন আলো-আধাঁরি আর আশা-নিরাশার মধ্যে দুলছেন। মোবারকের পতনের পর মিসরে এক ভিন্ন চিত্র। মিসরে রাজনীতি দৃশ্যতঃ নির্বাচনমুখী। সংবিধান সংশোধন ইস্যুতে গণভোট অনুষ্ঠানের পরও নির্বাচনের মাধ্যমে কাংখিত গণতন্ত্র আসবে, নাকি সেনাবাহিনী সমর্থিত কোন মেরুদন্ডহীন সরকার ক্ষমতায় আসবে, জনগণ সেই দোলাচলে। এমনকি মিসরের জনগণকে গণতন্ত্রের পুরনো তুর্কি মডেলে সন্তুষ্ট থাকতে হতে পারে। যেখানে সামরিকতন্ত্রই রাজনীত ও রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করবে।

মিসরে প্রো-ডেমোক্রেসী গোষ্ঠী আগের মতো সংহত, উদ্দীপ্ত ও সক্রিয় নয়। তারা বিভক্ত, বিভ্রান্ত এবং ক্রমশ পান্তাভাতের জড়ার মতো বিচ্ছিন্ন। মুসলিম ব্রাদারহুড একক কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মাঠে আসছেনা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমীকরণ বা ব্যকরন নাকচ করে মুসলিম ব্রাদারহুডই শুধু নয়, কোন রাজনৈতিক দলেরই মিসরে গণতন্ত্রের জোয়ার বইয়ে দেবার সামর্থ্য নেই।

আশা করা যায়, মিসরে প্রত্যাশিত সাধারণ নির্বাচন আসছে সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে। এরপর নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবার কথা। বাস্তবকারণেই মিসরে গণতান্ত্রিক রাজনীতির শর্তপূরণের সাংগঠনিক শক্তি গড়ে ওঠেনি। তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক গণভিত্তি সম্বলিত কোন রাজনৈতিক দল এখনও গড়ে উঠেনি। মিসরে ব্রাদারহুড ও সালাফী গ্রুপ ইসলামি ধারার রাজনীতি চর্চা করে। হোসনি মোবারকের রাজনৈতিক দল ইতোমধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, নিকট ভবিষ্যতে নির্বাচন হলে মিসরে ইসলামি ব্রাদারহুড সুবিধা পাবে, এ কারণে সেক্যুলারপন্থী সুশীলরা নির্বাচন বিলম্বিত করতে চায়। কিন্তু নির্বাচন বিলম্বিত হলে নতুন করে সংকট বাড়বে।

এদিকে মোবারকের রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় সুসংগঠিত ও গণআস্থার দল হিসেবে ব্রাদারহুড সেনা কর্তৃপক্ষের জন্য নির্ভরশীল রাজনৈতিক বিকল্প হতে পারে। ইতোমধ্যে হোসনি মোবারক ও তাঁর ছেলেকে গ্রেফতার করে অন্তরীন রাখা হয়েছে। হত্যাকান্ড সহ দুর্নীতির অভিযোগে মোবারকের বিচার হতে যাচ্ছে। তবে মোবারক বার্ধক্য ও হৃদরোগে কাবু। তাঁর চিকিৎসার জন্য সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মোবারকের বিচারের ডামাডোলে মিসরের নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হোক, জনগণ তা চাইবেন না।

বিগত গণভোটের পক্ষে জনমত তৈরীতে ব্রাদারহুড ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

www.pathagar.com

এর মাধ্যমে তারা একটি সুশৃংখল ও দায়িত্বশীল দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিগত গণ-আন্দোলনে ব্রাদারহুড রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও দখলদারি মনোভাব না দেখিয়ে নির্দলীয় গণ আন্দোলনের সহযোগি শক্তি হিসেবে দায়িত্বশীল আচরন করে তাদের বিরুদ্ধে উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতার অপবাদ নিরসনে সক্ষম হয়েছে। টাইম ভাষ্যকার Joe Klein তাই দলটি সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 'The Brotherhood has put its disciplined political organization into high gear'। ব্রাদারহুড মুখপাত্র মোহাম্মদ মোরসী মনে করেন, সামরিক বাহিনী যদি মোবারকের রাজনৈতিক দলের ওপর নির্ভর না করে, তাহলে তাদের দলের রাজনৈতিক গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে। লিবারেল সেক্যুলার গ্রুপ মনে করে, তারা অসংগঠিত। তারা প্রস্তুতির জন্য সময় চায়। এজন্য তারা সামরিক সরকারকে সময় দিতে রাজী। লিবারেলরা বিগত গণভোটে সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে জনগণের কাছে তাদের দক্ষতা দেখাতে পারেনি। তবে ব্রাদারহুড গণভোটে জনমত সংগঠনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। তারা বলেছে ঃ 'yes' for Islam and 'No' for Anti Islamic group.

বিগত আন্দোলনের সময় তাহরির স্কোয়ারের আন্দোলনকারীরা সেনাবাহিনীকে তাদের পাশে সহায়ক শক্তি হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু সেনাবাহিনী একই স্থানে বা মিসরের অন্যত্র অব্যাহত প্রতিবাদ সমাবেশ দেখতে চায় না। তারা রাস্তা পরিষ্কার রাখতে চায়। সমাবেশ দমনে সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণও করেছে। এতে বেশ কজন নিহত হয়েছেন। গ্রেফতারও হয়েছেন অনেকে। এক বিপ্লবীকে বিচার করে তিন বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে, সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন সুপ্রীম কাউন্সিল প্রতিবাদ-বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব দিতে ইচ্ছুক।

লিবিয়ার বিদ্রোহী কারা, তাদের মদদদাতাদের পরিচয় কী?

অধ্যাপক পিটার ডেল স্কট (Peter Dale Scott) সাবেক কানাডিয়ান কূটনীতিক এবং ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, ব্রেকলি'র ইংরেজীর অধ্যাপক। তিনি অনেক বইয়ের লেখক। এসব বইয়ের মধ্যে রয়েছে Drugs oil and war, The Road to 9/11, The war conspiracy, JKF, 9/11 Deep politics of war. এছাড়াও পিটার ডেল-এর সাম্প্রতিক সাড়া জাগানো বই American War Machine মার্কিন যুদ্ধ-কূটনীতির অন্তর্বাস উন্মোচন করে দিয়েছে।

লিবিয়ার সংকটকে সামনে রেখে অধ্যাপক পিটার ডেল সম্প্রতি লিখেছেন ঃ "Who are the Libyan Freedom Fighters and their Patrons? [http://www.
global research. ca/index. php? Context=va of aed = 2394/ অধ্যাপক পিটার ডেল স্কট লিখেছেন ঃ "The would is facing a very unpredictable and potentially dangerous situation in North Africa and the Middle East. What began as a memorable,

www.pathagar.com

promising, relatively nonviolent achievement of New politics- the revolutions in Tunisia and Egypt has morphed very swiftly into a recurdescence of old habits. America already mired in two decade long wars in Iraq and Afghanistan, and sporadic air attacks in Yemen and Somalia, now bumbing yet another Third world country, in this case Libya."

দৃশ্যতঃ লিবিয়ায় আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স এবং ন্যাটো সামরিক জোটের বিমান হামলার লক্ষ্য হচ্ছে, লিবিয়ার সিভিলিয়ানদের জীবন রক্ষা করা। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা এটিকে একটি আলাদা ধরনের যুদ্ধ বলে মনে করেন এবং লিবিয়ার এ যুদ্ধ-ওই দেশের সীমানার বাইরেও সম্প্রসারিত হতে পারে। প্রফেসর-পিটার ডেল স্কট-তার নিবন্ধে লিখেছেনঃ "It attempts rather to examine the nature of the forces that have emerged in Libya over the last four decades that are presently being played out."

-লিবিয়ায় বিদ্রোহীদের পরিচিতি উন্মোচন করতে গিয়ে পিটার ডেল বলেছেন,বিগত চার দশক ধরে যাদেরকে প্রস্তুত করা হয়েছে তাদেরকেই বিদ্রোহের দৃশ্যপটে দেখা যাচ্ছে।

লিবিয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই 'ইসলামিক ফাইটিং গ্রুপ' গাদ্দাফী সরকার উৎখাতে সশস্ত্র গেরিলা তৎপবতায় লিপ্ত। তবে গাদ্দাফীকে উৎখাতে নিবেদিত এই ইসলামিক ফাইটিং গ্রুপটি আল-কায়দা নেটওয়ার্কের সাথেও সম্পর্ক তৈরি করেছে। আল-কায়দার জন্মবৃত্তান্ত, তার দৃশ্য-অদৃশ্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং সামরিক তৎপরতা বিশ্লেষণ করে একে পশ্চিমা স্বার্থ বিরোধী বলার চেয়ে মুসলিম বিশ্বের জন্য হঠকারী ও আত্মঘাতি বলেই ধারণা করা হয়। আল-কায়েদার নামে গোপন বিধ্বংসী ও রক্তরক্তি অভিযানের ফলে মার্কিনীদের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' যৌক্তিকতা প্রমাণের সুযোগ তৈরী হচ্ছে। আল-কায়দা মৌলিকভাবে মার্কিন ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিরোধি হলেও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই তারা স্বেচ্ছায় অথবা অজ্ঞাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০০৪ সালে সি আই এ-র পরিচালক জর্জ টেনেট-সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটিতে প্রদত্ত এক রিপোর্টে উল্লেখ করেন ঃ "one of the most immediate threats [to U.S. security] is from smaller international Sunni extremist groups that have benefited from al quaida links. They include the Libyan Islamic Fighting Group."

লিবিয়ান বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত পূর্বাঞ্চলীয় ডারনা (DERNA)-কে 'ইসলামিক আমিরাত' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ যায়গাটি আল-কায়দার রিক্রুটের জন্য উপযুক্ত স্থান বলে মনে করা হয়। আল-কায়দার নেতা ওসামা বিন লাদেনের কথিত গাড়িচালক সুফিয়ান আল কাওমী এই ডারনার লোক। ২০১০ সালে গাদ্দাফী পুত্র সাইফ আল

www.pathagar.com

ইসলাম "reform and repent" কর্মসূচীর আওতায় সুফিয়ান আল কওমীকে মুক্তি দেন।

লিবিয়ান ইসলামিক ফাইটিং গ্রুপ ১৯৯০-এ আফগানিস্তানে গঠিত হয়। এই গ্রুপটির সশস্ত্র যোদ্ধারা এপর্যন্ত লিবিয় সেনাবাহিনীর কয়েক ডজন সদস্য ও পুলিশ হত্যা করেছে। ২০০৯ সালে গাদ্দাফীর শাসনের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে লিবিয়ান ইসলামিক ফাইটিং গ্রুপ গাদ্দাফীকে হত্যা প্রচেষ্টার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তারা অস্ত্র ত্যাগের ঘোষণা দেয়। মজার কথা হচ্ছে, এলআইএফজি-কে বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই-৬ মদদ দিয়ে আসছে বলে ব্যাপক প্রচারণা আছে। পূর্বাঞ্চলীয় ডারনা শহরকে কেন্দ্র করে LIFG একটি ইসলামিক আমিরাত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে। ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার বৃটিশ এমআই-৬ কেন লিবিয়ার কট্টরপন্থী আল কায়েদা-লিংক LIFG-কে মদদ দিয়ে আসছে, সেটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন। অন্যদিকে আমরিকান মদদে আফগানিস্তানে গড়ে ওঠা আল কায়দার অদলে ১৯৯০-এ লিবিয়ানদের নিয়ে LIFG তৈরী করা হয়। এর পেছনে আমেরিকান সিআইএ-র মদদ দুর্নীরিক্ষ্য নয়। LIFG-র ৬ নেতা এখনও লিবিয়ার কারাগারে আটক আছেন। এরা গাদ্দাফীকে উৎখাতের 'জেহাদকে' বৈধ ও শরিয়তসম্মত মনে করেন। কারামুক্ত অপর LIFG নেতা আবদুল হাকিম আল হাসাদী আল জাজিরা কে বলেছেন ঃ 'গাদ্দাফী লিবিয়ার জনগণকে বিভক্ত করতে চান।' "He claims that there is an Islamist emirate in Derna and that I am its emir. He is taking advantage of the fact that I am a former political prisoner." উল্লেখ্য, ইরাকে আত্মঘাতী বোমায় যারা অংশ নিয়েছেন, তাদের অধিকাংশই লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় ডারনার অধিবাসী। ডারনার অধিবাসীরা ব্যাপকভাবে গাদ্দাফী বিরোধী। উইকিলিকস্ মার্কিন কূটনীতিকের ২০০৮ সালের বক্তব্য উদ্ধৃত করে পূর্বাঞ্চলীয় ডারনা-র জনগণের গাদ্দাফী ও তাঁর গোত্র সম্পর্কে মন্তব্য উদ্ধৃত করে লিখেছে যে, এরা গাদ্দাফী ও তাঁর গোত্র সম্পর্কে সম্মানজনক ধারনা পোষণ করেন না। তাঁর মতে "Residents of eastern Libya in general and Darna in particular, view the Gaddafa (Gadohafi's tribe) as uneducated, uncloth interlopers from an inconsequential part of the country who have 'stolen' the right to rule in Libya."

এ বছরে লিবিয়ায় বিদ্রোহ শুরুর পরিদিন ১৬ ফেব্রুয়ারী আরও ১১০ জন LIFG সদস্যকে গাদ্দাফী সরকার মুক্তি দিয়েছেন। মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন আল-কায়দার অন্যতম শীর্ষ নেতা আবু ইয়াহিয়া আল-লিবি-র ভাই আবদুল ওয়াহাব মোহাম্মদ কায়েদ। কওমী আফগানিস্তান ছেড়ে লিবিয়ায় এসে তাঁর কাজ শুরু করেন। পাকিস্তানে কওমী ধরা পড়েন এবং ২০০২ সালে তাকে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ আমেরিকার কাছে হস্তান্তর করলে তাকে গুয়েনতানামো কারাগারে অন্তরীনে পাঠানো হয়। ২০০৯ সালে কওমীকে লিবিয়ায় ফেরত পাঠানো হয়। প্রফেসর পিটার ডেল স্কট লিখেছেন ঃ "US-

www.pathagar.com

counter terrorist experts have expressed concern that Al-Qaida could take advantage of a political vacuum if Gaddafi is overthrown. But most analysts say that, although the Islamist's ideology has strong resonance in Eastern Libya. There is no sign that the protests are gong to be hijacked by them."

উল্লেখ্য, বিদ্রোহের সূচনা থেকেই গাদ্দাফী বলে আসছিলেন যে, বিদ্রোহীরা সফল হলে লিবিয়ায় আল কায়েদার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। একথা বলে গাদ্দাফী হয়তো পশ্চিমাদের সতর্ক করে বিদ্রোহীদের ওপর থেকে তাদের সমর্থন তুলে নেবার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু আল-কায়াদার নাটাই যে ইঙ্গ-মার্কিন গোয়েন্দাদের হাতে, সেটা গাদ্দাফী হিসেবে রাখেনি। মার্কিন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর হিসাবেও আল কায়েদা কতদূর যেতে পারে, তার হিসাব আছে। আল-কায়াদা লিবিয়ার বিদ্রোহের সূচনায় কার্যকর প্রোভোকেটিয়ারের ভূমিকা নিলেও ইঙ্গ-মার্কিনীদের পক্ষেই তারা অজ্ঞাতসারে তাদের ভূমিকা নিয়েছে এবং আল-কায়াদার সাফল্য ছিনতাই করার পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া পশ্চিমারা বিশদভাবে প্রণয়ন করে রেখেছে। মার্কিন নীতি নির্ধারকরা বিদ্রোহীদের পরিচয় ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে লিবিয়ার বিদ্রোহীদের সরাসরি সামরিক ও লজিস্টিক সহায়তা না দেবার নীতি গ্রহণ করেছে। বিদ্রোহীদের পরিচয়, শক্তিমত্তা, তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সরেজমিনে জানতে মার্কিন সরকার তাদের সামরিক বিশেষজ্ঞ ও গোয়েন্দা মিশন লিবিয়ায় পাঠিয়েছে। এছাড়া মিসর ও তিউনিসিয়ার গোয়েন্দা সহায়তা ও তারা নিচ্ছে। লিবিয়ার জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশের প্রতিনিধিত্বকারী ইসলামিক ফাইটিং গ্রুপ এককভাবে বড়ো কোন সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। তাছাড়া আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদেরকে প্রমোট ও স্বীকৃতি দেবে না। বিদ্রোহ গড়ে তোলার পূর্বপর্যন্ত পশ্চিমারা ইসলামিক ফাইটিং গ্রুপকে ব্যবহার করবে। তারা লিবিয়ায় আর একটি ইরান পরিস্থিতি তৈরী হতে দিবে না। অথবা হেজবুল্লাহ বা হামাসের মতো কোন সশস্ত্র ইসলামিক গ্রুপকেও গড়ে উঠতে দিবে না। ১৯৯৫ সালে ইসলামিক ফাইটিং গ্রুপের সাথে গাদ্দাফী বাহিনীর সরাসরি যুদ্ধে উভয় পক্ষে বেশ কিছু হতাহত হয়। এ যুদ্ধের পর ফাইটিং গ্রুপ আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করে এবং আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনের পর গাদ্দাফীকে উৎখাতকে প্রধান কর্তব্য বলে ঘোষণা করে। এই ঘোষণা দিয়েছেন এমন একজন লিবিয়ান-আফগান ইসলামিক নেতা, বৃটিশ সরকার যাকে তাদের দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে মদদ দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, লিবিয় আলকায়দা নেতা থেকে শুরু করে ইসলামী রাষ্ট্রগঠনের প্রবক্তা ইসলামিক ফাইটিং গ্রুপ নেতাদের মদদদানে বৃটিশ সরকারও তাদের গোয়েন্দা সংস্থা-এমই-৬ নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। কিন্তু কেন?

প্রফেসর পিটার ডেল স্কট লিখেছেন ঃ "The involvement of the British government in the LIFG campaign against Qadhafi remains the

www.pathagar.com

subject of immense controversy. LIFG'S next big operation, a failed attempt to assassinate Qadhafi in February, 1996 that killed several of his bodyguards, was later said to have been financed by British intelligence to the tune of $ 160,000 according to Ex-MI5 officer David shayler."

গাদ্দাফীকে হত্যা মিশনে বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থা ইসলামিক ফাইটিং গ্রুপের পিছনে কেন ১ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার খরচ করেছে, সে প্রশ্নের বিশ্লেষণের সাথে লিবিয়ায় গাদ্দাফী বিরোধী বিদ্রোহের গতি-প্রকৃতি ও লক্ষ্য নির্ণয়ের বিষয়টি জড়িত।

যদিও ডেভিড শায়লারের বক্তব্যটি প্রশ্নাতীতভাবে স্বীকৃত নয়। তবে প্রফেসর স্কটের মতেঃ it is clear that Britain allowed LIFG to develop a base of logistic support and fund raising on its soil. At any rate, financing by Bin Laden appears to have been much more important. According to one report, LIFG received up to $ 50,000 from the Saudi terrorist mastermind for each of its militants killed on the Battlefields."

এটা নানাভাবেই প্রমাণিত যে, গাদ্দাফীকে উৎখাতের প্রাথমিক কর্মসূচি হিসেবে আমেরিকা, বৃটেন এবং ফ্রান্স ইসলামিক ফাইটিং গ্রুপকে (আল কায়াদার লিবিয় সংস্করণ) ব্যবহার ও মদদ দিয়ে আসছে। এমনকি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন কংগ্রেসের শুনানীতে লিবিয় ইসলামিক ফাইটিং গ্রুপ ও আল কায়দার সাথে তাদের 'আনহোলি এ্যালয়েন্সের' কথা স্বীকার করেছেন। বিশেষ করে তারা এ-ও জানে যে, লিবিয়ান বিদ্রোহীরা গাদ্দাফীর চেয়ে আমেরিকার প্রতি অধিকতর মাত্রায় ক্ষুব্ধ ও বিদ্বিষ্ট।

প্রফেসর স্কট লিখেছেন ঃ "A decade ago, this very same delusion of a western Islamist partnership in kosovo, Bosnia and Chechnya ended abruptly in the 9/11 attacks."

লিবিয় ইসলামিক ফাইটিং গ্রুপ নেতা আল হাসাদী ইটালিয়ান পত্রিকা '11 Sole 240 re' -এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন, পূর্ব লিবিয়ার ডারনা এলাকা থেকে তিনি ২৫ জনকে রিক্রুট করেছেন। ইরাকের কোয়ালিশন বাহিনীর বিরুদ্ধে এরা যুদ্ধ করে। এদের কয়েকজন লিবিয়ার আজদাবিয়ায় বিদ্রোহীদের সাথে ফ্রন্টলাইনে যুদ্ধরত রয়েছে। আল হাসাদী স্বীকার করেছেন, আফ্রিকার দেশ শাদ-এর প্রেসিডেন্ট ইদ্রিস দিবে ও লিবিয়ায় ইসলামিক ফাইটার্স গ্রুপ ও আল কায়দার অস্ত্র সংগ্রহ এবং বিদ্রোহী অঞ্চল তৈরীর ঘটনা সম্পর্কে অবহিত। এমনকি বিদ্রোহীদেরকে তাদের পশ্চিমা মিত্ররা ভূমি থেকে আকাশে ক্ষেপনযোগ্য মিসাইলও সরবরাহ করেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ন্যাটোবাহিনীর একাধিকবার বিমান হামলায় বেশ কিছু বিদ্রোহী যোদ্ধা

www.pathagar.com

নিহত হয়েছে। এসব ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলে বিদ্রোহীরা মেনে নিতে চান না। ধারণা করা হচ্ছে, ন্যাটো বাহিনী অবস্থা বুঝে প্রতিপক্ষ বিদ্রোহী তথা ইসলামিক ফাইটিং গ্রুপের ওপর বোমা হামলা শুরু করেছে। এদিকে বিদ্রোহীরা ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে অপর্যাপ্ত অভিযান ও বিলম্বিত তৎপরতার অভিযোগ করেছেন। লিবিয়ার তেল সম্পদ ও ভূ-খন্ডের ওপর পুরনো ঔপনিবেশবাদী পশ্চিমা শক্তিগুলো নতুন করে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যটি উন্মুক্ত করে দেওয়ায় গাদ্দাফী বিরোধী বিদ্রোহীরা পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ঘুরিয়ে দিতে পারে। সে আশংকা থেকে পশ্চিমারা মুক্ত নয়। আল হাসাদী ২০০২ সালে পাকিস্তানের পেশোয়ারে গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আফগানিস্তানে আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তাকেও পাকিস্তান মার্কিনীদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের কাছে হস্তান্তর করে। আমেরিকার হাত ঘুরে আল হাসাদী লিবিয়ায় ফিরে আসেন এবং গ্রেফতার হন। অতঃপর ২০০৮ সালে তিনি মুক্তি পান। মার্কিন ও বৃটিশ সরকারী সূত্রমতে, আল হাসাদী লিবিয় ইসলামিক ফাইটিং গ্রুপের সদস্য। এই গ্রুপটি ১৯৯৫ ও ১১৯৬ সালে বেনগাজি ও ডারনায় গেরিলা হামলা চালিয়ে সরকারী বাহিনীর প্রভুত ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করেছে। লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ ২৫ মার্চ, ২০০১ সূত্রমতে, আল হাসিদী স্বীকার করেছেন যে, আল কায়দার সাথে তাদের যোগাযোগ আছে।

অন্তবর্তীকালীন ন্যাশনাল কাউন্সিল

লিবিয়ার বিদ্রোহীদের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে- পূর্বাঞ্চলীয় বেনগাজি ও অন্যান্য তেল সমৃদ্ধ এলাকা। বিদ্রোহীরা বেনগাজি কেন্দ্রিক একটি অন্তবর্তীকালীন ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠন করেছেন। গাদ্দাফী সরকারের পদত্যাগকারী বিচারমন্ত্রী এবং সপক্ষত্যাগী একজন জেনারেল অন্তবর্তীকালীন ন্যাশনাল কাউন্সিলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কয়েকটি পশ্চিমা দেশ এই অন্তবর্তী কাউন্সিলকে স্বীকৃতিও দিয়েছেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন অন্ত বর্তীকালীন কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের কথা জানিয়েছেন। লিবিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর লন্ডন সম্মেলনের সময় আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিমা কূটনীতিকরা লিবিয়ার অন্তবর্তী কাউন্সিলের প্রবাসী নেতাদের সাথে বৈঠক করেছেন। হিলারী ক্লিনটন এসময় অন্তবর্তী কাউন্সিলকে 'any kind of assistance' দিয়ে গাদ্দাফীকে উৎখাতের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অন্তবর্তী কাউন্সিলের পক্ষ থেকে গাদ্দাফীর সেনাবাহিনী ত্যাগ করে সেনা সদস্যদের প্রতি তাদের সাথে যোগ দিয়ে ত্রিপলী থেকে গাদ্দাফীকে উৎখাতের আহ্বান জানানো হয়। হিলারী বলেছেন ঃ "We are Just at the begining of what will follow Gaddafi."

লিবিয়ার বিদ্রোহীদের গঠিত অন্তবর্তীকালীন কাউন্সিলের সামরিক প্রধান ওমর আল হারিরিকে ১৭ ফেব্রুয়ারী/১১ পর্যন্ত গাদ্দাফীর নিরাপত্তা বাহিনী নজরদারিতে রেখেছে। তিউনিসিয়া-মিশরে ফেসবুক ইন্টারনেট বিপ্লব শুরু হবার ধারাবাহিকতায় লিবিয়ায় বিদ্রোহ বিস্ফোরিত হয়। লিবিয়ার অন্তবর্তী ন্যাশনাল কাউন্সিল গাদ্দাফীর পতন ঘটানোর আগেই গাদ্দাফী-নিয়ন্ত্রিত তেল করপোরেশনের বদলে বিকল্প একটি তেল কোম্পানী

www.pathagar.com

গঠানের ঘোষণা দেয়। এদিকে গাদ্দাফীর এসেট জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ জব্দ করেছে। অন্তবর্তী ন্যাশনাল কাউন্সিল ১৯ মার্চ/২০১১ এক ঘোষণায় জানায়, তারা লিবিয়ান অয়েল কোম্পানী নামে একটি সুপারভাইজরী কর্তৃপক্ষ গঠন করেছে, সে কোম্পানী তেল উৎপাদন ও জাতীয় তেল নীতি প্রণয়ন করবে। একই সাথে ন্যাশনাল কাউন্সিল আরও ঘোষণা করে যে, বেনগাজির সেন্ট্রাল ব্যাংক তাদের মানিটারী অথোরিটি হিসেবে কাজ করবে এবং বেনগাজির সেন্ট্রাল ব্যাংক পরিচালনার জন্য অস্থায়ীভাবে একজন গভর্ণর নিয়োগ করবে।

বিদ্রোহীদের অস্ত্রের উৎস

প্রখ্যাত বৃটিশ সাংবাদিক বরার্ট ফিস্ক ৭ মার্চ, ২০১১ লন্ডনে দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট এ লিখেছেন ঃ "Libya in turmoil : America's secret plan to arm Libya's rebels; Obama asks Saudis to airlift weapons into Bengazi."

তবে সৌদী সরকার আভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক কারণে আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুরত্বপূর্ণ এ অনুরোধ পালনে প্রথমে সম্মতি জানায়নি। তবে অধ্যাপক পিটার ডেল স্কটের মতে ঃ "But the Saudis remain the only Arab ally strategically placed and capable of furnishing weapons to the guerillas of Libya. Their assistance would allow Washington to disclaim any military involvement in the supply chain even though the arms would be American and paid for by the Saudis." "The Saudis have been told that opponents of Gaddafi need anti-tank rockets and mortars as a first priority to hold off attacks by Gaddafi's armour, and ground to air missiles to shoot down his fighter bombers."

লিবিয়ার বিদ্রোহীদের কাছে ২৪ ঘন্টার নোটিশে এসব অস্ত্র পৌঁছে দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়। এসব অস্ত্র লিবিয়ার যে কোন বিমান ঘাঁটি অথবা বেনগাজি এয়ারপোর্টে ডেলিভারী দেবার ছক তৈরী করা হয়। এসব অস্ত্র প্রাপ্তির পরই বিদ্রোহী পক্ষের গেরিলাদের পক্ষ থেকে পূর্বাঞ্চলীয় বেনগাজী থেকে গাদ্দাফীর শক্ত ঘাঁটিসমূহে আক্রমনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। একই সাথে ন্যাটো আমেরিকার পক্ষ থেকে এবং মার্কিন রিপাবলিকান সদস্যরা লিবিয়ার আকাশকে 'নো-ফ্লাই জোন' ঘোষণার যুগপৎ চাপ দিতে থাকে এবং আরব লীগ জাতিসংঘের অনুমোদনে এটা কার্যকর করা হয় সময়ের সাথে সংগতি রেখে।

"Us military planners have already made it clear that a zone of this kind would necessitate U.S air attacks on Libya's functioning, if seriously deplected, anti-aircraft missile bases,

www.pathagar.com

thus bringing Washington direclly into the war on the side of Gaddafi's opponents." [প্রাগুক্ত]
এ সময় থেকেই লিবিয়ার আকাশে মার্কিন এওয়াকস বিমান মহড়া দিতে থাকে। এওয়াকস বিমান মূলতঃ উন্নত প্রযুক্তির মার্কিন গোয়েন্দা বিমান। এ বিমান থেকে সংগৃহীত লিবিয়ার সামরিক অবস্থান ও অন্যান্য তথ্য আমেরিকা সকল ন্যাটো দেশকে দ্রুত সরবরাহ করে। যাতে গাদ্দাফীর সামরিক শক্তি ধ্বংস করে বিদ্রোহীদের বিজয় নিশ্চিত করা যায়। পশ্চিমা ও ন্যাটো সামরিক সূত্র দাবী করেছে, তাদের উপর্যুপরি বিমান ও মিসাইল হামলায় গাদ্দাফীর সামরিক শক্তির অধিকাংশ ধ্বংস হয়েছে। তবে ন্যাটো আমেরিকান যুদ্ধ কয়েক সপ্তাহ ধরে চলার পরও গাদ্দাফীর পতন না হওয়ায় মার্কিন, ফরাসী ও বৃটিশ শীর্ষ নেতৃত্ব এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, গাদ্দাফীর পতন না হওয়া পর্যন্ত তারদে বিমান হামলা অব্যাহত থাকবে। এমনকি আমেরিকা যুদ্ধ কমান্ড ন্যাটোর হাতে ন্যস্ত করে সাইড লাইনে সরে যাবার কথা ঘোষণা করেও অবস্থান বদল করে নিজস্ব সামরিক শক্তি ব্যবহার করে গাদ্দাফীর পতন নিশ্চিত করার ব্রত নিয়েছে। এতে করে জাতিসংঘ প্রস্তাবের শর্ত লংঘন করার ঝুঁকি নেবার কথাও ন্যাটো জোটের মূল ত্রি-শক্তি ঘোষণা করেছে। লিবিয়ায় দৃশ্যমানভাবে পশ্চিমা সামরিক জোট স্থলপথে সেনা অভিযান না চালালেও পশিচমা সামরিক ও গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনায় বিদ্রোহীরা গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং ন্যাটো ও তার মূল শক্তিগুলো আকাশ যুদ্ধ জোরদার করেছে। ফলে বিদ্রোহীদের রাজনৈতিক আন্দোলন একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। বস্তুত: সামরিক পন্থায় গাদ্দাফীকে উৎখাত করার পরিকল্পনাই কার্যকর হতে যাচ্ছে। কার্যতঃ লিবিয়ার শাসক পরিবর্তনের নামে লিবিয়ার ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২৪ মার্চ, ২০১১ লষ এঞ্জেলস টাইমস-রিপোর্টে দিয়েছে ঃ "Libya rebels co-ordinating with west on air assault." ১৭ মার্চ/২০১১ 'ওয়াল ষ্ট্রিট জার্নাল'-এর রিপোর্ট : "Egypt said to Arm Libya rebels." এ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় ঃ

"CAIRO- Egypt's military has began shipping arms over the boarder to Libyan rebels with Washington's knowledge, US and Libyan rebel officials said."

মিসরের এই ভূমিকা এই ইংগিত দেয় যে, লিবিয়ার গৃহযুদ্ধে আরব দেশগুলোও নাক গলাচ্ছে। বিশেষ করে কাতার, আরব আমিরাত ও লেবানন আরব লীগ এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। লিবিয়ার বিদ্রোহী অফিসিয়ালরা প্রথম থেকেই কাতারের ভূমিকায় প্রশংসা করে আসছে। বিদ্রোহী কবলিত পূর্বাঞ্চলীয় তেলক্ষেত্র থেকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাশাপাশি তেল রফতানীর দায়িত্বটি কাতার পালন করছেন। দেখা যাচ্ছে, লিবিয়ার ওপর দস্যুতার উচ্ছিষ্ট ভোগে বেশ কিছু আরব ও উপসাগরীয় দেশও সামিল হয়েছে। যদিও এসব দেশের ক্ষমতাসীনরা এই অঘোষিত ক্রুসেডের পরিণতি সম্পর্কে

www.pathagar.com

একেবারেই অনবহিত। বেনগাজির অতি উৎসাহী বিদ্রোহীরা কাতারের পতাকা পর্যন্ত উত্তোলন করেছিল।

মার্কিন অফিসিয়ালরা লিবিয়ার বিদ্রোহ ও বিদ্রোহীদের কাছে অস্ত্র সরবরাহে মিসরের ভূমিকা গোপন রাখতে চায়। কেননা, দৃশ্যতঃ মিসর সরকার জনসমক্ষে লিবিয়ার ব্যাপারে একটা নির্দোষ-নিরপেক্ষ ভূমিকা দেখাতে চায়। এমনকি লিবিয়ায় নো-ফ্লাই জোন প্রস্তাবে মিসর ভোটদানে বিরত ছিল। এটা তার কৌশলগত অবস্থান। ১৭ মার্চ, ২০১১ Neon Tommy Annenberg Digital News-এর বেঞ্জামিন গোত্তলিয়ের তাদের এক রিপোর্টে জানান ঃ "Egypt arms Libyan rebels as Gaddafi's conquest continues."

তবে মিসরের ফরেন মিনিস্ট্রির মুখপাত্র মেনহা বাখৌম রয়টর্সাকে বলেছেন, মিসর প্রতিবেশী লিবিয়ায় কোনরকম সামরিক হস্তক্ষেপে জড়িত নয়। তিনি বলেন ঃ "Egypt will not be among those Arab states. We will not be involved in any military intervention. No intervention period."

তবে মিসর আভ্যন্তরীণ ও আরব প্রতিক্রিয়া এড়াতেই লিবিয়ায় তার সামরিক হস্তক্ষেপ আড়াল রাখতে চায়। লিবিয়ায় মিসরের মতো পশ্চিমাদের অনুগত কোন সেনা প্রতিষ্ঠান না থাকায় পশ্চিমারা গাদ্দাফীর বিকল্প হিসেবে পূর্বাঞ্চলীয় বিদ্রোহীদের ওপর দৃশ্যতঃ গ্রাউন্ড পর্যায়ে নির্ভরশীল হয়েছে। এসব বিদ্রোহীদের মধ্যে যেমন আল কায়দা-লিংক ইসলামিক চরমপন্থী রয়েছেন, তেমনি লিবিয়ান ইসলামিক ফাইটার গ্রুপও আছে। আরও আছে, সাবেক বাদশাহ ইদ্রিসের অনুগত সানুসী গোষ্ঠী। উপরন্তু পরস্পর সাংঘর্ষিক ও অনৈক্যের চোরাবালিতে ডুবে থাকা লিবিয়ার একাধিক গোত্রীয় বিভাজনকে একাকার করে একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে লিবিয়াকে শাসন করা সম্ভব হবে কিনা, তা নিয়ে বিশ্লেষকদের সন্দেহ রয়েছে। এর বিকল্প হতে পারে, লিবিয়াকে বিভক্ত করে তেলসমৃদ্ধ পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে পশ্চিমাদের প্রশ্রয়ে আর একটি রাষ্ট্র বানানো।

লিবিয়ার প্রতিবেশী সুদানে যেমন খৃষ্টান অধ্যুষিত এলাকার বিভক্তি সুদানীদের মেনে নিতে হয়েছে। এজন্য গণভোটও অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূর্বাঞ্চলীয় লিবিয়ার তেলসমৃদ্ধ এলাকা বিভক্তির প্রশ্নেও পশ্চিমারা গণভোট অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া বলবৎ করতে পারে। লিবিয়াকে একটি কাঠামোতে ধরে রাখতে হলে কয়েকটি গোত্রের মধ্যে সুষম রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক বন্টন ব্যবস্থার নয়া বিন্যাস করতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে লিবিয়ার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুসা কুসা বলেছেন, 'লিবিয়া সোমালিয়ার মতো গৃহযুদ্ধে বিদীর্ণ একটি দুর্ভাগা দেশে পরিণত হতে পারে।' গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে লিবিয়ার অখন্ড জাতীয়তাবোধ দারুনভাবে বিভক্ত ও আহত হয়েছে। এর পুনরুদ্ধার গাদ্দাফীর অনুপস্থিতিতে আরও কঠিন হবে। পশ্চিমারা যেহেতু লিবিয়ার তেল ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তাদের আধিপত্য চায়, সে কারণে লিবিয়া কতখন্ড হলো বা লিবিয়ার মানুষের ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই।

www.pathagar.com

"Yoichi Shimatsu লিখেছেন ঃ "Mideast Revolutions and 9-11 Intrigues created in Quatar." [New America Media, March 1, 2011] মধ্যপ্রাচ্যের গণ অভ্যুত্থান এবং ৯/১১ ষড়যন্ত্রের সূতিকাগার হচ্ছে কাতার। ইউচি শিমৎস্যু লিখেছেন ঃ "It may puzzle and perhaps dismay young protesters in Bengazi, Cioro and Tunisia that their democratic hopes are being manipulated by an ultra conservative Arab elite which has underhandedly backed a surge of militant Islamist radicals accross North Africa. Credible U.S. intelligence reports have cited evidence pointing to Quatar's long running support for Muslim Brotherhood, Al-Qaeda and jihadist fighters returning from Afghanistan."

কাতার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের লিবিয়া অভিযানের সহযোগিই নয়, কার্যতঃ কাতার দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত জঙ্গি ইসলামী সংগঠনগুলোকে পোষণ ও লালন করে আসছে।

"According to a Congressional research Service report of January, 2008, some observers have raised questions about possible support for Al-Qaeda by some Qatari citizens, including members of Qatar's large ruling family. According to the 9/11 commission report, Qatar's Interior Minister provided a safe haven to 9/11 mastermind khalid Shaikh Mohammad during the mid 1990, and press reports indicate other terrorists many have received financial support or safe haven in Qatar after September 11, 2011."

কাতারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ্ বিন খালিদ সানি স্বীকার করেছেন যে, খালিদ শেখকে বসনিয়া জেহাদে (১৯৯৫) অংশ গ্রহণের জন্য তারা অর্থ প্রদান করেছেন। একজন সাবেক মার্কিন পদস্থ কর্মকর্তা বলেছেন, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কাতার সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা খালিদ শেখকে সতর্ক করে দেওয়ায় তাকে এফবিআই গ্রেফতার করতে পারেনি।

কিন্তু কাতার এমন একটি ছোট দেশ, যার নিজস্ব আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের কোন অভিলাষ নেই। তাহলে কাতারকে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে কারা? কাতারকে ঘুঘু হিসেবে ব্যবহার করে জেহাদী জঙ্গিদের শিকার করা এবং তথাকথিত ইসলামি জঙ্গিদের ব্যবহার করে মুসলিম বিশ্বে আগ্রাসনের ক্ষেত্র তৈরীর মাধ্যমে নব্য ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী দখলদারির নীল নকশা বাস্তবায়নের কুশীলবকে এখন আর চিনতে কারও বাকী নেই। লিবিয়ার বিদ্রোহীদের

www.pathagar.com

সাথে কাতারের সম্পর্ক এবং মার্কিন ন্যাটো আগ্রাসনের সহযোগি শক্তি ও ভ্যানগার্ড হিসেবে কাতারের ভূমিকা বিশ্ব রাজনীতির নোংরা অধ্যায় উন্মোচন করে দিয়েছে। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্য, আরব-উপ-সাগরীয় এলাকা কিংবা উত্তর আফ্রিকার সাম্প্রতিক গণ অভ্যুত্থানের অভিমুখ আর অন্তর্মুখে রয়েছে বিস্তর ফারাক।

লিবিয়ায় পশ্চিমা জোটের হামলার নেপথ্য কাহিনী

কার্টিস ডোয়েবলার (Curtis Doebbler) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক একজন খ্যাতিমান আইনজীবি। সম্প্রতি মিসরের আল-আহরাম পত্রিকায় "Millions Spent to Remove Gaddafi. Is the west helping Libyan people" শীর্ষক একটি চমকপ্রদ তথ্যবহুল নিবন্ধ লিখেছেন। স্বনামধন্য ইংরেজী সাপ্তাহিক 'হলি ডে' ১৫ এপ্রিল, ২০০১ সংখ্যায় এ নিবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করায় এর গুরুত্ব ও পাঠকপ্রিয়তা আরও বেড়েছে।

লিবিয়ার ঘটনাপ্রবাহ পশ্চিমা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় যেভাবে উপস্থাপিত হয়ে আসছে, তাতে সাদামাটা বিশ্লেষণে পাঠকের কাছে মনে হবে যে, লিবিয়ায় গাদ্দাফী বিরোধী আন্দোলন স্থানীয় জনগণের ভেতর থেকে গড়ে ওঠা একটি স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। আর লিবিয়ার জনগণের পাশে পশ্চিমাদের অবস্থান গ্রহণ এবং তাদেরকে সামরিক, নৈতিক ও মানবিক সহায়তা দেওয়ার পেছনে মহৎ মানবিকতা ও উচ্চতর নৈতিক মূল্যবোধ জড়িত। কিন্তু কারটিস ডোয়েবলার লিখেছেন : "But a closer look than we are allowed by the "Controlled" western media shows a much different picture."

কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে বিষয়টি নিরীক্ষণ করলে পশ্চিমা মিডিয়ায় এর একটি ভিন্ন চিত্র দেখা যাবে। কারটিস ডোয়েবলার লিখেছেন ঃ "Rather than the result of a spontaneous show of public participation, the conflict besieging Libya may have been a classic expression of neo-Colonialists. They West specially the United States and its gulf allies rather than embracing the peoples expression of participation in Egypt and Tunisia a contrived events in Libya to be able to control these expressions and ensure that they did not result in these people or any other in the region being able to decide how to govern themselves."

লিবিয়ায় বিদ্রোহ প্রকাশ্য রূপ নেয়ার আগে পশ্চিমা দেশগুলো লিবিয়ায় তেল খাতে যেমন বিপুল বিনিয়োগ করে, তেমনি লিবিয়ার শাসক মুয়াম্মার গাদ্দাফীকে অপসারণেও অঢেল অর্থ ঢেলেছে। ডোয়েবলারের মতে, লিবিয়ার বিদ্রোহ স্বতঃস্ফূর্ত জনবিস্ফোরণ নয়। বরং এটি পশ্চিমা বিশ্বের নব্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দূরভিসন্ধির বহিঃপ্রকাশ। লিবিয়ার জনবিদ্রোহ প্রকাশ্য রূপ লাভ করার অনেক আগে থেকেই পাশ্চাত্যের

www.pathagar.com

গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক ও অন্তর্ঘাতী তৎপরতা বিস্তৃত করা হয়। "They were so well entrenched that as soon as the Libyan public got involved they could provide them diplomatic, strategic and military support. In such circumstances it is also naive to think that western intelligence operatives were not fermenting unrest."

ডোয়েবলার লিখেছেন, ২০০৮ সালে লিবিয় নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফীর সাথে সুইচ ব্যাংকের বিরোধ বাঁধার সময় থেকেই সুইচ কর্তৃপক্ষ বিলিয়ন ডলার না হলেও কয়েক মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ সংগঠনে। ডোয়েবলার লিখেছেন ঃ "US soldiers aid to Libya- The training of Libyan soldiers was widely rumoured to be accompanied with ideological report to convert Libyan officers to an American style of life."

গাদ্দাফী সারকোজিকে অর্থ দিয়েছেন

২০০৭ সালের ফরাসী নির্বাচনে লিবিয় নেতা গাদ্দাফী ফরাসী নেতা নিকোলাস সারকোজিকে নির্বাচনী ব্যয় মিটাতে বিপুল অর্থ প্রদান করেন। যদিও লিবিয়ায় পশ্চিমা দেশের বিমান হামলার শুরুটা করেছে ফরাসী যুদ্ধ বিমান। এছাড়া লিবিয়া বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করে। মার্কিন ব্যবসায়ীদের জন্য লিবিয়া উন্মুক্ত করে দেন গাদ্দাফী। লিবিয়াও মার্কিন ও ইউরোপীয় পুঁজি বাজারে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করে।

রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও লিবিয়া তার বিপুল অর্থসম্পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এটা করে। লিবিয়ার জনগণ ৫৪টি আফ্রিকান দেশের মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী। এমনকি দারিদ্র পীড়িত তিউনিসিয়া ও মিসরের চেয়ে লিবিয়ার অর্থনীতি অনেক শক্তিশালী। মানব উন্নয়নে লিবিয়ার সূচক অনেক ওপরে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় হবার কারণে লিবিয়া দীর্ঘদিন ধরে উচ্চবেতনে বিদেশী শ্রমিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, টেকনোক্র্যাটদের কাজের সুযোগ করে দিয়েছে। এতদসত্ত্বেও লিবিয়া পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মতোই সোস্যালিষ্ট রাষ্ট্রের সাথেও সু সম্পর্ক রেখে আসছে। এটাও পশ্চিমাদের সহ্য হয়নি।

পশ্চিমা পুঁজিবাদী শাসকরা বিদেশী তেলের ওপর যেমন তাদের অস্তিত্বকে নির্ভরশীল করে তুলেছেন, তেমনি তাদের মূল লক্ষ্য থাকে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরী করে অস্ত্র বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি করা। কিন্তু অন্যান্য উপসাগরীয় এবং আরবীয় শেখ ও রাজা শাসিত দেশে যেমন ইঙ্গ-মার্কিন ইউরোপীয়রা বিপুল অংকের অস্ত্র বিক্রির ফরমায়েশ আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছে, লিবিয়ার কাছে তারা প্রত্যাশা অনুযায়ী অস্ত্র বিক্রির ফরমায়েশ না পাওয়ায় সুযোগ তৈরীর পথ খুঁজতে থাকে।

Pepe Escober- Asia Times online-এ ৩০ মার্চ/১১ লিখেছেন : "There

www.pathagar.com

is No Business Like war Business" যুদ্ধ বাণিজ্যের চেয়ে বড়ো কোন বাণিজ্য নেই। পেপ এসকোবার এর মতে, অস্ত্র বাণিজ্যের প্রধান বেনিফিসিয়ারী হচ্ছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগন, ন্যাটোভুক্ত ইউরোপীয় দেশসমূহ, সৌদী আরব, আরব লীগের মহাসচিব আমর মুসা এবং কাতার। পেপ এসকোবার দৃঢ়তার সাথে লিখেছেন, তবে অস্ত্র ব্যবসার মুনাফা ত্রিপলীর সরকারপন্থী বা বেনগাজির বিদ্রোহী লিবিয়ানরা পাচ্ছে না।

পোপ এসকোবার লিখেছেন ঃ "When ordinary people rose up around the Middle East, there profitiers saw their opportunity to act. In the first instance, they may have thought that the ground was fertile enough from their significant investments in anti-Colonel propaganda that all that was needed was some philosophical support with a naivete impertinent to the political sophistication of Libyans, the Sorkozy government sent French philosopher Bernard Herri levy as their contribution to the rebel's cause."

লিবিয়ায় গাদ্দাফী বিরোধী আন্দোলনকারীদের সংগঠিত, উদ্বুদ্ধ ও দার্শনিক প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করতে ফরাসী প্রেসিডেন্ট সারাকোজি লিবিয়ায় তাদের দার্শনিক চিন্তাবিদ বার্নার্ড হেনরী লেভী কে পর্যন্ত পাঠিয়েছেন। লিবিয়ার বিদ্রোহীদের সশস্ত্র হয়ে ওঠা এবং তেলক্ষেত্র দখল করে ত্রিপলী দখল অভিযান পরিচালনা পর্যন্ত পশ্চিমাদের প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চলেছে। গাদ্দাফী বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁর দেশের লোকদের সশস্ত্র করে মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত করে গৃহযদ্ধ পরিস্থিতি তৈরী করার জুয়াখেলায় পশ্চিমা দেশের এজেন্টরা সফল হয়েছেন। গাদ্দাফী শুরু থেকেই বলে আসছেন যে, বিদ্রোহীরা বিদেশী এজেন্ট এবং আল-কায়দার লোক। ঔপনিবেশবাদী শক্তি, যারা গণপ্রতিরোধে লিবিয়া ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল, তারা আবার অফুরন্ত তেল সম্পদের লোভে জোটবদ্ধ ষড়যন্ত্র-অন্তর্ঘাতে লিবিয়া দখলের আগ্রাসন শুরু করেছে। ইতোমধ্যেই পশ্চিমা ব্যাংকে গচ্ছিত লিবিয়ার বিপুল অর্থ এবং নানা প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থ ফ্রিজ করা হয়েছে। এটাকে আধুনিক যুগের কুশলী চৌর্যবৃত্তি বলা যায়। শুধু তাই নয়, বেনগাজি, ব্রেগাসহ পূর্বাঞ্চলীয় তেলক্ষেত্র গুলোর নিয়ন্ত্রণ বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের ওপর ন্যাটো যুদ্ধ বিমানের নিরাপত্তা ছায়া বিস্তার করা হয়েছে। এই সুযোগে তারা উপসাগরীয় দেশের মাধ্যমে লিবিয়া থেকে তেল পাচার শুরু করেছে। বিদ্রোহীদের অস্ত্র ও মানবিক সাহায্য দানের জন্য 'তহবিল' খোলা হয়েছে। লিবিয়দের তেল বিক্রির অর্থেই এর খরচ বহন করা হবে। একদিকে লিবিয়ার তেল হরিলুট করার সুযোগ তৈরী করা হয়েছে, অন্যদিকে অস্ত্র বিক্রির ব্যবস্থাও হয়েছে। ন্যাটো সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ খরচটাও লিবিয়ার তেল বিক্রি করেই উসুল করা হবে।

www.pathagar.com

আমর মুসার ভূমিকা

আরব লীগের মহাসচিব আমর মুসা ক্ষমতাচ্যুত মিসরীয় প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের ঘনিষ্ঠ সহযোগি ছিলেন। মিসরের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি প্রেসিডেন্ট হবার স্বপ্ন দেখছেন। দীর্ঘদিন থেকেই আমর মুসা পশ্চিমাদের বিশ্বস্ত এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন। মিসরের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জাতিসংঘে মিসরের স্থায়ী প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনকালে বিগত একদশক ধরে পশ্চিমা এশটাবলিশমেন্টের সাথে আমর মুসার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। ১৯৯১ ও ২০০৩ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে আরব লীগ ও মিসরের পক্ষে পশ্চিমাদের শক্তি প্রয়োগকে আমর মুসা সমর্থন করেন।

আরবলীগের ২২টি সদস্য রাষ্ট্র লিবিয়ার আকাশকে 'নো-ফ্লাই জোন' ঘোষণার ব্যাপারে একমত হতে না পারলেও মহাসচিব আমর মুসা পশ্চিমাদের হাতে এ ব্যাপারে একটি প্রস্তাব তুলে দিয়েছেন। এ প্রস্তাবটির উত্থাপক সৌদী আরব ও কাতার। আলজেরিয়া ও সিরিয়া এ প্রস্তাবের বিরোধীতা করেছে। কার্যতঃ শেষ পর্যন্ত ২২টি সদস্য দেশের মাত্র ৯টি সদস্য লিবিয়ায় নো ফ্লাই জোন- আরোপের প্রস্তাব সমর্থন করে। কিন্তু পশ্চিমারা এ ধরনের একটি প্রস্তাবই চেয়েছিল। তারা তা পেয়েছে। কারটিস ডোয়েবলারের ভাষায় "It gave them Just enough credibility to launch their grab for Libya"- লিবিয়া দখলে এই প্রস্তাব পশ্চিমাদের বৈধতা দিয়েছে। এটুকুই পশ্চিমাদের প্রয়োজন ছিল।

এরপর পশ্চিমারা জাতিসংঘকে কেন্দ্র করে তাদের প্রোপাগান্ডা মেশিন ব্যবহার করতে থাকে। জাতিসংঘ ১৯৭৩ সালের প্রস্তাবের আওতায় আরব লীগের গৃহীত নো ফ্লাই জোন প্রস্তাব অনুমোদন করে গাদ্দাফীর সামরিক কর্তৃত্ব বিকল করে দেয়। যাতে করে বিদ্রোহীরা গাদ্দাফীর সামরিক বাহিনীর বিশেষ করে বিমান বাহিনীর হামলা ছাড়াই বিদ্রোহী স্পটগুলো রক্ষা ও গাদ্দাফীর পতনের লক্ষ্যে ত্রিপলী অভিমুখে এগিয়ে যেতে পারে। কার্যতঃ 'নো ফ্লাই জোন' প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়ে জাতিসংঘের মাধ্যমে আরোপিত হবার পর গাদ্দাফী যুদ্ধবিরতি ঘোষণা দেন। এই সুযোগে বিদ্রোহীরা একের পর এক বিজয়াভিযান চালিয়ে উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে। পশ্চিমারা ভাবলো, গাদ্দাফীর পতনের জন্য তাদের নীলনকশা বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমাদের আনন্দ ম্লান করে দিয়ে গাদ্দাফী বাহিনী যখন বিদ্রোহীদের একের পর এক হটিয়ে দিয়ে বেনগাজি দখলে অভিযান চালায়, তখন পশ্চিমারা তাদের হিসাবের গড়মিল বুঝতে পারে।

লিবিয় কূটনীতিকদের স্বপক্ষ ত্যাগ

পশ্চিমারা গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে জাতিসংঘের মেশিনারী ব্যবহারে তৎপর হয়ে ওঠে। কারটিস ডোয়েবলার লিখেছেন ঃ "And it was no mere ordinary propaganda campaign but a full-blown orchestration of history

www.pathagar.com

for the books." লিবিয়ান কূটনীতিকদের অনেকে পশ্চিমাদের দৌত্যকর্মে ও উস্কানীতে পদত্যাগ করে গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং বিদ্রোহীদের পক্ষ নেয়। তারা সরকারের কূটনীতিক স্টেটাসের মতোই জাতিসংঘ ও পশ্চিমা দেশের কাছে পূর্ণ কূটনৈতিক মর্যাদায় গাদ্দাফী সরকারের বিপক্ষে বিকল্প সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তৎপরতা চালাতে থাকেন। পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুনও বলেন, গাদ্দাফী লিবিয়া শাসনের বৈধতা হারিয়েছেন এবং অবিলম্বে তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন স্বপক্ষত্যাগী লিবিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের বিশেষ ছাড়পত্র দিয়ে তাঁদের রাষ্ট্র ও সরকার বহির্ভূত তৎপরতা চালানোকে বৈধতা দিলেন। এমনকি মহাসচিব জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ক্রেডেনশিয়াল কমিটি ও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রোটোকল বিধি লংঘন করেই পশ্চিমা দেশের স্বার্থে এটা করেন। এভাবেই জাতিসংঘ তার মৌলিক ঘোষণা ও সনদ লংঘন করে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে সূচিত লিবিয়ার গৃহযুদ্ধে একটি পক্ষ হিসেবে তার ভূমিকা নগ্নভাবে সীমাবদ্ধ করে।

বান কি মুনের ভূমিকা

লিবিয় ইস্যুতে বান কি মুন বিশ্বশান্তি রক্ষা ও ক্ষুদ্র দেশের অখন্ডত্ব ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জাতিসংঘের বিঘোষণাকে পদদলিত করে বৃহৎ পশ্চিমা শক্তির ইচ্ছাপূরণ করে জাতিসংঘের ওপর মানুষের আস্থাকে ধ্বংস করেছেন। লিবিয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘ নো ফ্লাই জোন ঘোষণা করার পর গাদ্দাফী সরকার আলী তেরেকীকে জাতিসংঘে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রেরণ করে। কিন্তু জাতিসংঘের মহাসচিব তাঁকে কূটনৈতিক ষ্টেটাস দেননি। আমেরিকা শুধু আলী তেরেকীর নিয়োগের বিরোধিতাই করেনি। কারটিস ডোয়েবলারের ভাষায় ঃ Moreover, a sourch close to the envoy that Libya had sent, Ali Tereki, a former foreign minister and former president of UN general Assembly, said that he had been told that if he assumed the post for his family would be targeted by the allied air strikes."

আলি তেরেকী গাদ্দাফী সরকারের পক্ষে জাতিসংঘে দায়িত্ব পালন করলে ন্যাটো বাহিনী তাঁর পরিবারের ওপর বিমান হামলা চালাবে। গাদ্দাফী সরকার এরপর নিকারাগুয়ান সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অপর জাতিসংঘ সাধারন পরিষদের সাবেক প্রেসিডেন্ট Miguel Escoto Brockman -কে লিবিয়ার পক্ষে জাতিসংঘে প্রতিনিধিত্বের জন্য দায়িত্ব দেয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ তাঁকেও কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দেয়নি। জাতিসংঘে মার্কিন স্থায়ী প্রতিনিধি এ ব্যাপারে সরাসরি হুমকি দিয়েছেন। এমনকি মিগুয়েল ডি'কষ্টা ব্রুকম্যানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করার হুমকিও দেওয়া হয়। এটাকে বৃহৎ শক্তির কূটনৈতিক দস্যুতা বলা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রভাব খাটিয়ে জাতিসংঘ তথা আন্তর্জাতিক অংগনে গাদ্দাফী

www.pathagar.com

সরকারের কূটনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার কেড়ে নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে। এমনকি জাতিসংঘে লিবিয়া সরকারের স্থায়ী মিশনকে কূটচাল ও ব্লাকমেইলের মাধ্যমে বিদ্রোহীদের পক্ষে কূটনৈতিক ওয়েবলার লিখেছেন ঃ "In this capacity, the former Libyan diplomats in New York are advocating for the bombing of their own country by foreign forces from their country's diplomatic premieses."

উরুগুয়ের প্রেসিডেন্ট Jose Mujuca বলেছেন ঃ "this attack implies a setback in the current international order. The remedy, in much wore than the illness. This business of saving lives by banging in an inexplicable contradiction."

উল্লেখ্য, জাতিসংঘ প্রস্তাব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিভাবকত্বে ন্যাটো জোটের লিবিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি নিরাপত্তা পরিষদ সদস্য দেশ আপত্তি জানিয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে চীন, রাশিয়া, ভারত, ব্রাজিল, জার্মানী। কিন্তু বিশ্বকে বিভক্ত করেই পশ্চিমা বিশ্ব জাতিসংঘকে ব্যবহার করে তাদের শক্তির মহড়া শুরু করেছে।

মিসর-লিবিয়া মধ্যপ্রাচ্যের গণজাগরণ ঃ

মিডিয়ার মূল্যায়ন

সাংবাদিক মশিউল আলম 'বিপ্লব, না ঔপনিবেশিক যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি?' শীর্ষক এক লেখায় [প্রথম আলো, ৯ এপ্রিল, ২০১১] সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন, লিবিয়ায় যা চলছে, তা কি বিপ্লব? তিউনিসিয়া ও মিসরের মতো স্বতঃস্ফূর্ত গণ অভ্যুত্থান?" তিনি 'ওয়াল স্ট্রীট জার্নালে'র সাবেক সম্পাদক পল ক্রেইগ রবার্টএর 'কাউন্টারপাঞ্চ'-এর লেখা উদ্ধৃত করেছেন। যাতে বলা হয়েছে ঃ "আমরা লিবিয়ায় যা দেখছি, তা উপনিবেশবাদের পুনর্জন্ম। তবে এখনকার পার্থক্য হলো, এবার ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন সরকার নিজ নিজ সাম্রাজ্য বিস্তার ও সম্পদ আহরনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়নি। নতুন উপনিবেশবাদ সক্রিয় হয়েছে 'দি ওয়ার্ল্ড কমিউনিটির' বাতাবরণে।"

জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ডা. তারেক শামসুর রেহমান 'ধর্মযুদ্ধ' ও আরব বিশ্বের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি' শীর্ষক এক লেখায় [আমার দেশ ২৭ মার্চ/২০১১] উল্লেখ করেছেন ঃ "পশ্চিমা শক্তিগুলো লিবিয়ার বিরুদ্ধে যে সামরিক অভিযান পরিচালনা করছে, তার নামকরণ করেছে 'অপারেশন অডিসি ডন।' আর লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফী এই যুদ্ধকে চিহ্নিত করেছেন 'ধর্মযুদ্ধ' হিসেবে।

.... লিবিয়ার সংকট স্পষ্টত'ই সমগ্র আফ্রিকার ভূ-রাজনৈতিক দৃশ্যপটকে বদলে দিতে পারে। ..... একুশ শতকে নতুন এক আফ্রিকার জন্ম হতে যাচ্ছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। কঙ্গো, রুয়ান্ডা কিংবা আইভরিকোস্টে ফ্রান্সের স্বার্থ ও প্রভাব থাকলেও, এখন সেখানে যুক্তরাষ্ট্র তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে। এ

www.pathagar.com

জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন লিবিয়ায় একটি বন্ধুপ্রতিম সরকার। কেননা লিবিয়াকে বলা হয় এ অঞ্চলে যাওয়ার 'গেটওয়ে।' .... যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে আফ্রিকায় AFRICOM নামে নতুন একটি কমান্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। লিবিয়ার পার্শ্ববর্তী নাইজার ও শাদ-এর প্রাকৃতিক সম্পদের [কোবাল্ট, ইউরেনিয়াম, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, প্লাটিনাম] ব্যাপারেও যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ রয়েছে। বিশেষ করে নাইজারের ইউরেনিয়াম সম্পদ দেশটিকে 'লিবিয়ার মতো পরিণতির দিকে' ঠেলে দিতে পারে। লিবিয়ায় গাদ্দাফীর পতন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বড় সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। ..... বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেই ২০০০ সালে প্রনীত হয়েছিল একটা ধারণাপত্র Rebuilding American Defenses- যেখানে বলা হয়েছে, দীর্ঘ যুদ্ধের কথা। আফগানিস্তান, ইরাকের পর এখন লিবিয়া।"

আফগানিস্তানের হামিদ কারাজাইয়ের মতো লিবিয়ায় আর একজন পাওয়া গেছে। তিনি হচ্ছেন গাদ্দাফী সরকারের স্বপক্ষত্যাগী বিচারমন্ত্রী মুস্তাফা আবদেল জলিল। তার নেতৃত্বেই গঠিত হয়েছে পূর্বাঞ্চল কেন্দ্রিক অন্তবর্তীকালীন ন্যাশনাল কাউন্সিল। লিবিয়ায় যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়েছে, তার পরিণতি আর একটি আফগানিস্তান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা ২০১০ সালের মে মাসে যে National security strategy প্রণয়ন করেছিলেন, সে আলোকে ন্যাটো-র সেনাবাহিনী মোতায়েনের একটি মহাপরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে।

খ্যাতনামা বৃটিশ সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক লন্ডনের দৈনিক 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট'-এ ১৯ মার্চ, ২০১১ এক নিবন্ধে লিখেছেন ঃ 'সাদ্দামের পর গাদ্দাফী, পশ্চিমের প্রিয় পদটি এখন ফাঁকা।' রবার্ট ফিস্ক লিখেছেন ঃ "শেষ পর্যন্ত আমরা লিবিয়ার নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য 'প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থাই' নিতে যাচ্ছি। সত্যিই কি তাই? দুঃখজনক হলেও সত্যি, অনেক আগেই কিন্তু আমরা এমনটি ভাবিনি।" [বিডি নিউজ/দৈনিক সংগ্রাম, ২২ মার্চ/২০১১]।

ফিলিস্তিনি সাংবাদিক নিকোলা নাসের লিখেছেন ঃ "যুক্তরাষ্ট্র কখন সশস্ত্র সংগ্রাম পছন্দ করে।" [প্যালেস্টাইন ক্রনিকলস, ৫ এপ্রিল, ২০১১] সাংবাদিক নিকোলা নাসের এতে লিখেছেন ঃ "যে ওবামা লিবিয় বিদ্রোহীদের অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছেন, সেই ওবামাই কিন্তু মাস খানেক আগে মিসরীয় বিদ্রোহীদের শান্তিবাদী স্লোগান 'সিমিলিয়া-সিমিলয়া'র প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ মিসরে তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহের বিপক্ষে, কিন্তু লিবিয়ায় তারা অস্ত্রের ব্যবহারই দেখতে চান। ওবামা বলেছিলেন, 'মিসরীয়রা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে এবং তারা সেটা করেছে সহিংসতার মাধ্যমেই সুবিচার পাওয়া সম্ভব, এমন ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে....। অহিংস আন্দোলনের নৈতিক শক্তিই ইতিহাসের মোড় সুবিচারের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।"

কিন্তু লিবিয়ায় সহিংসতা, গৃহযুদ্ধ চাপানো এবং সরাসরি গাদ্দাফী সরকারের পতনের নামে তেল ক্ষেত্র দখলের এই অভিযানে ওবামার অনুপ্রেরণা কি? লিবিয়ার সাধারণ

www.pathagar.com

মানুষকে গাদ্দাফীর হাত থেকে নিরাপত্তা দেবার অজুহাতে বিদ্রোহীদের অস্ত্র সাহায্য দান ও বিমান যুদ্ধের ছত্রচ্ছায়া দেওয়ার এই অবস্থাটি তৈরীর জন্যই কি আমেরিকানরা মিসরে 'অর্ডারলি ট্রানজিশন'-এ মোবারককে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছে? মোবারক আমেরিকার কথা শুনেছেন। কেননা তিনি আপাদমস্তক তাদেরই অনুগত ছিলেন। কিন্তু গাদ্দাফী তো আমেরিকার মদদে ক্ষমতায় আসেননি। দীর্ঘকালীন ক্ষমতায় থাকা যদি গাদ্দাফীর অপরাধ হয়, তাহলে আরব বিশ্বে এরকম শাসক আরও আছেন। স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় জনগণকে নির্যাতীত করে, হত্যাকান্ড চালিয়ে ক্ষমতায় থাকার ঔদ্ধত্য যদি গাদ্দাফীর অপরাধ হয়, তাহলে মধ্যপ্রাচ্য, আরব ও উপ সাগরীয় এলাকায় এরকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

প্রেসিডেন্ট ওবামা পূর্বসূরী যুদ্ধবাজ বুশের মতোই লিবিয়ার পরিস্থিতিকে 'বিরল ও অস্বাভাবিক' বলেছেন। অথচ লিবিয়া যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিময়।

নিকোলা নাসের আরও লিখেছেন ঃ "কিছু আরব রাষ্ট্রকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১৯৭৩ সালের একটি সিদ্ধান্তের নামে তারা এমন একটি আগ্রাসী যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে লিবিয়ার ওপর, যেখানে বিশ্বের প্রধান শক্তি যথা ঃ রাশিয়া, চীন, জার্মানী, ভারত ও ব্রাজিল রাজি ছিল না। এই যুদ্ধ তাই বৈধ নয়। এখন ন্যাটোর হাতে নেতৃত্ব তুলে দেওয়ার যে কথা ওবামা বলছেন, তার জবাব জাতিসংঘে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন বল্টনের কথাতেই আছে ঃ 'ওবামাই সম্ভবত বিশ্বের একমাত্র ব্যক্তি যিনি জানেন না যে, আমরা- যুক্তরাষ্ট্রই ন্যাটো চালায়।" [প্রাগুক্ত]

পশ্চিমা সাংবাদিক ষ্টিফেন লেন্ডম্যান লিখেছেন ঃ "ন্যাটো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার।" [সাপ্তাহিক বুধবার, ৬ এপ্রিল, ২০১১] তিনি লিখেছেন ঃ "নো ফ্লাই জোনের" পরিচালন কর্তৃত্ব ন্যাটোর হাতে ছেড়ে দেওয়া একটি কৌশল মাত্র। ন্যাটো হচ্ছে আসলে পেন্টাগণ অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের একটি লেঠেল বাহিনী। তার কাজই হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র নির্ধারিত বিভিন্ন দেশে নিজ থেকে কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো। ওয়াশিংটনের পরিকল্পনায়, আয়োজনে এবং নেতৃত্বে লিবিয়ায়-নির্লজ্জ-হামলা চালানো হয়েছে। এ কাজে যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় মিত্ররা কেবল হুকুম পালনকারী মাত্র।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ার ওয়েস্ট চেষ্টার ইউনিভার্সিটির প্রফেসর লরেন্স ডেভিডসন "আমেরিকার ইমেজঃ সুসংগঠিত ভন্ডামী" শীর্ষক এক লেখায় উল্লেখ করেন "মার্কিন জনগণের বেশীর ভাগই স্থানীয় ঘটনাবলীর বাইরে দুনিয়া সম্পর্কে উদাসীন। আর এই উদাসীনতা থেকে জন্ম 'নেয় অজ্ঞতা। পরিকল্পনা করে অপতথ্য দিয়ে অজ্ঞতা সৃষ্ট শূন্যতা পুরণ করা হয়। উদাসীনরা এমন যে, সরকারের যেসব বিষয় তাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে মনে হয় না, সেগুলো নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না।"

www.pathagar.com

[ইন্টারনেট থেকে ভাষান্তর করে লেখাটি ১০ এপ্রিল, ২০১১- দৈনিক নয়া দিগন্ত প্রকাশ করেছে]

লরেন্স ডেভিডসন ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিন ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ "ল্যাটিন আমেরিকা এমন এক জায়গা যেখানে আমেরিকা সব সময়ই সুশাসন ও উন্নয়নের প্রচারনা চালায়। কিন্তু বাস্তবে ভন্ডামীই সবকিছু। একটির পর একটি মার্কিন প্রশাসন কিউবা, ভেনিজুয়েলা, গুয়ানতেমালা, নিকারাগুয়া ও আল সালভেদরকে ঘায়েল করেছে বা করছে। ...... মার্কিন সরকার একই সাথে আর্জেন্টিনা ও চিলির মতো দেশগুলোতে রাজনৈতিক নেতারূপী খুনি ও নিপীড়কদের মদদ দিয়ে যাচ্ছে।

.... মার্কিনীদের বেশীর ভাগ তিক্ত সত্যের সম্মুখীন না হয়ে দেশের কথিত ভাবমূর্তি ধরে রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তারা এটা করতে চায় একগুয়েমী, আত্মপ্রতারণা ও ভন্ডামী দিয়ে। বলা যায় না, কতদিন এভাবে আমেরিকা চলতে পারবে।"

প্রবীন সাংবাদিক ও কলামিস্ট মঈনুল আলম লিখেছেন ঃ "পাশ্চাত্য অভিযানের মূল কারণ লিবিয়ার তেল সম্পদ।" [আমার দেশ ১০ এপ্রিল, ২০১১] উপরিউক্ত কলামে মঈনুল আলম লিখেছেন ঃ 'অয়েল ফুয়েলস ইন্টারেস্ট ইন লিবিয়ান' পত্রিকার পৃষ্ঠার শীর্ষে এই হেডলাইনে প্রকাশিত উপ-সম্পাদকীয়তে প্রখ্যাত সাংবাদিক টমাস ওয়ালকম লিখেছেন ঃ "৪২ বছর ধরে গাদ্দাফী লিবিয়ায় শাসনকালে তার আন্তর্জাতিক নাশকতামূলক কর্মকান্ডে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার প্রমাণ ছিল। তা সত্ত্বেও গাদ্দাফী শেষ পর্যন্ত লকাবরী বিমান দুর্ঘটনার পেছনে স্থানীয় অভিযুক্তকে ব্রিটেনের কাছে ফেরৎ এবং এ বিমান দুর্ঘটনায় স্বজনহারাদের ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হওয়ার পর লিবিয়ার তেল সম্পদের লোভে পশ্চিমা দেশের নেতারা গাদ্দাফীর সাথে হাত মিলানোর জন্য হামলে পড়েন।"

সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক- 'গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত' শীর্ষক এক লেখায় [ইন্টারনেট/সাপ্তাহিক বুধবার, ৯ মার্চ, ২০১১] লিখেছেন ঃ "বেচারা প্রবীন লিবিয়াবাসীরা! গাদ্দাফীর অধীনে ৪০ বছর থাকার পরও তাদের প্রতিরোধের চেতনা স্পষ্টভাবে শেষ হয়ে যায়নি। লিবিয়ার বিবেক চলে গেছে দেশের বাইরে। লিবিয়াবাসী সব সময় বিদেশী দখলদারদের বিরোধিতা করেছে। যেমন করেছে আলজেরিয়া, মিসর ও ইয়েমেনের জনগণ। কিন্তু তাদের প্রিয় নেতা সব সময় স্বৈরাচারী নয়, বরং নিজেকে উপস্থাপন করেছেন প্রতিরোধকারীর সহযোদ্ধা হিসেবে। এ কারণে ত্রিপলিতে তাঁর সাম্প্রতিক আত্মোপলব্ধিমূলক দীর্ঘ বক্তৃতায় তিনি মুসোলিনীর ঔপনিবেশিক বাহিনীর হাতে ফাঁসিতে নিহত ওমর মুখতারের কথা উল্লেখ করেছেন- মোবারক বা বেন আলীর মতো সহযোগিতার ভাষায় কথা বলেন নি।"

"গাদ্দাফীর সরকার বড় ধরনের সামরিক শক্তির অধিকারী নয় এবং তিনি কর্নেল গাদ্দাফী, জেনারেল গাদ্দাফী নন। তবু তিনি উপনিবেশ বিরোধী সঙ্গীত গাইবেন। তাঁর নিরাপত্তাবাহিনী যতোদিন দেশের পশ্চিমাঞ্চলে কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখবেন, ততদিন তিনি আড়ম্বড়ের সঙ্গে ত্রিপলীতে থাকবেন।"

www.pathagar.com

আরব জাগরণ ছিনতাইয়ের আশংকা

'আরব নিউজ'- মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতি গণ-জাগরণ নিয়ে আত্মসমালোচনামূলক এক রাজনৈতিক সমীক্ষামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। গত ২ এপ্রিল/২০১১-এ সমীক্ষাটি দৈনিক সংগ্রাম প্রকাশ করেছে। পাঠকের অবগতির জন্য গোটা বিশ্লেষণ এখানে তুলে দেওয়া হলো ঃ "আফগানিস্তান, ইরাক ও পাকিস্তানের পর পশ্চিমা সামরিক জোটের হামলার লক্ষ্যে পরিণত এবার লিবিয়া। তাদের ঘোষনা অনুযায়ী ইসলামপন্থী জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় যুদ্ধে নেমেছিল পশ্চিমা জোট আফগানিস্তান ও ইরাকে। গণমারণাস্ত্র ধ্বংস করাও তখন তাদের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু লিবিয়ায় পশ্চিমা যুদ্ধের উদ্দেশ্য তা নয়। লিবিয়ায় তারা যুদ্ধে নেমেছে নিরীহ 'গণমানুষের প্রাণ রক্ষা' করতে। দেশটির একচ্ছত্র শাসক গাদ্দাফীর নিপীড়ন থেকে জনগণকে তারা মুক্তি দেয়াতে চায়- যেভাবে মুক্তি পেয়েছেন তিউনিশিয়া ও মিসরের জনগণ।

গাদ্দাফীকে নিয়ে মুশকিল দেখা দিয়েছে যে, একজন সাধারণ শাসকমাত্র গাদ্দাফী নিজেকে ভাবেন না। তিনি মনে করেন শুধু লিবিয়ায় নয়, সমস্ত মানুষের কল্যাণের বরদান নিয়ে তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। অতএব ক্ষমতা তিনি ছেড়ে দিতে পারেন না। তার বিদায়ে দেশ ধ্বংস হবে। গাদ্দাফী একা নন, অহংবোধে মগ্ন এমন আরো নেতা রয়েছেন।

ব্যক্তিপূজার অবসান ঘটাতে ইসলাম আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু মুসলিম জগতে, দু:খের সঙ্গে বলতে হয়, এর বিপরীত চর্চার অভাব ঘটেনি। মুসলিম বিশ্বে এমন নেতৃত্বের অভাব নেই, যারা মনে করেন তাদের অনুপস্থিতিতে দেশের বিনাশ ঘটবে।

চার দশক দেশের সর্বময় কর্তৃত্বে আসীন ইয়েমেনের আলি আব্দুল্লাহ সালেহ মনে করেন, শাসন পরিচালনার সামর্থ্য তার দেশের জনগণ এখনো অর্জন করেননি। তার উক্তি ঃ আমি নেমে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু দেশ পরিচালনা করার মতো যোগ্য নেতৃত্ব দেশে আর নেই।

বাশার আসাদ ও তার বাবা প্রায় অর্ধ শতককাল সিরিয়া শাসন করে এসেছেন। জনগণ এদের দৃষ্টিতেও শাসন পরিচালনার অনুপযুক্ত। বাশার দাবি করেন, তিনি ও তার দেশের জনগণ একাত্ম। তাহলে যুদ্ধ বিক্ষোভের কারণ কোথায়? শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে সিরীয় সেনাবাহিনীর গুলীবর্ষণ কেন?

সস্তা শ্লোগান শোনানো হচ্ছে যে, সব গণ্ডগোলের মূলে রয়েছে ষড়যন্ত্রকারী ও বহিরাগতেরা। অর্থাৎ বাথ শাসনে সুখস্বর্গে রয়েছেন সিরিয়ানরা। সিরীয় সরকারের এক মুখপাত্র সিএনএনকে বললেন, ১১ বছর আগে বাবার উত্তরাধিকার হিসাবে ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর থেকে সংস্কার প্রবর্তন করতে চেয়েছেন প্রেসিডেন্ট আসাদ। তাহলে সংস্কার হলো না কোন কারণে? সময় চলে গেছে। এখন কি পশ্চিমা ক্রুসেডারদের অপেক্ষায় রয়েছেন আসাদ? সত্য ভাষণ হচ্ছে, লিবিয়ায়, সিরিয়ায় ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের একনায়কদের হাতে দেশগুলোর জনগণ দশকের পর দশক ধরে একনাগাড়ে

www.pathagar.com

নির্যাতিত হচ্ছেন, নিগৃহীত হচ্ছেন ও নিহত হচ্ছেন। জনগণের অবস্থার উন্নয়ন কামনা করতে গিয়ে হাজার হাজার মানুষ নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারী শাসকদের কারাশিবিরে বছর বছর ধরে বন্দীজীবন কাটাচ্ছেন। প্রতিবাদ নিষিদ্ধ। জীবনযাত্রার আলোকবর্তিকা বা অনুপ্রেরণা হিসেবে ইসলামকে বরণ করে নিয়ে গণমুক্তির ও গণতন্ত্রের আন্দোলনে যারা এগিয়ে এসেছেন, অত্যাচারের স্টীমরোলার তাদের ওপর চালিয়ে দিয়েছে এই নিষ্ঠুর শাসকগোষ্ঠী তথাকথিত গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ধ্বজাধারী পশ্চিমাদের অসৎ মদদে পুষ্ট হয়ে।

মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা মহানায়ক হাসান আল বান্না ও তাঁর উত্তরসূরি সাইয়েদ কুতবকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে। জামাল নাসের, আনোয়ার সাদাত ও হোসনি মোবারক সব একনায়কের শাসন জামানায় আরব জগতে সবচেয়ে জনপ্রিয় ইসলামী আন্দোলনগোষ্ঠী মুসলিম ব্রাদারহুডকে অর্ধশত বছর ধরে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছে। আরব বিশ্বের সর্বত্রই একই কাহিনী। মিসর থেকে শুরু করে ইয়েমেন হয়ে সিরিয়া পর্যন্ত এবং আলজেরিয়া ও তিউনিশিয়া থেকে লিবিয়া পর্যন্ত সর্বত্র শাসকমণ্ডলী কয়েক যুগ ধরে ইসলাম পছন্দদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য উন্মাদের মতো হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে। হামা শহরে ইখওয়ানের এক সমাবেশে ১৯৮২ সালে হামলা চালিয়ে কয়েক হাজার মুসলিমকে হত্যা করে সিরিয়ান সেনাবাহিনী। ১৯৯১-৯২-এর বহুদলীয় গণতান্ত্রিক নির্বাচনে নিরংকুশ বিজয় অর্জনকারী ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্টের সঙ্গে আলজেরিয়ার তথাকথিত প্রগতিপন্থী শাসক বিপ্লবীদের নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা কার না মনে আছে? ক্ষমতাসীনরা ভোটের ফলাফল বাতিল করেই ক্ষান্ত হয়নি, ইসলামপছন্দদের ওপর নারকীয় বর্বর অত্যাচারে তাদের তখন নেমে আসতে দেখা গেছে। গৃহযুদ্ধে প্রায় ৩ লাখ আলজিরীয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যান। ২০০৬ সালে নির্বাচনে বিজয়ী হয় হামাস। বিজয়ের মূল্য পরিশোধ করতে গিয়ে আজ তারা অবরুদ্ধ। জীবন ধারণের জন্য মৌলিক প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবে অমানবীয় জীবনযাপন করতে আজ তারা বাধ্য।

মধ্যপ্রাচ্যের জনগণ স্থানীয় শাসকদের হাতে নিহত হচ্ছেন, নিগৃহীত হচ্ছেন, বন্দী হচ্ছেন এতাদিন শুধুমাত্র পশ্চিমা শক্তিধরদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও মদদ তাদের জন্য বহাল থেকেছিল বলেই। কিন্তু আজ তাদের পতনে বা পতনের জন্য গণআন্দোলনে পশ্চিমাদের সমর্থন ও সহানুভূতির উদগার দর্শনে মুসলিম হিতৈষী মানেই উৎকণ্ঠিত না হয়ে পারেন না।

ইসরাইলের মতে, জাতি বিদ্বেষী শাসকগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে টিকে রয়েছে ও বর্বরতার চূড়ান্ত করে যাচ্ছে কাদের মদদে?"

আরও কিছু মূল্যায়ন

সমাজ-বিশ্লেষক ও রাজনৈতিক সমীক্ষক ফাহমিদ উর রহমান 'মধ্যপ্রাচ্য, বেহাত বিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদ' [আমার দেশ ২৫ ফেব্রুয়ারী/২০১১] শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন ঃ "...... স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার আশংকায় পশ্চিমারা এখন নড়েচড়ে বসেছে। তারা সর্বদাই বিকল্প

www.pathagar.com

একনায়ক প্রস্তুত করে রাখে। অবস্থা বুঝে সামরিক অভ্যুত্থান, গণবিক্ষোভ এমনকি গণতন্ত্রী নির্বাচনের ভেতর দিয়ে তারা তাদের প্রিয় ব্যক্তিকে আবার ক্ষমতায় নিয়ে আসে। এভাবেই সাম্রাজ্যবাদী চক্রের আবর্তন চলতে থাকে। তাদের সহযোগিতা করে সংশ্লিষ্ট দেশের সিভিল ও মিলিটারী এলিটরা।

ঔপনিবেশিকতার সূত্রে মুসলিম দেশগুলোতে যে সেকুলার এলিটদের উত্থান ঘটেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা আজ সাম্রাজ্যবাদের দাসানুদাসে পরিণত হয়েছে। আরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মুসলিম দেশগুলোর সামরিক বাহিনী এখন জনগণের স্বার্থের চেয়ে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষায় বেশীমাত্রায় আগ্রহী।

তিউনিসিয়া ও মিসরের সাম্প্রতিক জন অভ্যুত্থানের ফলে ব্যক্তির পরিবর্তন হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার পরিবতর্ন হয়নি। বেন আলী ও হোসনি মোবারকের বদলে পুরনো ব্যবস্থার সমর্থক লোকজনই ক্ষমতায় বহাল তবিয়তে আছে। মুখোশ পরিবর্তন করে সাম্রাজ্যবাদ এখন চাইছে মধ্যপ্রাচ্যে তার আধিপত্যকে আরও কিছুদিনের জন্য নিরাপদ রাখতে। ....পশ্চিমা সাম্রাজ্রবাদীরা গণতন্ত্র, রফতানীর মতো অনেক কাজ করেছেন। সেই গণতন্ত্রের চেহারা কি, তা এখন আফগানিস্তানের হামিদ কারজাই এবং ইরাকের নূর আল মালিকির দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি। তিউনিসিয়া ও মিসরের ভাগ্য কি এর চেয়ে ব্যতিক্রম হবে?।"

'অন লাইন মিডিয়া উইকিলিকস' ফাঁস করা রিপোর্টের বরাতে জানা গেছে, মিসরের সরকার বিরোধী আন্দোলনকে দৃশ্যপটে আনতে ওঁয়াশিংটনের চৌদ্দ কোটি মার্কিন ডলার খরচ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ তাদের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে বশীভূত স্বৈরশাসকদের লালন ও প্রোটেকশন দেয়। নানা রকম সার্টিফিকেট দিয়ে স্বৈরশাসকদের অহমিকার খোরাক জোগায়। তবে তারা যখন নিজ দেশের জনগণের কাছে দুর্বহ নিপীড়ক শাসকের বদনাম অর্জন করতে থাকেন, তার সাথে সমান্তরালে সাম্রাজ্যবাদীরা আবার গণতন্ত্রের সেবায়েত হিসেবে জনগণের পক্ষে অবস্থান নেয়। দীর্ঘদিনের লালিত স্বৈরশাসকদের অজ্ঞাতেই সাম্রাজ্যবাদ সংগোপনে তার পতনের নীল নকশা রচনা করে। ক্ষমতাচ্যুত পতিত স্বৈরচারকে এরপর সাম্রাজ্যবাদীরা চিনতেও চায় না।

মিসরের খ্যতিমান সাংবাদিক 'আল আহরাম' পত্রিকার সাবেক সম্পাদক এবং রাজনৈতিক ভাষ্যকার মোহাম্মদ হেইকেল অপূর্ণ জন আকাংখার ক্ষোভ ও আকুতি উপলব্ধি করে লিখেছেন ঃ "আম জনতা জীবনের নতুন নিশ্চয়তার সন্ধানে কাতর। কিন্তু তারা যার খোঁজ পেলেন, তা অনেক পুরনো। তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো ইসলাম। আসলে এটা গরীব মানুষের বিদ্রোহের ধর্ম, অবলম্বন। তাদের স্মৃতিতে ফিরে এলো মোহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুস্তাদআফিন- শোষিত দুর্বলদের মধ্য থেকে উঠে আসা লড়াকুদের ভরসায় লড়েছিলেন। মক্কার মুস্কাকবিরিন বা সম্পদশালী ও ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ওরাই ছিলেন তাঁর সহযোগী।

".... ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পর আরব আম জনতার আশা জাগলো একজন নতুন

www.pathagar.com

মহিসহ'র জন্ম হবে। তিনি আরব তথা ইসলামিক বিশ্বে দুর্নীতি, অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে নতুন এক বার্তা বহন করে আনবেন। শুধু তাই নয়, ওয়াশিংটন এবং তেল কোম্পানীগুলোর সেবাদাসদের বিরুদ্ধেও এক নতুন দিশা মিলবে।"

[ইলিউশন অব ট্র্যায়াম্প, অ্যান আরব ভিউ অব দ্য গালফওয়ার : মোহাম্মদ হেইকেল]

লড়াই শেষ হয়ে যায়নি

পাকিস্তানী-বৃটিশ সাংবাদিক রাজনৈতিক ভাষ্যকার এবং এককালের খ্যতিমান বামপন্থী নেতা তারিক আলী 'আরব জাগরণ' সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 'লড়াই একদমই শেষ হয়ে যায়নি'। [বৃটেনের দ্য গার্ডিয়ান থেকে প্রথম আলো, ৩১ মার্চ, ২০১০]

তারিক আলী লিখেছেন ঃ 'ত্রিপলীতে বোমা হামলা কিংবা বেনগাজির বাইরে অবস্থানরত গাদ্দাফী বাহিনীকে ঘায়েল করতে বিমান হামলার কারণ বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা; এমন ভাবা হাস্যকর। ... আশা করা হচ্ছে, আমরা যেন বিশ্বাস করি, ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে যে নেতাদের হাতে রক্তের দাগ লেগে আছে, তারা লিবিয়ার জনগণকে রক্ষা করছেন। বৃটিশ ফরাসী অধোঃপতিত গণমাধ্যম সবকিছু হজম করে ফেলতে পারে। ...

সৌদী সিপাহি বাহরাইনে ঢুকেছে। বাহরাইনের জনগণ স্বৈরশাসনের শিকার। বিপুল পরিমানে গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে। এসব খবর আল জাজিরায় তেমন আসেনি। কেন? বিস্ময় জাগে। মনে হচ্ছে, টিভি ষ্টেশনটি তার অর্থ জোগানদাতাদের কথামতোই চলছে। আর এর ওপর লাগাম পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

এসবই ঘটছে যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয় সমর্থনে। ইয়েমেনের স্বৈরশাসককে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অপছন্দ করে। প্রতিদিন তার বাহিনীর হাতে খুন হচ্ছে মানুষ। কোন অস্ত্র অবরোধ আরোপ করতেও দেখা গেল না, 'উড্ডয়ন নিষিদ্ধ এলাকা'র কথা না হয় বাদই দিলাম। যুক্তরাষ্ট্র বেছে বেছে আইন প্রয়োগের ভার নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার আর এক দৃষ্টান্ত লিবিয়া।

.... পশ্চিমা সে তাদের আশ্রিত রাজ্য তৈরী করতে যাচ্ছে, তার সীমারেখা ঠিক হবে ওয়াশিংটনে। যে সব লিবিয় তাদের মরিয়াপনা থেকে এখন ন্যাটো-র রোমারু বিমানের পক্ষালম্বন করছে, তারাও হয়তো ইরাকে তাদের সহযাত্রীদের মতোই কিছুদিন পর আফসোস করবে।

এসবের ফলে একসময় তৃতীয় দশা ক্রমশঃ বাড়তে থাকা জাতীয়তাবাদী রোষের সূত্রপাত হতে পারে। নিঃসন্দেহে সৌদী আরব ও এখানে তা ফুঁসে উঠেছে। .... নাগরিক অধিকারের রক্ষকরূপে হাজির হয়ে রাজপথে গণজাগরনের ঢেউকে নিজেদের দিকে টেনে নিয়ে যেতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে লিবিয়ায় এই হামলা চালানো। গাদ্দাফীর নির্বুদ্ধিতা সবক্ষেত্রে একাজে পশ্চিমাদের সহায়ক হয়েছে। বাহরাইন, মিসর, তিউনিসিয়া, সৌদী, ইয়েমেনিদের এভাবে বুঝ দেয়া যাবে না। ইউরোপ-আমেরিকায় ও চলতি নতুন অভিযানের সমর্থকের চেয়ে বিরোধিদের সংখ্যাই বেশী। লড়াই তাই একদম শেষ হয়ে যায়নি।"

www.pathagar.com

George Friedman লিখেছেন ঃ ".... Like 1848, this revolution will fail to transform the Muslim world or even Just the Arab world. But it would plunt seeds that will be democratic, but not necessarily Liberal. In other words, the democracies that eventually arise will produce regimes that will take their bearings from their own culture, which mans Islam." [New Age, February 25, 2011/ ww.startfor.com.]

আরব-মধ্যপ্রাচ্য-উত্তর আফ্রিকার মানুষকে সেই ইসলামী সমাজ বিপ্লবের গণতান্ত্রিক সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপাচ্যে গণতন্ত্র চায় না

প্রখ্যাত বামপন্থী মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক, লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক নোয়াম চমস্কি গণতন্ত্রের প্রতি মার্কিন এশটাবলিশমেন্টের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেছেন ঃ "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায়না মধ্যপ্রাচ্যে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক।" গত ২৫ ফেব্রুয়ারী/২০১১ ইরানের স্যাটেলাইট নিউজ চ্যানেল 'প্রেস টিভি' কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নোয়াম চমস্কি বলেছেন ঃ "মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক, যুক্তরাষ্ট্র তা চায় না। কারণ এসব দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন স্বার্থ বিপদাপন্ন হয়ে পড়বে।"

চমস্কির মতে, লিবিয়ার মতো তেল সমৃদ্ধ দেশে মার্কিন সমর্থন একজন স্বৈরশাসক গণতান্ত্রিক সরকারের চেয়ে অনেক ভালোভাবে মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে।' তিনি বলেন, 'ঐতিহাসিকভাবে আরব রাষ্ট্র নায়করা আরব বিশ্বের ওপর খবরদারি' করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছেন। দখলদার ইসরাইলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনীদের স্বাধীকার আন্দোলনের পক্ষ অবলম্বন করতে- এসব স্বৈরশাসকদের দেখা যায়নি।"

নোয়াম চমস্কি মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন গণজাগরণের ব্যাপারে আমেরিকার দ্বিধাগ্রস্ততার অভিযোগ করে বলেছেন ঃ "একদিকে এসব স্বৈরশাসক ওয়াশিংটনের স্বার্থ রক্ষা করে বলে মার্কিন সরকার তাদের বিপক্ষে যেতে পারছে না। অন্যদিকে জনতার প্রবল স্রোতের বিপক্ষেও শক্ত করে কিছু বলতে সাহস করছে না। এ কারণে তারা বাহরাইন উপকূলে নোঙর করা পঞ্চম মার্কিন নৌ বহর মোতায়েন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র যাতে প্রয়োজনমত যে কোন একনায়ককে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে এগুলোকে ব্যবহার করতে পারে।"

এদিকে কোন কোন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের গোপন সমর্থনপুষ্ট হবার কারণে গাদ্দাফীকে তিউনিসিয়া বা মিসরের স্বৈরশাসকদের মতো অতো তাড়াতাড়ি ক্ষমতা হারাতে হবে না। কিন্তু বিশ্লেষকদের অপর একটি অংশ লিবিয়ায় গাদ্দাফী বাহিনীর চালানো হত্যাকান্ডকে বসনিয়া ও কসোভোর মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর সার্ব বাহিনীর 'জাতিগত নির্মূল' অভিযানের সাথে তুলনা করতে চান। এমনকি

www.pathagar.com

তারা গাদ্দাফিকে সার্বনেতা স্লোভোদান মিলোশেভিচের ভাগ্য বরন করতে হতে পারে বলে মন্তব্য করেন।

ইসলামি রাজনীতি ঃ সংস্কার এবং সংযোজন-বিয়োজন

তিউনিসিয়ার একনায়ক প্রেসিডেন্ট জাইন এল আবেদীন বেন আলী ২৩ বছর রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন। এই ২৩ বছর ধরেই তিউনিসিয়ার ইসলামি সংগঠন 'আন নাহ্‌দা' পার্টির শীর্ষ নেতা রশিদ আল ঘানুশী নির্বাসনে কাটিয়েছেন। জাইন এল আবেদীনের নির্যাতন ও প্রতিহিংসা থেকে বেঁচে থাকার জন্য রাশিদ ঘানুশী সহ আরও অনেকে তিউনিসিয় রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবী প্রবাস জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বেন আলীর পতন ও পালিয়ে যাবার পর রশিদ ঘানুশী বৃটেন থেকে তাঁর ২৩ বছরের স্বেচ্ছা নির্বাসন জীবন শেষে দেশে ফিরে এসেছেন। তিউনিসিয়ার পুনর্গঠন ও গণতান্ত্রিক উত্তরণে রশিদ ঘানুশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী এক ব্যক্তিত্ব। কিছুদিন আগে তিনি 'ফিনানসিয়াল টাইমস' পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাৎকার দেন। এতে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক বাস্তবতার সাথে ইসলামী রাজনীতির সমন্বয়, সংযোজন, বিয়োজন সম্পর্কে রশিদ ঘানুশী বুদ্ধিদীপ্ত ও দার্শনিক সূলভ বেশ কিছু কথাবার্তা বলেছেন। এটা বিরাজমান বৈরী পরিস্থিতিতে ইসলামী রাজনীতির মোড় ঘোরানোর লক্ষণ। গণতান্ত্রিক রাজনীতির সংশ্লেষকে ইসলামী ধ্যান-ধারণার সাথে সমন্বিত করে রাজনৈতিক-সামাজিকভাবে সঙ্গী করে নেবার নানা দিক নির্দেশনা আছে রশিদ ঘানুশির সাক্ষাৎকারে।

বেন আলীর পতন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরী করেছে মাত্র। রশিদ ঘানুশী মনে করেন ঃ "বর্তমান সংবিধানকে ভিত্তি করে গণতন্ত্র কায়েমের প্রয়াস ব্যর্থ হবে। কেবল স্রষ্টাই জীবন আনতে পারেন মৃত্যু থেকে। দুর্নীতিবাজ ও একনায়কতত্ত্ববাদ থেকে গণতন্ত্র আনা সম্ভব নয়। কর্তৃত্ববাদের অবসান ঘটিয়ে চালু করা চাই নতুন একটি সিস্টেম। রাষ্ট্রকে পর্যবসিত করা হয়েছে ব্যক্তি বিশেষে। ... গণতান্ত্রিক সিস্টেম গড়ার পয়লা পদক্ষেপ, গণতান্ত্রিক সংবিধান তৈরী করা।"

রশিদ ঘানুশীর মতে ঃ "তিউনিসিয়ার আড়াই লাখ গ্রাজুয়েট গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রকৃত হোতা ও ভিত্তি। ইন্টারনেট ও অন্যান্য মাধ্যমকে সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করে এই ভিত গড়ে তোলা হয়েছে।"

'২০০৫ সালে আমরা সূচনা করেছিলাম, '১৮ অক্টোবর আন্দোলন।' এটি বিভিন্ন দল এবং সিভিল সোসাইটির প্রতিষ্ঠান গুলোকে ঐক্যবদ্ধ করেছে।' এমনকি এতে মানবাধিকার সংগঠন ও কমিউনিস্টরাও যুক্ত ছিলেন। ঘানুশীর বর্ণনায় ঃ 'এটা গঠিত হয়েছে সবার মত প্রকাশ এবং সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতার দাবীতে, সেই সাথে সব দলের অধিকারকে স্বীকার করে নেয়ার জন্য।' রাজনীতির মৌলনীতি প্রসঙ্গে ঘানুশী বলেন ঃ " বহুত্ববাদের সীমা নেই। তবে সন্ত্রাস অবলম্বন করা যাবে না।'

www.pathagar.com

যে কারো দল গঠনের স্বাধীনতা আছে। আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, নারীর অধিকার; কারণ সরকার সবসময়ই মানুষকে আতংকিত রাখার জন্য বলত, ইসলামপন্থীরা নারীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখবে।

"..... বিবেকের স্বাধীনতার ব্যাপারেও দলিল তৈরী হয়েছে। ইসলামপন্থীরা ধর্মত্যাগের শাস্তি দেবে এবং ধর্মবিশ্বাসের কারণে হত্যা করবে এমন অভিযোগের জবাবেই এটা করা হয়েছে। তিউনিসিয়ার জনগনের স্বাধীনতা আছে-যে কোন ধর্মে বিশ্বাসী হওয়ার এবং যে কোন ধর্ম ত্যাগ বা গ্রহণের । কারণ বিশ্বাস মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়।"

নাহদা-পার্টির ওপর সরকারী নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঘানুশী বলেন ঃ 'নাহদা-র বিরুদ্ধে ভয়াবহ অভিযান চালানো হয়েছিল। তিউনিসিয়ার এমন কোন পরিবার নেই, নাহদার সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে যার একজন সদস্যকেও কারারুদ্ধ, চাকুরীচ্যুত বা নির্বাসিত করা হয়নি। .... ৯০ দশকের প্রথম দিকে আমাদের ৩০ হাজার সদস্য ও সদস্যাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ক্রুসেড চালানো হয়েছিল আমাদের বিরুদ্ধে। তাতে শতাধিক ব্যক্তি নিহত কিংবা কারানির্যাতীত হয়েছেন। যখন এসব ঘটছিল, বেন আলী তখন ইউরোপ থেকে সমর্থন পেয়েছেন। .... বেন আলীর নির্যাতন যখন চরমে তখন ও ইউরাপ বেন আলীর বিপুল অর্জন ও সাফল্যের প্রশংসা করছিল। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তখন তাকে মানবাধিকার পদকে ভূষিত করেছিল। বেন আলী তখন খুন করে যাচ্ছিলেন দেশের মানুষ। আর ইউরোপে তাকে অনারারী ডক্টরেট দেওয়া হচ্ছিল।"

.... বেন আলী নিজেই সন্ত্রাসবাদের এক মহা উৎস। 'নাহদা' যখন তিউনিসিয়ায় তৎপর ছিল, দেশে তখন কোনো আল কায়দা এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ছিল না। অথচ এখন শত শত তিউনিসিয় যুবক ইরাক, সোমালিয়া, আফগানিস্তানে লড়ছে। মধ্যপন্থী ইসলামী আন্দোলনের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ তারা পায়নি। তাই ওরা প্রভাবিত হয়েছে আল কায়দার আদর্শে।"

...... আমি এমন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছিলাম, যেখানে কাউকে বাইরে রাখা হবে না। এ কারণে ইসলামপন্থীরা বললেন, আমি একজন সেক্যুলার এবং তাদের আন্দোলনের অংশ। ..... ইখওয়ান (মুসলিম ব্রাদারহুড) গণতান্ত্রিক মূলনীতি গ্রহণ করে নিয়েছে। এরপর থেকে তারা বহুত্ববাদের মূলনীতি এবং নারীর রাজনৈতিক 'অংশগ্রহণের বিষয়ে অনেক লিখিত বক্তব্য দিয়েছে। তাদের সর্বশেষ রাজনৈতিক কর্মসূচীতে এসব আইডিয়া গৃহীত হয়েছে।

অবশ্য নারীকে এবং অমুসলিমকে রাষ্ট্র প্রধান করার বিষয়ে কিছু 'রিজার্ভেশন' রয়েছে। ... আল জাজিরা-র সাথে সাক্ষাতে বলেছি, নাগরিকত্বের মূলনীতিকে রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি হিসেবে আমাদের সাগ্রহে গ্রহণ করা উচিত। নারী ও খৃষ্টানরাও নাগরিক। তাই যে কোন পদের জন্য প্রার্থী হওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে। ..... আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিবর্তন ও রূপান্তর ঘটছে। নাহদা সেই আশির দশকেই এক চুমুকে গণতন্ত্রের

www.pathagar.com

কাপভর্তি পানীয় পান করে ফেলেছে। অন্যান্য ইসলামী সংগঠন তা করছে বার বার চুমুক দিয়ে।"

ইউরোপের ব্যাপারে ঘানুশি স্পষ্ট ও জোরালো এবং গণতান্ত্রিক বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ "ইউরোপের নিজ স্বার্থ উদ্ধারের অধিকার আছে। আমরা এর বিরুদ্ধে নই। তাদের স্বার্থ কোথায় আমরা এটা শেখাতে যাই না। ইইউ'র দেশগুলো নিজেদের স্বার্থে বেন আলীকে সমর্থন দিয়েছিল। তবে এখন তারা উপলব্ধি করছে, অদূরদর্শীতা ও নীতিহীন দৃষ্টিভংগীর ফলেই এমনটা ঘটেছে। আমাদের বিশ্বাস, নেতিবাচকতাকে শ্রদ্ধা করেও স্বার্থ আদায় করা যায়। ....

.... পাশ্চাত্য একনায়কদের সমর্থন জোগায়। কিন্তু তারা জনগণের আস্থা হারালে তাদের পরিত্যাগ করে। একনায়করা নির্বোধ বলে এটা বুঝতে অনেক দেরী করে ফেলে।

একহাজারেরও বেশী নাহদা সদস্য শুধু শরনার্থীই নয়। ইউরোপের নাগরিক হয়েছেন এবং ওইসব দেশে জীবনযাত্রার সব ধরনের কার্যক্রমে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছেন। তাদের অনেকেই ব্যবসায়ী ও মহিলা। তারা ইউরোপের বৃহত্তর ইসলামি কমিউনিটির তৎপরতায় অংশ নিচ্ছেন। তারা উদারতা ও মধ্যপন্থার কর্মসূচী এগিয়ে নিচ্ছেন এবং কাজ করছেন উগ্রপন্থী ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে। আমি মনে করি, আমরা ইউরোপের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াইনি। আমাদেরকে সেখানে একটি ইতিবাচক শক্তি হিসাবে দেখা হয়েছে।"

[নতুন প্রজন্ম রাজনীতির জন্য বেশী যোগ্য ও উপযুক্ত ঃ সাক্ষাৎকার আবদুর রশিদ ঘানুশী, নয়া দিগন্ত, ১৪ ফেব্রুয়ারী/২০১১]

ও-আইসি মহাসচিবের মূল্যায়ন

মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার সাম্প্রতিক গণ-জাগরণ, মুসলিম বিশ্বের প্রতি পশ্চিমাবিশ্বের অনুদার, অসহিষ্ণু ও বৈরী আচরণ এবং মুসলিম বিশ্বের সামনে বিরাজমান চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে তার একটা যৌক্তিক সমাধানের দিক নির্দেশ দিতে চেষ্টা করেছেন ওআইসি'র মহাসচিব ও বিশিষ্ট তুর্কী বুদ্ধিজীবী ইহসানোগলু।

'প্রজেক্ট সিন্ডিকেট' থেকে দৈনিক নয়া দিগন্ত তাঁর নিবন্ধটি গত ২৩ এপ্রিল, ২০১১ প্রকাশ করেছে। 'ইউরোপের মিডিয়া ও রাজনীতিতে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার বাড়ছে' শীর্ষক ঐ নিবন্ধে ইহসানোগলু কয়েক দশকের দীর্ঘ স্বৈরাচারী দুঃশাসন থেকে তিউনিসিয়া ও মিসরের জনগণের বিপ্লবী শক্তির প্রশংসা করে একে 'শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরে নজীর' বলে অভিহিত করেছেন। তাকে ইহসানোগলু ইউরোপ আমেরিকায় বসবাসকারী অধিকতর গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বৈষম্যের শিকার অভিবাসী বা স্থানীয় মূল জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা অনুযায়ী বিপ্লবউত্তর দুটি আরব আফ্রিকা দেশে "পরিবর্তন বা পালাবদলের যে শান্তিপূর্ণ ফলাফল মিলবে, তা নিয়ে আশাবাদের বদলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, "লিবিয়া, বাহরাইন ও ইয়েমেনে পরিস্থিতি চরম

www.pathagar.com

উদ্বেগজনক। এই দেশগুলোতে কার্যকর রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পাওয়া কেবল মুসলিম বিশ্বই নয়, পাশ্চাত্য সহ গোটা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে শুধু চলমান গণআন্দোলনের আলোকে ইসলামী বিশ্ব ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ক নির্ধারণ করা ভুল। এই সম্পর্কের আর একটি বিষয় আছে। তা হলো 'পাশ্চাত্যে ইসলাম।' অর্থাৎ পশ্চিমা সমাজ, বিশেষ করে ইউরোপে বসবাসরত মুসলিমদের সমস্যা।"

ইউরোপের মুসলিমদের সমস্যা আরও ব্যাপক ও জটিল। সম্প্রতি কাউন্সিল অব ইউরোপ এক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এর শিরোনাম হলো "ইসলাম, ইসলামি মতবাদ ও ইসলাম আতংক।" এতে স্বীকার করা হয় যে, ইউরোপে মুসলিমরা নবাগত নন। কয়েকশ বছর আগে থেকেই ইউরোপ মুসলিমদের আবাস ভূমি। ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতায় ইসলামী সভ্যতার অবদানকে স্বীকার করা হয়েছে। ইহসানোগলু'র মতে ঃ 'তা সত্ত্বেও ইউরোপে মুসলিমরা উপলব্ধি করছেন, তারা সামাজিকভাবে বর্জিত, কলংকিত ও বৈষম্যের শিকার। প্রকৃতপক্ষেই তাঁরা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে গতানুগতিকভাবে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন।"

ইউরোপীয় মুসলিমদের যে দুর্ভোগের ও বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছেন ইহসানোগলু সেটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটা ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও সরকার সমূহের একটি পরিকল্পিত সিদ্ধান্তকে ও সাংস্কৃতিক মননকেই প্রতিনিধিত্ব করছে। বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীর মতো অগ্রসর ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক দেশের সরকারগুলো অতি সচেতনভাবেই বহুমাত্রিক সংস্কৃতি বর্জন করে সংস্কৃতির এককেন্দ্রিকতার উপাদানসমূহ মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দেওয়াকে তাদের নিজেদের সুরক্ষার অন্য প্রয়োজন বলে মনে করছেন। তাঁরা খোলাখুলিই বলেছেন, ইউরোপে মুসলিমদের থাকতে হলে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নয়, ইউরোপীয় কালচার মেনেই বাস করতে হবে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই অবদমনমূলক উগ্রতা ইউরোপ-আমেরিকানদের আন্তর্জাতিক নীতিতেও প্রতিফলিত হচ্ছে। কার্যতঃ এভাবে সাম্রাজ্যবাদী পুরনো শক্তিগুলো নবরূপে মুসলিম বিশ্বে ঔপনিবেশিকতাবাদ চাপিয়ে দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া বা উত্তর আফ্রিকার সংকটের মূলে নিহিত রয়েছে ইউরো-মার্কিন অক্ষের 'ভাগ করো-শাসন করো' নীতির কালো থাবা। কারও কারও মতে, ইউরোপের সাধারণ জনগণের গণতান্ত্রিক ঔদার্য সত্ত্বেও রাষ্ট্র-সরকার-গীর্জা মধ্যযুগীয় ক্রুসেডীয় প্রতিহিংসা লালন করে এসেছে। মুসলিম বিশ্বে সংকট সৃষ্টি ও সরাসরি আগ্রাসন মধ্যযুগীয় ক্রুসেডেরই ভিন্ন রূপ মাত্র। দ্বিতীয়তঃ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ইস্যুতে মুসলিম বিশ্বকে পাশ্চাত্য চাপের মধ্যে রাখলেও সত্যিকার গণতন্ত্রের অনুশীলন, যা কিনা, জনমতের ভিত্তিতে জাতীয় স্বকীয়তা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার সুবিধা দেয়, পশ্চিমারা মুসলিম বিশ্বের কোথাও অবাধ গণতন্ত্র চর্চা ও গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেয় না।

www.pathagar.com

আলজেরিয়ায় ইসলামিক স্যালভেশন পার্টিকে পশ্চিমারা গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করতে দেয়নি। মিসরের রাজনীতিকরা নতুন করে অভিযোগ করেছেন যে, ইসরাইল ও আমেরিকা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাথে বাঁধার সৃষ্টি করছে। ইরাক ও আফগানিস্তানে আমেরিকানরা গণতন্ত্রের বদলে বুলেট ও মৃত্যুপরোয়ানা উপহার দিয়েছে। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার পথে আমেরিকা প্রধান অন্তরায়। গোটা আরব ও উপসাগরীয় এলাকায় মার্কিন মদদ ছাড়া কোন স্বৈরাচার ও একনায়কের টিকে থাকা সম্ভব হতো না। এখনও আমেরিকান শিখণ্ডীদের সুরক্ষার জন্যই ওইসব দেশে গণতন্ত্রকে বলি দেওয়া হয়েছে। গণতন্ত্রকে সিঁড়িপথ হিসেবে ব্যবহার করে পাশ্চাত্যে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট-ইভানজেলিকরা ক্ষমতায় যেতে পারলে মুসলিম বিশ্বে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইসলামী শক্তির ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ তারা কেড়ে নিয়েছে। এর অর্থ, তথাকথিত মুসলিম সেক্যুলারদের জন্য গণতন্ত্র সংরক্ষিত। ইসলামী রাজনীতিকদের জন্য গণতন্ত্র নিষিদ্ধ। এই বৈষম্য মুসলিম বিশ্বে সহিংসতার জন্ম দিচ্ছে। এই সহিংসতার মধ্য থেকে জন্ম নেয়া জঙ্গিবাদের সামরিক নাটক তৈরী করে মুসলিম বিশ্বকে কয়েকদশক পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। বুশ সাহেব তার 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' প্রয়োজনে কোন কোন মুসলিম দেশকে "প্রস্তরযুগে" ঠেলে দেবার হুমকি দিয়েছিলেন। আফগানিস্তানে তারা প্রস্তরযুগ ফিরিয়ে এনে এখন পাকিস্তানকে একই অবস্থায় ঠেলে দেয়ার মিশন বাস্তবায়ন করছেন। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন ব্যর্থ হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা মিত্ররা ওই যুদ্ধবিধবস্থ দরিদ্র দেশটিকে পরিত্যাগ করে তালেবানদের উত্থানের সুযোগ দিয়েছে। আবার তালেবান বধের নামেই তারা আফগানিস্তান দখল করে নিয়েছে। লিবিয়া দখল সম্পন্ন হলে আফ্রিকান মানচিত্র রদবদল করার প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে অনেকে আশংকা করছেন। ওআইসি বা আরব লীগ আজ পর্যন্ত স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ। কাশ্মীরীদের স্বাধীনতার আন্দোলন অর্ধশতাব্দীকাল ধরে ঝুলে আছে। ফিলিপাইনের মরো মুসলিমদের স্বাধীনতার কথা বিশ্ববাসী ভুলেই গেছে। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে এশিয়ার পূর্ব তিমুর এবং সুদানে আর একটি স্বাধীন খৃষ্টান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটানো হয়েছে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও খৃষ্টান মিশনারীদের অন্তর্ঘাতী তৎপরতা দৃশ্যমান। তাহলে ইউরোপ-আমেরিকার সাথে মুসলিম বিশ্বের সহাবস্থানের উপায় কি? প্রথমতঃ মুসলিমরা তাদের ধর্মীয় পরিচয়, সংস্কৃতি-জীবনবোধ নিয়ে টিকে থাকার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। একইভাবে ঔপনিবেশিক গোলামী যুগ-পরবর্তী স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বটুকুও মুসলিম বিশ্বের জন্য রক্ষা করা দুরূহ হয়ে উঠেছে। এখানে পুরনো সাম্রাজ্যবাদের নব্য উত্তরসূরীরা হানা দিয়েছে। তৃতীয়তঃ মুসলিম দেশসমূহে ইসলাম ও গণতন্ত্র চর্চা, দুটোকেই পশ্চিমা বিশ্ব বাঁধাগ্রস্ত করে তুলেছে।

www.pathagar.com

ইহসানোগলু লিখেছেন ঃ "আজকাল ইউরোপের মূলধারার মিডিয়া ও রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে ইসলাম আতংকের দরুন ক্রমবর্ধমান বিষোদগার দেখা যাচ্ছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ড্যানিশ পিপলস পার্টি, ডাচ ফ্রিডম পার্টি, ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল ফ্রন্ট, সুইচ পিপলস পার্টি, ইংলিশ ডিফেন্স লীগ, ইটালিয়ান নর্দান লীগ ও অষ্ট্রিয়ান ফ্রিডম পার্টির নাম। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও একই ধরনের দল আছে। অথবা গজিয়ে উঠছে।" [দৈনিক নয়া দিগন্ত]

ইহসানোগলু এর কারণ হিসেবে ইউরোপের অনেকের ইসলামী বিশ্ব ও পাশ্চাত্যের 'অভিন্ন উৎস' সম্পর্কে অজ্ঞতাকে দায়ী করেছেন। তবে যে অজ্ঞতার উৎস, বর্ণবাদ ও ধর্মীয় বৈরীতা তা নিরসন করা কঠিন। ইহসানোগলু বলেছেন ঃ ইসলাম আংকের বিরুদ্ধে বলা মানে এই নয় যে, অন্যান্য ধর্মের প্রতি ঘৃণার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হবে। ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি বিদ্বেষ এবং পাশ্চাত্যে সংস্কৃতি সম্পর্কে ভুল ধারণা মোকাবিলার জন্যও আমরা যারা মুসলিম, তাদের অবশ্যই হাত বাড়াতে হবে। উগ্রপন্থীদের হাতে আমরা কিছুতেই জিম্মি হতে পারি না।'

ওআইসি মহাসচিবের কথার প্রতিধ্বনি করে আমরাও অপর বিশ্বের প্রতি হাত বাড়াতে চাই। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব লুণ্ঠনের মধ্যযুগীয় ক্রুসেডের বিরুদ্ধে টিকে থাকার পথও আমাদের খুঁজতে হবে।

অনুসিদ্ধান্ত

আরব মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার যুব-জনতার এই নব জাগরণের মধ্য দিয়ে এসব অঞ্চলের নবীন জনগণ বা ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে রাজপথে নেমে এসেছেন। তারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংস্কারের তীব্র আকাংকা পোষণ করেন এবং আকাংখা রূপায়নের সংগ্রামী শক্তিও অর্জন করেছেন। গণজাগরণের এই ধারায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছদ্মবেশ ধারণ করে তাদের নীল নকশায় ভিন্ন পোশাকের সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টদের ক্ষমতায় এনে গণতন্ত্রের তৃষ্ণা নিবারণের পুরনো খেলায় মেতেছে। তবে সাম্রাজ্যবাদ তাঁর অবস্থান ও কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে গণজাগরণের ত্রাতার ভূমিকা নিয়ে যতো দ্রুত বাহবা কুড়িয়েছিল, ততো দ্রুততায়ই আরব ও উত্তর আফ্রিকায় তারা বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে বসেছে। বিশেষ করে, মিসরের গণতান্ত্রিক উত্তরণকে ইসরাইলের সাথে মিলে বাধাগ্রস্ত ও বিপথগামী করার প্রক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে মিসরে সতর্ক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর পাশাপাশি মিসরে ইসরাইলের বিরুদ্ধে জনমত ক্রমশঃ বিক্ষুব্ধ ও সংগঠিত হচ্ছে। তৃতীয়তঃ ইঙ্গ-মার্কিন ন্যাটো শক্তির লিবিয়ায় আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের দ্বৈত নীতি প্রদর্শনের দ্বারা গোটা আবর ও আফ্রিকা জুড়ে গণতান্ত্রিক মুসলিম শক্তিকে শংকিত করে তুলেছে। লিবিয়া ও সিরিয়ার ব্যাপারে মার্কিন আগ্রাসী নীতি এবং ইয়েমেন বাহরাইনের ব্যাপারে তাদের তোষণ নীতি গণতন্ত্রের অন্তরালে

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদীদের আসল চেহারা উন্মোচিত করে দিয়েছে। মিসরে বা তিউনিসিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে অর্জন করেছে, লিবিয়া ও সিরিয়ার ব্যাপারে তারা হারাতে বসেছে তার কয়েকগুন বেশি। লিবিয়া বা সিরিয়ার একনায়ক শাসকদের পরিবর্তন ঘটিয়ে জনগণ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্ব তা চায়না। তারা চায় নবদীক্ষিত পশ্চিমা গোলাম। লিবিয়া বা সিরিয়ার ব্যাপারে মিসরে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটার সাথে সাথে হস্তক্ষেপ করা হয়তো পশ্চিমাদের জন্য বুমেরাং হয়েছে, বিশ্ব দানবীয় শক্তির অন্তহীন আগ্রাসনে গাদ্দাফীর পতন ঘটতে পারে, লিবিয়া বিভক্ত হতে পারে। এমনকি লিবিয়ার নেতা গাদ্দাফীর ভাগ্য ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের মতোও হতে পারে। কিন্তু তারপরও মুয়াম্মার গাদ্দাফী হবেন আর এক ওমর মোখতার, যিনি ইটালীয়ান ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে শহীদ হয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রতিরোধে গাদ্দাফীর বীরোচিত প্রতিরোধ আরব বিশ্বের নবজাগ্রত যুব-জনতার সামনে আর এক সত্য উদঘাটন করেছে। স্বৈরাচার পতনের সহায়ক শক্তির হাতে লিবিয়ার অর্থ, তেল ও সার্বভৌমত্ব চলে গেলে গাদ্দাফীর প্রতিরোধ বীরত্বের শিরোপা পাবে। আর এই সাথে মিসর, তিউনিসিয়া, লিবিয়া জুড়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুব-জনতার নয়া আন্দোলন গড়ে উঠবে। আরব বিশ্বে এখনও যে সব শাসকরা সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আনুগত্য ও সহযোগিতা দিয়ে টিকে থাকতে চান এবং সাম্রাজ্যবাদের ক্রুসেডিয় নীল নকশা বাস্তবায়নে সহায়তা করছেন, তারা শেষ পর্যন্ত তেল কিংবা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবেন না। মুসলিম বিশ্বকে নব্য সাম্রাজ্যবাদের শৃংখল পরানোর ষড়যন্ত্রের কাছে নবজাগ্রত যুব-জনতার আকাংখা শেষ পর্যন্ত হার মানবে না। তবে সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম বিশ্বের প্রতিরোধকে গণতান্ত্রিক পথ থেকে সরিয়ে সশস্ত্র জঙ্গিবাদের কাছে ন্যস্ত করতে চায়। এই বিপদ সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বের সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। মুসলিম বিশ্বের দৃশ্যমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিনিময়ে যেন জাতীয় সম্পদ, তার ওপর জাতীয় নিয়ন্ত্রণ ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব আবারও সাম্রাজ্যবাদের কাছে জিম্মি হয়ে না পড়ে, সে হিসাবটাও রাখতে হবে। রোম সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে দুঃস্বপ্ন বহন করে সাবেক ক্রুসেডীয় শক্তি ন্যাটো পরিচয়ে মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে হামলা-আগ্রাসন ও অন্তর্ঘাত চালাচ্ছে, তার সাথে আরব ও উত্তর আফ্রিকার জনগণ কখনও সহমত পোষণ করবে না। মিসর, কাতার সহ কয়েকটি আরব দেশ যেভাবে লিবিয়ায় গাদ্দাফী পতনে মার্কিন নীল নকশায় গোপন অস্ত্র সহায়তা দিয়ে বিদ্রোহীদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করছে, তাদের প্রতি আরব-আফ্রিকী জনগণের ক্রোধ বিস্ফোরিত হতে পারে। তবে সাম্রাজ্যবাদের লীলা খেলায় গোটা আরব ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এর সুফল পেতে দেরী হলেও সেটা একেবারে দুর্নীরিক্ষ্য নয়।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র ঃ

1. "Defense Secretary Gates. Who recently warned against any further protracted US ground war. Said on March 23 that the end of military action in Libya is unknown and could last longer than a few weeks. I think there are any numbers of possible outcomes here and no one is in a position to predict them. Gates told reporters in Egypt." (C-Span, March 24,2011).

২. Interested readers may wish to consult my first exploration. "Googling `Revolution`in North Africa" (Peter Dale Scott).

3. Dan Lieberman "Muammar Al Gaddafi Meets His own Rebels" Counter Currents. org, March 9,2011.

4. Joel Bainerman , Inside the Covert operations of the CIA & Israel`s mossad (New York: S.P.I Books, 1994) 14.

5. Richard keeble "The Secret War Against Libya" MediaLens, 2002.

6. "Petroleum and Empire in North Africa. NATO Invasion of Libya Underway" By keith Harmon Snow, 2 march 2011.

7. Ghali Hassan, "U. S. Love Affair with Murderous Dictators and Hate for Democracy" Axis of Logic, March 17,2005.

8. Center for Defense Information, " In the Spotlight: The Libyan Islamic Fighting Group (L I F G)" January 18, 2005.

9. Qadhafi was concerned about Al Qaeda terrorism in Libya. and in 1996 Libya became the first government to place Osama bin Laden on Interpol's Wanted List (Rohan Gunaratna. Inside Al Qaeda : Global Network of Terror [New York: Columbia UP 2002] 142). Thereafter American and Libyan intelligence collaborated closely for some years against Al Qaeda. Beginning when?

10. In Black "Libya rebels rejects Gaddafi`s Al Qaida spin" Guardian, March 1,2011.

11. Gary Gambill "The Islamic fighting Group (L I F G), Jamestown" Terrorism Monitor, May 5, 2005, citing Al-Hayat (London) 20 October 1995 [communique] "The shayler affair : The spooks, the colonel and the jailed whistle-blower" the observer (London) 9 August 1998, jean-Charles Brisard and .

12. দৈনিক গণশক্তি, কলকাতা, ৫ মার্চ, ২০০১১।

১৩. Holiday, March 6, 2011.

14. Daily Telegraph, London, February 21, 2011.

15. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১১, ৭ ফেব্রুয়ারী ২০১১।

16. দৈনিক সংগ্রাম, ১৪ মার্চ, ২০১১।

17. প্রথম আলো, ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১১, ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১১।

18. The Economist, April 18, 2011.

www.pathagar.com

19. Internet : httpill www. globalzesearch. Ca/index. php? Context=va d aed=23947
20. দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, লন্ডন, ৭ মার্চ ২০১১।
21. লস এঞ্জেলস টাইমস, ২৪ মার্চ ২০১১।
22. ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, ১৭ মাচ ২০১১।
23. Annenberg Digital News, March 17, 2011.
24. New America Media, March 1, 2011.
25. Holy Day, April 15, 2011.
26. Asia Times Online, March 30, 2011.
27. আমার দেশ, ২৭ মার্চ ২০১১।
28. দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট, লন্ডন, ১৯ মার্চ ২০১১।
29. বিডি নিউজ, দৈনিক সংগ্রাম, ২২ মার্চ ২০১১।
30. প্যালেস্টাইন ক্রনিকলস, ৫ এপ্রিল, ২০১১।
31. সাপ্তাহিক বুধবার, ৬ এপ্রিল, ২০১১।
32. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১০ এপ্রিল, ২০১১।

লেখক পরিচিতি : সহকারী সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম (২৪/৫/২০১১ মৃত্যু)

লেখা পরিচিতি : প্রবন্ধটি ২৮ মে, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

ফারাক্কা বাঁধ ও আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প : বাংলাদেশের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব

আখতার হামিদ খান

ভূমিকা :

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। বাংলাদেশ ভারতের একটি বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী রাষ্ট্র। এদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়'। এ মূলনীতির ভিত্তিতে সকলের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সহাবস্থানে বাংলাদেশ আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী। কিন্তু বাংলাদেশের সাথে ভারত কখনই সেরকম আন্তরিক সুপ্রতিবেশী ও বন্ধুসুলভ মনোভাব দেখায়নি। বরং এদেশের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, জাতীয় নিরাপত্তা, রাজনীতি ও অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একের পর এক আগ্রাসন নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে যুদ্ধাস্ত্র ও খুলনার পাটকলগুলোর যন্ত্রাংশ লুণ্ঠন থেকে শুরু করে তিন বিঘা করিডোর, বেরুবাড়ী, দক্ষিণ তালপট্টি দখল, ফারাক্কাবাঁধ নির্মাণ, সীমান্ত সন্ত্রাস, চোরাচালান, নির্বিচারে নিরীহ নাগরিক ও কৃষকদের পাখির মত গুলি করে হত্যা, পুশ ইন, সীমান্ত রেখা অতিক্রম করে বাংলাদেশের ভেতরের নদীর চর ও কৃষি জমি দখল করা, আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে নৌ ও সমুদ্র সীমালঙ্ঘন, দেশের ভেতরে গুপ্তচর নিয়োগ ইত্যাদি গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করে একের পর এক বাংলাদেশকে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলছে।

www.pathagar.com

ভারত বৃহৎ শক্তি। এই শক্তির দাপটে সে তার প্রতিবেশীদের ওপর সব কিছুর কর্তৃত্ব বজায় রাখছে ও শোষণনীতি চালাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে সার্বভৌম দেশ সিকিমকে ষড়যন্ত্র করে দখল করে নেয়। শিক্ষিত ও শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশী দেশ শ্রীলংকায় বহিরাগত তামিলদের দ্বারা দেশটির মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। এবং কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের ন্যায়সঙ্গত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। শক্তির জোরে আমাদের এই স্বাধীন দেশটির ওপর আন্তর্জাতিক সকল আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি অমান্য করে প্রকৃতির অমূল্য দান পানিসম্পদ উজান থেকে একতরফা ভাবে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে।

পাহাড় ও পর্বতশৃঙ্গে সৃষ্ট বরফগলা এই পানিপ্রবাহ অন্যায়ভাবে প্রবাহপথ রোধ করে বাংলাদেশের কোটি কোটি শান্তিপ্রিয় মানুষকে এবং এই মানুষের স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও দিনে দিনে হরণ করে নিচ্ছে। ফারাক্কাসহ বিভিন্ন নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে ইচ্ছেমত পানিপ্রবাহকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের উঁচু ও মরু অঞ্চলে নিয়ে যাচ্ছে এবং সেসব অঞ্চলে ফসল ফলাচ্ছে। কিন্তু আমাদের ভাটির দেশ, যাদের জীবন-জীবিকাসহ সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে নদী ও পানিকে ঘিরে। এই নদী বা পানিসম্পদ কারো ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। কিন্তু ভারত কোন কিছুরই তোয়াক্কা না করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার শোষণ নীতি চালিয়ে যাচ্ছে অব্যাহতভাবে। আর এ সকল ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে শুরু করেছে "আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প"।

ফারাক্কা বাঁধের ইতিকথা :

নদীমাতৃক বাংলাদেশে ছোটবড় সব মিলিয়ে ২৩০টিরও বেশি নদ-নদী রয়েছে। এছাড়াও, ছড়া নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় ইত্যাদি রয়েছে অসংখ্য। এসব নদীর মধ্যে ৫৭টি হল আন্তর্জাতিক যার মধ্যে ৫৪টির মূল উৎস তিব্বত (চীন), নেপাল, ভুটান ও ভারতের পর্বতময় অঞ্চল থেকে। বাকি ৩টি মিয়ানমার থেকে এসেছে। বাংলাদেশের অবস্থান ভাটি অঞ্চলে হওয়ায় উজানে যে কোন ধরনের পানি নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলাদেশের ওপরই বর্তাবে। কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত না করে কোলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধির অজুহাতে ভারত পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার রাজমহল ও ভগবানগোলার মাঝে ফারাক্কা নামক স্থানে এক মরণবাঁধ নির্মাণ করে। এই বাঁধের অবস্থান চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পশ্চিম সীমানা থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার (১১ মাইল) উজানে গঙ্গা নদীর ওপর। ১৯৬১ সালে এর মূল নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয় যা ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়। ১৯৭৫ সালে ২১ এপ্রিল থেকে ২১ মে এই ৪১ দিনের জন্য অস্থায়ী ও পরীক্ষামূলকভাবে ফারাক্কা বাঁধটির সকল ফিডার ক্যানেল চালু করে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নির্দিষ্ট সময়ের পর থেকে এটা ভারত আজ পর্যন্ত বন্ধ করেনি। ১৯৭৭ সালের চুক্তিতে কিছুটা সফলতা থাকলেও ১৯৯৬ সালের ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তির সফলতা কাগজ-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে। কারণ এর গ্যারান্টি ক্লজ বা অঙ্গিকার অনুচ্ছেদ না থাকায় বাস্তবে ফলাফল প্রায় শূন্য। এই "মিছরির ছুরি" মনোভাবের কারণে আমাদের মত একটি ঘনবসতিপূর্ণ কৃষিনির্ভর দেশ আজ বিপন্ন। বিপন্ন দেশটির নদী, মাটি, কৃষি, বনজ সম্পদ, বন্যপ্রাণী, পাখিকুল,

www.pathagar.com

মৎস্যকুল ও পরিবেশ। এই জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ ধ্বংসের প্রধান কারণ ফারাক্কা বাঁধ। এই বাঁধের প্রভাবে দেশের মানচিত্র থেকে প্রায় ২০টি নদী মুছে গেছে এবং প্রায় ১০০টি নদীর মরণদশা (পত্রপত্রিকার তথ্য অনুযায়ী)। আর বাকিগুলোর বুকে চর জেগে ইতোমধ্যে জনবসতি শুরু হয়েছে এবং একই নদী একাধিক ক্ষুদ্র ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। স্রোত না থাকায় এদেশের নদীগুলোর তলদেশে পলি জমে এর উচ্চতা বেড়ে যাওয়া ও নদীসংখ্যা কমে যাওয়ায় প্রতি বছর অত্যধিক নদীভাঙনের কারণে শত শত কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে। এর ওপর আবার ব্যয়বহুল ও দীর্ঘমেয়াদী আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্প!

ভারতের আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্প :

ভারত আগামী ৫০ বছরের ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং এর সকল অববাহিকার নদ-নদীর পানি বাঁধ, জলাধার ও সংযোগ খালের মাধ্যমে প্রত্যাহার করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে দক্ষিণের কাবেরী নদী পর্যন্ত টেনে নেবে এবং রাজস্থানের থর মরুভূমিসহ (Thar Desert) ঐ সকল রাজ্যের খরাপীড়িত অঞ্চলে পানি সরবরাহের জন্য যে মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এটাই River Linking Project বা আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্প। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের এই "রিভার লিংকিং প্রজেক্ট" এ ব্যয় হবে প্রায় ২শ' বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই আন্ত:নদী সংযোগের ক্ষেত্রে দু'বার সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করেছে।

এই প্রকল্পের আওতায় ৩৮টি ছোট-বড় নদীর পানিপ্রবাহকে ৩০টি আন্ত:সংযোগ খালের মাধ্যমে ফারাক্কা বাঁধের ভেতর দিয়ে যুক্ত করা হবে এবং এধরনের সংযোগ ঘটিয়ে ৭৪টি জলাধারে পানি সংরক্ষণ করে পানিপ্রবাহ ভারতের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের খরাপ্রবণ রাজ্যগুলোতে বণ্টন করে কৃষিকাজে ব্যবহার করা হবে। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার পানি প্রবাহ পশ্চিমবঙ্গের উড়িষ্যা হয়ে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র প্রদেশ ও কর্ণাটক দিয়ে তামিলনাড়ু পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে। গঙ্গার পানি পৌছবে উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং গুজরাটে। উভয় দিকের প্রবাহ প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার ঘুরিয়ে আবার একত্রে আনা হবে। তাছাড়া ৯টি বড় এবং ২৪টি ছোট ড্যামের সমন্বয়ে ৪টির মাস্টারপ্লান তৈরি করতে নেপাল ও ভূটানের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। পুরো প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২৮/০৬/০৬ তারিখে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সুবর্ণরেখা-মহানন্দা (৩৭৩ কিলোমিটার), গঙ্গা-দামোদর-সুবর্ণরেখা (৩৯৩ কিলোমিটার), ফারাক্কা-সুন্দরবন (৬০৩ কিলোমিটার) এবং যোগীগোপা-তিস্তা-ফারাক্কা (৪৪০ কিলোমিটার) পর্যন্ত সংযোগের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে (সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ৩০/০৬/০৬)। এই আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্পের সাথে বাংলাদেশের জন্য আর একটি ভয়াবহ ও বিপজ্জনক মরণফাঁদ টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প। এই প্রকল্প এলাকা সিলেট শহর থেকে ২০০ কিলোমিটার (১২৪ মাইল) এবং সিলেটের জকিগঞ্জের অমলসাদ সীমান্ত থেকে ১০০ কিলোমিটার (৬১ মাইল) উজানে মণিপুর রাজ্যের বরাক উপত্যকার চারাচাঁদপুর টুইভাইয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্পে ১৬ লাখ ৮০ হাজার হেক্টর মিটার ধারণক্ষমতাসম্পন্ন একটি জলাধার ও বাঁধ নির্মাণের কাজ

www.pathagar.com

বর্তমানে এগিয়ে চলছে। বিকল্পপথে পানিপ্রবাহের জন্য বৃহদাকার দু'টি স্লুইসগেট এবং দুটি সুড়ঙ্গ জলপ্রবাহের পথ তৈরি করে সেখানে ১৫শ' মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে খরচ হবে ৫,১৬৩ কোটি টাকা। এক তথ্য মতে, এই বাঁধটি হবে ১২৫ফুট উঁচু এবং ৩৯০ মিটার দীর্ঘ। এতে মোট ১৫.৯ হাজার মিলিয়ন কিউসেক মিটার পানি মজুদ করে রাখার ব্যবস্থা থাকবে। পানি মজুদ করে ভারত বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ, নৌচলাচল সুবিধা এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। টিপাইমুখে বাঁধ দেয়ার ফলে বর্ষা মৌসুমে সিলেট অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা দেখা দেবে এবং এর ফলে সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ এলাকার প্রায় ২ লক্ষ একর জমির ফসল ধ্বংস হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকবে। এর সাথে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মনু প্রকল্পের কার্যকারিতা আস্তে আস্তে অচল হয়ে পড়বে। এই বাঁধ শুষ্ক মৌসুমে মেঘনার মূল স্রোতধারা সুরমা ও কুশিয়ারাসহ সংশ্লিষ্ট সকল নদীর পানিপ্রবাহ ভীষণভাবে হ্রাস করবে। ভারত কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উল্লিখিত আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে পুরো সিলেট অঞ্চল (সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলা), ময়মনসিংহ অঞ্চলের পূর্ব, কুমিল্লা অঞ্চলের উত্তর এবং ঢাকার পূর্বাঞ্চল বিরাণ ভূমিতে পরিণত হবে। পরিবেশগত বিরূপ প্রভাবে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, উচ্চাভিলাসী আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে গঙ্গা ও পুরো ব্রহ্মপুত্র, সংকোশ এবং তিস্তাকে সংযোগ করে বিশাল পানিপ্রবাহ থেকে ১৭৩ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি সরিয়ে নিতে সক্ষম হবে। ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রাপ্ত উক্ত পরিমাণ পানি দিয়ে ভারতের ৩৪ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেচ দিয়ে কৃষিকাজ করা সম্ভব হবে এবং আরো ৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে ভূ-গর্ভস্থ পানি পাওয়া সম্ভব হবে। তবে, ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, এই প্রকল্পের ফলে হিমালয় হতে নি:সৃত নদীসমূহের ৩৫ ভাগ পানি বাস্পাকারে আকাশে উড়ে যাবে। ফলে রাশিয়ার একদা উচ্চাভিলাষী প্রকল্প যেমন- বুমেরাং-এ পরিণত হয়েছিল, ভারতও সেরকম ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে বলে উক্ত বিশেষজ্ঞগণ অভিমত পোষণ করেছেন।

ফারাক্কা বাঁধ ও আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্পের ক্ষতিকর প্রভাব ঃ

ফারাক্কা বাঁধের ফলে বাংলাদেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে, এই আন্ত :নদী প্রকল্পের বাস্তবায়নে তাতে শুধু আরেকটা মাত্রা সংযোজনই করবে না বরং অর্থনীতি, রাজনীতি ও পরিবেশের বিপর্যয়ে উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক ভূমিকা রাখবে। আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্পে খোদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তাদের অংশের পরিণতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রবল আপত্তি জানিয়েছে।

ফারাক্কার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখযোগ্য কিছু দিক নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে :

(১) বিস্তৃত অঞ্চল মরুকরণ (২) লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও সুন্দরবন বিনাশ (৩) কৃষিক্ষেত্র ধ্বংস (৪) পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক দূষণ (৫) নদ-নদী বিলুপ্ত (৬) জীববৈচিত্র্য

www.pathagar.com

ধ্বংস ও পরিবেশ ভারসাম্যহীনতা (৭) নদীভাঙন, অকালবন্যা, বেকারত্ব ও উদ্বাস্তু সমস্যা (৮) নদীবন্দরসমূহের সৃষ্ট অচলাবস্থা (৯) প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

(১) **বিস্তৃত অঞ্চল মরুকরণ** : গঙ্গানদীতে ফারাক্কা বাঁধ দেয়ার ফলে ইতোমধ্যে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব মধ্যাঞ্চলের সকল নদ-নদীর পানি আসে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও মেঘনা থেকে। এসব নদী এবং এর উপনদীগুলোর উৎপত্তি প্রতিবেশী দেশ ভারত, নেপাল, তিব্বত (চীন) ও ভুটানে অবস্থিত হিমালয়ের হিমবাহ থেকে। এগুলো আন্তর্জাতিক নদী। এই নদীগুলোর পানি কোন দেশের একক সম্পদ নয় বরং এসব নদীর পানিপ্রবাহ সকল দেশের ঐক্যমতের ভিত্তিতে সুষম বণ্টনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিমালা রয়েছে। কিন্তু ভারত সরকার আন্তর্জাতিক কোন আইনের তোয়াক্কা না করে বরং পেশিশক্তির জোরে গঙ্গা নদীর ওপর ফারাক্কা বাঁধের মত উচ্চাভিলাসী প্রকল্প চালু করে পুরো বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে আজ পানির জন্য হাহাকার অবস্থা বিরাজ করাচ্ছে। এছাড়া দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এখন মরুকরণের মত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। নদীমাতৃক এই দেশটির বেঁচে থাকার অন্যতম উৎস পানি। এই পাঁনিকে ভারত ফারাক্কা বাঁধের পর দ্বিতীয় উচ্চাভিলাসী প্রকল্প হিসেবে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প (River Link Project) হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটি ব্রহ্মপুত্র নদ আসামের জগিঘোপা ব্যারেজ থেকে শুরু করে তিস্তা মহানন্দার পানিকে নিয়ে ফারাক্কা বাঁধের উজানে গঙ্গায় মিলিত হয়ে ভারতের অধিকাংশ রাজ্যের খরাপীড়িত অঞ্চল অতিক্রম করে দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত প্রসারিত হবে। এ প্রকল্পের কাজ ২০১৬ সাল নাগাদ সমাপ্ত হওয়ার কথা। প্রকল্পটির দৈর্ঘ্য ১০ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি। স্থান ভেদে খালের চওড়া প্রায় ১ কিলোমিটার (আধা মাইল) এবং গড় গভীরতা ৩০ ফুট। ৩৮টি নদীকে ৩০টি খালের মাধ্যমে পানি প্রত্যাহার করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে প্রকল্পটিতে। এই মেগাপ্রকল্পে খরচ হবে প্রায় ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশের মোট পানিপ্রবাহের ৬৫ থেকে ৬৭ শতাংশ আসে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে। বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্রের শুকনো মৌসুমে গড় পানিপ্রবাহ ১,২৩,০০০ কিউসেক। এর ভেতর ঐ ক্যানালে নিয়ে যাওয়া হবে ১,০০,০০০ কিউসেক এবং গঙ্গা নদীর শুকনো মৌসুমে পানিপ্রবাহ ৮০ হাজার কিউসেক (কম বেশি হতে পারে) এর মধ্যে ৪৪ হাজার কিউসেক প্রত্যাহার করে ঐসব ক্যানালে প্রবাহিত করা হবে। ফারাক্কা বাঁধের পর দ্বিতীয় বার এই আন্তঃনদী সংযোগ মেগাপ্রকল্প ছাড়াও মেঘনা, সুরমা ও কুশিয়ারার মূল উৎস বরাক নদীর উজানে ভারতের মণিপুর রাজ্যের টিপাঁই গ্রামের চারাচাঁদপুর টুইভায়ের সঙ্গমে টিপাইমুখ নামক স্থানে বরাক নদীতে কৃত্রিম বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু (Hydro Electric Power Plant) করার কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। সে লক্ষ্যে ২০০৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঁধ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। সিলেট জেলার জকিগঞ্জ সীমান্ত থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার উজানে নাগা-মণিপুর রাজ্যে এই বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। এই সব মেগাপ্রকল্প ছাড়া আরও ২২টি নদী শাখা-প্রশাখা

www.pathagar.com

থেকে প্রবাহিত পথে বাঁধ দিয়ে নানারকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। এগুলোর মধ্যে তিস্তা, মহানন্দা, করতোয়া, গুমতি, খোয়াই, মনু, কোদালিয়া, ইসালিছড়া, ফুলছড়ি, আধার মানিকছড়া, ছাগলনাইয়া ছড়া, মহামায়া ছড়া, গইরাছড়া, গজারিয়া ছড়া, কাচুয়া ছড়া, মাবেস নদী ছড়া, মাতাই ছড়া, উজিরপুর ছড়া, চন্দান ছড়া, রাজেশপুর তেতনা ছড়া, কমলা ছড়া ও ভৈরব সঙ্গলী নদী উল্লেখযোগ্য। এ সকল নদীর পানিপ্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করায় ইতোমধ্যে পরিবেশ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সারা বাংলাদেশে ভীষণভাবে প্রভাব পড়েছে। এই সব মরণ ফাঁদ প্রকল্পের ফলে পুরো বাংলাদেশের ভবিষ্যত পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

ভূমিরূপের স্বাভাবিক স্তরের বিপরীতে এ ধরনের কৃত্রিম খাল বাংলাদেশের নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে বিঘ্নিত করছে এবং করবে। এছাড়াও এ ধরনের কর্মসূচী পুরো দেশের জল নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত করবে। এই আন্তঃনদী সংযোগ থেকে ভারত যদি এই বিশাল পানিপ্রবাহ একসাথে প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ভীষণভাবে ব্যাহত হবে এবং শিল্প উৎপাদন, সেচ, শক্তি, বনায়ন, মৎস্যসম্পদ প্রভৃতির ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে তাতে সারা বাংলাদেশের নদী অববাহিকা অঞ্চলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনবে।

পানির দেশের মানুষ পানির জন্য এ রকম হাহাকার! মাছের দেশের মানুষ মাছের জন্য হাহাকার! কোন সচেতন মানুষ এসকল দৃশ্য নিজের চোখে না দেখলে বুঝতেও পারবে না যে, এদেশের নদ-নদী ও পরিবেশ আজ কতটা অসহায়! এই অবস্থার পরেও যদি ভারত আবার আন্তঃনদী সংযোগ কিংবা টিপাইমুখ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে তাহলে পুরো দেশ পোরশা, সাপাহার কিংবা নাচোলের মত অবস্থায় পরিণত হবে। এই নদীনির্ভর ছোট্ট ভূ-খণ্ডটির বিশাল জনগোষ্ঠী ও পরিবেশ আজ এবং আগামীতে বিপন্ন। এই দেশটি মরুভূমিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। ফারাক্কা এবং অন্যান্য বাঁধের প্রভাবে দেশের অধিকাংশ নদ-নদীর নাব্যতা হ্রাস পেয়ে মরতে শুরু করেছে এবং কিছু নদীর চিহ্ন ইতোমধ্যেই মুছে গেছে। বাকিগুলোও মরণপথের যাত্রী।

২। **লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং সুন্দরবন বিনাশ :** সাগরের পানিতে বিভিন্ন কঠিন দ্রব্য দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে বলে স্বচ্ছ পানি অপেক্ষা সমুদ্রের পানির ঘনত্ব অধিক। স্বচ্ছ পানির ঘনত্ব যদি ১.০০ হয় তাহলে সমুদ্রের পানির ঘনত্ব ১.০২৬ থেকে ১.০২৮ এর মত হয়ে থাকে। সাগরের পানির ঘনত্ব, উষ্ণতা এবং লবণাক্ততা এ দু'য়ের ওপর নির্ভর করে থাকে। সাগরের লবণাক্ত পানি ব-দ্বীপ গঠনে সাহায্য করে থাকে। পাহাড়-পর্বত কিংবা উঁচু অঞ্চল থেকে মিঠা পানিপ্রবাহের সাথে বয়ে আনা নদীবাহিত পলি, কাদা, বালি প্রভৃতি পদার্থ জমা হয়ে নদীর কর্দমাক্ত পানি সাগরের লোনাপানির সংস্পর্শে এসে কর্দমগুলো একত্রিত হয়ে দ্রুত সাগরগর্ভে পতিত হয় এবং নদীর মোহনা ক্রমশ ভরাট হতে থাকে। এর ফলে প্রধান প্রধান নদী, পলি, কাদা, বালি প্রভৃতি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়।

www.pathagar.com

শত সহস্র বছর ধরে নদীবাহিত পলল দ্বারা গঠিত বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। এই সক্রিয় ব-দ্বীপের পলল উর্বরের কারণে এদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বরগুনা জেলার আন্দারমাণিক ও বিশখালী নদীর মোহনা থেকে শুরু করে পটুয়াখালী, বরগুনা, বাগেরহাট, খুলনা এবং সাতক্ষীরা জেলার উপকূলীয় অঞ্চলে হাড়িয়াভাঙ্গা (হাড়িভাঙ্গা) ও রায়মঙ্গল নদীর মোহনা পর্যন্ত বাংলাদেশের দক্ষিণের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সুন্দরবন সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমানে নদীসহ সুন্দরবনের সর্বমোট আয়তন প্রায় (বাংলাদেশ অংশে) ৬০৬৩ বর্গকিলোমিটার (২৩৪১ বর্গমাইল)। এর মধ্যে খুলনা অঞ্চলে (খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলা) সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায় ৫,৯৯৮ বর্গকিলোমিটার (২৩১৬ বর্গমাইল) এবং বরগুনা ও পিরোজপুর জেলার প্রায় ৬৫ বর্গকিলোমিটার (২৫ বর্গমাইল) (সূত্রঃ খুলনা জেলা গেজেটিয়ার, পৃ- ৪ এবং বাকেরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার, পৃ- ২৪)। এর মধ্যে পানি (নদী ও খাল) এলাকার আয়তন ১৭০০ বর্গকিলোমিটার (সূত্র Daily Star, ০৪ অগাস্ট ২০০৬)। তবে বরগুনা ও পিরোজপুর জেলার দক্ষিণ উপকূলে যে সামান্য অঞ্চল জুড়ে সুন্দরবন অবস্থিত তা এখন বিলুপ্ত প্রায়।

বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলের বিশাল অঞ্চল জুড়ে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত একটি বিশাল বনভূমি সুন্দরবন। এই বন ঝড়-জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানবসম্পদকে রক্ষা করে, এমনকি সমুদ্রভাঙনও রোধ করে থাকে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে পৃথিবীর একমাত্র বৃহত্তর প্রাকৃতিক এই ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনটি দিন দিন বিনাশ হচ্ছে। উজানে ভারত গঙ্গার ওপর ফারাক্কা বাঁধ ও অন্যান্য নদীতে বাঁধের কারণে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা এই অমূল্য সম্পদ আজ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বনটি বেঁচে থাকার জন্য যে পরিমাণ স্বাদু পানির প্রয়োজন তা পাচ্ছে না। উজান থেকে পানিপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় সাগর থেকে জোয়ারের সময় মাত্রাতিরিক্ত লোনাপানি বিভিন্ন নদী, খাল ও ছড়া দিয়ে বনের ভেতরে প্রবেশ করে। এই লোনাপানি বনের ভেতর প্রবেশের কারণে সুন্দরবনের পানি ও মাটির লবণাক্ততা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষের পাকা ফল মাটিতে পড়ে বীজ থেকে অঙ্কুর এবং অঙ্কুর থেকে চারাবৃক্ষ জন্মাতে পারছে না। কেননা ছোট ছোট চারাগাছের বেঁচে থাকার জন্য যে পরিমাণ স্বাদু পানির প্রয়োজন, তা না পাওয়াতে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পানির অভাবে বৃক্ষশূন্য অঞ্চলে বাষ্পীয়ভবন বেশি হওয়ায় পানির স্তর (Ground level water) অনেক নিচে নেমে যায়। অন্য দিকে এই বৈরী পরিবেশের কারণে বনে পাখিকুলের সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছে। ফলে যে সব পাখি ফল খেয়ে বীজ অন্যত্র নিয়ে ফেলে, সেখানেই স্বাভাবিকভাবে বৃক্ষ জন্মে। আর সেই বীজ বৃক্ষ থেকেই বিশাল বৃক্ষের জন্ম নেয়।

প্রয়োজনীয় পানির অভাবে সুন্দরবনের সুন্দরী বৃক্ষরাজি আজ বিপন্ন। ইতোমধ্যে অত্যধিক লোনাপানি বনে প্রবেশের কারণে সুন্দরী আগা মরা রোগের (টপ ডাইং) বিস্ত

www.pathagar.com

ার অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ অংশের সুন্দরবনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এই রোগ। ১৯৮০ এর দশকের গোড়ার দিকে সর্বপ্রথম সাতক্ষীরা জেলার বৃক্ষ বিনাশকারী এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। দেশের ভেতরে রাজনৈতিক হানাহানি, মানুষের ভেতর দেশপ্রেম ও জন-সচেতনতার অভাবের কারণে দেশের অমূল্য সম্পদ সুন্দরবন আজ ক্রমশ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, সুন্দরবনের প্রায় ৪০ ভাগ সুন্দরী গাছ আগা মরা রোগে আক্রান্ত। ১৯৭০ দশকের চেয়ে বর্তমানে সুন্দরবনে গাছ, মাছ, পশু এবং পাখিকুলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যহারে হ্রাস পেয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, লোনা ও স্বাদুপানির মিশ্রণের অনুপাত সঠিক না থাকা অর্থাৎ সুন্দরবনের মিঠাপানির প্রবাহ কমে যাওয়ার ফলে দেখা দিয়েছে লোনাপানির আধিক্য। ফলে গাছের ডগায় এবং শেকড়ে পোকার আক্রমণ বেড়েছে। বনের ভেতরে নদী ও খালে পলি পড়ে নাব্যতা হ্রাস হেতু পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে মৃত্তিকার বিশেষ উপাদানের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তবে মিঠাপানি প্রবাহ হ্রাস পেয়ে লবণাক্ততা বৃদ্ধিই সুন্দরবন বিনাশের প্রধান কারণ বলে সর্বজনমহলে স্বীকৃত।

সুন্দরবনকে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ হিসেবে ইউনেস্কো (UNESCO) এই গহীন অরণ্যকে ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ৫২২ তম বিশ্ব ঐতিহ্যের (World Heritage Sight) অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে। সুন্দরবনের প্রায় ৭৫ শতাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে সুন্দরী বৃক্ষ। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার ১৫টি থানার ৪,২৬২ বর্গকিলোমিটার জুড়ে সুন্দরবন (ভারতীয় অঞ্চলে) অবস্থিত। সেখানে ভারত সরকার তাদের অংশের সুন্দরবনকে রক্ষা এবং বনে বসবাসকারী সকল জীব-জন্তু, পশুপাখি ও কুমিরসহ বিভিন্ন জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য ১৯৮০ সালে সুন্দরবনের লোথিয়ান দ্বীপে গড়ে তুলেছে কুমির প্রকল্প, সজনেখালিতে ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং পাখিকুলকে রক্ষার জন্য পাখিরালয় প্রভৃতি। সেই সাথে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত আইন বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০০৬ সালে ভারতের একজন প্রথম শ্রেণীর চিত্রতারকাকে অবৈধভাবে মায়াহরিণ হত্যার দায়ে জেলে ঢুকানো হয়েছিল। কিন্তু আমাদের দেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বাস্তব পদক্ষেপ নেই। তাই সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৭৩ সালে প্রথম টাইগার প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল। সেটিও আজ ফাইলবন্দী। প্রয়োজনীয় পরিবেশ না পেয়ে এরা বাঁচার তাকিদে চলে যাচ্ছে ভারতীয় অংশের সুন্দরবনে। তবে বর্তমানে আমাদের দেশে হরিণ ও কুমিরসহ সুন্দরবনের বিভিন্ন রেঞ্জে কিছু প্রজনন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

ভারত কর্তৃক ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের কারণে বাংলাদেশের নদ-নদীতে মিঠাপানির প্রবাহ অত্যধিক হ্রাস পেয়েছে। নাব্যতা হারিয়ে বহু নদীতে পলি পড়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতির দরুণ বিশ্বের অতুলনীয় ও অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের গভীর গহীন অরণ্যটি আজ উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। তাই সুন্দরবনটি বাংলাদেশের হলেও এটির পরিবেশ সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য রক্ষায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সার্বিক সহযোগিতা আবশ্যক।

www.pathagar.com

সুন্দরবনের মাটি ও পানিতে মৃদু লবণাক্ততা উদ্ভিদের জন্য সহায়ক। কিন্তু অতিরিক্ত লবণের কারণে সুন্দরবন ও এর আশপাশের বৃক্ষশোভিত সকল বেষ্টনী বিপন্ন হতে চলেছে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে, মাটিতে ১ হাজার থেকে ২ হাজার মাইক্রোমস ও পানিতে ৩ হাজার মিলিমস পর্যন্ত লবণের পরিমাণ সহনীয়। সুন্দরবনের আশেপাশে ইছামতি, পশুর, রায়মঙ্গল, মালঞ্চ প্রভৃতি নদীতে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে লবণ ছিল ১৯ হাজার মিলিমস। এর পরিমাণ বেড়ে বর্তমানে ৬০ হাজার মিলিমসে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে ১৯৮৬ সালে সুন্দরবনের মাটিতে লবণ ছিল ৩২ হাজার মাইক্রোমস, যা বর্তমানে প্রায় ৪০ হাজার মাইক্রোমস এ দাঁড়িয়েছে। জোয়ারের সময় লোনাপানি সাগর থেকে সুন্দরবনের নদ-নদীতে প্রবেশ করে। নদীতে স্বাদু পানির স্বাভাবিক প্রবাহ থাকলে সেই প্রবাহ সাগরের লোনাপানিকে ঠেলে পুনরায় সাগরে নিয়ে যায়। কিন্তু ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবে বাংলাদেশের নদীগুলোতে শুকনো মৌসুমে পানি শূন্যতা দেখা দিয়েছে, যার অনিবার্য পরিণতি লবণাক্ততা। এই লোনায় আক্রান্ত সুন্দরবনের সবুজ বন ও গাছপালা দিন দিন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সাগরের লোনাপানির আঘাতে বেশ কয়েক প্রজাতির ধান ও মাছ বিলুপ্ত হয়েছে। এমনকি লোনা পানির আধিক্যের কারণে বনের বিভিন্ন এলাকা "ব্লাস্ট ও টপ ডাইং" রোগে আক্রান্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ গাছ মারা গেছে এবং যাচ্ছে।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ভারত কর্তৃক গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা বাঁধ এবং অন্যান্য বাঁধ দেয়ার কারণে দেশের বৃহত্তম বন সুন্দরবন বিনাশের পথে। কারণ ফারাক্কা বাঁধ চালুর আগে এরকম কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। শত শত বছর ধরে সুন্দরবন প্রাকৃতিকভাবে তার আপন সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য এবং এর জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করে চলছিল। কিন্তু ফারাক্কা বাঁধের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে বনটি এখন মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করছে। বনটি বিনাশের সাথে সাথে ধ্বংস হচ্ছে দেশের জীববৈচিত্র্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এর সাথে সংশ্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকার পথ। ফলে মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসবে দেশের পরিবেশ ও অর্থনীতির ওপর। এরপর যদি ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয় তাহলে কী হবে আমাদের দেশের অবস্থা! কী হবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পরিণতি! তাই সময় থাকতে আমাদের শাসকগোষ্ঠী বা সরকার এবং সর্বস্তরের মানুষকে দলমত নির্বিশেষে সচেতন হতে হবে, রক্ষা করতে হবে দেশকে।

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে বরগুনা, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলাসহ দেশের প্রধান বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ফলে বন ও পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাবে প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ নদীগুলোর পানিপ্রবাহ কম থাকায় সাগর ও নদীগুলোতে ক্রমশ চর পড়ছে ফলে পানি ও মাটিতে লবণাক্ততার পরিমাণ অস্বভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৯৭৪ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততার পরিমাণ ছিল ৩৮০ মাইক্রোমস এবং পি পি এম (পার্টস পার মিলিয়ন) ছিল ২৬ মিলিয়ন। বর্তমানে তা তিনগুণ থেকে চারগুণ

www.pathagar.com

বৃদ্ধি পেয়েছে যা একাধারে মানবসম্পদ ও পরিবেশের জন্য বিপজ্জনক। সমুদ্র থেকে যে লবণাক্ত পানি জোয়ারের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রবেশ করে তা অপসারণ করতে নদীর স্বাভাবিক মিঠাপানির প্রবাহ প্রয়োজন। তাতে লবণ পানি আবার সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারে। প্রতি বছর শুষ্ক মৌসুমের শুরুতে দেশের নদ-নদীতে পানিশূন্যতা দেখা দেয়, ফলে লবণাক্ততা বাড়তে থাকে। সে কারণে সাগর উপকূলীয় অঞ্চলে অনেক গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট অনুযায়ী খুলনা অঞ্চলের প্রধান কয়েকটি নদীতে গত কয়েক বছর ধরে লবণাক্ততা বৃদ্ধির হার ৫০ শতাংশেরও বেশি। খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার বেশির ভাগ নদ-নদীতেই এখন স্বাভাবিকের চেয়ে বহুগুণ লবণাক্ততা বিরাজ করছে। খুলনা জেলার রূপসা, শিবসা, কাজীবাছা ও পশুর নদীতে ২০০২ সালের মার্চ মাসের তুলনায় ২০০৩ সালের মার্চে লবণাক্ততা গড়ে প্রায় ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রূপসা নদীতে গত এক বছরে লবণাক্ততা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৮৫ শতাংশ, শিবসায় ৫৬ শতাংশ, কাজীবাছায় ২৫ শতাংশ এবং পশুর নদীতে এ হার ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। **কৃষিক্ষেত্র ধ্বংস হচ্ছে :** বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এদেশের অর্থনীতি। এদেশের প্রায় ৮৫ ভাগ লোক কৃষিজীবী। দেশটিতে রয়েছে বিস্তীর্ণ সমভূমি আর উর্বর নদীপলল সমৃদ্ধ মৃত্তিকা। বৃষ্টিবহুল উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু এদেশকে উৎকৃষ্ট কৃষিভূমিতে পরিণত করেছে। এদেশের মোট ভূমির প্রায় ৭৫ শতাংশ জমি কৃষিযোগ্য এবং চাষাবাদের জন্য নদীনালার পানির ওপর নির্ভরশীল। এ সব জমিতে আউশ, আমন, ইরি ও বোরোসহ বিভিন্ন প্রজাতির ধান উৎপন্ন হয়। এক সময় এদেশের মাটিকে বলা হত 'সোনার চেয়েও খাঁটি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আজ এদেশের মানুষ শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবে চাষাবাদ করতে পারছে না। উত্তরাঞ্চলসহ দেশের অধিকাংশ এলাকায় গভীর অগভীর কোন নলকূপে পানি পাওয়া যাচ্ছে না। পানির স্তর ভয়াবহভাবে নিচে নেমে গেছে। পানির জন্য সর্বত্র হাহাকার। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, গঙ্গা নদীর ওপর ভারত ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে গঙ্গার পানির সিংহভাগ প্রত্যাহার করে ভারতের খরাপীড়িত অঞ্চলে কৃষিকাজ চালাচ্ছে আর আমাদের দেশের কৃষকরা কৃষি জমিতে সেচের জন্য প্রয়োজনীয় পানি পাচ্ছে না। ফলে দেশের অনেক জায়গায় পুড়ে যাচ্ছে ফসল এবং ফসলী জমি। পানির অভাবে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে মাঠ-ঘাট। আষাঢ়-শ্রাবণ এই দু'মাস বর্ষাকাল। অথচ এই বর্ষাকালেও দেশে পর্যাপ্ত পানি নেই। যেখানে দেশের প্রায় ৭০% সেচকার্যে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীল সেখানে পানির অভাবে দেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষকেরা কৃষিজমিতে প্রয়োজনীয় সেচকার্য চালাতে পারছে না। তারপর পানিপ্রবাহের স্বল্পতার কারণে সমুদ্র থেকে জোয়ারের সাথে প্রচুর লবণ পানি প্রবেশ করে জমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করছে। বরেন্দ্র অঞ্চলসহ দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে হাজার হাজার নলকূপে আরও বেশি পাইপ বসিয়ে গভীর নলকূপের সাহায্যে পানি উত্তোলনের

www.pathagar.com

কারণে পানির স্বাভাবিক স্তর অস্বাভাবিক নিচে নেমে গেছে। গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের কারণে ইতোমধ্যেই দেশের অন্যতম বৃহৎ সেচ প্রকল্প তথা গঙ্গা- কপোতাক্ষ প্রকল্প (G.K. Project) এলাকায় পাম্পিং ক্যাপাসিটির প্রায় ৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় মাটির আর্দ্রতা কমে যাওয়ার কারণে ফসল উৎপাদন কমে যাচ্ছে। বৃষ্টির আশায় কৃষকরা বিলম্বে চাষাবাদ শুরু করে, ফলে ফলন কমে যাচ্ছে। কৃষকেরা শাক-সবজি চাষের জন্য বৃষ্টি অথবা হাজামজা পুকুরের পানির ওপর নির্ভর করছে। কিন্তু তা-ও ঠিকমত পাচ্ছে না। বৈরী পরিবেশের কারণে নদীগুলো শুষ্ক মৌসুমে পানিশূন্য থাকা এবং অনাবৃষ্টির কারণে অনেক সময় কষ্টার্জিত ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ফলে চাষী বা সবজি উৎপাদনকারী ভীষণভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।
১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গা চুক্তি হলেও কোন গ্যারান্টি ক্লজ (Garantee Clause) না থাকায় বাংলাদেশের মানুষ আশানুরূপ ফল পায়নি। পাকশির হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচে শুষ্ক মৌসুমে চুক্তির আগের চেয়ে কম পানি পাচ্ছে বাংলাদেশ। ২০০৬ সালের এপ্রিলে দেখা গেছে স্মরণকালের সর্বনিম্ন পানির প্রবাহ। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা গেছে যে, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে প্রতি বছর কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে তিস্তা বাঁধের অবস্থা আরও করুণ। এক হাজার পাঁচশ কোটি টাকা ব্যয়ে তিস্তা ব্যারেজ আজ অচল। কৃষকরা পানি পাচ্ছে না। কারণ জলঢাকা (তিস্তা) নদীতে বাঁধ দিয়ে ভারত পানি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ফলে তিস্তা প্রকল্পের জন্য যে পরিমাণ পানিপ্রবাহ দরকার তা পাচ্ছে না বাংলাদেশ। এ কারণে কৃষকরা প্রকল্প এলাকা চাষাবাদ করতে পারছে না। এত ব্যয় সাপেক্ষে তৈরি প্রকল্পটি আজ হুমকির সম্মুখীন। এর ওপর ভারত যে মেঘাপ্রকল্প তথা "আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প" বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে, সেটি বাস্তবায়িত হলে কৃষক তো পানি পাবেই না বরং পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে। অনাবৃষ্টি ও খরার প্রভাব দেখা দেবে, গাছপালা মরে যাবে, খাল-বিলের পানি শুকিয়ে যাবে। ফলে পরিবেশ দূষিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার রোগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দেবে।
ভারত কর্তৃক গঙ্গা নদীর ওপর ফারাক্কাসহ বিভিন্ন নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে পানি প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করার ফলে দেশের নদ-নদীগুলোর পানি কমে গেছে। এ কারণে দিন দিন নদীগুলোর নাব্যতা হ্রাস পেয়ে নদীর সংখ্যা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে এবং মাছের বিচরণভূমির পরিমাণ সংকুচিত হয়ে পড়ছে। নদীতে প্রয়োজনীয় মিঠাপানির পরিমাণ কমে যাওয়ায় এবং সাগর থেকে লোনাপানির আধিক্য হওয়ায় মিঠাপানির মাছের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।
দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাহিদার তুলনায় মৎস্যসম্পদ বাড়ছে না। ফলে প্রতিনিয়ত বেশি মাছ ধরার কারণে মাছের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া দেশের মৎস্য আইন লংঘন তথা ৯´´ আকারের নিচে ইলিশ মাছ ধরার নিষাধাজ্ঞা মেনে না চলা, জনসচেতনতার অভাব ইত্যাদি নানা কারণে মৎস্যসম্পদ হ্রাস পাচ্ছে। পরিবেশ দূষণের কারণে নদীর পানি বিষাক্ত হওয়াও মৎস্য সম্পদ হ্রাসের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত।
ইলিশ বাংলাদেশের জাতীয় মাছ। বৃষ্টি মৌসুমে ঘরে ঘরে খিচুড়ি ইলিশ এদেশের মানুষের মজাদার খাবারের তালিকায় অন্যতম। এই রূপালী ইলিশের সুনাম

www.pathagar.com

বিশ্বজোড়া। বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই ইলিশ মাছ নেই এবং যে সব দেশে ইলিশ মাছ আছে তাও এত উন্নত জাতের সুস্বাদু রূপালী ইলিশ নয়।

ভারত কর্তৃক বাঁধ নির্মাণ এবং দেশের বিভিন্ন নদীতে ক্রস বাঁধ তৈরিতে পানি প্রবাহ হ্রাস, পলি ভরাট এবং জলজ পরিবেশ দূষণের ফলে ৫৬টি নদীতে ইলিশের বিচরণক্ষেত্রে শতভাগ ধ্বংস ও কয়েকটি নদীর ওপরের অংশ ৯০ শতাংশ বিচরণক্ষেত্র বিলীন হয়েছে। এর প্রধান কারণ অবাধে জাটকা নিধন ও মিঠা পানির চারণভূমি হ্রাস।

৪। বাংলাদেশে আর্সেনিক সৃষ্টি এবং পানিতে মাত্রাভিত্তিক আর্সেনিক দূষণের কারণ : বর্তমান বিশ্বে আর্সেনিক এখন একটি আতংকের নাম। এটি বাংলাদেশে সাম্প্রতিক হলেও সারা বিশ্বে অতি পুরনো। ঈসা (আ)-এর জন্মের পর ৫০০ বছর পূর্বে থেকে চিকিৎসাক্ষেত্রে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ল্যাটিন শব্দ আর্সেনিকাম (Arsenicum) থেকে এর উৎপত্তি। আর্সেনিক একটি স্বতন্ত্র রাসায়নিক মৌল। আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার জন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে ঐ খাদ্যে এবং উক্ত মৃতের শরীরে কী পরিমাণ আর্সেনিক আছে তা নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি ইউরোপের বিজ্ঞানী ডি. মার্শ (D. Marsh) আবিষ্কার করেন।

হিমালয় উত্থানের ফলে পার্বত্য নদীসমূহ বেগবান হয়ে ওঠে এবং আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, হিমবাহ প্রভৃতির সচলতার সাথে নদীসমূহ দিয়ে বয়ে আসতে থাকে শিলাখণ্ডের ভগ্নাংশ যা নদীর নিম্নাংশে সূক্ষ্ম কণার আকারে প্রবাহিত হয়ে অধ:ক্ষেপ হিসেবে নদীর তলদেশে সঞ্চিত হয়। লক্ষ লক্ষ বছরের এই নদীবাহিত কণিকা নদী অববাহিকার সমুদ্রগর্ভে অধ:ক্ষিপ্ত হয়ে গড়ে ওঠে কয়েক কিলোমিটার পুরু ভূমি, যার স্তরে স্তরে জমে আছে কংকর, বালুকণা, কাদা এবং বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ। নদীপ্রবাহ দ্বারা গঠিত ভূমির ওপর সম্প্রতি পলিমাটির যে সর্বশেষ অধ:ক্ষেপ জমেছে ভূ-তত্ত্ববিদগণ তার নাম দিয়েছেন নবীন পলল (Younger Deltaic Deposit)। এই নবীন পললের মধ্যে পানির স্তর দিন দিন নিচে নেমে যাওয়ায় আমাদের এই বাংলাদেশের মাটির নিচের পানিতে বেড়ে যাচ্ছে মরণব্যাধি বিষ আর্সেনিক। বর্তমানে বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণের ফলে সৃষ্ট উদ্বেগের মূল কারণ হল এর ফলে ক্যান্সারসহ মানবদেহে বিভিন্ন ব্যধির বিকাশ ঘটায়। পানিদূষণের মাধ্যমে মানুষের শরীরে আর্সেনিকের প্রবেশ মূলত পরিবেশগত বিপর্যয়েরই পরিণতি এবং বর্তমানে বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি ও প্রতিকার আলোচিত প্রধান বিষয়াবলীর একটি।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণের ঘটনা প্রথম ধরা পড়ে ১৯৭৮ সালে। পরবর্তীতে বিভিন্ন জরিপ ও সমীক্ষায় বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক এলাকা জুড়ে আর্সেনিকের দূষণ ধরা পড়ে এবং আর্সেনিকের অসংখ্য রোগী সনাক্ত করা হয়। ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশের আর্সেনিক দূষণের সমস্যাটি সরকারিভাবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়।

সর্বশেষ তথ্য অনুসারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞগণ একমত হন যে, বাংলাদেশের আর্সেনিক দূষণের ব্যাপকতা নজিরবিহীন। পৃথিবীর আর কোন দেশে

www.pathagar.com

আর্সেনিকের এত ব্যাপক দূষণ আর কখনো দেখা যায়নি। বিভিন্ন তথ্য মতে বর্তমানে ২ থেকে ৫ কোটি মানুষ আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করায় বাংলাদেশের জনসাধারণ আর্সেনিক সংক্রান্ত পানিসমস্যার প্রত্যক্ষ ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে। এছাড়াও ২ লক্ষেরও অধিক মানুষের শরীরে ইতোমধ্যে আর্সেনিক আক্রান্ত রোগের বিভিন্ন উপসর্গ প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দেশের সর্বত্রই পানির চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু পানিপ্রবাহ বাড়েনি। নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত দেশে বৃষ্টিপাত খুবই কম হওয়ায় মানুষ তাদের দৈনন্দিন, কৃষি এবং খাবার পানি প্রয়োজনমত পাচ্ছে না। তাই এই শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজন মেটাতে নলকূপের সাহায্যে পানি উত্তোলন করা হয়। পক্ষান্তরে প্রতিবেশী দেশ ভারত গঙ্গাসহ হিমালয় থেকে উৎপন্ন বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত প্রায় সকল নদীতে বাঁধ দিয়ে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্ত সকল নদীর পানি ৩০টি খালের মাধ্যমে শুকনো মৌসুমে ভারতের উঁচু ও মরু অঞ্চলে নিয়ে যাচ্ছে। ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবে দেশ এখন মারাত্মক বিপর্যয়ের দিকে এগুচ্ছে। এরপর যদি আন্তঃনদী সংযোগ এবং টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় তবে এদেশের পানির স্তর ভীষণভাবে আরও নিচে নেমে যাবে। পানির স্তর অস্বাভাবিকভাবে নিচে নেমে যাওয়ার কারণে ইতোমধ্যেই সারা দেশে ৩ লাখের বেশি নলকূপে পানি উঠছে না। ফলে জনজীবনে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনছে। বর্তমানে শুকনো মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানির গড় স্তর ৩০ থেকে ৪০ ফুটেরও বেশি নিচে নেমে গেছে।

বর্তমানে আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাবে ১৫ থেকে ২০ লাখ নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের মরণথাবায় ৩৬ জন মৃত্যুবরণ করেছে এবং প্রায় ৪০ হাজার জন আক্রান্ত হয়েছে। আর্সেনিকযুক্ত ভূ-গর্ভস্থ পানির জন্য দেশের ৬১ জেলায় প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ হুমকির সম্মুখীন। শুধু তিনটি পার্বত্য জেলায় এখন পর্যন্ত কোন নলকূপের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া যায়নি। এ যাবৎ ২৭০টি উপজেলার ৫০ লাখ ৭০ হাজার নলকূপ পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪ লাখ ৪০ হাজার নলকূপের পানিতে আর্সেনিকযুক্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এমনকি দেশের কোন কোন অঞ্চলে কিছু গভীর নলকূপের পানিও আর্সেনিকযুক্ত। তবে এর পরিমাণ শতকরা ১.৫ ভাগ থেকে ২.০০ ভাগ বলে জানা গেছে। আর্সেনিক হতে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে আর্সেনিকমুক্ত বা নিরাপদ পানি পান ও ব্যবহার করা।

৫। নদ-নদীর বিলুপ্তি : বাংলাদেশে এক সময় নদ-নদী ছড়ানো ছিল জালের মত। এ জন্য এদেশকে বলা হত নদীমাতৃক দেশ। উনিশশ' সত্তরের দশকের গোড়ার দিকেও ছোটবড় সব মিলিয়ে প্রায় একহাজার থেকে পনেরশ' নদী ছিল। কিন্তু ঐ সকল নদীর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ২৪০ থেকে ২৫০ এ। কোন কোন তথ্য মতে, বর্তমানে দেশে নদীর সংখ্যা ২৩০টি। এগুলোর মধ্যে প্রধান নদী পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা ও কর্ণফুলী। প্রধান নদী পাঁচটির মধ্যে পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র এর উৎপত্তি মূল হিমালয়ে এবং এগুলো ভারতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

www.pathagar.com

ব্রহ্মপুত্রের বর্তমানে প্রধান প্রবাহ নব-ব্রহ্মপুত্র বা যমুনা (Young Brahmaputra) যা দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের উত্তরে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। অতঃপর দক্ষিণ-পূর্বে ১০৪ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের কয়েক কিলোমিটার উজানে মেঘনায় মিলিত হয়ে এটি দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। ভারত কর্তৃক ফারাক্কাসহ অন্যান্য নদীর উৎস-মুখে বাঁধ নির্মাণের ফলে ইতোমধ্যেই দেশের নদীগুলোর করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে।

সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য ঘেরা এই গঙ্গা (পদ্মা) এখন মৃত্যুমুখে। গঙ্গা-পদ্মার ক্ষীণদশার জন্য দায়ী ফারাক্কা বাঁধ। আর এর ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে তো বাঁধাগ্রস্ত করছেই সেই সাথে ঘটছে সামাজিক বিপর্যয়। বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ জমি গঙ্গাবিধৌত। শুধু বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের মাছ ধরা ও চাষাবাদসহ জীবন জীবিকা নির্ভর এই নদীর ওপর। অথচ নাব্যতা হারিয়ে পদ্মার বুকে প্রতি বছর চরের সংখ্যা ও এর উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এসব চরে দিন দিন জনবসতি বেড়েই চলেছে। মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারিপুর ও শরিয়তপুরের পদ্মার চরে এ সংখ্যা বেশি। মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার উত্তরে পদ্মায় একাধিক চরের সৃষ্টি হয়েছে। শুধু পদ্মা নয় পুরনো ব্রহ্মপুত্র, যমুনা (নব-ব্রহ্মপুত্র) এবং মেঘনা নদীরও একই অবস্থা। ব্রহ্মপুত্র-যমুনায় দেশের অন্য সকল নদীর চেয়ে বেশি চর সৃষ্টি হয়েছে। এসকল চরে এখন বিশাল জনগোষ্ঠীর বসবাস। এখানে অন্তত ১০টি চরে (২০০৭ এর তথ্য) কমপক্ষে দু'হাজার পরিবারের বসবাস। এদের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলছে। এরকম শুধু ব্রহ্মপুত্র আর যমুনায়ই সীমবদ্ধ নয়, সারা দেশের প্রায় সকল বৃহৎ নদীগুলোর একই করুণ দশা। আর শাখা-প্রশাখাগুলো বছরে প্রায় ৮-৯ মাসই পানিশূন্য বা মৃতাবস্থায় থাকে অতএব অতি সহজেই বোঝা যাচ্ছে দেশের প্রধান নদীগুলোর করুণ পরিণতি। তাহলে এদের শাখা-প্রশাখার অবস্থা কী হতে পারে!

গত তিন দশকে ফারাক্কা বাঁধের কারণে দেশের ২৩০টি নদীর মধ্যে অনন্ত ৮০টি নদী, উপনদী ও শাখানদী পানিশূন্য হয়ে পড়েছে। পানিপ্রবাহ অস্বাভাবিকভাবে হ্রাসের কারণে বৃহৎ নদীসমূহ মৃত নালায় পরিণত হচ্ছে। যেখানে ১৯৭১ সালে দেশে মোট নাব্য নদীপথ ছিল ২৪ হাজার ১শ' ৪০ কিলোমিটার। বর্তমানে সেখানে শুকনো মৌসুমে এর পরিধি এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩ হাজার ৮শ' কিলোমিটার। এ পরিধি দিন দিন আরও কমছে। চুক্তি অনুযায়ী পানি পাচ্ছে না বাংলাদেশ। দু'হাজার কিলোমিটার জুড়ে চর, প্রমত্তা পদ্মা এখন মৃতপ্রায় স্রোতহীন নদী। পাকশি নর্থবেঙ্গল পেপার মিলের পাম্প স্টেশনের নিচে চর জেগে ওঠায় পদ্মা এখন একটি খালে পরিণত হয়েছে। জেগে ওঠা এসব চরে কৃষকেরা আখ, বাদাম ও ধান চাষ করছে।

সুজলা-সুফলা এই দেশে শীতের শুরু থেকে সমগ্র শুকনো মৌসুম জুড়ে নদীতে পানি থাকে না। পানির অভাবে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ইতোমধ্যে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নদীসমূহের নাব্যতা সংকটের কারণে দেশের নৌপথ প্রতিবছর সংকুচিত হচ্ছে। আবহাওয়ার স্বাভাবিকতার পরিবর্তন বাড়ছে। পলি জমে নদীর তলদেশের উচ্চতা বেড়ে যাওয়া এবং নদীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় বর্ষাকালে উত্তরের পাহাড়ি ও

www.pathagar.com

বৃষ্টির পানি সীমিত আয়তনের নদীসমূহ বহন করতে পারছে না। ফলে বন্যার পানি নদী ছেড়ে উপকূলের গ্রাম-গঞ্জে ঢুকে পড়ায় প্রতি বছর বন্যায় দেশের শত শত কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট করে এবং বানভাসী মানুষেরা আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। নদীর সংখ্যা হ্রাস এবং নাব্যতা সংকটের কারণে নদীর অস্বাভাবিক এ আচরণ। এর ফলে প্রতিনিয়ত নদী ভাঙন বেড়ে চলছে ফলে মানুষ হয়ে পড়ছে সহায় সম্বলহীন এবং শহরমুখী।

পানি বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের প্রধান নদীপ্রবাহ তিনটি-পদ্মা (গঙ্গা), ব্রহ্মপুত্র-যমুনা (নব-ব্রহ্মপুত্র) এবং মেঘনা এই তিনটি প্রবাহের সাথে যুক্ত দেশের বড় ও মাঝারি আয়তনের ২৩০টি নদ-নদী। উজান থেকে আসা ঐ তিনটি প্রধান নদীর প্রবাহ কৃত্রিম কারণে বাধাগ্রস্ত হওয়ায় এর সাথে সংযুক্ত অন্য নদ-নদীগুলোর অবস্থাই বদলে গেছে। আর এর সাথে সংযুক্ত হচ্ছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বিস্ফোরণ। দেশের প্রধান নদীগুলোর মধ্যে একটি আদি ব্রহ্মপুত্র এখন মৃতপ্রায়। শুকনো মৌসুমে এর অধিকাংশ এলাকায় পানি থাকে না। এই আদি ব্রহ্মপুত্রের পানি এক সময় বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রায় ৫০ হাজার একর জমির সেচের উৎস ছিল। কিন্তু এখন পানির অভাবে সেই সমস্ত সেচ প্রকল্পগুলো বন্ধ। সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেছে নৌপথের ব্যবসা বাণিজ্য, উপরন্তু ব্রহ্মপুত্রের চরে এখন রবিশস্যের চাষ হচ্ছে।

প্রয়োজনীয় পানিপ্রবাহ না থাকায় উত্তরাঞ্চলের দীর্ঘতম প্রমত্তা নদী তিস্তা ধীরে ধীরে শীর্ণ খালে পরিণত হয়েছে। যেখানে তিস্তা ব্যারেজকে সচল রাখার জন্য দরকার কমপক্ষে ৫ হাজার কিউসেক পানি সেখানে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ২৫০ কিউসেক। ফলে উত্তরাঞ্চলের সেচভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। তিস্তার বিরূপ প্রভাব পড়েছে ঐ অঞ্চলের তিস্তার পুরনো ধারা আত্রাই, করতোয়া ও পুনর্ভবার ওপর। তিস্তার দু'টো শাখা নদী বাঙ্গালী ও ঘাঘট শুকিয়ে মরা নদীতে পরিণত হয়েছে।

এক সময়ের পদ্মার প্রধান শাখানদী প্রমত্তা গড়াই এখন শুকনো মৌসুমে থাকে প্রায় পানি শূন্য। কেবল বর্ষা মৌসুমে কিছুটা প্রবাহমান হয়। রাজবাড়ি জেলার ওপর থেকে বয়ে যাওয়া সেরাজপুর হাওড় ও চন্দনা এখন মৃত নদী। ফরিদপুরের কুমার নদী দিয়ে কয়েক দশক আগেও বড় বড় স্টিমার চলাচল করত। কিন্তু সেদিনের সে কুমার এখন কঙ্কাল নদী। বৃহত্তর কুষ্টিয়া এবং যশোর অঞ্চলের প্রায় সকল নদীর মাতানদী ছিল মাথাভাঙ্গা। এখন শুকনো তো দূরের কথা, বর্ষা মৌসুমেও এককালের প্রমত্তা মাথাভাঙ্গা থাকে নীরব, নিথর ও প্রাণহীন।

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে গড়াই-মধুমতির নিম্ন প্রবাহ বলেশ্বর। এই বলেশ্বর নদীর নামডাক ছিল বিখ্যাত আর অন্য সব নদীর চেয়ে আলাদা। পিরোজপুর ও বাগেরহাট জেলা বিভক্তকারী এই নদীতে প্রচুর ইলিশ ও হাঙ্গর পাওয়া যেত। আর এর স্রোত ছিল তীব্র। কিন্তু ২০০5 এবং ২০০৬ সালে কয়েকবার বরিশাল হয়ে খুলনা ভ্রমণকালে দেখা গেল যে, বলেশ্বর ছিল একেবারে নীরব ও নিস্তব্ধ। বর্ষা মৌসুমে কিছুটা সচল থাকলেও শুকনো মৌসুমে একে দেখলে সকলে ভাববে এটি একটি স্রোতহীন মৃতপ্রায় নদী। সাগরের তুলনামূলকভাবে কাছাকাছি অবস্থান বিধায় নাজিরপুর থেকে জিয়ানগর উপজেলা পর্যন্ত ছোট ছোট নৌযান চলাচল করতে পারে। কিন্তু এই নদীর অবস্থা দিন

www.pathagar.com

দিন আশংকাজনক। পদ্মার আর একটি বৃহত্তর শাখানদী আড়িয়াল খাঁ। এই আড়িয়াল খাঁকে প্রমত্তা পদ্মার এক সময় প্রধান প্রবাহ নির্গমন পথ হিসেবে গণ্য করা হত। সেই আড়িয়াল খাঁ-র উৎসমুখ সদরপুর থেকে মাদারিপুর পর্যন্ত অবস্থা অত্যন্ত করুণ। শিবচরের যেখানে আড়িয়াল খাঁ সেতু নির্মিত হয়েছে সেখানে সেতুর ওপরে দাঁড়ালে এর করুণ দৃশ্য সহজেই দেখা যায়। নদীটি বর্ষা মৌসুমে সচল থাকলেও শুকনো মৌসুমে মৃতপ্রায়। দু'তীরের চরে চাষ হচ্ছে চীনাবাদাম, পেঁয়াজ, রসুন, পাট, গাম, আখ ও শাক-সবজি। সারিবদ্ধভাবে সাদা কাশফুল শোভা পাচ্ছে, এরই কিছু ভাটিতে বিভিন্ন উপজেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত প্রমত্তা পদ্মার শাখা কীর্তিনাশাসহ কয়েকটি নদীর অবস্থাও অত্যন্ত আশংকাজনক। সেখানে সংস্কারের কোন লক্ষণ নেই এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপজ্জনক।

যশোর ও খুলনা অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত কপোতাক্ষ, হরিহর, নবগঙ্গা, চিত্রা, ব্যাঙ, ইছামতি, ভৈরবসহ প্রায় সকল নদী শুকনো ঋতুতে মৃতপ্রায় দশা। এছাড়াও কালনী, ডাকুয়া, বেতনা, বেগবতী, মুক্তেশ্বরী, হাঁসকুড়া, বাগমারা, চিলা, শোলামারি (সৈলমারী), ভদ্রা, ঘুমনা, টেকা, হানু, শ্রী, সোনাই ও কালিন্দী নদীর অবস্থাও একই রকম।

কুমিল্লার দুঃখ নামে পরিচিত ছিল গোমতী নদী। এখন শুকনো মৌসুমে সেটি শুকিয়ে থাকে কিন্তু বর্ষা মৌসুমে কিছুটা প্রাণ ফিরে পায়। তবে স্রোত আর আগের মত নেই। অপরদিকে তিতাস নদীসহ এর সকল শাখানদীর অবস্থা আরও করুণ। পুবের টিলাপাহাড় থেকে নেমে আসা চোয়ানো পানিতে বর্ষা মৌসুমে সচল থাকলেও শুকনো মৌসুমে নদীটি মৃতপ্রায়। কিশোরগঞ্জের নরসুন্দর যৌবন হারিয়ে কঙ্কাল। ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, গাজিপুর, মানিকগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, লৌহজং, বানার, ইছামতি, বুড়িগঙ্গা, বংশী, বালু, কালিগঙ্গা ও তুরাগ নদী প্রভাবশালীদের দখলে চলে যাচ্ছে এবং উত্তর দিকের মরে যাওয়া অংশে এখন চাষাবাদ চলছে। এ সকল নদীর অবস্থা দিন দিন ক্ষীণ ধারায় পরিণত হচ্ছে।

সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা গেছে পঞ্চগড়, নীলফামারী, রংপুর, বগুড়া এবং সিরাজগঞ্জের ওপর দিয়ে প্রবাহিত ছিল প্রমত্তা করতোয়া ও বাঙ্গালী নদী। সেগুলো এখন প্রায় মৃত। পাবনার ইছামতি এবং মানিকগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জের ইছামতি ছাড়াও পাবনার বড়াল এবং এর সমস্ত শাখা নদীগুলো এখন মৃত নদী।

এই সব নদী-নালা দেশের পরিবেশের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নদী-নালার সাথে দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর গভীর সম্পর্ক। সুতরাং নদ-নদী হুমকির সম্মুখীন হলে দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন হতে বাধ্য। ফলে ভারতের নদী প্রকল্পের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাংলাদেশ চরমভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। বাড়বে তাপমাত্রা, মানুষের জীবনযাপন হবে কষ্টসাধ্য, বিপন্ন হবে Ecological Balance বা প্রতিবেশ ভারসাম্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, যেভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে বিশ্বব্যাপী অনাবৃষ্টি এবং বায়ুমন্ডলে উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলে অত্যাধিক বরফগলা ইত্যাদির অস্বাভাবিকতার কারণে পানিই হবে বর্তমান শতাব্দীর প্রধান

www.pathagar.com

সমস্যা। প্রসঙ্গে ২০০৬ সালের ২৩ অকটোবর "দৈনিক ইত্তেফাক" এর প্রধান সম্পাদকীয় ছিল পানি সংকেটে আগামী বিশ্ব। এতে বলা হয়েছে ২০৭০ থেকে ২০৮০ সালে মধ্যে পানিসংকট ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দেখা দিবে। দরিদ্র দেশগুলোর খাদ্যোৎপাদনে অর্জিত বিশাল সাফল্য ম্লান হয়ে যাবে পানীয় ও জলের সংকটের মুখে। কেবল খাদ্য দুর্ভিক্ষ নয়, বরং দরিদ্র বিশ্বের বহু দেশকে তখন মুকাবিলা করতে হবে পানীয় জলের দুর্ভিক্ষের। ২০৫৬ সালে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় অর্ধশত বছর পর পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৯শ' কোটিতে। এক বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা হতে জানা যায়, ভূ-মণ্ডলে বর্তমানে পানির সংস্থান আছে ১ হাজার ৩ শ' লক্ষ কোটি ঘনমিটার। এর মধ্যে পানযোগ্য পানির পরিমাণ মাত্র ২.৫ ভাগ। এর মধ্যে হিমবাহ আকারে আটকে আছে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। বাকি ৯৭.৫ ভাগ পানিই পানের অযোগ্য। জাতিসংঘের এক সমীক্ষায় আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে ২০২৫ সালের মধ্যে চরম পানীয়জলের সংকটে পড়ে গরীব দেশের কোটি কোটি লোকের মৃত্যু হতে পারে। সমীক্ষায় আরো বলা হয়, বিশ্বের ১২০ কোটি মানুষ পানির অভাবে মৃত্যুর ঝুঁকিতে পড়বে এবং ১ কোটি ৫০ লক্ষ শিশু অনিবার্যভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। বিশেষজ্ঞদের আরও আশঙ্কা বর্তমানে বিশ্বে যেভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে তাতে কেবলমাত্র বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের অধিকাংশ জেলা অর্থাৎ ১২ থেকে ১৫ শতাংশ প্লাবিত এবং প্রায় ২০ মিলিয়ন (২ কোটি) মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পড়তে পারে। তাদের ধারণা, তাপমাত্রা যদি বর্তমানের চেয়ে ১ থেকে ২ ডিগ্রী বাড়ে তাহলে বাংলাদেশের শীতকালীন ফসল বিশেষ করে গম ও আলুসহ বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি উৎপাদন হ্রাস পাবে। এছাড়া দেশের জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভূমির ক্ষয় বৃদ্ধি পাবে।

৬। **জীববৈচিত্র্য (Bio-Diversity) ধ্বংস** : বাংলাদেশের নদ-নদীর স্বার্থের সাথে শুধু মানুষই নয় বরং প্রতিবেশী হিসেবে জড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রজাতির পশুপাখি, কীটপতঙ্গ ও পোকা মাকড়ের জীবনধারা। এদেশের নদ-নদীসমূহ মরে গেলে দেশের দুর্লভ প্রাণী ও কীটপতঙ্গসমূহ আমাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাবে। আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মানবসৃষ্ট পরিবেশ পরিপন্থী পদক্ষেপের কারণে পরিবেশ রক্ষাকারী অনেক প্রজাতির অস্তিত্ব অবলুপ্ত হতে চলেছে। অনেক প্রজাতি ইতোমধ্যে এদেশ থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে। প্রকৃতির নৈসর্গিক ভূখণ্ড থেকে বৈচিত্র্যময় প্রাণী ও উদ্ভিদ হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম। ক্রমাগতভাবে পরিবেশ হয়ে উঠছে ভারসাম্যহীন। এদেশের অবস্থান উত্তরে হিমালয় পর্বত, সমতল ও দক্ষিণে সাগরের কারণে অসংখ্যা নদী শিরা-উপশিরার মত বয়ে চলেছে। তাই জীববৈচিত্র্য রক্ষা অতি জরুরী। কারণ ক্রান্তীয় এ ভূখণ্ড অত্যন্ত উর্বর। দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিছু পাহাড় ছাড়া এদেশের বাকি অঞ্চল নবীন পললে গড়া সমতলভূমি। প্রাণী ও উদ্ভিদের যথাযথ বিকাশের জন্য এখানকার আবাহওয়া অত্যন্ত অনুকূল। বিশাল বৈচিত্র্য ধারণ করার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এখানকার জীববৈচিত্র্য দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

এদেশের সর্বত্র জীববৈচিত্রে সমৃদ্ধ। এখানে ১১৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৬৩০ প্রজাতির বেশি পাখি, ১২৫ প্রজাতির সরীসৃপ ইত্যাদি বাস করে। স্বাদু পানিতে বসবাস করে

www.pathagar.com

২৬০ প্রজাতির মাছ আর ৪৭৫ প্রজাতির আছে সামুদ্রিক মাছ। এদেশে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা ৩২৭ এবং ৬৬ প্রজাতির মাছ আর ৪৭৫ প্রজাতির আছে সামুদ্রিক মাছ। এছাড়াও প্রতিবছর শীতের শুরুতে উত্তর সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে অসংখ্য প্রজাতির পাখি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক ও সিলেটের হাকালুকি হাওড়সহ দেশের বিভিন্ন জলাশয়ে আশ্রয় নেয়, কিন্তু শীতের শেষে স্বাভাবিকভাবে নিরাপদে দেশে ফিরে যেতে পারে না। অসাধু শিকারিদের হাত থেকে এরা নির্বিচারে নিধনের শিকার হয়। ফলে ঐ সব অতিথি পাখির আগমন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। প্রয়োজনীয় খাদ্য, বৈরী আবহাওয়া, নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস এবং সর্বোপরি মানুষের নিষ্ঠুর আচরণের ফলে ১৬ হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ ও বন্য পশুপাশির বিলুপ্তি ঘটেছে।

বাংলাদেশ আগে ৫ হাজার প্রজাতি এবং উপপ্রজাতির জীবনকে ধারণ করত। এদের মধ্যে ১৬ প্রজাতিকে ব্যবহার করা হত খাদ্য হিসেবে। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত জীববৈচিত্র্য রক্ষার অঙ্গীকার Convention এবং Convention to Combat Desertification, ইত্যাদি ফোরামে বাংলাদেশ বিশেষ করে জীববৈচিত্র্য রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার করেছে তা হল, Convention on Biological Diversity (CBD)। ১৯৯২ সালের জুন মাসে ব্রাজিলের রিওডিতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কনভেনশনে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছিল, এবং তখন থেকে ৫ জুন দিনটিকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৯৪ সালের ৩ মে বাংলাদেশ সেটি গ্রহণ করে। সেখানে বন ও পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্য রক্ষার ওপর জোর দেয়া হয়। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ National Conservation Strategy (NCS) এবং National Environment Management Action Plan (NEMAP) গঠন করেছে এবং বাংলাদেশের প্রাণীতালিকা প্রণীত হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণার্থে তিন ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকেন্দ্র, ন্যাশনাল পার্ক এবং মৎস্য সংরক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। পরিবেশগতভাবে জীববৈচিত্র্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও মুমূর্ষ এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে Ecologically Critical Area (ECA) হিসেবে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ১৯৭৩ এর আওতায় ৮টি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র, ৫টি ন্যাশনাল পার্ক প্রভৃতি নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশে পরিবেশ আইন ১৯৯৫ এর আওতায় ৭টি এলাকাকে Ecologically Critical Area (ECA) হিসেবে ঘোষিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য আইন ১৯৫০ অনুযায়ী, ঋতুভেদে মাছ ও এদের আবাস সংরক্ষণের জন্য মৎস্য সংরক্ষণ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (BRRI) ধানের প্রজাতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে 'জিন ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য অনেকগুলো প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের মধ্যে ১৩টি এলাকায় জীববৈচিত্র্য শুমারি, বনজসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (Forest Resource Management Project (FRMP), Management of Aquatic Ecosystem Through Community Husbandry

www.pathagar.com

(MACH), হাওড় ও প্লাবিত অঞ্চল, ঔষধি বৃক্ষ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, Integrated Coastal Zone Management (ICZM) এবং কক্সবাজার উপকূলীয় ও হাকালুকি হাওড় এলাকার জলাভূমির জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

বিশ্বের যেকোন দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় সেদেশের মোট আয়তনের কমপক্ষে ২৫% বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কারণ পরিবেশের ভারসাম্য টিকিয়ে রাখতে বনভূমিগুলো বৈচিত্র্যময় প্রাণী ও উদ্ভিদের বেঁচে থাকার অনুকূল শর্তগুলো পূরণ করে। কিন্তু এত আইন থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মোট আয়তনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ ১০ শতাংশেরও কম (FAO এর তথ্যানুসারে) এবং এ আয়তন প্রতিনিয়ত আরও কমছে। অবশ্য সরকারিভাবে এর পরিধি ১৭% এর বেশী দেখানো হয়েছে। কিন্তু ঐ তথ্য সত্য নয়। তবে প্রয়োজনীয় পরিবেশের অভাবে ইতোমধ্যে অনেক জীববৈচিত্র্য বিলীন হয়েছে এবং অনেক বিপন্নের পথে। এক সমীক্ষায় দেখাগেছে বছরে সমগ্র বনাঞ্চলের ৩.৩ শতাংশ বন উজাড় হচ্ছে।

প্রতিবেশী দেশ ভারত বাহুবলে গঙ্গাসহ বিভিন্ন নদীতে বাঁধ দিয়ে নদীর স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছে এবং নতুন করে শুরু করেছে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প। এর ফলে আমাদের দেশের স্বাভাবিক পরিবেশ ধ্বংস এবং জীববৈচিত্র্য আরও বিপন্ন হবে। তাই ভারতের আন্ত:নদী প্রকল্পের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। বিষয়টি বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন করতে হবে। কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়াতে হবে, আধুনিক গণমাধ্যম ও ই-মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে, সরকারের পাশাপাশি প্রবাসীদের বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে এবং দেশের ভেতরের বিশাল জনগোষ্ঠিকে সংশ্লিষ্ট করে জনমত গঠন করতে হবে, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন জোরদার করতে হবে। এদেশকে রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে আমাদের জীবনকে রক্ষা করতে হবে। সেই সাথে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা আমাদের মূল দায়িত্ব। এজন্য সকলকে সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিবেশ-বান্ধব নীতি প্রণয়নে, পরিবেশ বিষয় নিবিড় অনুসন্ধানের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্যের আন্তঃসম্পর্ক বা আন্ত ঃনির্ভরশীলতা আবিষ্কার জরুরি। বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য সকলকে আর বেশি সচেতন হওয়া উচিত।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বন ও বৃক্ষ যেমন অপরিহার্য, তেমনি বনের স্বাভাবিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন বনচর পশুপাখীর। বাংলাদেশের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কমপক্ষে ১৮৫টি আইন রয়েছে। এছাড়াও পরিবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত ২২টি আন্তর্জাতিক চুক্তি বাংলাদেশ অনুমোদন করেছে। উপরন্তু বাংলাদেশ আরও ২৬টি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। দেশে এখন ১৪টি অভয়ারণ্য ও ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে। কিন্তু কোন বিধিবিধান ও আইনের তোয়াক্কা না করে দেশের সংরক্ষিত এলাকাতেও পশুপাখির জন্য নির্ধারিত অভয়ারণ্যে চলছে বন উজাড় ও পশুপাখি নিধনের ঘটনা।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রধান কারণ ফারাক্কা বাঁধসহ অন্যান্য বাঁধ ও দেশের নদ-নদী, খাল-বিলের নাব্যতা হ্রাস এবং

www.pathagar.com

ভূমি দস্যুদের দখল, গাছপালা কেটে লাগামহীনভাবে বনভূমি ধ্বংস, এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উঁচু ভূমি কিংবা প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ পাহাড় কেটে নিচুভূমি ভরাট করে আবাসভূমি তৈরি এবং অপরিকল্পিতভাবে নগর ও শিল্পায়ন ইত্যাদি।

৭। দেশের প্রায় সকল নদীবন্দরসমূহের সৃষ্ট অচলাবস্থা : ভারত কর্তৃক ফারাক্কা বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীসমূহের পানিপ্রবাহ ভীষণভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফলে নদীগুলোর নাব্যতার অভাবে ঢাকা, খুলনা, নারায়গঞ্জ, ভৈরববাজার, চাঁদপুর, বাঘাবাড়ি, চিলমারী, গোয়ালন্দ, বরিশাল, ঝালকাঠি, হুলারহাট, কাউখালী, স্বরূপকাঠী (নেছারাবাদ), ভাণ্ডারিয়াসহ বিভিন্ন নদীবন্দরে জাহাজ বা বড় নৌ-যান আগের ন্যায় ভিড়তে পারে না। নদীমাতৃক এদেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পণ্যদ্রব্য আনা-নেয়ার জন্য সকল নৌ-বন্দরমুখী কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ছে ফলে এই নদীনির্ভর দেশটি অর্থনৈতিকভাবে নানামুখী ক্ষতির শিকার হচ্ছে।

ইতোমধ্যে ফারাক্কার ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি ও চিলমারী নৌবন্দরে বছরের প্রায় সময়ই তেলের ট্যাংকারসহ পণ্যবাহী বিভিন্ন জাহাজ নোঙর করতে পারছে না। বৃটিশ আমলের শেষদিকেও ধানসিঁড়ি নদীর সাথে পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলার চিরপাড়া নদী দিয়ে বিশাল আকারের লঞ্চ-স্টীমার ঢাকা বরিশাল ও খুলনা হয়ে কোলকাতাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলাচল করত। ১৯৮০ দশকের গোড়ার দিকে চর পড়ে চিরপাড়া চ্যানেলটির মুখ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে বর্তমানে উক্ত নৌযানসমূহ রুট পরিবর্তন করে সুন্দরবন হয়ে খুলনা যেতে হচ্ছে। অতএব, সারাদেশের নৌ-বন্দরসমূহের অচলাবস্থার জন্য দায়ী ভারতের ফারাক্কাসহ অন্য সকল বাঁধ। তাই আজ আমাদের উচিত হবে দেশের মাটি, মানুষ ও পরিবেশকে রক্ষার জন্য সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৮। নদীভাঙন, অকালবন্যা ও উদ্বাস্তু সমস্যা : নদীমাতৃক এই বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা নদীনালার ওপর নির্ভরশীল। অতএব নদীর অস্তিত্ব বিপন্ন হলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পেশার মানুষ বেকার হয়ে পড়বে। ভারত কর্তৃক ফারাক্কাসহ অসংখ্য বাঁধ নির্মাণ পরবর্তী বাংলাদেশের নদ-নদীর বিপন্নদশার কারণে লক্ষ লক্ষ জেলে পেশার মানুষ বেকার হয়ে যাচ্ছে। নদীসমূহের নাব্যতা হ্রাসের কারণে সাগরের লোনাপানি উপকূলীয় অঞ্চলে প্রবেশের ফলে বনভূমি তথা সুন্দরবনের সুন্দরীবৃক্ষসহ সকল বৃক্ষ বিনাশ ও সংকুচিত হচ্ছে। ফলে এর সাথে নির্ভরশীল বাওয়ালী, কাঠুরে, জেলে ও মধু আহরণকারী (মৌয়ালী) লোকজনও দিনদিন কর্মহীন হয়ে পড়ছে।

পানি সংকটের কারণে নদীসমূহের নাব্যতা হ্রাস পেয়ে তলদেশের উচ্চতা বেড়ে দেশের প্রধান প্রধান নদীসমূহের মাঝে চর সৃষ্টি হয়। অতঃপর এই সকল চর বা দ্বীপে জনবসতি শুরু হয়, সেখানে ক্রমান্বয়ে লোকজন ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট তৈরি এবং কৃষিকাজ করতে শুরু করে। কিন্তু বর্ষা মৌসুমে ভারত পাহাড় পর্বতের অতিরিক্ত পানি ধারণে অক্ষম হয়ে পড়ায় ফারাক্কাসহ যখন সকল বাঁধ খুলে দেয় তখন প্রয়োজনের অধিক পানি বাংলাদেশ ভাটির অঞ্চল বলে এদেশের ওপর সরাসরি আঘাত হানে।

www.pathagar.com

ফলে জনবসতি, রাস্তাঘাট ও ব্যাপক শস্যহানি ঘটে এবং মারাত্মক নদীভাঙনের সৃষ্টি হয়। গত কয়েক দশক ধরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক নদীভাঙন দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি এক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, বাংলাদেশের ভূ-ভাগ ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে নতুন নতুন চর সৃষ্টি হচ্ছে। এসব চরের আয়তন দেশের দক্ষিণ দিক বরাবর বেড়েই চলছে। আগামী ৫০ থেকে ১০০ বছরের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের উত্তর প্রান্তে অগভীর উপকূল অঞ্চলে চলমান ব-দ্বীপ গঠন প্রক্রিয়ায় আরও কমপক্ষে ২৫ থেকে ৩০ হাজার বর্গকিলোমিটার নতুন ভূমি লাভ করবে। অন্যদিকে কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, জামালপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জের লৌহজং, শরিয়তপুর, সিলেট, পাবনা, নেত্রকোণা, খুলনা, রংপুর, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, রাজবাড়ি, মাদারীপুর, শেরপুর, বরগুনা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশালসহ অনেক বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, পদ্মা, মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ ও সন্ধ্যা নদীর বিস্তীর্ণ এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় প্রতিবছর। ফলে এসব ভাঙনকবলিত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা সহায়-সম্বল হারিয়ে শহর কিংবা রেললাইনের পাশে আশ্রয় নেয়। তারা উদ্বাস্তু হয়ে মানবেতর অবস্থায় জীবন কাটায়। কাজের সন্ধানে শহরগুলোতে ভিড় জমানোর ফলে তাদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে।

৯। প্রাকৃতিক দুর্যোগ : ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল। অতীতকাল থেকে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে এদেশ। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা-খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, টর্নেডো, নদীভাঙন, শস্যহানি ইত্যাদির কোন না কোনটি এদেশের প্রায় নিত্যদিনের সঙ্গী। এদের মধ্যে ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালের বন্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসকল বন্যায় ঢাকাসহ প্রায় সারাদেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালের বন্যায় সারাদেশে প্রচুর শস্যহানি ঘটে আর যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

দেশের ঝড়, জলোচ্ছ্বাস আর সাইক্লোনের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্বে ঐতিহাসিকভাবে যে সালগুলোর সম্পৃতা উল্লেখ্য করার মত সেগুলো হচ্ছে ১৫৮৪, ১৮২২, ১৮২৫, ১৮৫৫, ১৮৬৭, ১৮৬৯, ১৮৭০, ১৮৬৫ আর ১৯৭০। তবে এসব বছরের মধ্যে ১৯৭০ এর ১২ নভেম্বরের ভয়াল প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে উপকূলীয় ১৭টি জেলার প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের প্রাণহাটি ঘটে। পক্ষান্তরে সঠিক পূর্বাভাসের অভাবে ১৯৯১ সালের ঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসে মারা যায় প্রায় দেড় লাখ লোক এবং সম্পদ ধ্বংস হয় কোটি কোটি টাকার। এই সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে শত শত বছর ধরে এদেশের বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জেলাসমূহের ওপর দিয়ে যে প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলা বয়ে গেছে তাতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। গত শতকের শেষ তিন দশকে অর্থাৎ ১৯৬৫, ১৯৭০ ও ১৯৯১ সালে সংঘটিত স্মরণকালের ভয়াবহ ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে।

www.pathagar.com

অগণিতসংখ্যক গবাদিপশু ধ্বংস হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে মৎস্যসম্পদ, হাঁস-মুরগি আর পশুপাখি। উপড়ে পড়েছে বড় বড় গাছপালা। ১৯৬৫ সালের মে মাসের ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের আঘাতে বৃহত্তর বাকেরগঞ্জ (বরিশাল), ঢাকা, নোয়াখালী, খুলনা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের ওপর দিয়ে ১৬৫ কিলোমিটার বেগে ঝড় বয়ে গেছে। ঐ সময় ১১ থেকে ১২ ফুট উচ্চতার জ্বলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে। এর ফলে ১৬,৪৫৬ জনের প্রাণহানি ঘটে শুধু বরিশাল অঞ্চলেই। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস দু'বার আঘাত হানে। ফলে গাছপালা উপড়ে পড়ে এবং ক্ষেতের পাকা ধান পানিতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড় দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। তবে ১৯৯১ সালের এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড়ের পর থেকে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বেশ কিছু ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র (Cyclone Shelter) স্থাপন করা হয়েছিল। সেখানে ঝড়ের সময় বা যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে এই আশ্রয়কেন্দ্রে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা আশ্রয় নিতে পারে অনায়াসে। কিন্তু সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলো কার্যত অচল। সেগুলোর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং আরও নতুন সাইক্লোন শেল্টার তৈরি করা অতি জরুরি।

ভূমিকম্প ১৭৬২, ১৭৭৫, ১৮১২, ১৮৭৬, ১৮৯৭ এবং ১৯৭৮ সালে সংঘটিত সব ভূমিকম্প ছিল ভয়াবহ। ১৭৬২ সালের ভূমিকম্পে মেঘনার পূর্ব তীর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। ব্রহ্মপুত্রসহ ঢাকা অঞ্চলের নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয় প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়। ১৮৯৭ সালের ভূ-কম্পের ফলে ঘর-বাড়ি ও দালান কোঠাসহ অনেক জনপদ ধ্বংস হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এসকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও দেশের নদীপথে নাব্যতা ভীষণভাবে হ্রাস এবং সংকুচিত হওয়ার ফলে প্রায় প্রতিবছর সারাদেশ বন্যাকবলিত হয়ে পড়ে। এতে রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্থ হয়, জমির ফসল ও বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি এবং গো-খাদ্য, মানুষের ঘরবাড়ীসহ হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহারের আইনগত ভিত্তি ঃ

আন্তর্জাতিক নদী আইন অনুযায়ী একটি নদী যদি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তবে ঐ নদীর পানি সম্পদের ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে এমনভাবে আন্তর্জাতিক নদীকে ব্যবহার করবে তা যেন অপরাপর রাষ্ট্রসমূহের সহজাত অধিকার ও স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হয়। যে দেশের ওপর দিয়ে নদী প্রবাহিত, নদীর সে অংশের পানি সে দেশের পক্ষে ইচ্ছেমত ব্যবহারের একচেটিয়া অধিকার আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত নয়। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ওপেনহেইম বলেন "কোন রাষ্ট্রকে নিজ ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক অবস্থা এমন করে পরিবর্তন করতে দেয়া যাবে না যার ফলে প্রতিবেশি কোন রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের প্রকৃত অবস্থায় কোন অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে।" আন্তর্জাতিক নদীর ব্যবহার সংক্রান্ত অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন আন্তর্জাতিক আইন ইনস্টিটিউটও।

www.pathagar.com

পৃথিবীতে প্রায় ২১৪টি আন্তর্জাতিক নদী রয়েছে। এই নদীসমূহ একাধিক স্বাধীন দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত। এসব নদীর মধ্যে আমাজান, জায়ার, জাম্বেসী, দানিয়ুব, নাইজার, নীল, রাইন, মেকং, লেকচাঁদ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে কোন আন্তর্জাতিক নদীর ওপর তীরবর্তী রাষ্ট্রের অধিকার সমঅংশীদারিত্বের নীতির ওপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক নদী সম্পদের তীরবর্তী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সুষম বন্টনের নীতি আজ স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক নদীর ব্যবহার সম্পর্কে ১৮১৫ সালে ভিয়েনা সম্মেলনে এবং ১৯২১ সালে আন্তর্জাতিক দানিয়ুব নদী কমিশন কর্তৃক প্রণীত আইনে এই নীতির উল্লেখ রয়েছে।

১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক আইন সমিতির হেলসিংকি সম্মেলনে গৃহীত নীতিমালার ১৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রতিটি রাষ্ট্র তার সীমানায় আন্তর্জাতিক পানি সম্পদের ব্যবহার অধিকার ভোগ করবে যুক্তি ও ন্যায়ের ভিত্তিতে। পানি সম্পদের সুষম বন্টনের নীতি ১৯৭২ সালে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত মানব পরিবেশ সংক্রান্ত জাতিসংঘের কনফারেন্স ঘোষণাপত্রের ৫১ অনুচ্ছেদে স্থান লাভ করে।

১৯৪৯ সালের বিখ্যাত করফু নদী (Corfu Channel) মামলায় (ব্রিটেন বনাম আলবেনিয়া) আদালত তার সিদ্ধান্তে উল্লেখ করে যে, একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বহিঃপ্রকাশ কখনোই এমনভাবে হতে পারে না যার বিরূপ প্রভাব সেই রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে অনুভূত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশী আইন বিশেষজ্ঞগণ স্পষ্টতই ব্যাখ্যা প্রদান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, বিশ্বে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক মামলা ও চুক্তি রয়েছে, যেখানে পানির হিস্যার প্রশ্নে ভাটির দেশের দাবিকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং পানির একচেটিয়া ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৫৭ সালে লেক লেনঁও (Lake Lanoux) মামলার (স্পেন বনাম ফ্রান্স) রায়ে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আন্তর্জাতিক নদীর প্রাকৃতিক জলপ্রবাহের ধারা এমনভাবে পরিবর্তন করা যাবে না যার পরিণতি তীরবর্তী অপরাপর রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক হুমকি হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের Wyoming VS Colorado কিংবা Chicago Diversion Case 1925, মামলার রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক নদীর একচেটিয়া ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইন বিরোধী এবং নদীর স্থানীয় অংশের ওপর পার্শ্ববর্তী কোন রাষ্ট্রের অবাধ সার্বভৌমত্ব কার্যকর হতে পারে না।

১৯২১ সালে সুদান ও মিশরের মধ্যে নীলনদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তাতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, সুদান নীলনদে এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেনা যাতে মিশরের স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে।

১৯৬০ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত সিন্ধু উপত্যকা চুক্তিতেও এমন ঘোষণা উল্লেখ ছিল যে, তীরবর্তী একটি রাষ্ট্র এমন কোন ব্যবস্থা নেবে না যাতে অপর তীরবর্তী রাষ্ট্রের নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে বিঘ্নিত করতে পারে।

www.pathagar.com

যে নদী একবার একাধিক দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, তার ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্টতই আন্তর্জাতিক আইন রয়েছে। সেখানে নিজ দেশের আইন দ্বারা কখনোই তা নির্ধারিত হয় না। কিংবা নিজ দেশ এককভাবে সেই পানি ব্যবহার করে পার্শ্ববর্তী দেশকে পানির ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। কিন্তু প্রতিবেশি দেশ ভারত আন্তর্জাতিক স্বীকৃত কোন আইন মানছে না। শক্তির জোরে একের পর এক বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ৫৪টি নদীর প্রায় সকল প্রবাহ পথে বাঁদ দিয়ে বাধার সৃষ্টি করে এর বিশাল পানিপ্রবাহ কৃত্রিম খালের সাহায্যে উঁচু অঞ্চলে প্রবাহিত করে কৃষিক্ষেত্রসহ ইচ্ছেমতো সকল ক্ষেত্রে পানি ব্যবহার করছে। আর এই প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৭৫ সাল থেকে। প্রথম ১৯৭৫ সালে ৪১ দিনের (২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে) অজুহাতে বাংলাদেশ সরকারকে আই ওয়াশ (Eye Wash) বা প্রতারণার ফাঁদে ফেলে বহু বিতর্কিত ফারাক্কা বাঁধটি চালু করে। ওয়াদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও বাঁধটি আর বন্ধ করেনি এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সকল আন্তর্জাতিক নদীসহ ভারতের ওপর দিয়ে বয়ে আসা সকল নদীর মুখে বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের সকল প্রবাহপথ বন্ধ করে দিয়েছে। এদের মধ্যে গঙ্গা নদীর ওপর ফারাক্কা বাঁধ, ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর বাঁধ, মুহুরী নদীতে বেলুনিয়া বাঁধ, পিয়াই নদীর ওপর পিয়াই বাঁধ, খোয়াই নদীর ওপর শহর প্রতিরক্ষা বাঁধ। এই সকল নদীতে বাঁধ, গ্রোয়েন নির্মাণ কিংবা স্লুইচ গেট নির্মাণসহ আরও অসংখ্য ছড়ানদীতে বাঁধ বা স্লুইচগেট নির্মাণ করে পানির স্বাভাবিক প্রবাহপথে বাধার সৃষ্টি করছে। এই বেআইনী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ বার বার প্রতিবাদ জানালেও তাতে তারা কোন কর্ণপাত করছে না। ফলে ফারাক্কাসহ ঐ সকল বিপদজনক বাঁধের প্রভাবে সারা বাংলাদেশ ক্রমশ মারাত্মক বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। নদীমাতৃক সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা এ অপরূপ বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় পানির অভাবে আজ দিন দিন বিরাণ ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বিশাল জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দরিদ্র এই দেশটির উন্নয়নের সকল ক্ষেত্র। গুরুত্বপুর্ণ এই সেক্টরের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার দেশের অর্থনৈতিক খাত। পানির সাথে সংশ্লিষ্ট দেশের শিল্পকারখানা, নৌ-পরিবহন, নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা, মৎস্যসম্পদ, বনজসম্পদ, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ বিপর্যয়, জীববৈচিত্র্য ধ্বংসসহ মৃত্তিকার জলীয়তা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে দেশ এক মারাত্মক সংকটের দিকে এগুচ্ছে। প্রয়োজনীয় পানিপ্রবাহের অভাবে প্রায় সকল নদীর নাব্যতা ভীষণভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফলে প্রতিবছর অকাল বন্যা ও প্রকট নদীভাঙনের শিকার হচ্ছে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা। তার শহর, সড়ক, মহাসড়ক ও রেললাইনের পাশে আশ্রয় নিচ্ছে এবং ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ফারাক্কা বাঁধের পর তিস্তা বাঁধ, টিপাই বাঁধ প্রকল্প এবং আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ায় দেশ নিশ্চিত মরুময়তার দিকে এগুচ্ছে। নদীসমূহে প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

পানিপ্রবাহের অভাব দেশের নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, বিল-ঝিল, পুকুর-ডোবাসহ সকল ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। মৎস্যক্ষেত্র প্রয়োজনীয় বিচরণভূমির অভাবে মৎস্য উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে বর্ষা মৌসুমেও নদীতে মাছ নেই, হাওড় বাওড় মাছশূন্য। এর ফলে প্রতিবছর মাছের ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে।

প্রয়োজনীয় পানিপ্রবাহ না থাকায় দেশের উপকূলীয় নদীসমূহে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলছে লবণাক্ততার পরিমাণ। লবণাক্ততার কারণে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে খুলনা অঞ্চল।

সুপারিশমালা : ফারাক্কা বাঁধ ও আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প ভারতের একটি সূদুর প্রসারী চক্রান্ত। বাংলাদেশ নামের এ ভূ-ভাগকে চিরতরে মরুভূমির দিকে ঠেলে দেয়ার প্রয়াস তাদের। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের –

১. দেশের ভেতরে এবং বাইরে এ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করতে হবে।

২. শুষ্ক মৌসুমে ভারত ফারাক্কা ব্যারেজের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ন্যায্য পানির হিস্যা দিচ্ছে কি না সে বিষয়ে দু'দেশের চুক্তির প্রতি খেয়াল বা নজরদারী রাখতে হবে।

৩. দু'দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে এ বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে। কারণ শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের কথা বলে যদি সেখানে চাহিদা অনুযায়ী কম পানি দেয়া হয় সেক্ষেত্রে তা গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে।

৪. অববাহিকা ভিত্তিক নদী উন্নয়ন কার্যক্রম চালাতে হবে।

৫. দেশকে বাঁচাতে হলে নদী বাঁচাতে হবে। প্রতিবেশি দেশ ভারতের সাথে গঠনমূলক ও সৃজনশীল আলোচনায় ফারাক্কাসহ সকল সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে হবে।

৬. প্রয়োজন হলে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থা এর অন্য সদস্য দেশসমূহের সাহায্য নিতে হবে। আমাদের নদীর নাব্যতা বাড়াতে প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বৃহত নদী ও হাওড় বরেন্দ্র এলাকার নদী সমূহে পরিকল্পিতভাবে জলাধার তৈরি করতে হবে যাতে বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা যায় এবং শুষ্ক মৌসুমে কৃষি ও সেচ কাজে প্রয়োজন মত ব্যবহার করা যায়।

৭. ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিরোধ করতে হবে।

৮. বিষয়টি বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য আন্তর্জাতিক ফোরামে উপস্থাপন করতে হবে।

৯. কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়াতে হবে। আধুনিক গণমাধ্যম ও ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। সরকারের পাশাপাশি প্রবাসীদের বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে।

উপসংহার : স্মরণাতীত কাল থেকে বাংলাদেশ নদীর পানি ব্যবহার করে চলেছে। যার

www.pathagar.com

ফলে বাংলাদেশের জমি, পানি ও মানুষের মাঝে এক স্বাভাবিক ভারসাম্য গড়ে উঠেছে। ভারতের ফারাক্কা ব্যারাজ এই ভারসাম্য বিনষ্ট করে বাংলাদেশের মানবিক পরিবেশকে দূষিত করেছে যার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। গঙ্গানদীতে পানি প্রত্যাহারের ফলেঃ

- বর্ষার শেষে নদীতে পলি পড়ে নদীতল ভরে যাচ্ছে, যার ফলে বন্যায় নদীর পানির উচ্চতা বাড়ছে।
- শাখা নদী মাথাভাঙ্গা, বরলি, গড়াই মজে যাচ্ছে ও এগুলোতে পানিপ্রবাহ কমে যাচ্ছে।
- নদীর মোহনায় উজান থেকে পানি প্রবাহ উত্তরোত্তর হ্রাস পাওয়াতে সমুদ্রের লোনা পানির অনুপ্রবেশ বাড়ছে ও নদীতে চর পড়ে যাওয়াতে উজান থেকে প্রবাহিত পানির নিষ্কাশন বাধাপ্রাপ্ত ও বিলম্বিত হচ্ছে।
- শুকনো মৌসুমে নদীতে পানির পরিমাণ ও উচ্চতা কমে যাওয়াতে ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ ও উচ্চতা কমে যাচ্ছে। গঙ্গা ছাড়া অন্যান্য অভিন্ন নদীতেও ভারত ব্যারাজ নির্মাণ করে তার ইচ্ছামত নদীর পানি প্রত্যাহার করে চলেছে। ভারত ত্রিপুরা থেকে প্রবাহিত অযথা ছোট ছোট নদীতে পানি ছাড়া শীতের মৌসুমে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। যার ফলে বাংলাদেশে এসব নদীতে পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। উজানে ভারতের নদীর পানি যথেষ্ট প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মরুকরণ প্রক্রিয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের জনপ্রতি আবাদী জমি খুব কম। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ যে হারে কমে যাচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে এক সংকটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার আশংকা রয়েছে। দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটাতে ও শিল্প বাণিজ্য প্রসারের জন্যে তার জমি থেকে বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি উৎপাদনের প্রয়োজন। আর এর জন্যে দরকার সেচ ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ। পানি বাংলাদেশের একটি মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ। আর এ সম্পদের প্রায় আশি শতাংশ বহন করে প্রধান দু'টো নদী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ দুটো নদীর পানি সম্পদের ব্যবহার হয়েছে খুবই কম। এর প্রধান কারণ অভিন্ন নদীগুলোর পানির ব্যবহার নিয়ে ভারতের সঙ্গে বিরোধ এবং এর ফলে বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর পানি উন্নয়ন প্রকল্পের আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ও বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর কোন আর্থিক সাহায্য দিতে অসম্মতি।

বাংলাদেশের পানি সেচ কার্য্যক্রম এ পর্যন্ত প্রায় সীমাবদ্ধ রয়েছে ছোট বড় নলকূপের ব্যবহারের মধ্যে। গ্র্যাভিটি ফ্লো'র মাধ্যমে ব্যাপক হারে নদীর পানি ব্যবহার হয়নি। বাংলাদেশে পানি সম্পদ উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য খাদ্য শস্য উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া। এ লক্ষ্য এখনও অর্জিত হয়নি। যা সম্ভব শুধু প্রধান নদীগুলোর পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের নদীর পানির পরিমাণ ও উচ্চতা কমে যাওয়াতে গত শুকনো মৌসুমে নদী-নালা খাল-বিল শুকিয়ে যায় এবং অনেক এলাকায় পানির অভাবে জমি ফেটে যায়। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়াতে নলকূপগুলো অকেজো হয়ে পড়ে। খাওয়ার পানির অভাব প্রকটভাবে দেখা দেয়। এ পরিস্থিতির উদ্ভব হতনা যদি গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি সম্পদ উন্নয়ন করে নদীগুলোর পার্শ্ববর্তী এলাকায় নদীর পানির সরবরাহের ব্যবস্থা করা হত।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী অববাহিকায় বসবাসকারী কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করছে। তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে অববাহিকা ভিত্তিক নদী উন্নয়ন কার্যক্রম একান্ত আবশ্যকীয়। আর এ কার্যক্রম আরম্ভ করতে শরীক দেশগুলোর সরকারদের এখনও দ্বিধা বা গড়িমসি করা উচিত হবে না। ■

তথ্যসূত্র :

১. Dr. Khan, F.H; 1972 : Geolgy of Bangladesh. Dhaka.
২. Dr. Wadia, D.N; 1978 : Geology of India. India.
৩. The Illustrated Encyclopedia- Francesea, Baines, Jack colomel Fiona Macdomald, Steve Parker.
৪. Bangladesh District Gazetteers, Chittagong, S.N.H. Raz vi. M.A.
৫. Bangladesh District Garellers, Sylhet, Genenal Edito. S.N.H. Rizvi, M.A. EPCS.
৬. আব্বাস, বি.এম.এ.টি : ১৯৮০ : ফারাক্কা ব্যারেজ ও বাংলাদেশ, ঢাকা।
৭. জলিল, আব্দুল; ১৯৮২ : সুন্দরবনের ইতিহাস, ঢাকা।
৮. বাংলাপিডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি: ২০০৭, ঢাকা।
৯. সচিত্র বাংলাদেশ বিশেষ সংখ্যা (১৯৯৫) ঢাকা।
১০. হোসেন, মোকাররম ; ১৯৯৫ : বাংলাদেশের নদী, ঢাকা।
১১. দৈনিক ইত্তেফাক ; ৩০ জুন ২০০১ : ঢাকা।
১২. দৈনিক ভোরের ডাক ; ১৫ নভেম্বর ২০০১, ঢাকা।
১৩. দৈনিক যুগান্তর ; ১ নভেম্বর ২০০৩, ঢাকা।
১৪. দৈনিক প্রথম আলো ; ১৭ জানুয়ারি, ২০০৬, ঢাকা।
১৫. দৈনিক জনতা ; ০৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬, ঢাকা।

লেখক পরিচিতি : আখতার হামিদ খান, সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, সাভার, ঢাকা।

লেখা পরিচিতি : প্রবন্ধটি জুন ২৫, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত হয়।

www.pathagar.com

শিক্ষা ও নৈতিকতা

শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির

০১. ভূমিকা [Introduction]

শিক্ষা ও নৈতিকতা, মুদ্রার এপিঠ ওপিঠের মত। মানবিক নৈতিকতা ছাড়া শিক্ষা কুশিক্ষার নামান্তর, যা মানুষকে পশুর চেয়েও নিম্নস্তরে নামিয়ে ফেলে।[১] আর মানবিক নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষা মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রাখে। শিল্পের জন্য শিল্প যেমন জীবনের কোন প্রয়োজন মেটায় না তেমনি শিক্ষার জন্য শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ব নিয়ে গড়ে উঠতে সহায়তা করে না। স্তর ভিত্তিক জীবনের বিকাশে এ শিক্ষা কোন কাজে আসে না। যে শিক্ষা মানুষকে অন্যের পাশে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেনা, যে শিক্ষা মানুষকে ভীরুতাকে জয় করতে শিখায় না, যে শিক্ষা জীবনে ও মরণে আলো দিতে পারে না, যে শিক্ষা মানুষকে মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে স্বার্থপরতায় অন্ধ করে তোলে, যে শিক্ষা মানুষকে উগ্র ইন্দ্রিয়সুখের জন্য হত্যার কারণ তৈরি করে, যে শিক্ষা সতীর্থকে নির্মমভাবে খুন করতে উদ্বুদ্ধ করে, যে শিক্ষা ভালবাসার কবর রচনা করে ঘৃণাকে উসকে দিয়ে হিংসা হানাহানির প্রসার ঘটায়, যে শিক্ষা ঐক্যের পরিবর্তে শুধু বিভেদই বাড়ায়, আজ সর্বত্র সে শিক্ষার প্রচার ও প্রসার।

---

১. সূরা তীন ৯৫ ঃ আয়াত নং-৫

www.pathagar.com

এই হচ্ছে বস্তুবাদী শিক্ষার দৃষ্টান্ত। যেখানে বস্তুই জীবনের শেষকথা, ক্ষমতা কার হাতে সেটাই বড় কথা। Ends justifies the means-পাশ্চাত্যের এ এক বড় শিক্ষা-দর্শন। এমনি ধরনের আরেকটি শিক্ষা দর্শন হলো - Everything is fair in love and war. - পাশ্চাত্যের এই শিক্ষা দর্শনে নৈতিকতাকে সুকৌশলে নির্বাসিন দেয়া হয়েছে। ছলে-বলে-কৌশলে বা মারি-অরি-পারি যে উদ্দেশ্য সাধনের শিক্ষাই পাশ্চাত্য বস্তুবাদী শিক্ষার নির্যাস। পাশ্চাত্য সভ্যতা, নৈতিকতা নিরপেক্ষ শিক্ষার প্রবক্তা। শিক্ষার ফলে কোন্ ধরনের নৈতিকতা জন্ম নিল সে বিষয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা উদাসীন। আর ইসলামে মানবিক নৈতিকতা ছাড়া কোন শিক্ষাই নেই। মানবিক নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষাও বস্তুবাদী শিক্ষায় পরিণত হতে পারে যদি সে নৈতিকতার প্রয়োগকে পাশ কাটিয়ে চলা হয়, স্বার্থের দ্বন্দ্বে মানবিক নৈতিকতাকে বিসর্জন দেয়া হয়। তখন সেই মানবিক নৈতিকতার প্রবক্তা স্বয়ং নৈতিকতার ধ্বজাধারীতে পরিণত হয়। অর্থাৎ মানবিক নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষাও অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি তা বাস্তবে অনুসৃত না হয়। আর মানবিক নৈতিকতার শিকড় হচ্ছে "কথা ও কাজে মিল" রাখা। কথা ও কাজে মিল থাকা ঈমানের অন্যতম প্রকাশ। কথা ও কাজে যার মিল নেই, তার ভেতরে সত্যিকার অর্থে কোন মানবিক নৈতিকতাই নেই। আর এ ধরনের মানুষ ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর নৈকট্য বঞ্চিত।[২] কারণ আল্লাহর নিকট ক্রোধের পাত্র নিশ্চয়ই তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত হতে পারেনা। শিক্ষা ও নৈতিকতা উভয়টির জন্যই শিক্ষক এক অনিবার্য প্রয়োজন। শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষা ও নৈতিকতা উভয়টিই অচল। তাই শিক্ষা ও নৈতিকতার প্রশ্নে শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য। শিক্ষক, শিক্ষা ও নৈতিকতা এই ত্রিভুজ দিয়েই গড়ে ওঠে কোন জাতির সভ্যতার চূড়া। পৃথিবীর সকল সমাজেই এই তিন উপাদানই ছিল সভ্যতা গড়ার মূল হাতিয়ার। শিক্ষক, শিক্ষা ও নৈতিকতা নিয়ে দৃষ্টিভংগিগত ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন মতামত বিকশিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধের শিরোনাম 'শিক্ষা ও নৈতিকতা' হলেও এতে প্রসংগক্রমেই শিক্ষা দর্শন, শিক্ষণ ও শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে আলোচনাও স্থান পেয়েছে।

০২.শিক্ষার প্রচলিত ধারণা (Conventional Conception of Education]

বাংলা 'শিক্ষা' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'শাস' ধাতু থেকে উদ্ভুত। 'শাস' ধাতুর অর্থ হচ্ছে 'শাসন করা', 'নিয়ন্ত্রণ করা' ইত্যাদি। আবার সাধারণভাবে শিক্ষা 'বিদ্যা অর্জন বা আহরণ' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই বিদ্যা শব্দটি সংস্কৃত "বিদ" ধাতু হতে আগত। এর অর্থ জানা বা জ্ঞান আহরণ করা।[৩] শিক্ষা বলতে জ্ঞান অর্জন, শিক্ষণ ও প্রয়োগকরণ এ তিনের সমন্বয়কে বুঝায়। এছাড়া শিক্ষণ, পঠন ও লেখনে দক্ষতা অর্জন শিক্ষার আরেক পরিচয়। সামগ্রিকভাবে একজন মানুষের বিকশিত হতে যে অপরিহার্য হাতিয়ার

২. সূরা সাফ ৬১ ঃ আয়াত নং ঃ ২-৩

৩. প্রফেসর মোঃ আনসার আলী, *শিক্ষা নীতি পরিক্রমা,* মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, জুলাই ১৯৯৫, পৃ.৭

www.pathagar.com

প্রয়োজন তা হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা সৃষ্টিশীল। নতুন নতুন ধারণা ও জ্ঞানের বিকাশে শিক্ষা নিয়তই অবদান রেখে যাচ্ছে। শিক্ষার প্রয়োজন সর্বজনীন, বিশ্বময়। জীবনধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজনের মতই শিক্ষা মানুষের জীবনে অপরিহার্য। শিক্ষা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Education. যার প্রতিটি অক্ষরকে বিশ্লেষণ করে শিক্ষার এক সামগ্রিক অর্থকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।[৪] বিশ্লেষণটি নিম্নরূপ ঃ

The term EDUCATION stands for-
E-Enlargement of mind (মনের প্রশস্ততা বা সংকীর্ণতার অবসান)
D-Discipline (শৃংখলা)
U-Universal outlook (সর্বজনীনতা)
C-Characterization [নৈতিক চরিত্র গঠন]
A-Activities (শিক্ষার প্রয়োগ বা কর্মচাঞ্চল্য)
T-Truth worthiness [সত্যানুরাগ]
I-Idealism [আর্দশানুরাগ]
O-Omniscient [প্রজ্ঞার প্রকাশ]
N-Nice tempered [মেজাজের ভারসাম্য]

বিশ্লেষণটিকে পরখ করলে দেখা যায়, জীবনের সুকুমারবৃত্তিগুলোকে স্পর্শ করেছে শিক্ষা। প্রচলিত ধারণায় অর্থগতভাবে শিক্ষাকে তিনভাবে ভাগ করা হয়েছে ঃ

০১. ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ঃ ল্যাটিন শব্দ educere, educare, and educatum হতে উদ্ভূত হয়েছে EDUCATION। যার অর্থ দাড়াচ্ছে 'to learn', 'to know', and to 'lead out'. অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে উন্মোচিত বা বের করা বা প্রকাশ করার এক অনিবার্য উপায়।

০২. সীমিত পরিসরে অর্থ ঃ শিক্ষার সাথে রয়েছে শিক্ষাদানের সম্পর্ক। আর শিক্ষাদানের সাথে রয়েছে শিক্ষা দর্শন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পদ্ধতি, শ্রেণীকক্ষ, শ্রেণী ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদান প্রধান [প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ বা ভাইস চ্যান্সলর ইত্যাদি] , সমাজ, পরিচালনা বডি, পরিচালনার জন্য অফিস ইত্যাদির সম্পর্ক। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদান করা হয় তা শিক্ষার সীমিত পরিসরে পরিচয় বহন করে। যেখানে পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে অন্য কোন শিক্ষার স্বীকৃতি গৌণ বিবেচনা করা হয়।

০৩. বৃহত্তর পরিসরে অর্থ ঃ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে অর্জিত শিক্ষাই বৃহত্তর পরিসরে শিক্ষার পরিচয় । স্থান ও সময় নিরপেক্ষ যে কোন শিক্ষা অর্জনই শিক্ষার বৃহত্তর অঙ্গন।

শিক্ষা নিয়ে মানুষের সচেতন চিন্তা-ভাবনার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষার সর্বজনসম্মত কোন সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকরা

৪. http://education12world.blogspot.com/2010/07/meaning-and-definition-of-education.html

www.pathagar.com

নিজস্ব চিন্তা-চেতনার আলোকে শিক্ষার বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা দিয়েছেন।[৫] যেমন ঃ

০১. দার্শনিক সক্রেটিসের মতে, "শিক্ষা হল মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের আবিষ্কার।"

০২. দার্শনিক প্লেটোর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে সেই শক্তি, যার দ্বারা সঠিক সময়ে আনন্দ ও বেদনার অনুভূতিবোধ জন্মায়। এটি শিক্ষার্থীর দেহে ও মনে সকল সুন্দর ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করে তোলে।"

০৩. দার্শনিক এরিস্টটলের মতে, "সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা দেহ-মনের সুষম এবং পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তির জীবনের প্রকৃত মাধুর্য ও পরম সত্য উপলব্ধিতে সহায়তা করে।"

০৪. শিক্ষাবিদ কমেনিয়াসের মতে, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক উন্নতির সাহায্যে ইহলোক ও পরলোকের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি। শিক্ষার সাহায্যে মানুষ নিজকে ও বিশ্বকে জানতে পারে।"

০৫. শিক্ষাবিদ থমসন বলেছেন, "শিক্ষা বলতে আমরা শিশুর উপর পরিবেশের প্রভাব বুঝি।"

০৬. জন লকের মতে, "সুস্থ্ শরীরে সুস্থ্ মনের সৃষ্টি হল শিক্ষা।"

০৭. হেনরিক পেস্তলোজীর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যের স্বাভাবিক, প্রগতিশীল ও নিয়মানুগ বর্ধন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ।"

০৮. ফ্রেডারিক হার্বার্ট এর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের বহুমুখী প্রতিভার ও অনুরাগের সুষম প্রকাশ এবং নৈতিক চরিত্র গঠন।"

০৯. ফ্রেডারিক ফ্রোয়েবেলের মতে, "সুন্দর বিশ্বস্ত এবং পবিত্র জীবন উপলব্ধি হল শিক্ষা।"

১০. ফ্রেন্সিস পার্কারের মতে, "মানুষের সকল প্রকার সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষা।"

১১. জন ডিউইর মতে, "আত্মোপোলব্ধিই হল শিক্ষা।"

১২. হোয়াইট হিডের মতে, "শিক্ষা হচ্ছে জ্ঞানার্জন এবং সুষ্ঠু প্রয়োগের একটি পরিকল্পনা এবং কৌশল মাত্র।"

১৩. দার্শনিক রাসেল-এর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে কতিপয় মানবিক গুণের যথা সাহস, উদ্যম, অনুভীতিশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির বিকাশ সাধন।"

১৪. কান্টের মতে, "আদর্শ মনুষ্যত্ব অর্জনই শিক্ষা।"

১৫. হার্বার্ট স্পেনসারের ভাষায়, "পরিপূর্ণ জীবনযাপনই শিক্ষা।"

১৬. হার্বার্ট রীডের মতে, "মানুষকে মানুষ করাই শিক্ষা। স্রষ্টার সৃষ্টির রহস্য সম্যক উপলব্ধি করতে যা সাহায্য করে, তাই শিক্ষা।"

শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকদের উপরোক্ত মতামতে শিক্ষার দর্শন ও তাকে

---

৫. *শিক্ষা নীতি পরিক্রমা,* প্রাগুক্ত, পৃ.১১-১২

www.pathagar.com

সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু এর প্রায়োগিক দিক নিয়ে শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকদের মাঝে বিস্তর মতামতের ভিন্নতা রয়েছে। জন মিল্টন শিক্ষার সংজ্ঞায় ধর্মকে প্রয়োজন মনে করেছেন। তবে এটা কোন্ ধর্ম তা তিনি উল্লেখ করেননি। তিনি খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী একজন পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ ছিলেন।

০৩. ইসলামে শিক্ষার ধারণা [Conception of Education In Islam]

'শিক্ষা' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে ইসলামী শিক্ষায় পাঁচটি শব্দ পাওয়া যায়[৬] [এছাড়াও আরো থাকতে পারে] ঃ

০১. তারবীয়াহ [تربية] ঃ তারবীয়াহ [تربية] শব্দটি উদ্ভুত হয়েছে ربو শব্দ হতে। ربو অর্থ : Increase, to grow, to exceed, to raise, rear, bring up, to educate, to teach, instruct, to develop, augment এবং তারবীয়াহ [تربية] অর্থ : Education, up bringing Instruction, Pedagogy, Breeding, Raising.

০২. তা'লীম [تعليم] ঃ তা'লীম [تعليم] শব্দটি উদ্ভুত হয়েছে 'ইলম্ [علم] হতে। তা'লীম [تعليم] অর্থ: Information, Advice, Instruction, Direction, Teaching, Training, Schooling, Education, Apprenticeship.

০৩. তাদীব [تأديب] ঃ তাদীব [تأديب] শব্দটি উদ্ভুত হয়েছে أدب [আদব] শব্দটি হতে, ' [أدب] আদব' অর্থ : Culture, Refinement, Good breeding, Good, manners, Social graces, Decorum.

০৪. তাদরীব [تدريب] ঃ তাদরীব [تدريب] -এর আভিধানিক অর্থ : Habitation, Accustoming, Practice, Drill, Schooling, Training, Coaching, Tutoring.

০৫. তাদরীস [تدريس] ঃ তাদরীস [تدريس] শব্দটি উদ্ভুত হয়েছে দারস [درس] শব্দটি হতে, তাদরীস-এর আভিধানিক অর্থ ঃ To study, to learn, to teach, to instruct, to wipe out, to blot out, to thrash out, tution.

সাধারণভাবে শিক্ষা বলতে আমরা পুঁথিগত বিদ্যাকেই বুঝি। পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন হয় তাই সাধারণতঃ শিক্ষা বলে বিবেচিত হয়। যিনি যত বেশি পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করতে পারেন, তিনি তত বেশি শিক্ষিত বলে সমাজে আদৃত হন। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা লাভের উপায় হচ্ছে জ্ঞানার্জন। এই জ্ঞান অর্জন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেও হতে পারে, আবার অনানুষ্ঠানিকভাবেও হতে পারে। মানুষকে খাদ্য, আহার, বাসস্থান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার কলাকৌশল, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হত।

---

৬. আবদুস শহীদ নাসিম, বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা নীতির রূপরেখা, Islamhouse.com/2009।

www.pathagar.com

প্রজন্ম হতে প্রজন্মে বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে এ সমস্ত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা কনিষ্ঠ ও অনুজদের মাঝে প্রদান করা হত বা তারা অর্জন করে নিত। মানুষের এই সমস্ত অর্জিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা - এক প্রকার শিক্ষা। নিরক্ষর চাষী চাষবাস সংক্রান্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞ, নিরক্ষর তাঁতী সুন্দরভাবে তার কাপড় বোনা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, শ্রমিক বিভিন্ন জিনিষ তৈরি সম্পর্কে, শিল্পী বিভিন্ন প্রকার শিল্পনৈপুণ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ। এরাও এক ধরনের শিক্ষিত। পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়াই এই সমস্ত ব্যক্তি দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বয়োজ্যেষ্ঠ ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করছে। নিরক্ষর [উম্মী] মানুষের এইসব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার রূপ পরিগ্রহ করে শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে পুঁথিগত বিদ্যায় স্থান লাভ করেছে। যেমন, শিকারীর পশু শিকারের কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি, কৃষকের চাষবাস, তাঁতীর বয়ন কাজ, শ্রমিকের শিল্পের কাজ, শিল্পীর নৈপুণ্যের কাজ, জেলের মৎস্য শিকারের কাজ ইত্যাদি। এই সমস্ত লোক নিরক্ষর হলেও তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, নৈপুণ্য, অধ্যবসায়, ঐকান্তিকতা, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি শিক্ষিতের সমপর্যায়ভুক্ত। ভাষা শেখার আগে কেউ ব্যাকরণ শেখে না। আগে ভাষা তারপর ব্যাকরণের জন্ম। আগে অনানুষ্ঠানিক জ্ঞানের চর্চা, তারপর তার আনুষ্ঠানিক রূপ প্রকাশ পায়। 'নিরক্ষর' শব্দটির আরবী আভিধানিক অর্থ উম্মী। অক্ষর জ্ঞানহীন। প্রিয় পাঠক, নিরক্ষর হলেই একজন মানুষ প্রজ্ঞাহীন বা শিক্ষাহীন মূর্খ তা বুঝায় না। একইভাবে অক্ষরজ্ঞান থাকলেই একজন মানুষ প্রজ্ঞাময় হবেন তা যথার্থ নয়। একজন চিকিৎসকের কাছে যদি প্রকৌশলবিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান জানতে চাওয়া হয় অথবা একজন প্রকৌশলীর কাছে যদি চিকিৎসাবিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান জানতে চাওয়া হয় তবে উভয়ের অবস্থা যা হবে তাতে চিকিৎসককে প্রকৌশলবিদ্যার জন্য উম্মী বলা যায় এবং প্রকৌশলীকে চিকিৎসাবিদ্যার জন্য উম্মী বলা যায় অনায়াসে। এভাবে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে উম্মী। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অক্ষরজ্ঞান বিষয়েই শুধু উম্মী ছিলেন, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা, মানবিকতা ও উদারতা, সুবিচার ও নিরপেক্ষতা, ভ্রূণ বিজ্ঞান হতে পানি বিজ্ঞান পর্যন্ত বিজ্ঞানের সকল বিষয়ের বিচারে তিনি আজও অতুলনীয়। তাঁর প্রতি নাযিলকৃত আল কুরআন বিজ্ঞানময়।[৭] আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আপনাকে আল-কুরআন দেয়া হয়েছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট হতে।"[৮] [আল কুরআন যে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নাযিলকৃত; নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রচিত নয় তাঁর উম্মী হওয়াই এর প্রমাণ এবং তিনি নিজ উদ্যেগে মানবজাতির জন্য কোন বিধান রচনার প্রয়াস

৭. সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ আয়াত নং-০২।
৮. সূরা নমল ২৭ ঃ আয়াত নং- ০৬

www.pathagar.com

চালাননি।] তাঁর প্রতি নাযিলকৃত জীবনবিধানের মুগ্ধতায় বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর বহু মনীষী নানা প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছেন। বহু নারী-পুরুষ ইসলামকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিচ্ছেন।[৯] আল্লাহ, তাঁর [নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সম্পর্কে বলছেন, "তিনিই [আল্লাহ তা'আলা] উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর [আল্লাহর] আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত; ইতিপূর্বে তো এরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে এবং তাদের অন্যান্যদের জন্যেও যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[১০] অর্থাৎ একজন উম্মী বা নিরক্ষর মানুষকে আল্লাহ মনোনীত করলেন কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়ার জন্য। একজন প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি সেই-ই যিনি নিজে কোন্ বিষয়ে উম্মী এবং কোন্ বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন সে সম্পর্কে সচেতন। যিনি রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও বিজ্ঞ তিনি ব্যবসায়িক বিষয়েও বিজ্ঞ হবেন এমনটি ভাবার যৌক্তিক কোন কারণ নেই। স্বতঃসিদ্ধও নয়। ব্যবসা বিষয়ে জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও যিনি ব্যবসা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন তিনি কার্যতঃ মূর্খতার পরিচয় দেন। এতে ব্যবসার নামে হয় জগাখিচুড়ি। নষ্ট হয় আমানাতদারী। নিজেকে সবজান্তা ভাবার সমস্যা এখানেই। যে বিষয়ে যিনি উম্মী তিনি সে বিষয়ে উম্মীর সহজ স্বীকৃতি দেয়াই প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের পরিচয়। আর যে ব্যক্তি আমানাতদারী ও সুবিচার জ্ঞানে উম্মী অর্থাৎ যার আমানাতদারী ও সুবিচার জ্ঞানের অভাব রয়েছে তার ব্যবসা - রাজনীতি যে কোন কাজে পরিচালকের ভূমিকা নেয়া মানে সে কাজে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। তাই দায়িত্ব পালনের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনের বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা গভীর গুরুত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "বল, যারা জানে ও যারা জানে না তারা কি সমান?"[১১] আল্লাহ আরো বলেন, "তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং [ঈমানদারদের মধ্য হতে] যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।"[১২] কুরআনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে শিক্ষা বিষয়ে আল্লাহ যা বলেছেন, তাতে

---

৯. গত বছর ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের স্ত্রীর বোন 'লরেন বুথ' ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দেন। পশ্চিমা গবেষকরা বিভিন্ন মাসজিদে জরিপ করে বের করার চেষ্টা করেন যে গত এক বছরে কতজন নতুন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। সে হিসেবে ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডনে গত এক বছরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন প্রায় ১,৪০০ জন। এর ভিত্তিতে গড় হিসেব করে সারা দেশে এক বছরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের হার দাঁড়ায় পাঁচ হাজার ২০০ জন। / দৈনিক প্রথম আলো, ৬ জানুয়ারী ২০১১, পৃ-১১। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সাড়া জাগানো অভিনেত্রী 'প্যারিস হুইটনি হিলটন'-এর মুখপাত্র আয়ান ব্রিঙ্কহাম সিবিএস নিউজকে এ কথা জানিয়েছেন যে 'প্যারিস হিলটন' শান্তির ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। / দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১১, পৃ-০১।

১০ সূরা জুমুয়া ঃ ৬২ আয়াত নং- ০২ ও ০৩।

১১. সূরা আয্-যুমার ঃ ৩৯ আয়াত নং-০৯

১২. সূরা আল-মুজাদিলা ঃ ৫৮ আয়াত নং-১১

www.pathagar.com

শিক্ষা বিষয়ে ইসলামের দার্শনিক ও প্রায়োগিক উভয়দিকই প্রতিফলিত হয়েছে। কুরআনের কিছু বাছাইকৃত আয়াত হতে নিম্নে তা তুলে ধরা হল ঃ

ক. শিক্ষা হল স্রষ্টাকে চেনা ও অজানাকে জানা ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

"পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক হতে।

পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।

শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।"[১৩]

খ. শিক্ষা হল জীবন-জগতের পরিচয় জানা ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, অতঃপর আদম সকল ফেরেশতাদের সম্মুখে তা প্রকাশ করলেন এবং আল্লাহ বললেন, 'এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' ফেরেশতারা বলল, 'আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই। বস্তুতঃ আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।"[১৪]

গ. শিক্ষা হল আল্লাহর দান ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

" যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত্ব করতে পারে না।"[১৫]

"...... আল্লাহ তাকে [দাউদ আ.] রাজত্ব ও হিকমাত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন। "[১৬]

"...... তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"[১৭]

"....... আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাত অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, তোমার প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।"[১৮]

ঘ. শিক্ষা হল জ্ঞানের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি ঃ

"........এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।'"[১৯]

---

১৩. সূরা আল 'আলাক ৯৬ ঃ আয়াত নং- ১-৫
১৪. সূরা আল বাকারা ২ ঃ আয়াত নং -৩১ ও ৩২
১৫. সূরা আল বাকারা ২ ঃ আয়াত নং -২৫৫
১৬. সূরা আল বাকারা ২ ঃ আয়াত নং -২৫১
১৭. সূরা আল বাকারা ২ ঃ আয়াত নং -২৮২
১৮. সূরা আন নিসা ৪ ঃ আয়াত নং- ১১৩
১৯. সূরা তাহা ২০ ঃ আয়াত নং-১১৪

www.pathagar.com

ঙ. শিক্ষা হল জ্ঞান বিতরণ বা হিকমাত প্রশিক্ষণ দেয়া ঃ

"তিনিই [আল্লাহতা'আলা] উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর [আল্লাহর] আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত; ইতিপূর্বে তো এরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে এবং তাদের অন্যান্যদের জন্যেও যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২০]

চ. শিক্ষা হল বিশেষ জ্ঞান ঃ

"অতঃপর তারা সাক্ষাত পেল আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের, যাকে আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও আমার নিকট হতে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।"[২১]

ছ. শিক্ষা হল বোধশক্তিসম্পন্ন হওয়া ঃ

" .... এবং বোধশক্তিসম্পন্নেরা ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।"[২২]

জ. শিক্ষা হল বিশ্বাস অর্জনের সাহস ঃ

"........... আমি যা তোমাদেরকে বলব তা, আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা হতে বলব। যে সম্প্রদায় আল্লাহে বিশ্বাস করে না ও আখিরাতে অবিশ্বাসী আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি।"[২৩]

ঝ. শিক্ষা হল মুসলিম হিসেবে মৃত্যু ঃ

"হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! আপনিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"[২৪]

ঞ. শিক্ষা হল প্রতিরক্ষা ও কৃতজ্ঞতা ঃ

'আর আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে; সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না ?'[২৫]

০৪. শিক্ষার সর্বজনীন প্রকার (Universal Types of Education)

শিক্ষার প্রকার বলতে শিক্ষা অর্জনের উপায়কে বুঝায়। সর্বজনীনভাবেই শিক্ষা অর্জনের প্রকার দুইটি ঃ

ক. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ শিক্ষা বৎসর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, টেক্সট বই, শিক্ষা কারিকুলাম, গ্রেড পদ্ধতি এবং বিভিন্ন শিক্ষান্তর বর্জিত শিক্ষাই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা হিসেবে

---

২০. সূরা জুমুয়া ৬২, আয়াত নং- ০২ ও ০৩।
২১. সূরা কাহাফ ১৮ ঃ আয়াত নং-৬৫
২২. সূরা আলে-ইমরান ০৩ ঃ আয়াত নং-০৭।
২৩. সূরা ইউসুফ ১২ ঃ আয়াত নং-৩৭।
২৪. সূরা ইউসুফ ১২ ঃ আয়াত নং-১০১।
২৫. সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ আয়াত নং-৮০।

www.pathagar.com

বিবেচিত। একজন প্রাজ্ঞ শিক্ষকের সযত্নে গড়ে ওঠে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার আবহ। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে আসহাবে সুফফার শিক্ষা গ্রহণ ছিল অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সক্রেটিসের তত্ত্বাবধানে প্লেটোর এবং প্লেটোর তত্ত্ববধানে এরিস্টটলের বিকাশ, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার দৃষ্টান্ত। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় কোন সনদ বিতরণ নেই। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ছকবাধাঁ কারিকুলামের পরিবর্তে চলমান স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় শিক্ষাকে উপস্থাপন করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীর মনে প্রতিটি শিক্ষা হয়ে ওঠে ব্যবহারিক দৃষ্টান্তপূর্ণ। প্লেটো এবং এরিস্টটলের মত, কবি নজরুল ইসলাম ও কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার এ উপমহাদেশের দুই দিকপাল।

খ. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ শিক্ষা বৎসর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, টেক্সট বই, শিক্ষা কারিকুলাম, গ্রেড পদ্ধতি এবং বিভিন্ন শিক্ষা স্তর নির্ভর শিক্ষাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত। সরকারী-বেসরকারী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার দৃষ্টান্ত। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় বিভিন্ন শিক্ষা স্তর শেষে মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ সনদ বিতরণ করা হয়।

০৫. ইসলামে শিক্ষার প্রয়োজন (Needs of Education In Islam]

আনুষ্ঠানিক হোক বা অনানুষ্ঠানিক হোক মানুষের জীবনে শিক্ষার প্রয়োজন মৌলিক। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার মত শিক্ষাও মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি। তবে অন্যান্য মৌলিক চাহিদার সাথে শিক্ষার চাহিদার একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা মানুষের শারিরীক প্রয়োজনকে পূরণ করে। আর শিক্ষা আসল মানুষটির প্রয়োজন পূরণ করে। বিষয়টি আমরা এভাবে বুঝতে পারি - যখন কোন মানুষ মারা যায়, তখন আমরা বলি অমুকের লাশ। আর এই লাশের চোখ, কান, নাক, জিহ্বা শারীরিক সব কিছুই বিদ্যমান থাকে। শুধু অমুক নেই বা আসল মানুষটিই নেই। সে মানুষটি তার সকল শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা সহ অথবা তার সকল ধরনের মূর্খতাসহ চিরতরে হারিয়ে গেছে। শরীরের ভেতর আসল মানুষটির জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন। মানুষ হিসেবে মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যই শিক্ষা দরকার। শিক্ষা ছাড়া মানুষের মত বাঁচার কোন উপায় নেই। আল্লাহ্ বলেন, 'যাদের চক্ষু ছিল অন্ধ আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যারা শুনতেও ছিল অক্ষম।'[২৬] আল্লাহ্ এখানে আসল মানুষের অন্ধত্ব ও বধিরতা তুলে ধরেছেন, শারীরিক অন্ধত্ব বা বধিরতা নয়। আসল মানুষের অন্ধত্ব ও বধিরতা দূর করার জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন অনিবার্য। তা নাহলে মানুষ ও পশুর মাঝে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্যই থাকেনা। কোন জাতি যদি শিক্ষার এই মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম হয় তবে সে জাতি জংলী জাতি বা অমানবিক বা পাশবিকতায় পরিচালিত জাতি হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। তাই শিক্ষাকে কোন অবস্থাতেই বিলাসী সেবা অর্জনের পর্যায়ে আনা যাবেনা, একে সহজলভ্য করতে হবে। যাতে করে

---

২৬. সূরা কাহফ্ ১৮ ঃ আয়াত নং-১০১।

www.pathagar.com

মানুষ শিক্ষার মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়। আর শিক্ষাকে সহজলভ্য করতে রাষ্ট্রের ব্যাপক ভূমিকা রাখার অবকাশ রয়েছে।

০৬. ইসলামে শিক্ষার লক্ষ্য [Aim of Education In Islam]

মানুষের শিক্ষার সাথে মানবজাতি, আকাশ, পানি ও স্থলের সকল প্রাণী ও গোটা পৃথিবীর সার্বিক পরিবেশের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে বিধায় শিক্ষার লক্ষ্য মানব জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী শিক্ষার লক্ষ্য হল মানুষকে শ্রেণীশত্রু চিহ্নিত করতে শেখানো এবং শ্রেণীশত্রু হত্যা কোনো অমানবিক বা অনৈতিক কাজ নয় বরং শ্রেণী শত্রু চিহ্নিত করা এবং খতম করাই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী শিক্ষার মূল লক্ষ্য। অন্য দিকে জড়বাদী শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে অর্থ উপার্জন। এতে নৈতিকতার কোন স্থান নেই। মরহুম আবুল হাশিমের ভাষায়, 'জড়বাদী পাশ্চাত্যের ধনতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে সমাজতন্ত্রীরা দলবদ্ধ জীব, যাদের একমাত্র বিষয় নিজেদের দলের কল্যাণ সাধন, আর ধনতন্ত্রীরা হচ্ছেন সর্প ও সরীসৃপের মত ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীব এরা একা একা বা জোড়ায় জোড়ায় চলে। এদের কাজ নিজের কিংবা বড়জোর নিজের জোড়ার কল্যাণ সাধন।'[২৭] অন্যদিকে ইসলামে শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষে মানুষে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, গাণিতিক সাম্য নয়। আল্লাহ বলেন, "আমরা মানুষকে এক জাতিরূপে সৃষ্টি করেছি।"[২৮] তাই মানুষে মানুষে যথেচ্ছ ভেদাভেদ সৃষ্টি করার কোন অধিকার মানুষের থাকতে পারে না। একজন মানুষ অন্যজনের মত গাণিতিকভাবে সর্বোতভাবে সমান হতে পারে না। কেউ হয় কালো, কেউ হয় সাদা, কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ বুদ্ধিমান, কেউ বোকা। অতি স্বাভাবিকভাবেই কেউ কেউ নিজেদের ব্যক্তিগত গুণের কারণে অন্যান্যদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণে মানুষের সামাজিক সাম্যে হস্তক্ষেপ না করাই অর্থাৎ প্রত্যেকের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জতকে সমানভাবে মূল্যায়ন করাই ইসলামের শিক্ষার লক্ষ্য। কেনো প্রতিভাবান ব্যক্তি বুদ্ধির ক্ষেত্রে; কোনো সম্পদশালী ব্যক্তি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভিজাত বলে গণ্য হতে পারে না। একজন হারকিউলিস, রুস্তম বা ভীম দৈহিক শক্তির ক্ষেত্রে আভিজাত্য অর্জন করতে পারেন কিন্তু ইসলামে সামাজিক আভিজাত্য বলে কিছু নেই।[২৯]

০৭. ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Education In Islam)

নিত্য পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে তিনভাবে উপস্থাপন করা যায়। ক. ব্যক্তি পর্যায় খ. সামাজিক পর্যায় এবং গ. গ্লোবাল বা বৈশ্বিক পর্যায়।

ক. ব্যক্তি পর্যায় : ব্যক্তি পর্যায়ে একজন মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখে শিক্ষা। একজন মানুষের মাঝে সমাজ ও বিশ্ব পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে চলার, উন্নত

---

২৭. আবুল হাশিম, *ইসলামের মর্মকথা,* ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ প্রকাশনা-২০৩, পৃ.৬৯।
২৮. সূরা ইউনুস ১০ ঃ আয়াত নং-১৯।
২৯. *ইসলামের মর্মকথা,* প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪।

www.pathagar.com

জীবন-যাপনে সক্ষম হওয়া এবং মানব জাতির কল্যাণে অবদান রাখার মত যোগ্যতা সৃষ্টি করাই ইসলামে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

খ. সামাজিক পর্যায় : শিক্ষা মানুষের মাঝে চিন্তার ঐক্য তৈরি করে। চিন্তার ঐক্য, সামাজিক জীবনে আচরণগত ঐক্যের ভিত্তি। সমাজে শান্তি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে কাজ করে এই চিন্তার ঐক্য। সমাজে ভিন্নমতের আধিক্য বা বাহুল্য শিক্ষার ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজি, আরবী ও বাংলা মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন কারিকুলামে সম্পন্ন হচ্ছে, এছাড়া ১৯৭২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক শিক্ষানীতির প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়নের ফলে স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাঝে কোনো চিন্তার ঐক্য গড়ে ওঠেনি। ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণা থেকে এখনও আমরা বেরিয়ে আসতে পারিনি। তাই একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে এখনও কাংখিত মর্যাদার আসন অর্জিত হয়নি।

গ. বৈশ্বিক পর্যায় : বৈশ্বিক পর্যায়ে, পুরো পৃথিবীকে পর্যায়ক্রমে গ্লোবাল ভিলেজ-এ পরিণত করাই ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য। প্রযুক্তির উন্নয়ন, বিশ্বব্যাপী ব্যবসার সম্প্রসারণ, পৃথিবীকে পর্যায়ক্রমে গ্লোবাল ভিলেজ-এ পরিণত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। আর ব্যবসার সম্প্রসারণ পুরো বিশ্বে দক্ষ জনশক্তির ব্যাপক চাহিদা তৈরি করেছে। এই চাহিদা স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে পুরো বিশ্বে নানা দেশের মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে। আর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ হল দক্ষ জনশক্তি গড়ার মূল উৎস। এ দক্ষতা, অর্থনৈতিক উপযোগিতার ক্ষেত্রে যেমন সত্য তেমনি ইসলামের মূল্যবোধ তৈরি করে উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রেও সত্য। যে কোন মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক উপযোগিতা সৃষ্টি করতে যেমন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই ঠিক তেমনি ইসলামের মূল্যবোধের ভিত্তিতে উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ গড়তেও ইসলামী মূল্যবোধের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই।

উপরে উল্লেখিত সকল পর্যায়ে শিক্ষার কিছু সর্বজনীন উদ্দেশ্য রয়েছে। শিক্ষার এ উদ্দেশ্যগুলো পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষের জন্য প্রায় সমভাবে প্রযোজ্য। আবার দেশ-জাতি-জীবনদর্শন ভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্যের ভিন্নতাও দেখা যায়। শিক্ষার সর্বজনীন বা সাধারণ উদ্দেশ্য বলতে সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে যে গুণের বিকাশ প্রত্যাশিত তা বুঝায় । যেমন ঃ

ক. শিক্ষার সর্বজনীন বা সাধারণ উদ্দেশ্য :

১. পরিপূর্ণ জীবন যাপনের যোগ্যতা অর্জন।

২. নৈতিক চরিত্র অর্জন।

৩. বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ অর্জন।

৪. বৃত্তি গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন।

৫. পরিবেশ ও সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলার যোগ্যতা অর্জন।

www.pathagar.com

৬. সামাজিক নেতৃত্বের বা পরোপকারের যোগ্যতা অর্জন।
৭. সমাজের সংস্কারমূলক ক্ষেত্র চিহ্নিত করার যোগ্যতা অর্জন।
৮. ভারসাম্যপূর্ণ এবং পরমতসহিষ্ণু দৃষ্টিভংগি অর্জন।
৯. ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবন সম্পর্কে ধারণা অর্জন।
১০. জ্ঞানভিত্তিক পরিশীলিত আচরণ করার যোগ্যতা অর্জন ।

০৮. ইসলামে শিক্ষার কাজ (Functions of Education In Islam)

শিক্ষা যা করে তাই-ই শিক্ষার কাজ। শিক্ষা কি করে? শিক্ষা মানুষের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে মনের চোখকে দেখতে সাহায্য করে। মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করে। আর এভাবে মানুষের আচরণকে পরিশীলিত করে। মানুষকে যে শিক্ষা দেয়া হয় সেই জ্ঞানের আলো হৃদয়ে জ্বালানোই শিক্ষার কাজ। যেমন, যে জীবনদর্শন মানবজাতিকে পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে এবং যে জীবনদর্শনের শিক্ষা মানুষকে শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে একটি মনোনীত শ্রেণী দ্বারা আর সব শ্রেণীকে নির্মূল করে দিয়ে শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের পাঠ দেয়, সে জীবনদর্শনের শিক্ষা মানুষের মনে যে ঈর্ষা ও ঘৃণার আলো জ্বালাবে, ভালবাসার নয় তাতে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। এ জাতীয় জীবনদর্শন ঘৃণার দর্শন, প্রেমের দর্শন নয়। এ জাতীয় জীবন-দর্শন 'মনুষ্যত্বকে' ধ্বংস করে দিয়ে মানুষের মধ্যে পাশবিক প্রবৃত্তিগুলোর আলো জ্বালাতে থাকে। তখন মানুষ পশু বা তার চেয়েও নিম্নমানের বা নিষ্ঠুর আচরণ অনায়াসে করতে পারে। অন্যদিকে ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছে, আত্মীয়, মিসকীন ও মুসাফিরদের অধিকার আদায় করতে হবে।[৩০] ইংরেজিতে Tax, Charity এবং Rights এই তিনটি শব্দের আভিধানিক ও ব্যবহারিক ব্যবধান বিস্তর। পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ জীবনদর্শন এবং বস্তুবাদী শ্রেণীসংগ্রামের জীবনদর্শনের শিক্ষায় আত্মীয়, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য কোন 'অধিকার বা Rights' বলে কিছু নেই। সেখানে Charity বা দয়া-দাক্ষিণ্য আছে, তবে তা সম্পূর্ণ ব্যক্তির খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভরশীল এবং তা ইসলামের বিধানের মত এত সুস্পষ্টভাবে শ্রেণীবদ্ধ বা ক্লাসিফাইড নয়। আর এ কারণেই পাশ্চাত্যে কুকুর-বিড়ালকেও উইল করে সম্পত্তি দেয়ার অসংখ্য দৃষ্টান্ত যেমন রয়েছে; তেমনি অর্ধাহারে-অনাহারে মানুষের দিন গুজরানের দৃষ্টান্তও আছে। অন্যদিকে ইসলামে বিষয়টি শুধু Charity বা দয়া-দাক্ষিণ্যের বিষয় নয়, এটা আত্মীয় মিসকীন ও মুসাফিরের অধিকার। আর ধনী ব্যক্তিদেরকে এ অধিকার আদায় করতে বলা হয়েছে। বিষয়টা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই করতে হবে এবং এর অন্যথা হলে অবশ্যই জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে। জবাবদিহিমূলকভাবে জীবন গড়াই মানবজাতির প্রতি ইসলামের শিক্ষার এপ্রোচ। যাতে করে প্রকৃত জবাবদিহির দিন তা সহজ হয়। পৃথিবীতেও শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষ সুখী হয়। ধনী, দরিদ্র, আত্মীয়, মিসকীন,

৩০. সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ১৭, আয়াত নং- ৩১-৩৮।

www.pathagar.com

মুসাফির, ধর্ম-বর্ণ-রক্ত-জাত-পাত নির্বিশেষে জনে জনে মমত্ববোধ ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের অস্তিত্বকে স্বাভাবিকভাবেই স্বীকার করেছে; তবে তাদের মাঝে সংগ্রাম বা ঘৃণার অস্তিত্বকে স্বীকার করেনি বরং তাদের মাঝে পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধের শিক্ষা দিয়েছে। ইসলামের জীবনদর্শন তাই ঘৃণার নয়, প্রেমের, একের প্রতি অন্যের দায়িত্বশীলতার। জনে জনে মমত্ববোধ ছড়িয়ে দেয়াই ইসলামে শিক্ষার কাজ।

০৯. ইসলামে শিক্ষার পরিধি (Scope of Education In Islam)

যে কোন সভ্যতা মূলতঃ শিক্ষার ফলশ্রুতি। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানা উপাদান নিয়ে পত্তন হয় কোনো সভ্যতার। আর সভ্যতার সেইসব উপাদানের নেপথ্যে রয়েছে শিক্ষার অবদান। আর তাই শিক্ষার পরিধি বলতে সভ্যতায় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর অবদানগুলোকেই বুঝায়। ইসলামে শিক্ষার পরিধি বা সভ্যতায় ইসলামের অবদানগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

সামাজিক অবদান

১. একটি মানবিক সোনালী সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
২. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।
৩. মানুষকে সামাজিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করে।
৪. সমাজে মুক্ত চিন্তার বিকাশ ঘটায়।
৫. সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূর করে।
৬. প্রতিটি মানুষকে তার মেধা অনুযায়ী বিকশিত করতে সহায়তা করে।
৭. ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনে চিন্তার ঐক্য তৈরি করে।
৮. আদর্শের প্রতি প্রত্যয় সৃষ্টি করে।
৯. সামাজিক কুসংস্কার দূর করে।
১০. সমাজকে সুশৃংখল করে।
১১. পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট উপলব্ধিতে এবং কাঙ্খিত সামাজিক পরিবর্তনে সহায়তা করে।
১২. পরিশীলিত বা ভদ্রোচিত আচরণ নিশ্চিত করে।
১৩. সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব গড়ার মাধ্যমে মানুষকে জীবনের বহুমূখী সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলে।
১৪. মানুষের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে।
১৫. ব্যক্তির চিন্তা চেতনাতে গভীরতা আনতে সাহায্য করে।
১৬. দলগত মনোভাব তৈরি করে।
১৭. মানুষের অভিযোজন ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে; যার প্রভাবে সামাজিক জীবনে কাঙ্খিত পরিবর্তন ঘটে।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক অবদান

১. জাতীয় ঐক্য ও সম্প্রীতি গড়ে তোলে।

২. দেশ ও উম্মাহর প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত করে।

৩. দেশ ও উম্মাহর প্রতি কর্তব্য পরায়ণ করে ।

৪. নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

৫. শক্তিশালী উম্মাহ গড়ে তুলতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলে।

৬. রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা সৃষ্টি করে।

৭. রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে তোলে।

৮. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

৯. বিচক্ষণ ও বিজয়ী কূটনৈতিক অবদান রাখতে সহায়তা করে।

১০. উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যের তুলনায় নিজঅবস্থান পর্যালোচনা করতে সহায়তা করে।

১১. দেশ ও জাতিকে উন্নয়নের পথ দেখাতে সহায়তা করে।

১২. জাতীয় স্বার্থ উপলব্ধিতে সহায়তা করে।

১৩. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিস্তৃতি ও সুদৃঢ়করণে সহায়তা করে।

১৪. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

১৫. রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়।

অর্থনৈতিক অবদান

১. জীবিকা উপার্জনের যোগ্য করে গড়ে তোলে।

২. বৃত্তিমূলক মনোভাব সৃষ্টি করে।

৩. জনশক্তিকে সম্পদে পরিণত করে।

৪. পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

৫. কর্মানুরাগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৬. দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করে।

৭. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অনুকূল অবস্থা সুদৃঢ় করে।

৮. প্রযুক্তির উন্নয়নে অবদান রাখে।

৯. নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

১০. অনুদানমূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করে।

সাংস্কৃতিক অবদান

মানুষের জীবনধারাই মানুষের সংস্কৃতির প্রতিফলন করে। আর জীবনধারা তৈরি হয় শিক্ষার নিরবচ্ছিন্ন প্রভাবে। ইসলামে শিক্ষার সাংস্কৃতিক অবদানগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. খেলাধুলা, শরীরচর্চার প্রচলনের মাধ্যমে শারীরিক বিকাশ সাধন।

২. শিল্প ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ ঘটানো।

৩. দৃষ্টিভঙ্গী উদার ও প্রসারিত করা।

www.pathagar.com

৪. পরিশীলিত আচরণকে উৎসাহিত করে সমাজে বসবাসযোগ্য যোগ্যতার বিকাশ ঘটানো।
৫. গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো।
৬. মূল্যবোধের চর্চাকে অগ্রাধিকার দেয়া।
৭. অবসর যাপনের মানবিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করা।
৮. বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি ও আগ্রহের বিস্তার ঘটানো ।
৯. দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ করে দেয়া।
১০. জীবনের সকল স্তরের সৌন্দর্যকে সংস্কৃতিতে গ্রহণযোগ্য উপস্থাপনায় প্রকাশ করা।
১১. জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করতে শেখানো।
১২. মানুষকে রুচিশীল করে তোলা।

১০. শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতির তুলনামূলক আলোচনা [Comparative Discussion of Philosophy of Education and Education Policy)

প্রত্যেক জাতি তথা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতির দ্বারা পরিচালিত। শিক্ষাব্যবস্থার এই নিয়মনীতি জাতীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটেই রচিত হয়ে থাকে এবং জাতীয় দর্শনের ভিত্তিতে যে কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয়। শিক্ষাব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য এই সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুনগুলোকেই শিক্ষানীতি বলা হয়ে থাকে। স্থান, কাল পাত্র ভেদে শিক্ষানীতির নিয়মকানুনের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষানীতির ভূমিকা অপরিসীম।[৩১] পুরো বিষয়টি সরলীকরণ করলে দাঁড়ায়, জাতীয় শিক্ষাদর্শন-শিক্ষানীতি-শিক্ষাব্যবস্থা অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষাদর্শন, জাতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তি এবং জাতীয় শিক্ষানীতি, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি। শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার মূলভিত্তি হল জাতীয় শিক্ষাদর্শন।

জীবন ও জগত সম্পর্কে লালিত যে ধারণা বা বিশ্বাস দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা জাতি পরিচালিত হয় তাই-ই সে ব্যক্তি বা জাতির জীবন-দর্শন। জাতিতে জাতিতে যেমন জীবন দর্শনের ভিন্নতা আছে তেমনি একই জাতির বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যেও জীবন দর্শনের ভিন্নতা রয়েছে। জীবন দর্শনের ভিন্নতার কারণেই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দর্শনের ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ জীবন ও জগতকে কোনো ব্যক্তি বা জাতি যেভাবে বুঝতে শিখেছে সেই ব্যক্তি বা জাতি তার প্রভাবান্বিত বলয়ে সেই শিক্ষাকেই তুলে ধরেছে। এভাবে গড়ে উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাদর্শন। মানুষের শিক্ষার জন্য এই জীবন দর্শনকেই শিক্ষা দর্শন বলে। শিক্ষার ক্ষেত্রে দর্শনের বিষয়টি এতই গুরুত্ব বহন করে যে, কোনো অশিক্ষা-কুশিক্ষা, জীবন-দর্শন ভেদে মূল্যবান শিক্ষা হিসেবে

৩১. *শিক্ষা নীতি পরিক্রমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

www.pathagar.com

বিবেচিত হতে পারে আবার কোনো মানবিক শিক্ষা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।[৩২] একাডেমিকেলী দর্শনের যে শাখা শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তাকে শিক্ষাদর্শন বলে। দার্শনিক 'হল' [C.L. Hall] তাঁর 'Conflicting Philosophies of Education' প্রবন্ধে শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় শিক্ষাদর্শনের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা মতভেদ আলোচিত ও পর্যালেচিত হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, জীবন ও জগত সম্পর্কে ধারণা ও বিশ্বাসকে ভিত্তি করে অর্জিত শিক্ষাকে কেন্দ্র করে অনেক দার্শনিক মতবাদের বা শিক্ষাদর্শনের উদ্ভব হয়েছে। এর মধ্যে দুটি মতবাদ বা শিক্ষাদর্শন উল্লেখযোগ্য। এক. প্রকৃতিবাদ [Naturalism or Materialism] ও দুই. ভাববাদ [Idealism]। আর এই দুই মতবাদের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে প্রয়োগবাদ [Pragmatism] ।

ভাববাদ একটি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা জীবন ও জগতকে বিশ্লেষণ করে। ভাববাদীদের মতে এই বিশ্ব এক পরম সত্তার প্রকাশ। আমরা যে জীবন ও জগৎ প্রত্যক্ষ করি তা খণ্ডিত, সসীম এবং ক্ষণস্থায়ী। এই পরমসত্তাকে ঈশ্বর, ব্র[illegible], সৃষ্টিকর্তা, প্রকৃতি নামে অভিহিত করা হয়। মানুষের জৈবিক সত্তাই যে তার একমাত্র পরিচয় নয়, তার উপরে রয়েছে পরমসত্তা - এই শিক্ষাই ভাববাদের মূল বক্তব্য। শিক্ষাদর্শনে ভাববাদের প্রবক্তাদের মধ্যে প্লেটো, কান্ট, কমেনিয়াস, পেস্তালোজী, ফ্রোয়েবেল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে প্রকৃতিবাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে 'বিশ্ব প্রকৃতিই হচ্ছে বাস্তব আর সব মিথ্যা। বস্তুজগতের বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।' আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক নীতি নির্ধারণে তথা শিক্ষানীতি প্রণয়নে এবং তার প্রয়োগ পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা প্রকৃতিবাদ থেকে গৃহীত। প্রকৃতিবাদীরা প্রকৃতিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন - এক. জড় প্রকৃতি বা বস্তু প্রকৃতি। দুই. যান্ত্রিক প্রকৃতি এবং তিন. জৈবিক প্রকৃতি। এই তিন ধরনের ভাগ হতে তিন ধরনের মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে। একদলের মতে মানুষের জীবন জড় প্রকৃতির নিয়মেই পরিচালিত হয়। একে জড় প্রকৃতিবাদ বা বস্তুবাদ [Physical Naturalism or Materialism] বলা হয়। অপর দল মানুষকে যন্ত্র হিসেবে কল্পনা করেছেন। তাদের মতে আত্মা বলতে কিছু নেই। জড় জগত যেমন যান্ত্রিক নিয়মে চলে, মানুষের মনও তেমনি যান্ত্রিক নিয়মে চলে। এই মতবাদকে যান্ত্রিক প্রকৃতিবাদ [Mechanical Naturalism] বলা হয়। আর একদলের মতে মানুষকে জৈবিক সত্তা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। তাদের মতে ইতর প্রাণীদের যে সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, মানুষের মধ্যেও সেই সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুতরাং এই সব বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে হলে সমজাতীয় প্রাণীর প্রকৃতি অনুশীলন করতে হবে। এই মতবাদকে জৈবিক মতবাদ [Biological

৩২. সেমিনার স্মারক গ্রন্থ [২০০৩-২০০৫], বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, জুলাই ২০০৬, পৃ. ৩৯-৪০।

www.pathagar.com

Naturalism] বলা হয়। এই শিক্ষাদর্শন বা মতবাদে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের কোন সুযোগ নেই। এ দর্শন ইহকাল সর্বস্ব। মানুষের ধর্মবোধ, বিবেকবোধ ও নীতিবোধের কোনো ব্যাখ্যা এ শিক্ষাদর্শনে স্থান পায়নি।

শিক্ষাদর্শনে প্রয়োগবাদ বা **Pragmatism** মতবাদটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। প্রয়োগবাদ বা **Pragmatism**-এর মূল কথা হলো উপযোগিতা। প্রয়োগবাদীদের মতে কোন কিছুর সত্যতা প্রমাণ করতে হলে তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ **Seeing is Believing**। বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখতে হবে যে কোন কিছুর সত্যতা আছে কি না। বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যতা বলে কিছু নেই এবং চিরন্তন সত্য বলেও কিছু নেই। বর্তমানে যা সত্য, অন্য যুগে তা অসত্য বলে পরিচালিত হতে পারে। পরীক্ষণের বা এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে যা সত্য বলে প্রমাণিত হয় তাই গ্রহণযোগ্য। এই শিক্ষাদর্শনেও অদৃশ্যে বিশ্বাস বা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ইত্যাদির কোন স্থান নেই। প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শনের প্রধান প্রবক্তা হচ্ছেন, জন ডিউই। আর এই মতবাদের সমর্থক হচ্ছেন, পায়ার্স, কিলপ্যাট্রিক, উইলিয়াম জেমস, শিলার প্রমুখ বুদ্ধিজীবিগণ।[৩৩]

প্রকৃতিবাদ [Naturalism or Materialism] এবং প্রয়োগবাদ [Pragmatism]-এর শিক্ষাদর্শনের মাঝে অমিলের চেয়ে মিলই বেশি। প্রয়োগবাদ [Pragmatism] অনেকটা প্রকৃতিবাদ [Naturalism or Materialism]-এর উন্নত বা আধুনিক সংস্করণ। জীবন ও জগতের প্রতি প্রকৃতিবাদ [Naturalism or Materialism] এবং প্রয়োগবাদ [Pragmatism]-এর দৃষ্টিভংগির চেয়ে ভিন্নতর দৃষ্টিভংগি মানব ইতিহাসে রয়েছে। যার কোন ব্যাখ্যা প্রকৃতিবাদ [Naturalism or Materialism] বা প্রয়োগবাদ [Pragmatism] দিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। প্রয়োগবাদ [Pragmatism] বা প্রকৃতিবাদ [Naturalism or Materialism]-এ এসব বিষয়ে কোনো আলোচনাই নেই। প্রসংগত সে ভিন্নতর দৃষ্টিভংগি নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

পৃথিবীর বুকে যখন মানুষের প্রথম পদচারণা পড়লো, তখন মানুষ উজ্জ্বল প্রদীপরূপে যে সূর্য আর স্নিগ্ধ আলোর চাঁদ দেখেছিল, আজও তাই-ই আছে। সাগর-নদী, গাছ-পালা, পশু-পাখী, বন-বনানী, সুউচ্চ পর্বতমালা, নয়নাভিরাম সুনীল আকাশের দিগন্তে একাকার হওয়া কিংবা শিহরিত করা শীতল বাতাসে রোমাঞ্চিত হওয়া সবই এখনও আছে, যেমন ছিল শুরুতে। মানবজাতির নিকট সেই একই বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক জগত ও জীবনের মৌলিক চাওয়া-পাওয়া একই থাকা সত্ত্বেও জীবন দর্শন এবং শিক্ষা দর্শনে নানা পার্থক্য সূচিত হয়েছে। বস্তুত: গোটা প্রকৃতির মধ্যে মানুষ নিজেকে যেভাবে খুঁজে পেয়েছে সেভাবেই তার জীবন দর্শনকে, শিক্ষা দর্শনকে গড়ে নিয়েছে। আর এভাবেই তৈরি হয়েছে জীবন দর্শন ও শিক্ষা দর্শনের ভিন্নতা। জীবন জিজ্ঞাসার মৌলিক প্রশ্নগুলোর দিশা দিয়েই আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। কালক্রমে মানুষ

---

৩৩. *শিক্ষা নীতি পরিক্রমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৮।

www.pathagar.com

যখন সেই পথের দিশা থেকে সরে এল, তখন মানুষের সামনে প্রকৃতিই ছিল জীবন জিজ্ঞাসার সমাধানের একমাত্র উৎস। প্রকৃতির বিশালত্বের তুলনায় মানুষ নিজের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব নিয়ে তখন অসহায়ত্ব বোধ করেছে। ফলে সূর্য, আগুন, সাপ, বৃক্ষ, গরু, সাগর-নদীসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাণীর নিকট মানুষ মাথা নত করা শুরু করেছিল। আর মানুষের যা স্বভাবজাত অর্থাৎ মানুষ যা করে তার পক্ষে যৌক্তিকতা তৈরি করে নেয়। এভাবে প্রাকৃতিক শক্তি বা প্রাণীর পূজা করার পক্ষে একটি জীবন দর্শন বানিয়ে ফেলে। আর তা ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করতে করতে একসময় মানুষ তার নিজ হাতে মূর্তি বানিয়ে সেই মূর্তির পূজা করার শিক্ষা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছে। প্রকৃতির বিশালত্বের কাছে নিজের ক্ষুদ্রত্বের এই উপলব্ধি নিয়ে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করার পক্ষে যুক্তি খুঁজেছে। ফলে হাতড়ে পাওয়া সেসব যুক্তি নিয়ে তৈরি হয়েছে জীবন দর্শন। সৃষ্টি হয়েছে ভাববাদ জাতীয় শিক্ষা দর্শন। প্রকৃতিকে জয় করার শক্তি যখন মানুষ খুঁজে পেলো তখন জন্ম নিল প্রকৃতিবাদ এবং প্রয়োগবাদ জাতীয় শিক্ষা দর্শন ইত্যাদি। মানুষ ও প্রকৃতির স্রষ্টা ও স্বত্বাধিকারী আল্লাহর নির্দেশিত পথ এড়িয়ে মানুষ যখন নিজের মত করে প্রকৃতিকে বুঝতে চাইল, তখন আসলে কি ঘটল সে কথাই তুলে ধরলেন, ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব। তিনি তাঁর লিখিত 'মুসলিম দার্শনিকদের স্বকীয়তা' প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন এভাবে "একথা সত্য যে, প্লেটো ও এরিস্টটলের মত বড় বড় দার্শনিক বিশ্বাস করতেন, আকাশের গ্রহ নক্ষত্র সব জ্যোর্তিময় দেবতা"[৩৪] অন্যদিকে পাশ্চাত্য জগতে আব্রাহাম নামে পরিচিত, আল কুরআনে উল্লেখিত **ইবরাহিম ['আলাইহিস সালাম], প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করে যা পেলেন, কুরআনের ভাষায় তা দেখি** : "অতপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করলো তখন সে নক্ষত্র দেখে বললো, 'এইতো আমার প্রতিপালক।' অতপর যখন তা অস্তমিত হল তখন সে বললো, যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করিনা। অতপর যখন সে চন্দ্রকে সমুজ্জ্বলরূপে উদিত হতে দেখলো তখন বললো, 'এইতো আমার প্রতিপালক।' যখন এও অস্তমিত হল তখন বললো, আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হবো। অতপর যখন সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উদিত হতে দেখলো তখন বললো, 'এইতো আমার প্রতিপালক, এতো সর্ববৃহৎ।' যখন এও অস্তমিত হল, তখন সে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! যে সকল শক্তিকে আল্লাহর শরীক কর তার সাথে আমার কোন সংস্রব নেই। আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।'"[৩৫] ইবরাহিম 'আলাইহিস সালাম, চুড়ান্তভাবে সকল প্রকার প্রাকৃতিক শক্তির উৎস ও স্বত্বাধিকারী আল্লাহকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর উপলব্ধি ছিল

৩৪. ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, *মুসলিম দার্শনিকদের স্বকীয়তা [ইসলামী দর্শনের রূপরেখা]*, ইফা প্রকাশন নং-৩৯১, পৃ. ১৬৩।

৩৫. সূরা আল আনআম; ০৬ : আয়াত নং- ৭৬-৭৯।

www.pathagar.com

এমন ঃ **এক.** সকল প্রাকৃতিক শক্তি আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁরই অনুগত। মানুষের কোনো প্রয়োজনই নেই কোনো ধরনের প্রাকৃতিক শক্তিকে পূজা করার বা বিমূর্ত প্রাকৃতিক শক্তির মূর্তরূপ কোনো মূর্তিকে পূজা করার। সকল প্রাকৃতিক শক্তির উৎস আল্লাহ। তাই পূজা বা নত শির পাবার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই আছে। **দুই.** মানুষ আল্লাহর এক অনন্য মর্যাদাসম্পন্ন সৃষ্টি। মানুষ অসহায় নয়। স্বয়ং আল্লাহ তার অভিভাবক। তাই আল্লাহ ছাড়া আর কোনো শক্তিকে ভয় পাবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ মানুষের নেই।

নূহ 'আলাইহিস সালামের সময় পৃথিবীতে ব্যাপক প্লাবন, লোহিত সাগরের মধ্যদিয়ে চলাচলের পথ তৈরি করে দিয়ে মূসা 'আলাইহিস সালাম এবং তাঁর অনুসারীদের নিরাপদে পার করে নিয়ে অত্যাচারী শাসক ফিরাউনকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে মারা, সালিহ 'আলাইহিস সালামের দু'আ কবুল করে আল্লাহতা'আলার অনুমতিক্রমে কঠিন পর্বতের ভেতর থেকে গর্ভবতী উষ্ট্রিকে বের করে আনা, মারইয়াম (আ)-এর গর্ভে ঈসা 'আলাইহিস সালাম-এর জন্মদান এবং সমকামিতায় লিপ্ত লূত 'আলাইহিস সালাম-এর জনগোষ্ঠীকে সালফার বা গন্ধক বৃষ্টি ঝরিয়ে সমূলে ধ্বংস করা [যা বর্তমানে জর্ডানে অবস্থিত এবং ডেড সী বা মৃত সাগর নামে পরিচিত], সবই ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য। এসব ঐতিহাসিক সত্যের কোন ব্যাখ্যা প্রকৃতিবাদ [**Naturalism or Materialism**] এবং প্রয়োগবাদ [**Pragmatism**]-এর শিক্ষাদর্শন দিতে অক্ষম। ফলে এসব শিক্ষাদর্শন মানুষকে নিরেট বস্তুবাদী মূর্খতায় অথবা পরীক্ষণের নামে ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করার আহাম্মকে পরিণত করছে। এভাবে বর্তমান পৃথিবীতে বস্তুবাদের প্রভাবে একদিকে পাশবিক সমাজ এবং পরীক্ষণের অহংকারে ধর্মনিরপেক্ষতার অন্ধত্ব অর্জন করছে। আল্লাহতায়ালা যথার্থই বলেছেন, "তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয়, শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারতো। বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।"[৩৬]

১১. শিক্ষায় প্রভাব বিস্তারকারী সর্বজনীন উপাদান (Influencing Universal Factors in Education)[৩৭]

শিক্ষা ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্রমবিবর্তন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নিম্নোক্ত উপাদানগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নকে প্রভাবিত করেছে। যেসব উপাাদান জাতীয় শিক্ষার উন্নয়নে প্রভাবক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তা তুলে ধরা হল ঃ

১১.১. সামাজিক উপাদান : Social Factor

---

৩৬. সূরা আল হাজ ঃ ২২, আয়াত নং - ৪৬।

৩৭. মোঃ আব্দুস সামাদ, *তুলনামূলক শিক্ষা*, প্রভাতী লাইব্রেরি, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা। তৃতীয় প্রকাশ ২০১০, পৃ, ১২৯।

www.pathagar.com

১১.২.	সাংস্কৃতিক উপাদান :	Cultural Factor
১১.৩.	অর্থনৈতিক উপাদান :	Economic Factor
১১.৪.	রাজনৈতিক উপাদান:	Political Factor
১১.৫.	ভৌগলিক উপাদান :	Geographical Factor
১১.৬.	দার্শনিক উপাদান :	Philosophical Factor
১১.৭.	জাতিগত উপাদান :	Racial Factor

১১.১ সামাজিক উপাদান : শিক্ষা যেমন সমাজকে প্রভাবিত করে, সমাজও তেমনিভাবে শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। কারণ যে কোন সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গতি ও প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। তবে যেসব সামাজিক উপাদান সক্রিয়ভাবে শিক্ষাকে প্রভাবিত করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

ক.	জনসংখ্যা	:	Population.
খ.	পরিবার	:	Family.
গ.	সমাজ	:	Society.
ঘ.	গোষ্ঠী/দল	:	Group.
ঙ.	সম্প্রদায়	:	Community.
চ.	জনমত	:	Public Opinion.
ছ.	সামাজিক স্তর	:	Social Stratification.

১১.২ সাংস্কৃতিক উপাদান : যে কোন জাতির সাংস্কৃতিক উপাদান তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করে। শিক্ষাকে যেসব সাংস্কৃতিক উপাদান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

ক.	প্রথা	:	Customs.
খ.	সামাজিক বিশ্বাস বা লোকাচার	:	Social belief or Folk behaviour.
গ.	মূল্যবোধ	:	Values.
ঘ.	সংস্কৃতি	:	Culture.
ঙ.	সাংস্কৃতিক সংগঠন	:	Cultural Organization.
চ.	কুসংস্কার	:	Superstition.
ছ.	ভাষা ও সাহিত্য	:	Language and literature.
জ.	ধর্ম	:	Religion.
ঝ.	সভ্যতা	:	Civilization.

১১.৩ অর্থনৈতিক উপাদান : যে কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সে দেশের অর্থনৈতিক দর্শন এবং আর্থিক অবস্থার সাথে গভীরভাবে জড়িত। অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মাধ্যমে মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয়ে থাকে। মানুষের এ জীবিকা নির্বাহের ধরণ ও প্রকৃতি শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। শিক্ষাকে প্রভাবিত করে এমন অর্থনৈতিক উপাদানের মধ্যে

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য হল ঃ

ক. সম্পদ : Wealth.

খ. পেশা : Profession.

গ. চাহিদা : Demand.

ঘ. প্রতিষ্ঠান : Institution.

ঙ. প্রচার মাধ্যম : News Media.

১১.৪ রাজনৈতিক উপাদান : শিক্ষা ছাড়া কোনো ব্যক্তির কাছে রাষ্ট্র, সরকার, সংবিধান এবং রাজনৈতিক দলের ধারণা আসতে পারে না। শিক্ষাকে প্রভাবিত করে এমন রাজনৈতিক উপাদানগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. রাষ্ট্র : State.

খ. সরকার : Government.

গ. রাজনৈতিক দল : Political Party or Organization.

ঘ. সংবিধান : Constitution.

১১.৫ ভৌগলিক উপাদান : ভৌগলিক পরিবেশও শিক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কৃষি নির্ভর দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কৃষি শিক্ষার দিকে এবং শিল্প প্রধান দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রযুক্তি ও শিল্প বিষয়ের দিকে গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। শিক্ষাক্রমে শীত প্রধান দেশে শীতকালীন দীর্ঘ ছুটি এবং গরম প্রধান দেশে গ্রীষ্মকালীন দীর্ঘ ছুটি সন্নিবেশিত হয়। এভাবে ভৌগলিক পরিবেশের কারণে কোন জাতির সংস্কৃতি, সভ্যতা ও শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভাবিত হয়।

১১.৬ দার্শনিক উপাদান : যেহেতু দর্শন জীবনকে প্রভাবিত করে সেহেতু এর দ্বারা শিক্ষাও প্রভাবিত হয়। যেমন প্রাচীন যুগের সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল কেন্দ্রিক সেদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের নির্দিষ্ট গ্রীক দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। গণচীনের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি কমিউনিস্ট দর্শন। প্রাচীন ভারতের গুরুকুল [Gurukul] শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি বৈদিক দর্শনের উপর। বৌদ্ধ দর্শনের উপর বৌদ্ধ বিহার ও সন্ন্যাসী মঠ গড়ে ওঠে। বর্তমান ভারতে অনেকে জি. ও. বিনোদাভাব-এর সারাভোদ্য়্যা [Saravodya] দর্শনের উপর শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনে সহযোগিতা করছে। এছাড়া যেসব সাম্প্রতিক দর্শন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে তা হলো ঃ

ক. সমাজতন্ত্র : Socialism.

খ. গণতন্ত্র : Democracy.

গ. জাতীয়তাবাদ : Nationalism.

ঘ. মানবতাবাদ : Humanism.

ঙ. আবেগতন্ত্র : Emotionalism.

www.pathagar.com

১১.৭ জাতিগত উপাদান : পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই একাধিক জাতি রয়েছে। এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দলীয় প্রভাব শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। কার্যতঃ ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব পড়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। যেমন, ভারতের প্রভাব কাশ্মিরের উপর, ইসরাইলীদের প্রভাব গাজার ফিলিস্তিনিদের উপর, শ্রীলংকানদের প্রভাব তামিলনাড়ুদের উপর এবং বৃটিশদের প্রভাব ছিল তার ঔপনিবেশ-এর উপর। এভাবে জাতিগত উপাদান অনেক সময়ই কোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

১২. শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা [Teacher's Role in Education]

শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করেন শিক্ষকগণ। শিক্ষক হচ্ছেন শিক্ষার এক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। ব্যাপক অর্থে যিনি তাঁর অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ফলপ্রসূতার সাথে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করতে পারেন তিনিই প্রকৃত শিক্ষক। একজন শিক্ষকের ভূমিকা ও প্রভাব অনেক সময় জাতীয় ও ভৌগলিক সীমারেখা অতিক্রম করতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে উন্নত সভ্যতা ও বিশ্ব শান্তির সহায়ক হতে পারে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন তেমনি এক তুলনাহীন শিক্ষক। যার প্রভাব সকল জাতীয় ও ভৌগলিক সীমারেখা অতিক্রম করেছে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর দৃষ্টিতে মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন ও কর্ম গোটা মানব জাতির সম্পদ, শুধু মুসলিমদের নয়। তাঁর ভাষায়, "I have read sir Abdullah Suhrawardy's collections of the sayings of the Prophet with much interest and profit. They are among the treasures of mankind, not merely Muslims."[৩৮]

শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা নিম্নরূপ[৩৯] :

১২.১ নির্দেশনা দান।
১২.২ উৎসাহ দান।
১২.৩ ব্যাখ্যা দান।
১২.৪ পেশা বা বৃত্তি নির্বাচনে সহায়তা দান।
১২.৫ মূল্যবোধ পরিবেশন বা উপস্থাপন।
১২.৬ পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন।
১২.৭ সমন্বয় সাধন।

১৩. ইসলামে একজন আদর্শ শিক্ষক [An Ideal Teacher In Islam]

---

৩৮. Gandhi, Mahatma, M.K. in his Introduction to The Sayings of Muhammad by Allama Sir Abdullah Al-Mamun Al-Suhrawardy, Calcutta, March 24, 1938. Islam: What Others Say, Page-96 Sayd Ashraf Ali, Islamic Publications, 1993]

৩৯. *শিক্ষা নীতি পরিক্রমা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-১৩০।

www.pathagar.com

আদর্শ শিক্ষক একটি বিস্তৃত ধারণা। আদর্শ শব্দটি শিক্ষকের অগ্রে বা পূর্বে স্থান পাওয়ায় এরূপ অবস্থার অবতারণা হয়। আদর্শ শব্দটি আমাদের সমাজে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আদর্শ শিক্ষক কে? এ উপলব্ধির জন্য 'আদর্শ' কে হবেন সে বিষয়ে ঐকমত্য প্রয়োজন। 'আদর্শ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল 'অনুসরণীয় নমুনা" বা Examplary character। অর্থাৎ এমন একটি নমুনা, যা সম্পূর্ণ এবং খুবই উপযুক্ত সকল মানুষের, সকল সময়ে, সকল কাজে অনুসরণের জন্য। সার্বিক অর্থে আদর্শ হল, এমন একটি নমুনা, যা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সকল মানুষের সকল প্রয়োজন পূরণে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

আল্লাহতা'আলা বলেন, "তোমাদের জন্য অবশ্যই আল্লাহর রাসূলের [জীবনের] মধ্যে অনুসরণযোগ্য উত্তম আদর্শ রয়েছে, যে আল্লাহতা'আলার সাক্ষাত প্রত্যাশী ও আখিরাতকে ভয় করে এবং যে বেশি পরিমণে আল্লাহতা'আলাকে স্মরণ করে।"[৪০]

আল্লাহতা'আলা আরো বলেন, "তিনিই [আল্লাহ] উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যিনি তাদের [মানুষের] কাছে আল্লাহতা'আলার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান; তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত; ইতোপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।"[৪১]

আয়াত দুটো থেকে সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধ হয় যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ। আর তাঁকে অনুসরণকারী শিক্ষকই হলেন আদর্শ শিক্ষক এবং একজন আদর্শ শিক্ষকের কাজ প্রধানত চারটি ঃ

১৩.১ মানুষের নিকট আল্লাহর আয়াত বা নিদর্শন তুলে ধরে মানুষকে আল্লাহতায়ালা সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করা।

১৩.২ মানুষদেরকে পবিত্রকরণ অর্থাৎ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার দূর করে জীবন ও জগতের প্রকৃত সত্য জ্ঞানের আলোকে মানুষের চরিত্রকে পুনর্গঠন। মানুষের মধ্যে সু-স্বভাবের চর্চা ও লালন এবং কু-স্বভাব নিয়ন্ত্রণ ও বর্জনের মাধ্যমে ইহকালীন শান্তিময় জীবন-যাপন ও পরকালীন জীবনে আল্লাহতায়ালার কঠিন আযাব থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করা।

১৩.৩ কিতাব শিক্ষা অর্থাৎ নাযিলকৃত কুরআনে উল্লেখিত যে কোনো জ্ঞানের বিষয়ে গভীর মর্ম উপলব্ধি করতে সহায়তা করা।

১৩.৪ হিকমাত শিক্ষা, অর্থাৎ অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগের কৌশল বা প্রযুক্তির শিক্ষা দান করা যার মাধ্যমে মানুষ বস্তুজগতকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হবে এবং দক্ষতার সাথে [Efficiently] আল্লাহতা'আলার প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হবে।

আয়াতের পর্যালোচনান্তে বলা যায় আদর্শ শিক্ষক হলেন তিনি, যিনি আদর্শতম শিক্ষক

---

৪০. সূরা আহযাব ৩৩ ঃ আয়াত নং- ২১।

৪১. সূরা জুম'আ ৬২ ঃ আয়াত নং- ০২।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অনুসরণ করে সূচারুরূপে উপরে বর্ণিত দায়িত্বগুলো পালন করেন। আর কোনো নাস্তিক, মুশরিক ও মুনাফিক যেহেতু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আদর্শ বলে বিশ্বাস করে না এবং অনুসরণও করে না তাই কোন নাস্তিক, মুশরিক ও মুনাফিক কখনো আদর্শ শিক্ষক হতে পারে না। একজন আদর্শ শিক্ষকের কাছে ছাত্র, অভিভাবক ও সমাজের প্রত্যাশা অনেক। যে প্রত্যাশা পূরণ না হলে হতাশা আছড়ে পড়ে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রত্যাশা তুলে ধরা হল ঃ

ক. যথার্থ আদর্শিক জ্ঞানে মণ্ডিত হবেন।

খ. নিজস্ব ধর্মীয় দর্শন ও অন্যান্য জীবন দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান রাখবেন।

গ. আদর্শের ভিত্তিতে আল্লাহর অনুগত বান্দাহ হিসেবে ছাত্রদেরকে গড়ে তুলবেন।

ঘ. প্রতিটি পাঠ আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত করে পড়াবেন।

ঙ. আদর্শ বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডন করতে সক্ষম হবেন।

চ. সুন্দর চারিত্রিক গুণাবলী ও ব্যবহারের মাধ্যমে নিজস্ব আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করবেন।

ছ. কথা ও কাজের মধ্যে মিল রাখবেন।

জ. আদর্শ প্রচারে কুশলী ও সাহসী হবেন।

ঝ. 'ইবাদাতের concept নিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকে সামনে রেখে শিক্ষাদানে ব্রতী হবেন।

১৪. শিক্ষায় মুসলিমদের অবদান (Muslim Contribution in Education)

ইক্‌রা - এই নির্দেশই ছিল ইসলামের প্রথম শিক্ষা। ইক্‌রা মানে পড়ুন, পাঠ করুন, উপলব্ধি করুন। মানুষের হৃদয়ে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে ফেরেশতাদের সিজদা পাওয়া মানুষের সঠিক মর্যাদায় তাকে অধিষ্ঠিত করাই ছিল ইসলামের লক্ষ্য। আর মানুষ যেন তার সৃষ্টির প্রক্রিয়া অবহিত হয় এবং চিনে নেয় তার একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহকে। আল্লাহ্ বলেন, "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।"[৪২]

শিক্ষার এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করে বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে অমূল্য অবদান রেখে গেছে। একদল প্রথিতযশা ঐতিহাসিক, বিজ্ঞান-মনস্ক গবেষক ও তথ্য-উদ্ঘাটক (যেমন: জন উইলিয়াম ড্র্যাপার, গুইজট, জন ডেভেনপোর্ট, স্টেনলি লেন-পুল, এম.পি.ই বার্থেলট এবং অতি উৎসাহী ও নিবেদিত আধুনিককালের ই.জে. হোইয়ার্ড ম্যাক্স মেয়ারহফ,

৪২. সূরা 'আলাক ৯৬ ঃ আয়াত নং- ১-৫

www.pathagar.com

জর্জ সার্টন এবং ফিলিপ কে. হিট্টি) সম্পূর্ণভাবে এই ঐকমত্যে পৌছেন এবং স্বীকার করেন যে, "মুসলিম আরবগণ শুধু প্রাচীন গ্রীক, পার্শী এবং ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থাই করেননি, বহুলাংশে সে-সবের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। তাদের দূরদর্শী ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য আমরা সে-সব লেখকদের নিকট ব্যক্তিগতভাবে ঋণ স্বীকার করছি, বিশেষ করে শেষোক্ত দু'জন লেখকের (এবং অন্যান্য প্রমিত আরবি উৎস সমূহের নিকট) যাঁরা তাঁদের গ্রন্থসমূহে পর্যাপ্ত তথ্যের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। এমনকি মুসলিম ইতিহাস, কৃতিত্ব, অর্জন এবং মানব সভ্যতার বিকাশে মুসলিমদের অবদান কারো পক্ষেই ভুলে যাবার নয়।" অষ্টম শতাব্দীর গোড়া থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত মুসলিমগণ ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের দক্ষতা অর্জনে অত্যন্ত সন্ধিৎসু জাতি। তারা শুধু নিজেরাই জ্ঞান চর্চা ও অনুশীলনে নিরত ছিলো না, বরং জ্ঞানান্বেষু অন্যান্য জাতিকে তাদের অধিত জ্ঞানের অংশীদার করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ জ্ঞান সাধনার পাশাপাশি ধর্মপ্রচারক ও সমরনায়কদের সঙ্গে বিদেশেও পাড়ি জমিয়েছেন।

তারা [এইসব লেখক-সাধক-বিজ্ঞানী] রাজনৈতিক কারণে যখন বিভিন্ন সময়ে শ্রেণীগতভাবে মর্যাদাচ্যুত হয়েছেন, তখনও নতুন প্রজন্মের নিকট জ্ঞানের আলোক ছাড়ানোর কাজে বিভিন্ন ভাবে নিয়োজিত রেখেছেন নিজেদের। মুসলিমদের জ্ঞান ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ এসে এভাবেই বন্য দ্যালামাইতস, স্যালজুক, তাতারস এবং বার্বার জাতি শান্তির সন্ধান খুঁজে পেয়েছে। তবে মুসলিম সভ্যতার জন্য ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলো চেঙ্গিস খান, হালাকু খান নামে মানবতার শত্রুগণ। মামলুক সুলতানদের দ্বারা এইসব মানবতার শত্রুগণ প্রতিহত না হওয়া পর্যন্ত এরা মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের অর্জন ও কৃতিসমূহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে যাচ্ছিলো।

মিশর এবং সিরিয়া চিরদিনই সালাহ আল-দীন (জন্ম তাকরিত ১১৩৮, মৃত্যু মার্চ ১১৯৩) রোকন আল দীন বাবর (১২৬০-৭৭) এবং সাঈফ আল-দীন কালাউন (১২৭৯-৯০), প্রমুখের জন্য গৌরবান্বিত বোধ করবে। এরা যে শুধু ক্রুসেডেই গৌরবজনক ভূমিকা রেখেছিলো তা নয়, বরং জ্ঞান সাধনা, ইসলামের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও আনুগত্য, সুকুমার শিল্পকলা, স্থাপত্য শিল্প, হাসপাতাল স্থাপন এবং খাল খনন প্রভৃতি শিক্ষা ও জনহিতকর কার্যক্রমের জন্য যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আরব থেকে মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতি কিভাবে ইউরোপে বিস্তৃতি লাভ করেছে সে ইতিহাস সত্যিই চমকপ্রদ। মূলতঃ সিসিলি ও স্পেন ছিলো এসব বিস্তৃতির প্রধান উৎসস্থল। সিসিলির ছিলো খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত দু'জন শাসক - এরা হলেন রজার দ্বিতীয় এবং ফ্রেডরিক দ্বিতীয়। এছাড়া ছিলেন হোহেনস্টফেন, বিশেষত: শেষোক্তজন আলপস্ পর্বতমালা অতিক্রম করে আরবের মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতি বহন করে নিয়ে আসে ইউরোপে এবং লোথারিঞ্জিয়া [Lotharingia (Lorraine)], লাইজি (Liege), জর্জি (Gorge) এবং কোলন (Cologne) এই স্থানসমূহ ক্রমে আরব থেকে আনীত

www.pathagar.com

মুসলিমদের জ্ঞানের লালন কেন্দ্ররূপে পরিচিতি লাভ করে। স্পেন থেকে এই জ্ঞান পিরিনীস (Pyrenees) ডিঙিয়ে ক্রমে ক্রমে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়ে। এয়োদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে মুসলিমগণ যখন এক পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও কর্মকাণ্ডে স্থিত হয়ে যায়, খ্রিস্টিয় ইউরোপ তখন চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, জ্যোর্তিবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্রমেই অগ্রসরমান। বিশেষ করে কর্ডোভা, টলেডো, সেভিল এবং গ্রানাডার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে ডিগ্রী প্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ দেশে ফেরত আসার পর বর্ণিত বিষয় ও ক্ষেত্রসমূহে শনৈ শনৈ অগ্রগতি লাভ করতে থাকে। বিস্ময়করভাবে মুসলিমদের জ্ঞান তখন পরিশ্রমী অনুবাদকদের দ্বারা অনূদিত হয়ে ইউরোপে স্থানান্তরিত হতে থাকে। এসব অনুবাদকদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী খ্যাতিমান হয়ে আছেন, জেরার্ড অব ক্রেমোনা, অ্যাডেলার্ড অব বাথ, রবার্ট অব চেস্টার, মাইকেল স্কট, স্টিফেন অব সারাগোসা, ইউলিয়ম অব লিউনিস, ফিলিপ অব ত্রিপোলি। অনুবাদের মাধ্যমে ল্যাটিন জনগণের মধ্যে এসব অনুবাদকরা মুসলিম আরবদের জ্ঞান সহজলভ্য করে তোলে। কিছু বই হিব্রু ভাষাতেও অনূদিত হয়। অপরদিকে কিছু সংখ্যক হিব্রু ও ল্যাটিন গ্রন্থ ইউরোপের নিজস্ব ভাষাতেও অনূদিত হয়। ইউরোপের স্যালার্নোতে চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন শুরু হয়।

আফ্রিকার অধিবাসী কনস্টানটাইন চিকিৎসাবিজ্ঞান শেখার জন্য সৌভাগ্যক্রমে সেখানকার মেডিক্যাল কলেজে একজন আরবকে পেয়েছিলেন শিক্ষক হিসেবে। মন্টপেলিয়ার এবং প্যারিস খুব শিগগরিই এই ধারা অনুসরণ করে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। তখনকার দিনে আরবি ভাষাই ছিলো বলতে গেলে সমগ্র বিশ্বের বিদ্যা শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলগুলিতে আরবি ভাষাতেই পড়ানো শুরু হলো। বিশেষতঃ টলেডো, নারবোনে, নেপলস্, বোলোনা এবং প্যারিস প্রভৃতি শহরে আরবি ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে পড়াশোনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল স্থাপন করে।

নির্ভরযোগ্য লেখক ও গবেষকদের মতে, মুসলিম স্পেন থেকে ফ্রান্স ও তার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে এবং মুসলিম অধ্যুষিত সিসিলি থেকে ইতালিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষাবাদ বিস্তৃতি লাভ করে। স্পেনের মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক সে সময়ে যে সেচ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন এবং তাদের উদ্যানবিদ্যা তথা কৃষি-বনায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন তাতে অচিরেই দেশকে শাক-সবজি ও কৃষিজাত ফসলে স্বনির্ভর এবং সবুজাভ স্পেনে রূপান্তরিত করে। মুসলিমদের এইসব গৌরবময় অতীতের ঘটনাবহুল ইতিহাস এবং ঐতিহ্যময় কর্মকাণ্ডের কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে আবু যাকারিয়া ইবন মুহাম্মাদ আল-আওয়াম ইশবিলি বিরচিত "কিতাব আল-ফলাহাত" গ্রন্থে। আবু যাকারিয়া বিরচিত

www.pathagar.com

গ্রন্থে ন্যূনপক্ষে ৫৮৫টি প্রজাতির উদ্ভিদ নিয়ে আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রত্যেকটি লেখায় উদ্ভিদসমূহ রোপণ ও নার্সিং করার সুস্পষ্ট নিয়মাবলী সুগ্রন্থিত।[৪৩]

জ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে মুসলিমদের পারদর্শিতা ছিল না। দার্শনিক আল-কিন্দি, আল-ফারাবী, ইবন সিনা ও ইবন রুশদ সমসাময়িককালের 'জ্ঞানভান্ডার' নামে পরিচিত হতেন। আল-কিন্দি চক্ষু রোগ, রসায়ন, চিকিৎসা ও দর্শনে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি শতাধিক পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইবন সিনা মাত্র আঠার বছর বয়সে চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে দুটি বিশ্বকোষ ইবন সিনা রচনা করেছিলেন সেসব দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত চিকিৎসা জগতে পথপ্রদর্শক গ্রন্থ বলে বিবেচিত হতো। পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত তাঁর বইগুলো ষোলবার পুনঃমুদ্রিত হয়।

রসায়ন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি সকল বিষয়েই মুসলিম গবেষক ও বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট দখল ছিল। আল-খাওয়ারিযমি, মুসা বিন সাকির, আলবিরুনী, ওমর খৈয়াম, ফেরদৌসী, মাসুদী, আত-তাবারী, ইবন খলদূন - এমন আরো শত শত বিজ্ঞানী ও জ্ঞান তাপস যুগে যুগে জ্ঞান চর্চা করে বিশ্বকে যে আলোকবর্তিকা হাতে দিয়ে গেছেন, তা আজো তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে অমূল্য অবদান হিসেবে স্বীকৃত।[৪৪] মুসলিমদের জ্ঞানচর্চা চলছিল পাঁচশ বছর, আর এই সময়ই ছিল ইউরোপের ইতিহাসের অন্ধকারতম যুগ। একই সময় ভারতবর্ষ অবনত ছিল প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণাত্যের অধীন যা বৌদ্ধধর্মকে বিধ্বস্ত কিংবা বিকৃত করেছিল।[৪৫]

মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানের আলো জ্বালাবার নির্দেশ - ইকরা দিয়ে শুরু হয়েছিল ইসলামের শিক্ষার সূচনা। তা শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে মানব সভ্যতাকে আলো বিতরণ করে গেছে, কোন ধরণের মানবিক বিকৃতি ছাড়াই। মানুষকে কোনো বস্তুর বা প্রাকৃতিক কোনো শক্তির দাসত্বে পরিণত করেনি। মানুষকে যন্ত্র বলে উল্লেখ করেনি, যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শন করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে গভীর বিস্তৃতি সত্ত্বেও মানুষের যে মর্যাদা আল্লাহ দান করেছিলেন তা অক্ষুন্ন ছিল। মানুষ শুধু আল্লাহর ইবাদাতকারী অনুগত বান্দাহ হয়ে তাঁর অন্য সকল সৃষ্টির উপর মর্যাদাবান হয়েই ছিল। আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষই শিক্ষার মাধ্যমে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ সাধন করতে পারে, স্থান-কাল-পাত্রভেদে উদ্ভূত পরিস্থিতি মুকাবিলা করতে পারে এবং প্রকৃতিকে নিজের আয়ত্তে এনে কাজে লাগাতে পারে। মানুষের এই অনন্য

---

৪৩. মোহাম্মদ সা'দাত আলী, *জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমান,* আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭ জিন্দাবাহার ১ম লেন, ঢাকা-১১০০। পৃ. ৩০-৩২।

৪৪. *জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

৪৫. মানবেন্দ্রনাথ রায়, *ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা,* অনুবাদক-বদিউর রহমান, ১ম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬, প্যাপিরাস, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, পৃ. ৪৬।

www.pathagar.com

গুণ তাকে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধির মর্যাদায় আসীন করেছে। ফেরেশতাদের মাঝে আদম আ. সৃষ্টির যৌক্তিকতা প্রকাশ করতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন, 'তিনি আদমকে সবকিছুর নাম [বস্তু জ্ঞান] শিক্ষা দিয়েছেন'।[৪৬] ইসলামী শিক্ষা চায় মানুষের বৈষয়িক ও আত্মিক বিকাশ সাধন হোক এবং এর মধ্য দিয়ে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি বা খিলাফাতের যোগ্য হয়ে গড়ে উঠুক। বস্তুজগতের শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের কোনো সংকীর্ণতা নেই। আল্লাহতা'আলা ওহীর মাধ্যমে যা শিক্ষা দিয়েছেন এবং মানুষ তাদের অর্জিত জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রয়োগ করে মানবকল্যাণমুখী যা অর্জন করেছে, সবই ইসলামে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। 'প্রকৃতিকে বিচার বিশ্লেষণ করে মানুষ যে সকল জ্ঞানের দুয়ার উন্মোচন করেছে তা কখনো ওহীর জ্ঞানের বিরোধী হতে পারেনা। কারণ এর একটি হল 'কালামুল্লাহ' বা আল্লাহর বাণী আর অপরটি হল 'খালকুল্লাহ' বা আল্লাহর সৃষ্টি।'[৪৭] আল্লাহ মানুষকে যে মৌলিক শক্তি দান [অর্থাৎ শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তর (উপলব্ধির জন্য)] করেছেন, তার সাহায্যে মানুষ যে তার নিজের কল্যাণে চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয় বা অন্তরকে কাজে লাগাতে সক্ষম হবে, সে বিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "এবং আল্লাহ তোমাদেরকে বের করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তর [উপলব্ধির জন্য] দিয়েছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"[৪৮]

ইসলামের দৃষ্টিতে দেহ ও মন উভয়টি নিয়েই মানুষ। সুতরাং যে শিক্ষা মানুষের দেহ ও মন উভয়টির বিকাশ সাধন করে, স্রষ্টার সাথে মানুষের পরিচয় ঘটায়, নৈতিকতা ও মাধুর্য বৃদ্ধি করে, কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার উন্নতি সাধন করে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করে তা-ই ইসলামী শিক্ষা। আমরা যেটাকে সাধারণ শিক্ষা বলে অভিহিত করি, তার মাঝে যদি আল্লাহর কুদরতের পরিচয় পাওয়া যায় এবং সেটাকে মানবতার কল্যাণে ব্যয় করা হয় তাহলে তাও ইসলামী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।[৪৯]

ইসলামের সোনালী যুগে সাধারণ শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষা নামে শিক্ষার বিপরীতমূখী দুটি প্রকরণ ছিল না, বরং যারাই কুরআন ও হাদীসের চর্চা করতেন, তারাই সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের চর্চা করেছেন। ইবন রুশদ, ইমাম রাজী, গাযালী প্রমুখ মনীষী এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মুসলিম বিশ্ব যখন সাম্রাজ্যবাদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল তখন সাম্রাজ্যবাদী চক্র ইসলামী চেতনার শিক্ষার ধারাকে গুরুত্বহীন করার লক্ষ্যে মুসলিমদের মাঝে সাধারণ শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষা নামে দুটি ধারা তৈরি করে

---

৪৬. সূরা বাকার ০২ ঃ আয়াত নং- ৩১।
৪৭. অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ যাইনুল আবেদীন, *আদর্শ শিক্ষকের পুঁজি*, মিল্লাত পাবলিকেশন্স ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১ মার্চ ২০০৭, পৃ. ১৪।
৪৮. সূরা নাহল ১৬ ঃ আয়াত নং- ৭৮।
৪৯. *আদর্শ শিক্ষকের পুঁজি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

www.pathagar.com

দিয়ে যায়; যার সুদূরপ্রসারী ফলাফল দাঁড়িয়েছে এই -মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলিমরা আজ ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে দাঁড়ানোর শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। অথচ ইসলাম জ্ঞানকে এভাবে কখনই বিভক্ত করেনি। জ্ঞান মুসলিমদের হারানো সম্পদ। "আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : জ্ঞানের কথা বিজ্ঞজনের হারানো সম্পদ। সে যেখানেই তা পাবে সে-ই হবে তার সবচেয়ে বেশি অধিকারী।"[৫০] হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জ্ঞানকে সাধারণ শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষা নামে কোন বিভেদ করেননি। এভাবে জ্ঞানকে বিভক্ত করা কোনো মুসলিমেরই উচিত নয়। শোভনীয় নয়। এ ধরনের বিভেদ আত্মঘাতি। ঐক্য বিনষ্টকারী। মানুষের কল্যাণে যে জ্ঞানই উপকারী হয় সবই ইসলামী শিক্ষা।

১৫. ইসলামে শিক্ষার ভূমিকা (Role of Education In Islam)

দেহ ও মন দিয়ে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মানুষের শিক্ষাব্যবস্থায় দেহ ও মনের প্রয়োজন পূরণ হয়, দেহ ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়, সে ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দেহ ও মন উভয়টির প্রয়োজন না মিটলে শিক্ষা মানুষকে একদেশদর্শীরূপে গড়ে তোলে। বস্তুবাদী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিলে মানুষ পশুর চেয়েও নিম্নমানের আচরণে বেড়ে ওঠে। আবার শুধু মনের বা আধ্যাত্মিক জাতীয় অর্থাৎ শুধু উর্ধ্ব জগত বিষয়ে শিক্ষাকে প্রাধান্য দিলে মানুষ বাস্তব জীবনে কোন কাজেই লাগেনা। বাস্তব জীবন পরিচালনায় সামান্যতম কোনো অবদান রাখতে সক্ষম হয় না। একমাত্র ইসলামী শিক্ষাই এই উভয়ের সমন্বয় করে মানুষের দেহ ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়ক হবার যোগ্যতা রাখে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ইসলামী শিক্ষা মানব সমাজে নিম্নোক্ত ভূমিকা রেখে যায় ঃ

১. মানুষের দেহ ও মনের চাহিদা যথার্থভাবে পূরণ করে।
২. সৎ, চরিত্রবান ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে।
৩. মানুষকে তার স্রষ্টা আল্লাহর সাথে পরিচিত করে।
৪. মানুষের ইহকালীন শান্তি [রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি সকল ধরনের সমস্যার সমাধান দিয়ে] ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করে।
৫. মানুষের মাঝে পারস্পরিক মমত্ববোধ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে।
৬. আল্লাহর বিশাল সৃষ্টি প্রাকৃতিক শক্তির গূঢ় রহস্য উদ্ভাবন ও কলাকৌশল আবিস্কার করে মানবতার কল্যাণ সাধন করে।
৭. মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে বা থাকতে সহায়তা করে।
৮. হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল 'ইবাদ বা স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে।

---

৫০. তিরমিযী/ মিশকাত। *একত্রেবাবে হাদীস, ১ম ও ২য় খণ্ড*, আব্দুস শহীদ নাসিম অনূদিত, হাদীস নং-৪২,পৃ. ৫৬।

www.pathagar.com

৯. জাগতিক শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়ে ভারসাম্যমূলক জীবন গড়তে সহায়তা করে।

১০. মানুষকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে অকুতোভয় করে তোলে।

১৬. ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Features of Islamic Education)

ক. কল্যাণকর জ্ঞান মাত্রই ইসলামী ঃ

আল্লাহর কাছে মুমিনদের স্বপ্নের চাওয়া, "হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করুন। আর পরকালের কল্যাণও। আর আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন"[৫১]

আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, " ..... অবশ্যই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমান ও পৃথিবীর অধিবাসীবৃন্দ, এমন কি গর্তের পিঁপড়া, এমনকি পানির মাছ ঐ ব্যক্তির জন্য দু'আ করতে থাকে যে ব্যক্তি লোকদেরকে কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষা দেয়।"[৫২]

আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জ্ঞানকে দুনিয়াবী ও ইসলামী এভাবে কোনো পার্থক্য করেননি। কল্যাণকর জ্ঞান মাত্রই ইসলামী। তা দুনিয়ার হোক বা আখিরাতের কল্যাণ হোক।

খ. মূর্খতার অবসান ও ইসলামের যথার্থ জ্ঞান অর্জন ঃ

আল্লাহ বলেন, " বল, যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কি সমান?"[৫৩] আল্লাহ আরো বলেন, "তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারতো। বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। "[৫৪]

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "সকল মুসলিমের জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করা ফারয"[৫৫]

'উসমান ইবনু আফফান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে আলকুরআন শেখে এবং অপরকে তা শেখায়।"[৫৬]

একজন মুসলিমের মূর্খের মত জীবন পরিচালনার অবকাশ নেই। হৃদয়কে অন্ধ রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে অসভ্যতা। আল্লাহর আদেশ অমান্যের শামিল। নিজের হৃদয়কে জ্ঞান দিয়ে আলোকিত করে একজন আলোকিত মানুষ হিসেবে মুমিনকে সমাজে কল্যাণময় ভূমিকা রেখে যেতে হয়।

---

৫১. সূরা আল বাকারা ০২ ঃ আয়াত নং- ২০১।
৫২. সহীহ জামে আত তিরমিযী।
৫৩. সূরা আয্ যুমার ৩৯ ঃ আয়াত নং- ০৯।
৫৪. সূরা হাজ ২২ ঃ আয়াত নং- ৪৬।
৫৫. মুসনাদে আহমদ।
৫৬. সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

গ. জ্ঞানের মূল উৎস আল্লাহতা'আলা একমাত্র নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী ঃ

আল্লাহ বলেন, "হে নবী বলুন, আল্লাহই সমস্ত জ্ঞানের মালিক।"[৫৭] আল্লাহ আরো বলেন, "গোপন-প্রকাশ্য, দৃশ্য-অদৃশ্য, মূর্ত-বিমূর্ত সব কিছুর জ্ঞান তাঁর কাছে রয়েছে এবং একমাত্র তাঁরই কাছে আছে।"[৫৮]

আল্লাহ বলেন, "তাঁর জ্ঞাত বিষয়ের কেনো কিছুই মানুষ নিজের আয়ত্বাধীন করতে পারেনা, তবে তিনি যতটুকু চান তা ব্যতীত।"[৫৯]

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমার কাছ থেকে একটি কথা শিখে থাকলেও লোকদের নিকট তা পৌঁছাও।"[৬০]

জীবনের প্রয়োজনে যত প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করতে হয় তা সবই ওহীর দৃষ্টিকোণ বা ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে শিক্ষা নিতে হবে, দিতেও হবে। কারণ একমাত্র আল্লাহতা'আলাই নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী ।

ঘ. শুধু আল্লাহর 'ইবাদাত ও প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা অর্জন ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "আমি জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার 'ইবাদাতের জন্য।"[৬১] মহান আল্লাহ আরো বলেন, "আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে খালিফা সৃষ্টি করছি।"[৬২]

সকল ধরণের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের সাথে মানব রচিত বিধানের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যোগ্যতা অর্জন করে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করা। এ লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থার উচ্চস্তরে মুসলিম বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, শাসক, বিচারক, অর্থনীতিবিদ, সেনাপতি ও রাষ্ট্রদূত সহ উন্নতমানের মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ্ ও মুজতাহিদ সৃষ্টির উপযোগী কারিকুলাম তৈরি করা।

ঙ. পরমতসহিষ্ণুতা ঃ

আল্লাহতায়ালা বলেন, "তোমরা সৎকাজ ও তাকওয়ার প্রসারে সহযোগিতা কর। পাপাচার ও সীমা লংঘনের কাজে সহযোগিতা করোনা।"[৬৩]

মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ

৫৭. সূরা মুল্ক ৬৭ ঃ আয়াত নং- ২৬।
৫৮. সূরা হাশর ৫৯ ঃ আয়াত নং- ২২।
৫৯. সূরা আল বাকারা ০২ ঃ আয়াত নং- ২৫৫।
৬০. সহীহ আল বুখারী।
৬১. সূরা আয যারিয়াত ৫১ ঃ আয়াত নং- ৫৬।
৬২. সূরা আল বাকারা ০২ ঃ আয়াত নং- ৩০।
৬৩. আল-কুরআনুল করীম; সূরা মায়িদা ০৫ ঃ আয়াত নং- ০২।

www.pathagar.com

অমুসলিমকে হত্যা করল সে জান্নাতের ঘ্রাণও ভোগ করতে পারবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ ৪০ বছরের দূরত্ব হতেও অনুভব করা যাবে।'[৬৪]

নিছক ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে অমুসলিমদের হত্যা করা, আক্রমণ করা বৈধ নয়। এছাড়া অমুসলিমদের সাথে আলোচনা বা তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠানে ইসলামের আপত্তি নেই। কিন্তু তা হতে হবে ভদ্রজনোচিত পন্থায়। পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। হৃদয়গ্রাহী যুক্তি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। আল্লাহতায়ালা বলেন, "আহলে কিতাবের সাথে তর্ক-বির্তক করতে হলে একমাত্র ভদ্রজনোচিত পন্থায় তা কর।"[৬৫]

অমুসলিমদের সাথে অভদ্র ও অশোভন আচরণকে ইসলাম অনুমোদন দেয়নি। বৈধ করেনি। এমনকি ইসলামের পরিপন্থী আকীদা বিশ্বাস পোষণ করার জন্য তাদেরকে গালিগালাজ করারও অনুমতি দেয়নি। আল্লাহতায়ালা বলেন, "যারা আল্লাহতায়ালাকে ছাড়া অন্যান্য উপাস্যের পূজা করে, তাদেরকে গালি দিও না। তাহলে তারা শত্রুতা ও অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহকে গালি দেবে। "[৬৬]

চ. পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা গবেষণা করা ঃ

আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য, যারা দাড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করেননি, আপনি পবিত্র, আপনি আমাদের জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন।' "[৬৭]

আল্লাহ আরো বলেন, "তুমি কি দেখ না, আল্লাহ আসমান হতে বৃষ্টিপাত করেন; এবং আমি এর সাহায্যে নানা রঙের ফল বের করি। আর পাহাড়ের মধ্যে আছে নানা রঙের পথ - সাদা, লাল ও নিকষ কালো। মানুষ, জীব-জন্তু ও গৃহপালিত পশুগলোরও রয়েছে নানা রঙ। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে; আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।"[৬৮]

পৃথিবী ও মহাবিশ্বে বিরাজমান বহু সংখ্যক সৃষ্টির দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আল্লাহতায়ালা, যাতে মানুষ তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। আর চিন্তা-গবেষণা করে আল্লাহর এসব সৃষ্টির তাৎপর্য উপলব্ধিকারীরাই বলতে সক্ষম হয়, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করেননি, আপনি পবিত্র।'

---

৬৪. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল জিয্ইয়া, হাদীস নং - ৩১৬৬।
৬৫. সূরা আনকাবুত ২৯ ঃ আয়াত নং- ৪৬।
৬৬. সূরা আল আন'আম ০৬ ঃ আয়াত নং- ১০৮।
৬৭. সূরা আলে-ইমরান ০৩ ঃ আয়াত নং- ১৯০ ও ১৯১।
৬৮. সূরা ফাতির ৩৫ ঃ আয়াত নং- ২৭ ও ২৮।

www.pathagar.com

ছ. মানবতার মুক্তির জন্য চিন্তা ঃ

মহান আল্লাহ বলেন, "আমি কি তোমার জন্য তোমার বক্ষ প্রশস্ত করিনি? আর আমি নামিয়ে দিয়েছি তোমার থেকে তোমার বোঝা, যা তোমার পিঠ ভেঙ্গে দিচ্ছিল।"[৬৯]

আল্লাহ বলেন, "আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"[৭০]

আল্লাহ আরো বলেন, "ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।"[৭১]

জাহিলিয়াত তথা মূর্খতার যুগে নৃশংসতাই ছিল মানবতার সংজ্ঞা। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছিল। সমাধানের প্রত্যাশায় তার হৃদয়টা হয়ে পড়েছিল ভারাক্রান্ত। অধিক শোকে পাথর। লাঘবহীন ভারী এক কষ্টের বোঝা তাঁকে ক্রমাগত যন্ত্রণাক্লিষ্ট করছিলো। মানুষের মুক্তির দিশার জন্য উচাটন মনে আল্লাহ নাযিল করলেন কুরআন। মানবজাতির মুক্তির সনদ।

জ. অহংকার নয়, বিনয় ও নম্রতা ঃ

মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দীর্ঘ ২৩ বছরের সংগ্রাম সফল হবার পর বিজয় প্রাক্কালে আল্লাহ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন বিনয়ের এবং ক্ষমা প্রার্থনার। আল্লাহ বলেন, "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি তো তাওবা কবুলকারী।"[৭২]

আল্লাহ আরো বলেন, "ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না; তুমি তো কখনই পদভারে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না।"[৭৩]

ঝ. অনুমান নয়, জ্ঞান ও যাচাই

আল্লাহ বলেন, "যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না; চক্ষু, কর্ণ, হৃদয় - এসব প্রত্যেকটির সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।"[৭৪]

---

৬৯. সূরা ইনশিরাহ ৯৪ ঃ আয়াত নং- ১,২ ও ৩।
৭০. সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ আয়াত নং- ১০৭।
৭১. সূরা আল বাকারা ০২ ঃ আয়াত নং- ১৭৭।
৭২. সূরা নাসর ১১০ ঃ আয়াত নং- ১, ২ ও ৩।
৭৩. সূরা বনী ইসরাঈল ১৭ ঃ আয়াত নং- ৩৭।
৭৪. সূরা বনী ইসরাঈল ১৭ ঃ আয়াত নং- ৩৬।

www.pathagar.com

আল্লাহ আরো বলেন, "হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বসো এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।"[৭৫]

মুসলিম মাত্রই জ্ঞান নির্ভর আচরণ করতে হবে। অন্ধত্ব ও মূর্খতা মুসলিমদের জন্য শোভনীয় নয়।

ঞ. তাত্ত্বিক নয়, ব্যবহারিক ঃ

আল্লাহ বলেন, "মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে; আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে, যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে - যদি তারা ফিরে আসে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে ফায়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।"[৭৬]

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমার ভাইকে সাহায্য কর। সে যালিম হোক কিংবা মাযলুম। একজন বললো, হে আল্লাহ রাসূল, মাযলুমকে আমরা সাহায্য করবো এটা তো বুঝলাম কিন্তু যালিমকে আমরা কেমন করে সাহায্য করবো? তিনি বললেন, "তুমি তার [যালিমের] হাত শক্ত করে ধরে রাখবে।"[৭৭]

ইসলাম তাত্ত্বিক কোনো দর্শন নয়; ইসলাম ব্যবহারিক জীবনের বাস্তব নির্দেশনা। প্রয়োজনে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছে ইসলাম; তবে কোনো অবস্থাতেই সুবিচারকে উপেক্ষা করে নয়।

ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্যের আলোকে শিক্ষিত হওয়া এবং এ শিক্ষার আলোকে একটি জাতি গড়ে তোলায় সবার অংশ গ্রহণের ফলেই কাংখিত পৃথিবীর স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। এ কাজে একজন অপর জনের খুঁত ও দোষকে উপেক্ষা করে প্রত্যেকের ইতিবাচক দিকটিকে উৎসাহিত করা এবং প্রত্যেকের নিজ মেধা ও দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করা।

১৭. ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি (Bases of Islamic Education)

ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তিগুলো হলঃ

১. **তাওহীদ ঃ** মানুষের ইবাদাত পাবার যোগ্যতা ও অধিকার একমাত্র এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহরই আছে।

২. **রিসালাত ঃ** আল্লাহ মানব জাতিকে সত্য পথ দেখাবার জন্য বিধানসহ নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন।

---

৭৫. সূরা হুজুরাত ৪৯ ঃ আয়াত নং- ০৬।
৭৬. সূরা হুজুরাত ৪৯ ঃ আয়াত নং- ০৯।
৭৭. সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং-২২৬৫।

www.pathagar.com

৩. **আখিরাত ঃ** এ পৃথিবীর পরবর্তী জীবনে পৃথিবীর সমুদয় কর্ম সম্পর্কে জবাবাদিহি করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৪. **খিলাফাত ঃ** এ পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহতায়ালার নির্দেশ মুতাবিক তাঁরই বিধান ব্যক্তিক, সামষ্টিক ও আন্তর্জাতিক জীবনে বাস্তবায়ন করবে।

৫. **বিশ্বভ্রাতৃত্ব ঃ** পৃথিবীর সকল মানুষ আদম (আ) ও হাওয়ার (রা) সন্তান। এজন্য তারা পরস্পর ভাই ভাই। কৃত্রিম কোন কারণে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা যাবেনা।

৬. **ব্যক্তি-স্বাধীনতা ঃ** মানুষ স্বাধীন ভাবে জন্ম গ্রহণ করে এবং স্বাধীন ভাবে একমাত্র আল্লাহতায়ালার বান্দা হিসেবে জীবন যাপন করবে।

৭. **মৌলিক অধিকার ঃ** অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার পূরণ হওয়া।

৮. **সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ঃ** সৎকাজে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা।

১৮. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Islamic Education System)

শিক্ষক, ছাত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা নীতি ও শিক্ষা দর্শন নিয়ে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা উভয়ই কার্যকর রয়েছে। আর চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশ একটি ঐক্যবদ্ধ জাতির পরিবর্তে একটি দ্বিধাবিভক্ত জাতি হিসেবে বেড়ে উঠছে। বিগত ৪০ বছরেও এর কোনো সমাধান আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ করতে সক্ষম হননি। অবস্থাদৃষ্টে যে কোন বিদগ্ধ ব্যক্তির মনে হতে পারে বাংলাদেশ এক অজানা গন্তব্যের পথে চলছে। এ অবস্থার অবসান হওয়ার প্রত্যাশা সবার। এই প্রত্যাশায় নিম্নে উভয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি তুলনামূলক চিত্র :

ক্রম.	বিষয়	ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা	ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা
০১.	জীবনের লক্ষ্য	মানবজীবনের কোন স্থির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তি তার চিন্তা ও কর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোনো বিশ্বাস বা ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেনা। এখানে মানুষ তার	ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবনের লক্ষ্য সুনির্ধারিত। প্রবৃত্তি দ্বারা তাড়িত হওয়ার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের কল্যাণ

www.pathagar.com

		প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। শিক্ষার বিষয়বস্তু জনগণের বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ইচ্ছামত নির্ধারিত হয়। পার্থিব জগতই সব। এ শিক্ষায় বস্তুর উর্ধ্বে কোন রকম চিন্তা-চেতনার স্থান নাই।	উভয়ই ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ। তবে আখিরাতমুখী জীবন পরিচালনাই ইসলামের স্থির লক্ষ্য।
০২.	শিক্ষা সুযোগ না অধিকার	অর্থই শিক্ষা অর্জনের নিয়ামক। যার অর্থ নেই তার শিক্ষা অর্জনের সুযোগ নেই। শিক্ষা সুযোগ, কোন অধিকার নয়। তবে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচি গৃহীত হয়।	প্রতিটি নর নারীর ঈমানসহ মৌলিক শিক্ষা অর্জন বাধ্যতা মূলক। শিক্ষা সুযোগ নয় অধিকার। এ অধিকার বাস্তবায়নে রাষ্ট্রকে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে হয়।
০৩.	শিক্ষানীতির মৌল ভিত্তি	স্থায়ী আদর্শহীন বিধায় বিভিন্ন সময়ে শিক্ষানীতি পরিবর্তিত হতে থাকে। এতে জাতি কোন সুনির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছার সুযোগ পায়না। সর্বদাই ভাঙ্গা-গড়ার মহড়া চলে।	শিক্ষনীতির মৌল ভিত্তি বা কাঠামো অপরিবর্তিত থাকে।
০৪.	শিক্ষার সর্বজনীনতা	সর্বজনীনতা অস্বীকৃত। জাতীয়তাই মানবতাকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করে।	রক্ত, বর্ণ, ভাষা, গোত্র, জাতীয়তা ও প্রতিপত্তির জন্য ইসলামে কারও বিশেষ মর্যাদা নেই। বরং রক্ত, বর্ণ, ভাষা, গোত্র, জাতীয়তা ও প্রতিপত্তি নির্বিশেষে ইসলাম মানুষকে সামাজিকভাবে সমান মর্যাদা দিয়েছে। ইসলামে শিক্ষা সর্বজনীন।

www.pathagar.com

০৫.	শিক্ষাদর্শন বা শিক্ষাদর্শ	শিক্ষা গ্রহণ ও দানের ক্ষেত্রে স্থায়ী আদর্শ নেই । ফলে তা সদা পরিবর্তনশীল।[৭৮]	ইসলাম আল্লাহতায়ালা কর্তৃক নাযিলকৃত ও মনোনীত স্থায়ী জীবনাদর্শ। মৌলিক শিক্ষা অপরিবর্তনীয়।
০৬.	আদর্শ চরিত্র	কোন আদর্শবাদী মানবিক চরিত্রের উন্মেষ ঘটে না।	আর্দশ চরিত্র গঠনই লক্ষ্য।
০৭.	মূল্যবোধের ঐক্য	মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক অবস্থা বিরাজ করে। মূল্যবোধের ঐক্য নেই।	মূল্যবোধের ঐক্যই ইসলামী মূল্যবোধের পরিচয়। সাংঘর্ষিক কখনই নয়।
০৮.	শাসক-শোষক সম্পর্ক	ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিত্তশালী শ্রেণী, শিক্ষার সকল সুযোগ গ্রহণপূর্বক বিত্তহীনদের অধিকতর	ইসলামে বিত্তবানদেরকে স্বতর্স্ফূতভাবে বিত্তহীনদের অধিকার আদায় করতে হয় বিধায়

৭৮. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৪০টি বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু স্থায়ী আদর্শ না থাকায় এখনো এদেশের জন্য একটি কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৪ সনে ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিলো। কিন্তু বাংলাদেশের মুসলিম জাতিসত্ত্বার চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী হওয়ায় তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। পরবর্তী কালে আরো কয়েকটি শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছিলো। কিন্তু ড. কুদরাত-ই-খুদা কমিশন প্রণীত শিক্ষানীতি অবলম্বন করে এগুতে গিয়ে সেই কমিটিগুলোও জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। কিন্তু কুদরাত-ই-খুদা কমিশন কর্তৃক প্রণীত এবং জাতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত সেই শিক্ষা নীতিকেই ভিত্তি বানিয়ে সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০০৯ কর্তৃক সুপারিশের আলোকে নতুন শিক্ষানীতি সম্প্রতি দেশে চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষানীতির ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলতে গেলে বলতে হয়, ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের প্রাক্কালে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি অঙ্কশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ও ব্যাকরণ শিক্ষার প্রচলন ছিল। মুসলিম শাসনের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। মক্তব ও মাদ্রাসা, মাসজিদ ও মঠ এবং ব্যক্তিগত বাড়িতেও শিক্ষা কর্ম চলতো এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ণ-গোত্র-ধর্ম নির্বিশেষে সবার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্থায়ী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সে শিক্ষানীতি পরিচালিত হওয়ায় দীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে শিক্ষানীতিতে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন করতে হয়নি। কিন্তু, বৃটিশ শাসনের পত্তন হবার পর হতে এর ইতিহাস সদা পরিবর্তনশীলতার ইতিহাস। তার কিছু নমুনা উল্লেখ করছি ঃ এডামস রিপোর্ট (১৮৪৪); উডস ডেসপাস (১৮৫৪); হান্টার কমিশন (১৮৮২); লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার (১৮৯৮); স্যাডলার কমিশন (১৯১৭); সার্জেন্ট পরিকল্পনা (১৯৪৪); আকরাম খান কমিটি (১৯৫২); আতাউর রহমান খান কমিশন (১৯৫৭); শরীফ কমিশন (১৯৫৮); এয়ার মার্শাল নূর খান শিক্ষা কমিশন (১৯৬৯); জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ এবং সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০০৯।

www.pathagar.com

		শোষণের সুযোগ পেয়ে থাকে। ধনী-দরিদ্রের মাঝে সংঘাত বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টির মানসিকতা সৃষ্টি করে।	বিত্তশালী-বিত্তহীন সকলের শিক্ষার সমান সুযোগ। তবে এই সুযোগকে নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকেই ভূমিকা রাখতে হয়। ইসলামে মানুষে-মানুষে শাসক-শোষক সম্পর্ক স্বীকৃত নয়।
০৯.	সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ	শিক্ষক ছাত্রের মাঝে কেবল আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে জ্ঞান বিতরণ করে বলে সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ দিন দিন নিঃশেষ হতে থাকে।	জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের ব্যাপারে ইসলামে অর্থ মুখ্য নয়। তাই শিক্ষক ও ছাত্রের মাঝে সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গভীর হয়ে থাকে।
১০.		অবাধ স্বাধীনতা, জাতীয়তা, ও উগ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধ মানুষকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।	ইসলামে কোন কিছুই অবাধ নয়। সবকিছুই পরিমিত, প্রয়োজন মাফিক। এখানে উগ্রতার কোনো অবকাশ নেই।
১১.	ঈমান বা আল্লাহতায়ালার উপর আস্থা ও বিশ্বাস	ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা শিরক বা নাস্তিক্যবাদ ভিত্তিক। আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বে অবিশ্বাসপূর্ণ শিক্ষাধারা। এ শিক্ষা সম্পূর্ণ বস্তুবাদনির্ভর।	ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা আল্লাহতায়ালার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস-কে ঘিরে। এ শিক্ষা বস্তুকেন্দ্রিক যেমন নয় আবার বস্তুবিবর্জিতও নয়।
১২.	পরমতসহিষ্ণুতা	এ শিক্ষা শিক্ষার্থীদের বস্তুপূজারী ও অহেতুক ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব এবং উগ্র ধর্মবিরোধী করে তোলে।	ইসলামী শিক্ষা মানুষকে বস্তু পূজারী করে না। আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদাতকারীরূপে গড়ে তোলে। সেই সাথে পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুও করে।

www.pathagar.com

১৯. নৈতিকতা কি? (What is morality?)

সহজভাবে বলতে গেলে নৈতিকতা হলো চালক বা ড্রাইভার এবং নিয়ন্ত্রকও। শিক্ষা এ চালকের উৎস। শিক্ষা মানুষের অন্তরে বা প্রাণে বা আত্মায় এ চালক ইনস্টল বা স্থাপন করে। বস্তুবাদী ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা হলে চালক বা নৈতিকতা সে শিক্ষার অনুরূপ বস্তুবাদী নৈতিকতা হবে। আর শিক্ষা, ইসলামী হলে চালক বা নৈতিকতা মানবিক হবে। কারণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায় মানুষকে যন্ত্র বিবেচনা করা হয়। ফলে এখানে যান্ত্রিক নৈতিকতা সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে ইসলাম মানুষের আত্মাকেই প্রকৃত মানুষ বিবেচনা করে। ফলে ইসলামের নৈতিকতা হয় মানবিক। এ প্রসংগে কম্পিউটারকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করছি। কম্পিউটারের সচলতার জন্য তিনটি উপকরণ প্রয়োজন। এক. হার্ডওয়্যার দুই. অপারেটিং সিস্টেম তিন. ড্রাইভার সফটওয়্যার। মানুষেরও তেমনি। কম্পিউটারে হার্ডওয়্যার হচ্ছে হার্ডডিস্ক, সিপিইউ, মনিটর ইত্যাদি যা খালি চোখে দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়। আর মানুষের হার্ডওয়্যার হল তার পুরো শরীর বা বডি, যা খালি চোখে দেখা যায় এবং স্পর্শও করা যায়। কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম হলো Windows XP, Windows 7, Windows vista ইত্যাদি যা খালি চোখে দেখা যায় না এবং স্পর্শও করা যায় না। আর মানুষের অপারেটিং সিস্টেম হলো তার রূহ বা আত্মা বা Soul, যা খালি চোখে দেখা যায় না এবং স্পর্শও করা যায় না। কম্পিউটারের ড্রাইভার সফটওয়্যার হলো কম্পিউটারের চালক ও নিয়ন্ত্রক। একে কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেমে ইন্সটল বা স্থাপন করতে হয়। তারপর ড্রাইভার সফটওয়্যারটি কম্পিটারের অপারেটিং সিস্টেমকে কাজে লাগিয়ে যে সেবার জন্য ড্রাইভার সফটওয়্যার ইন্সটল করা হয়েছে সে কাংখিত সেবাই দেয়। ড্রাইভার সফটওয়্যারও খালি চোখে দেখা যায় না এবং স্পর্শও করা যায় না। তেমনি মানুষের ড্রাইভার সফটওয়্যার হলো তার নৈতিকতা। শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নৈতিকতা মানুষের আত্মা বা প্রাণে ইনস্টল বা স্থাপন হয়, মানুষের আত্মাকে কাজে লাগিয়ে অর্জিত সে নৈতিকতা মানুষকে সে ধরণের সেবাই দেয়, যা সে আত্মায় ইনস্টল বা বপন করেছে। নৈতিকতা মানুষের আত্মার চালক এবং মানুষের ব্যবহার নিয়ন্ত্রক।

২০. আভিধানিক অর্থে নৈতিকতা [Literal Meaning of Morality] ঃ

আভিধানিক অর্থে, নৈতিকতা বা Morality, ল্যাটিন শব্দ moralitas [manner, character, proper behavior] হতে উদ্ভুত। উইকিপিডিয়ার ভাষায়, Morality is a sense of behavioral conduct that differentiates intentions, decisions, and actions between those that are good (or right) and bad (or wrong). A moral code is a system of morality (for example, according to a particular philosophy, religion, culture, etc.) and a moral is any one practice or teaching within a moral code. Immorality is the active

www.pathagar.com

opposition to morality, while amorality is variously defined as an unawareness of, indifference toward, or disbelief in any set of moral standards or principles.

উইকিপিডিয়ার দৃষ্টিতে নৈতিকতার দু'টি প্রধান অর্থ রয়েছে। একটি বর্ণনামূলক বা "descriptive" অন্যটি "normative" বা শৃংখলামূলক। যার বিস্তারিত নিম্নরূপ :

- In its "descriptive" sense, *morality* refers to personal or cultural values, codes of conduct or social mores that distinguish between right and wrong in the human society. Describing morality in this way is not making a claim about what is objectively right or wrong, but only referring to what is considered right or wrong by an individual or some group of people (such as a religion). This sense of the term is addressed by descriptive ethics.
- In its "normative" sense, *morality* refers directly to what is right and wrong, regardless of what specific individuals think. It could be defined as the conduct of the ideal "moral" person in a certain situation. This usage of the term is characterized by "definitive" statements such as "That person *is* morally responsible" rather than descriptive statements like "Many people believe that person is morally responsible." These ideas are explored in normative ethics. The normative sense of morality is often challenged by moral nihilism (which rejects the existence of any moral truths) and supported by moral realism (which supports the existence of moral truths).[৭৯]

২১. ইসলামে নৈতিকতা, নৈতিকতা তত্ত্ব ও নৈতিকতার মানদণ্ড [Morality, Ethics and Moral Standard In Islam] :

আভিধানিকভাবে, morals [নৈতিকতা] are individual principles of right and wrong, and ethics [নৈতিকতা তত্ত্ব] is the philosophical discussion of morality. A system of ethics deals with sets of those moral principles. The terms ethics and morality are often used interchangeably and can mean the same in casual conversation, but morality refers to moral standards or conduct while ethics refers to the formal study of such standards and

৭৯. http://en.wikipedia.org/wiki/Morality

www.pathagar.com

conduct. For theists [আস্তিক], morality typically comes from gods and ethics is a function of theology; for atheists [নাস্তিক], morality is a natural feature of reality or human society and ethics is a part of philosophy.

ইসলামে নৈতিকতার রূপটি অবিভাজ্য। উইকিপিডিয়া অভিধানের মতে ইসলামে নৈতিকতার দ্বৈত অর্থ নেই। ইসলামে কোন বর্ণনামূলক বা "descriptive" জাতীয় নৈতিকতা নেই। ইসলামে সবই "normative" বা শৃংখলামূলক। তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এর প্রয়োগে ভিন্নতা রয়েছে।

আল্লাহ বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"নিশ্চয়ই তুমি মহান নৈতিক চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।"[৮০]

আর আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাঝেই রয়েছে অনুসরনীয় সর্বোত্তম মানবীয় আদর্শ। আল্লাহ আরো বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর সাক্ষাত প্রত্যাশী ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য তো রাসূলুল্লাহর মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[৮১] অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পুরো জীবনটাই অনুসরণীয় এবং তা শৃংখলামূলক।

আয়াত দুটো বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাহলো আল্লাহ তাঁর অবতীর্ণ কিতাবে শুধু কিছু বিধান নাযিল করেননি, তা বাস্তবায়নযোগ্য কিনা তার প্রমাণও রেখে দিয়েছেন। সে প্রমাণ হল তাঁর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তাঁর পুরো জীবন অনুসরণীয় সফল আদর্শ হিসেবে এখনও মানবজাতিকে অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছে। মাইকেল এইচ হার্টের ভাষায়, "My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels"[৮২]

জর্জ বার্ণাড শ বলেন,

If any religion has the chance of ruling over England nay Europe, within the next hundred years, it can only be Islam.[৮৩]

---

৮০. সূরা কালাম; ৬৮ : আয়াত নং- ০৪।

৮১. সূরা আহ্যাব; ৩৩ : আয়াত নং- ২১।

৮২. Michael H. Hart, ***The 100, A Ranking of The Most Influential Persons In History***, pp-33.

৮৩. Sayd Ashraf Ali, Islam: What Others Say, Islamic Publications, 1993, Page-221.

www.pathagar.com

মহাত্মা গান্ধী বলেন,

"Muhammad was a great Prophet. He was brave and feared no man but God alone. He was never found to say one thing and do another. He acted as he felt."[৮৪]

মাইকেল এইচ হার্ট, জর্জ বার্নার্ড 'শ কিংবা মহাত্মা গান্ধী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে কোন বংশীয় আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত নন কিংবা অন্য কোনভাবে প্রভাবিতও নন। আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়া-আফ্রিকার এই তিন দিকপালের তিনটে উদ্বৃতিই এতটুকু প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে, গোটা মানব জাতির জন্য মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন একমাত্র অনুসরণীয় শ্রেষ্ঠ মানবিক নৈতিকতাসম্পন্ন মানদণ্ড।

২২. নৈতিকতার প্রকার ও সর্বজনীনতা (Types and Universility of Morality)

কিছু কিছু ড্রাইভার সফটওয়্যার কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেমের জন্য ক্ষতিকর। সাধারণতঃ এগুলোকে কম্পিউটার ভাইরাস নামে অভিহিত করা হয়। এসব ড্রাইভার সফটওয়্যার কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেমকে ধ্বংস করে দেয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন। বিকৃত ও কুশিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মাঝেও এমন ধরণের নৈতিকতা ইনস্টল বা প্রোথিত হতে পারে যা তার মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে দিতে পারে। ডারউইনের যোগ্যতমের উদ্বর্তনবাদ [Survival of the fitest] তেমনি ধরণের নৈতিকতা মানুষের মাঝে ইনস্টল বা প্রোথিত করেছিল। যা সূত্রাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকে পশ্চিমা দেশগুলোতে মানুষের মনুষ্যত্বের অধোগতি আরম্ভ হয়। সুতরাং মনুষ্যত্বের জন্য উপকারী বা ধ্বংসকারী উভয় ধরণের নৈতিকতাই আছে। নীট্শের মত বিখ্যাত দার্শনিকরা বললেন, বলবানদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য দুর্বলেরা নীতিতত্ত্ব সৃষ্টি করেছে। যদিও এই মত মূলতঃ ভুল এবং এর উল্টোটাই সত্য। দুর্বলেরা কখনো আইন-কানুন ও নৈতিকতা সৃষ্টি করে না এবং সেগুলি বলবানদের উপর চাপিয়েও দেয় না। অন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পদ শান্তিতে উপভোগ করার জন্য এবং অধিকতর শোষণ সহজ করার জন্য সবলেরা আইন-কানুন ও মনুষ্যত্ব ধ্বংসকারী নৈতিকতা তৈরি করে। তাই নৈতিকতা মানেই তা পরম [Absolute] ও সর্বজনীন নয়। যেমন কথিত সভ্য ইউরোপের পাবলিক পার্কে পার্কে যে যথেচ্ছ ব্যভিচার চলে তা ইউরোপীয় নৈতিকতার মানদণ্ড। অন্যদিকে ব্যভিচারের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রেখে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করা ইসলামের নৈতিক মানদণ্ড। উভয়ের মধ্যে কোন্টি মানুষের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর কোন্টি পশুর জীবনের

৮৪. Ibid, Page-96.

www.pathagar.com

সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা উপলব্ধি করার ক্ষমতা সে মানুষের হবে না যিনি ইতোমধ্যে মনুষ্যত্ব ধ্বংসকারী নৈতিকতা নিজের মধ্যে ইনস্টল বা বপন করেছেন।

গোটা মানবজাতির জন্য একই রকম নৈতিক বিধান প্রচলন সম্ভব কিনা এ বিষয়ে বলতে গিয়ে মরহুম আবুল হাশিম বলেন, "সারা মানবজাতির জন্য একই রকম নৈতিক বিধি-বিধানের প্রচলন তখনই সম্ভব হতে পারে যখন মানুষ তার নিজের প্রকৃতির বাস্তব-স্বরূপ উপলব্ধি করার মত প্রজ্ঞা ও একে স্বীকার করার মত সাহস অর্জন করবে এবং নিজের সহজ প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করার অধিকার স্বীকার করে এবং অন্যের অনুরূপ অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে তার নৈতিকতার তত্ত্ব গড়ে তুলবে। মানব প্রকৃতি মূলতঃ একই রূপ। স্থানীয় জলবায়ুর প্রভাবে বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকৃতিগত সামান্য পার্থক্য দেখা দেয়। মানব-প্রকৃতির মূলগত ঐক্যের দৃঢ় ভিত্তিতে ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য একই নৈতিক বিধান নির্দিষ্ট করেছে এবং জলবায়ুর তারতম্যের ফলে মানব প্রকৃতিতে যে সামান্য পার্থক্য দেখা দেয় তার সঙ্গে মানুষের আচরণকে খাপ খাইয়ে নেয়ারও যথেষ্ট সুযোগ রেখেছে। ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ, সামাজিক বা জাতীয় বিবেক এবং নীতিবোধকে বস্তুত অস্বীকার করে। "সংঘের কোন বিবেক নেই" - এটা হলো তাদের প্রিয় শ্লোগান। এই অস্বীকার করার নীতিই তাদেরকে অপরাপর জাতির সঙ্গে কাজ-কারবারে কোন সুবিচারমূলক নৈতিক বিধি-বিধান মেনে চলতে দেয় না। তারা মনে করে ন্যায়-অন্যায় যেভাবেই হোক জাতীয় ইচ্ছা বা আকাংখা পরিতৃপ্ত করা পুণ্যের কাজ। যদিও নীতিগতভাবে তারা স্বীকার করে যে, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির সম্পর্ক এক ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির সম্পর্কের মতই। কিন্তু বাস্তবে অন্য জাতির সাথে ব্যবহারে তার প্রতিফলন হয় না। নীতিবোধের এই মান অনুসারে বিবেচনা করলে জাতি হিসেবে তারা ভয়ংকর অসৎ ও অবিবেচক। কিন্তু ইসলামে যেমন ব্যক্তির জন্য তেমনি জাতির জন্য একই সুবিচারমূলক নৈতিকতা। ইসলাম ব্যক্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। ইসলামী জীবন-দর্শন অনুসারে ব্যক্তির বিবেক দ্বারাই সামাজিক বিবেক সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রিত হয়। শুধু মানুষ নয় অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গেও ইসলাম এই বিবেক অনুসারে আচরণ করতে বাধ্য করে। এইভাবে ইসলাম মানব-সৃষ্ট কৃত্রিম ন্যায়-অন্যায়বোধ বাতিল করে দিয়ে, মূল মানবপ্রকৃতির ভিত্তিতে একইরূপ নৈতিকতার সাহায্যে ব্যক্তি, জাতি, বিশ্ব ও প্রাণীদের ক্ষেত্রেও একই ধরণের আচরণের মাধ্যমে সমগ্রের সঙ্গে অংশের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে।"[৮৫]

২৩. ইসলামে নৈতিকতার গুরুত্ব ও উপযোগিতা (Importance and Utility Of Ethics In Islam)

ড্রাইভার সফটওয়্যার ব্যতীত কোন কম্পিউটার যেমন অচল, তেমনি নৈতিকতা ব্যতীত কোন জীবিত মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। নৈতিকতার ধরণ বা প্রকার ভিন্ন

---

৮৫. *ইসলামের মর্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬।

www.pathagar.com

হতে পারে, কিন্তু নৈতিকতাবিহীন কোন মানুষ হতে পারে না। আর নৈতিকতা নিরপেক্ষ যেহেতু কোন মানুষ হতে পারে না, তাই মানুষ কোন্ ধরণের নৈতিকতা অর্জন করবে বা ধারণ করবে তা মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে শিক্ষা মনুষ্যত্ব ধ্বংসকারী নৈতিকতা অর্জনের মাধ্যম, তা মানবিকতা অর্জনেচ্ছু কোন মানুষের কাংখিত হতে পারে না। যে নৈতিকতা মানুষকে পশুর চেয়েও নিম্নস্তরের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে সে নৈতিকতা মানুষের কাম্য হতে পারে না। কারণ মানুষ সামাজিক। সমাজে মনুষ্যত্ব ধ্বংসকারী নৈতিকতা সম্বলিত মানুষের প্রাধান্য বিস্তৃত হলে সে সমাজ পশুর সমাজে পরিণত হয়। আর রাষ্ট্র হয়ে ওঠে স্বৈরাচারী। বিশ্বের সকল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর নৈতিকতার চিত্র এরই সাক্ষ্য দেয়। "এ প্রসঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা চলে আসে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা নানা রকম বৃত্তিমূলক ও পেশাগত শিক্ষা প্রদান করি বটে কিন্তু ভালো মানুষ হবার যে শিক্ষা, ভালো নাগরিক হবার যে শিক্ষা সে সম্পর্কে আমরা তত মাথা ঘামাই না। অথচ আজকের সমাজে মাদকতা, সন্ত্রাস ইত্যাদির কথা চিন্তা করলে একথা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, এসবের বিরুদ্ধে যে অভিযান দরকার তার দায়িত্ব শুধু বাবা-মা ও রাষ্ট্রকে দিলে চলবে না; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও এ দায়িত্ব নিতে হবে এবং নৈতিক শিক্ষাকে আমাদের শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করতে হবে। ..... নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের চরিত্র গঠন শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, যে দেশের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ লোকের ধর্ম ইসলাম, সে দেশে এবং যে ইসলাম ধর্মে মাদকতাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে মাদকাসক্তির প্রকোপ কেন বাড়ছে? আমরা কি তবে ধর্ম শিক্ষার দিকে একেবারেই নজর দিচ্ছি না?"[৮৬]

২৪. ইসলামে আইন ও নৈতিকতা [Law and Morality In Islam]

ইসলামে আইনের উৎস কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস এবং এগুলো সবই মানবিক নৈতিকতার মানদণ্ড সম্বলিত। নৈতিকতা নিরপেক্ষ কোন আইন ইসলামে নেই। অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ আইনের উৎস হল প্রচলিত রাষ্ট্রীয় দর্শন। এতে কুরআন, সুন্নাহর কোন স্থান নেই। তবে পুজিঁবাদ, সমাজবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি প্রচলিত যাবতীয় রাষ্ট্রীয় মতবাদ ধর্মনিরপেক্ষ আইনের উৎস। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিকতা বলতে প্রচলিত উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় মতবাদ সৃষ্ট নৈতিকতাই বুঝায়। এসব রাষ্ট্রীয় মতবাদ উদ্ভুত নৈতিকতা, বস্তুবাদী ও যান্ত্রিক। মানবিক নয়। প্রতাপ-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি কেন্দ্রিক। ব্যক্তি নিরপেক্ষ নয়। পরিপূর্ণরূপে জাগতিক। মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কোন স্থান এতে নেই। মৃত্যুর পর আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া এবং সকল কর্মকান্ডের জন্য জবাবদিহি করার অনুভূতির কথা এখানে অপ্রয়োজনীয় বাচালতা। নিরেট জাগতিক তথা বস্তুবাদী নৈতিকতা মানুষকে মনুষ্যত্ব বোধে উজ্জীবিত

---

৮৬. ড. শমশের আলী, *মাদকাসক্তি ঃ পারিবারিক মূল্যবোধ ও ইসলামী দর্শন*, ইসলামিক স্টাডিজ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ঢাবি, পৃ.-৪৭।

www.pathagar.com

না করে শক্তির ভাষায় বা পাশবিক উন্মত্ততায় বস্তুকে অর্জন করার অনুমোদন দেয়। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিকতা হয়ে দাঁড়ায় সবল কর্তৃক দুর্বলের জাগতিক অবলম্বন বা সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার বা ছিনতাই করার এবং সবল কর্তৃক দুর্বলকে খুন করার কিংবা সবল কর্তৃক দুর্বলের আব্রু লুটে নেয়ার নৈতিকতা। ধর্মনিরপেক্ষ আইন এসব অমানবিক ও পশু প্রবৃত্তির নৈতিকতার নিবিড় পৃষ্ঠপোষক। আর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ আইনের পৃষ্ঠপোষক।

পাশাপাশি কুরআন ও হাদীস হতে ইসলামী আইন ও নৈতিকতার দৃষ্টান্ত দেখা যাক্। আল্লাহ বলেন, "এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের উপর এই হুকুম দিলাম, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা বা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল।"[৮৭]

'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "পৃথিবীতে যখনই কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে খুন করা হবে, তার খুনের শাস্তির একটি অংশ আদম আ.-এর প্রথম সন্তান ভোগ করবে। কেননা সেই প্রথম হত্যাকান্ডের প্রচলন করেছিল।"[৮৮]

" .... আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কোন এক ভাষণে বলেছিলেন ঃ 'ওহে মানব জাতি। আল্লাহ তোমাদের উপর হজ ফরয করেছেন, অতএব তোমরা এটা পালন কর।' অতপর এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো [জানতে চাইলো] "হে আল্লাহর রাসূল ঃ প্রতি বছর?" রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিরব রইলেন। লোকটি তার প্রশ্নটি তিনবার পুনরোক্তি করলো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন ঃ "আমি যদি হ্যাঁ সূচক জবাব দেই, তাহলে এটা তোমাদের উপর হবে বাধ্যতামূলক [প্রতি বছর হজ পালন করা]। আর এরূপ কাজ করা বাস্তবিকই তোমাদের ক্ষমতা বহির্ভূত। যে সব বিষয় আমি অনুক্ত বা উহ্য রাখি তাতে তোমরা প্রশ্ন করো না। কারণ তোমাদের পূর্বে [জাতিগুলো] ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এজন্যে যে, তারা তাদের নবীদের মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্ন করতো এবং পরে তাঁদের শিক্ষা সমূহকে অমান্য করতো। অতএব আমি যদি তোমাদের কিছু করতে আদেশ করি তা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী করে যাও এবং আমি যদি কোন কাজ করতে নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাকো।"[৮৯]

উদ্বৃত কুরআনের আয়াতটি হতে ইসলামের মানবিক ও নৈতিক দৃষ্টিভংগি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আর তার পরবর্তী হাদীসটিতে, ইসলামের দৃষ্টিতে যে কোন অমানবিক কাজের নৈতিক ও পারলৌকিক ফলাফলের ভয়াবহতা বলে দেয়া হয়েছে। আর সর্বশেষ হাদীসটি প্রথম থেকে শেষাবধি ধর্মীয় আইনের সকল নীতিকে পরিবেষ্টন

---

৮৭. সূরা আল-মায়েদা ঃ ০৫ আয়াত-৩২।
৮৮. সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম।
৮৯. সহীহ মুসলিম।

www.pathagar.com

করেছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যে সব বিষয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুক্ত রেখেছেন - করতে আদেশও করেননি বা নিষেধও করেননি - তা অনুমতিপ্রাপ্ত বা মুবাহ। অর্থাৎ সেটা নিষিদ্ধও নয়, বাধ্যতামূলকও নয়। তিনি যা কিছু আদেশ করেছেন তা ফরয বা বাধ্যতামূলক এবং তা আমাদের সামর্থ্য অনুসারে পালন করা বাধ্যতামূলক। যা কিছু নিষেধ করেছেন তা হারাম বা নিষিদ্ধ। এখানে মানবীয় সামর্থ্যের পার্থক্যকে যেভাবে অনুমোদন দেয়া হলো, পৃথিবীর কোনো আইনে এই মানবিকতার নজির নেই।

২৫. নৈতিকতার ইসলামী ও পাশ্চাত্য তুলনামূলক ধারণা [Islamic & Western Comparative Concept of Morality] ঃ

বর্তমান বিশ্বে নিকোলো ম্যাকিয়াভেলী [১৪৬৯-১৫২৭] রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এক জনপ্রিয় নাম। তবে এই জনপ্রিয়তা প্রকাশ্যে নয়। নিরবে তার রাষ্ট্রপরিচালনার নৈতিক দর্শন অনুসরণে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কারো কারো মতে ম্যাকিয়াভেলী রাষ্ট্র পরিচালনায় যে নৈতিক দর্শন দিয়েছে তাতে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। জাতীয় রাষ্ট্র তত্ত্বের জনক হিসেবে ম্যাকিয়াভেলীকে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে একজন যুগস্রষ্টা চিন্তাবিদ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই, রাষ্ট্র পরিচালনায় ম্যাকিয়্যাভেলীর নৈতিক দর্শনকেই নিরবে অনুসরণ করে থাকে। আর তাই প্রতীকি হিসেবে 'নৈতিকতার পাশ্চাত্য ধারণা' আলোচনায় ম্যাকিয়াভেলীর প্রসংগ অবতারণা।

১৪৬৯ সালের ৩ মে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে নিকোলো ম্যাকিয়াভেলীর জন্ম। ১৪৯৪ সালে ২৭ বছরে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে কেরানি হিসেবে সরকারী চাকরীতে যোগদান করেন। পরবর্তীতে যোগ্যতা বলে ফ্লোরেন্স প্রজাতন্ত্রের কাউন্সিলের সচিব নিযুক্ত হন। সচিব হিসেবে বহিঃরাষ্ট্রসমূহের সাথে যোগাযোগের সুযোগের ফলে পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনৈতিক বিষয়সমূহে ম্যাকিয়াভেলী বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

১৫১২ সালে মেডিসি ফ্লোরেন্স দখল করলে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এ অভিযোগে তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়। এ সময় তিনি ফ্লোরেন্সের বাইরে এক খামার বাড়িতে নির্বাসিত জীবন-যাপন করেন। নির্বাসিত জীবনে ম্যাকিয়াভেলী একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। "The Prince" তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ফ্লোরেন্সের নতুন শাসক লোরেঞ্জো ডি মেডিসির নামে গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন। তিনি আশা করেছিলেন এর মাধ্যমে তাঁর প্রতি মেডিসির দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে এবং তাঁকে পুনরায় রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ প্রদান করা হবে। ১৫২২ সালে [বাধ্যতামূলক অবসরের ১০ বছর পর] তিনি রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করেন। তবে তাঁকে তাঁর আশানুরূপ রাষ্ট্রীয় পদ দেয়া হয়নি। ১৫২৭ সালে মেডিসি রাজতন্ত্রের পুনরায় পতন হলে ম্যাকিয়াভেলীর বিরুদ্ধে রাজতন্ত্র সমর্থনের অভিযোগ আনা হয় এবং তাঁকে

www.pathagar.com

আবারও সরকারী পদ হতে অব্যাহতি দেয়া হয়। ১৫২৭ সালের ২৭ জুন ম্যাকিয়াভেলী মৃত্যুবরণ করেন।

"The Prince" গ্রন্থে ম্যাকিয়াভেলী রাষ্ট্রের যে নৈতিক দর্শন প্রচার করেছেন, তার অন্যতম ভিত্তি হলো মানব প্রকৃতি ও মানুষের মনোভাব সম্পর্কে তাঁর ধারণা। তার ধারণা অনুযায়ী মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই খারাপ। মানুষের মধ্যে কোন ভাল গুণ নেই। সাধারণভাবে মানুষ অকৃতজ্ঞ, চঞ্চল, ভীরু, শঠ ও লোভী। আর ভয়, ক্ষমতা লিপ্সা, দম্ভ এবং স্বার্থপরতা মানুষকে যাবতীয় কর্মের প্রেরণা যোগায়। মানুষ সাধারণত ভাল অপেক্ষা মন্দ কাজে বেশি আগ্রহী।

তিনি মনে করেন, যে ব্যক্তি ভালবাসা লাভের অধিকারী এবং যে ব্যক্তি ভীতিপ্রদ তারা উভয়ই প্রভাবশালী। কিন্তু মানুষের আচরণের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো ভীতিপ্রদ মানুষের আনুগত্য স্বীকার করা। ভালোবাসার বন্ধনকে মানুষ নিজের স্বার্থের প্রয়োজনে যে কোন সময় ছিন্ন করতে পারে, কিন্তু ভীতিপ্রদ শাসককে মেনে চলতে মানুষ বাধ্য থাকে। এরূপ আনুগত্য স্থায়ী হয়। ম্যাকিয়াভেলীর মতে নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির সর্বাধিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারার মধ্যেই শাসকের সর্বাধিক সাফল্য নির্ভর করে। সামাজিক মূল্যবোধের উপর কোন শাসকের সাফল্য নির্ভর করে না। তিনি তাঁর "The Prince" বইতে বলেন, 'পিতার মৃত্যু শোকও মানুষ অতিসত্বর ভুলে যায়, কিন্তু পৈত্রিক সম্পত্তি হারাবার শোক সে জীবনে কোনদিন ভুলতে পারে না।' তাই নাগরিকগণ নিরাপত্তার প্রশ্নে একজন শক্তিশালী ও দৃঢ়চেতা শাসকের মাঝে আশ্রয় খোঁজে। মানুষ তার নিজের স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনেই শক্তিশালী শাসকের কাছে আনুগত্য স্বীকার করে।

যেহেতু ম্যাকিয়াভেলীর মতে মানব চরিত্র স্বভাবতই শঠ, অকৃতজ্ঞ ও লোভী এবং নিতান্ত বাধ্য না হলে মানুষ সৎকর্ম করে না, তাই শাসকের 'ভাল মানুষ' হয়ে কোন লাভ নেই। যে পাশবিক শক্তির কাছে মানুষ পরাভূত হয় - সেই পাশবিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই মানুষকে অবদমিত রাখতে হবে। শাসককে সর্বদা রাখতে হবে যে, প্রতারণা, নিষ্ঠুরতা যে কোনভাবেই হোক মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করতে হবে। কেননা ভালবাসার মধ্য দিয়ে নয় বরং ভীতি প্রদর্শনই মানুষের বশীভূত করার একমাত্র পথ। তিনি বলেন, প্রেমপ্রীতি, ভালবাসা, দয়া-দাক্ষিণ্যের মাধ্যমে মানুষকে কোনদিন জয় করা যায় না। কেননা মানুষ সব সময়ই ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লোভ-লালসা চরিতার্থ করতে চায়। কোন প্রকার সুশিক্ষা, সদুপদেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের উন্নতি - কোন কিছু দ্বারাই মানুষের মানসিকতাকে পরিবর্তন করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে মানুষের উপর পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করা ছাড়া শাসকের অন্য কোন উপায় থাকে না। এভাবে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির সর্বাধিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। তাতে শাসকের প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন অব্যাহত থাকবে। ফলশ্রুতিতে শাসনের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হবে। তার মতে, শাসকের

www.pathagar.com

মধ্যে ' শৃগাল ও সিংহ' - এ দুয়ের গুণাবলীর সমন্বয় সাধিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, " The Prince must be a Fox, ... to recognize the traps and a Lion to frighten the wolves." অর্থাৎ শাসক হবেন শৃগালের ন্যায় ধূর্ত এবং সিংহের ন্যায় বলশালী।

রাষ্ট্রনায়কদের গুণাবলী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাষ্ট্রনায়কদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এমন হবে যে, 'তিনি যেখানে যেমন সেখানে তেমনই দেখা দিতে পারেন।' রাষ্ট্রের কল্যাণার্থে ও এর স্থিতিস্থাপকতার কারণে রাষ্ট্রনায়কদের যে কোন কর্মসূচি গ্রহণ করার পক্ষপাতিত্ব করেছেন ও ন্যায়সঙ্গত মনে করেছেন। সুতরাং ধর্ম বা নৈতিকতার কথা আদৌ চিন্তা না করে রাষ্ট্র তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য যা কিছু অনুকূল তাই করে যাবে। তাঁর মতে, রাষ্ট্র যদি চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে পারে তবে মাধ্যম যতই নিচ বা ঘৃণ্য হোক না কেন অর্জিত সাফল্যই মাধ্যমের যৌক্তিকতা প্রমাণ করবে। তাঁর ভাষায়, লক্ষ্য মাধ্যমের যৌক্তিকতা বিধান করে, মাধ্যম লক্ষ্যের নয় [End Justifies the means, not means the ends]। তার নৈতিকতার মূল বক্তব্য ছিল, রাজনীতি থেকে নীতি ও ধর্মকে পৃথক করা। গির্জা ও ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচারিত ধর্ম ও নৈতিকতার সাথে রাষ্ট্রের কোনো সম্পর্ক নেই - It is isolated from morality and religion.

বর্তমান বিশ্বে কার্যত ম্যাকিয়াভেলীর End Justifies the means এবং Life & State is isolated from morality and religion নৈতিক দর্শনই অনুসৃত হচ্ছে। ম্যাকিয়াভেলীর ইতালিতে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের আদৌ কোন স্থান ছিল না। মূল্যবোধের রাজ্যে তখন চলছিল এক চরম সংকট। শুধু শাসক গোষ্ঠীর জন্য প্রদর্শিত একদেশদর্শী এই নৈতিকতার একমাত্র সমঝদার হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের গণতন্ত্রের মুখোশধারী সকল স্বৈরাচারীরা।

ম্যাকিয়াভেলীর সৌভাগ্য হয়নি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মত মানুষের সন্ধান পাবার এবং তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নেবার। ইসলাম মানুষকে কতটা মহৎ করতে পারে তা অনুধাবনের লক্ষ্যে সহীহ মুসলিম হতে একটি হাদীস উদ্বৃত করছি ঃ হযরত জারীর (রা) বলেন, "আমরা সকাল বেলায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে বসেছিলাম। এ সময়ে তাঁর কাছে যুদ্ধ প্রত্যাগত এক দল মুসলিম এল। তাদের গায়ে ছিল ছিন্ন জামা ও কম্বল এবং কোষবদ্ধ তরবারি। তারা সকলেই ছিল মুদার গোত্রীয়। তাদের ক্ষুধাকাতর অবস্থা দেখে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেহারা বিমর্ষ রূপ ধারণ করলো। তিনি একবার নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বেরিয়ে এসে বিলালকে ডাকলেন। তাকে আযান দেয়ার আদেশ দিলেন। বিলাল আযান দিলেন ও ইকামাত দিলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায পড়ালেন। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাষণ দিলেন ঃ "হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন।" [৪ ঃ সূরা আন নিসা, আয়াত-১] "

www.pathagar.com

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং আগামীকালের জন্য কী সঞ্চয় করা হলো তা প্রত্যেকের দেখা উচিত।" [৫৯ ঃ সূরা আল হাশর, আয়াত-১৮] ভাষণ শুনে একব্যক্তি এক দিনার দান করলো। অতপর তার দেখাদেখি আর একজন এক সা খেজুর এমনকি কেউ একটা খুরমার এক টুকরোও দান করলো। অতপর আনসার থেকে এক ব্যক্তি বড় এক পাত্র ভর্তি খাবার নিয়ে এল, যা সে বহন করতেই পারছিলোনা। অতপর লোকদের দান করার এমন হিড়িক পড়ে গেল যে, আমি খাদ্য ও কাপড়ের বড় বড় দুটো স্তূপ জমা হতে দেখলাম। তখন দেখলাম, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিমর্ষ হয়ে যাওয়া চেহারা স্বর্ণের মত উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "যে ব্যক্তি ইসলামের জন্য কোন উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, সে উক্ত দৃষ্টান্ত স্থাপনের সাওয়াবও পাবে। অথচ অনুকরণকারীদের সাওয়াব কিছুমাত্র কম হবেনা। আর যে ব্যক্তি ইসলামের জন্য কোন খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, সে ঐ খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপনের শাস্তি তো ভোগ করবেই। উপরন্তু যারা তার অনুকরণে উক্ত খারাপ কাজ করবে, তাদের কর্মফলও সে ভোগ করবে। অথচ সেই অনুকরণকারীদের শাস্তি কিছুমাত্র কম হবেনা।"[৯০]

মহত্তম হতে আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছেন, সে বিষয়েও ম্যাকিয়াভেলী ছিলেন সম্পূর্ণ অনবহিত। আল্লাহ বলেন, "ভাল ও মন্দ সমান হতে পারেনা। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সঙ্গে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।"[৯১]

আল্লাহ আরো বলেন, "মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোস-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। আল্লাহ যালিমদেরকে পসন্দ করেন না।"[৯২]

অন্যায় আচরণের প্রতিরোধ ও পৃথিবীতে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ইসলামের সামাজিক শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য। দুঃখজনক হলো, আজকের মুসলিম শাসকদের অনেকেই ম্যাকিয়াভেলীর 'শৃগাল ও সিংহের' নৈতিকতা অনুসরণ করছেন। মুসলিম শাসকরা ইসলামের মানবিক নৈতিকতার মূল স্রোত থেকে কতটা দূরে তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

২৬. ইসলামে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে নৈতিকতা [Morality In Islam To Build Person, Society and State] ঃ

নৈতিক চরিত্রের পূর্ণতা বিধানই ছিল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রাসূল হিসেবে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য। মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণের উৎস হচ্ছে সে সমাজের মানুষের উন্নত নৈতিক চরিত্র। নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে যে লোক সর্বোত্তম, ইসলামের দৃষ্টিতে সেই উত্তম ব্যক্তি এবং আখিরাতেও উত্তম নৈতিক চরিত্র হবে পাল্লায়

---

৯০. সহীহ মুসলিম।
৯১. সূরা হামীম আস্-সাজদা ঃ ৪১ : আয়াত নং-৩৪।
৯২. সূরা শূরা ঃ ৪২ : আয়াত নং-৪০।

www.pathagar.com

ভারী। আল্লাহ মানব জাতিকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানই শুধু দেননি, একজন সর্বোত্তম নৈতিকতা সম্পন্ন অনুসরণীয় রাসূলও পাঠিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, "আমরা এ গ্রন্থে [কুরআনে] কোন কিছুই বাদ রাখিনি।"[৯৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্যে দীনকে [জীবন বিধান]-কে পূর্ণতা দান করলাম।"[৯৪]

আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই তুমি মহান নৈতিক চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।"[৯৫]

একটি উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন ভিত্তির উপর ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে মহান আল্লাহতায়ালা কিছু ডিভাইন ফর্মুলা প্রদান করেছেন। যার উপর ভিত্তি করে মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সভ্যতায় এক অতুলনীয় সমাজব্যবস্থা উপহার দিয়েছিলেন। যা মানবসভ্যতাকে অজ্ঞতা ও পাশবিকতার অন্ধকার হতে উন্নত চরিত্র ও মানবিকতার আলোর মুখ দেখিয়েছে। সংক্ষেপে সে সূত্রগুলোই নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

২৬.১] আল্লাহ ছাড়া আর কারো 'ইবাদাত না করা ঃ বস্তুতঃ মানুষের মত মর্যাদাবান সত্তার ইবাদাত পাবার যোগ্যতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। যদিও মানুষ আগুন, সূর্য, প্রাণী ও গাছ-পাথরের পূজাও করছে। এ ধরনের পূজা মানুষের মর্যাদার অবমাননা। গোটা সৃষ্টির মধ্যে মানুষের মর্যাদার চেয়ে একমাত্র আল্লাহর মর্যাদা উন্নত। সুতরাং মানুষ তার চেয়ে Inferior মর্যাদার কোন সত্তার প্রতি মাথা নত করতে পারে না। যারা তা করে তাদের সেসব কর্মকাণ্ড অস্বাভাবিকতার শামিল। এটা সেসব মানুষের এক ধরণের বিশ্বাসের বিকৃতি।

২৬.২] বাবা-মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার নিশ্চিত করা ঃ পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ জীবন দর্শন 'মা দিবস' ও 'বাবা দিবস' উপহার দিয়েছে। আর মা-বাবার সবচেয়ে নাজুক সময়, বৃদ্ধ বয়সের জন্য ওল্ড হোম সংস্কৃতির প্রচলন করেছে। বাবা-মায়ের প্রতি দুর্ব্যবহার, অবহেলা, তাচ্ছিল্য আর ১৮ বছর হলেই বাবা-মাকে আইন দেখানোর অধিকার অর্জন এবং নৈতিক বাঁধনকে ছুড়ে ফেলা, এগুলো হলো ধর্মনিরপেক্ষতার পাশ্চাত্য উপহার। অন্যদিকে ইসলাম সন্তানকে নির্দেশ দিচ্ছে, বাবা-মায়ের সাথে ধমকের সুরে কথা বলা যাবে না। নম্র ভাষায় কথা বলতে হবে। দুর্ব্যবহার তো দূরের কথা; বৃদ্ধ বয়সের অসংলগ্ন কথা ও আচরণের জন্য তাদেরকে 'উফ' পর্যন্ত বলা যাবে না এবং ওল্ডহোম নয় তাদেরকে বৃদ্ধ বয়সে নিজেদের কাছে রেখে সেবা করতে হবে। প্রিয় পাঠক, তাহলে কোন্ জীবনদর্শন মানবিক, ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্যের নাকি ইসলামের? অবশ্যই আপনার বিবেকের উত্তর হল মানবিক জীবনাদর্শ ইসলামের

---

৯৩. সূরা আনআ'ম ঃ ০৬ : আয়াত নং-৩৮।

৯৪. সূরা মায়িদা ঃ ০৫ : আয়াত নং-০৩।

৯৫. সূরা কালাম ঃ ৬৮ : আয়াত নং- ০৪।

www.pathagar.com

পক্ষে। আর প্রকৃতই যদি সন্তানরা তাদের বাবা-মায়ের সাথে তা করে যা ইসলাম বলেছে; তাহলে, সন্তান ও পিতা-মাতার সম্পর্কের গভীরতা কি অতলান্ত হত না? পৃথিবীটা অনির্বচনীয় অনুভূতিতে ভরে উঠতো।

২৬.৩] আত্মীয়, মিসকীন ও মুসাফিরদের অধিকার আদায় করতে হবে ঃ ইংরেজিতে Tax, Charity এবং Rights এই তিনটি শব্দের আভিধানিক ও ব্যবহারিক ব্যবধান বিস্তর। পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ জীবন দর্শনে আত্মীয়, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য কোন 'অধিকার বা Rights' বলে কিছু নেই। সেখানে Charity বা দয়া-দাক্ষিণ্য আছে, তবে তা সম্পূর্ণ ব্যক্তির খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভরশীল এবং তা ইসলামের বিধানের মত এত সুস্পষ্টভাবে শ্রেণীবদ্ধ বা ক্লাসিফাইড নয়। আর এ কারণেই পাশ্চাত্যে কুকুর-বিড়ালকেও উইল করে সম্পত্তি দেয়ার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। আর ইসলামে বিষয়টি শুধু Charity বা দয়া-দাক্ষিণ্যের বিষয় নয়, এটা আত্মীয় মিসকীন ও মুসাফিরের অধিকার। আর ধনী ব্যক্তিদেরকে এ অধিকার আদায় করতে বলা হয়েছে। বিষয়টা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই করতে হবে এবং এর অন্যথা হলে অবশ্যই জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে। প্রিয় পাঠক, কতটা মানবিক ইসলামের জীবনবিধান! ইসলামের বিধানটি জ্ঞানভিত্তিক, কোন ব্যক্তির খেয়াল-খুশির বা মর্জির অধীন নয়। অন্যদিকে পাশ্চাত্য বিধানটি অন্ধ, একদেশদর্শী এবং সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির খেয়াল-খুশির অধীন। পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের চেতনায় কাউকে জবাবদিহির প্রয়োজন নেই মর্মে শেখানো হয় আর সেভাবেই মানুষের মধ্যে জবাবদিহির চেতনাহীন ভাবধারা গড়ে উঠে। যদিও সব মানুষকেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে এবং তার কাজের জন্য জবাবদিহিও করতে হবে। যদি জীবনটা জবাবদিহিমূলকভাবে গড়ে তোলা যেত তবে তাই হতো বুদ্ধিমানের কাজ। জবাবদিহিমূলকভাবে জীবন গড়াই মানবজাতির প্রতি ইসলামের এপ্রোচ। যাতে করে প্রকৃত জবাবদিহির দিন তা সহজ হয়। পৃথিবীতেও মানুষ সুখী হয়। জীবনের অর্থ খুঁজে পায়। ধনী, দরিদ্র, আত্মীয়, মিসকীন, মুসাফির - জনে জনে মমত্ববোধ ছড়িয়ে পড়ে।

২৬.৪] নম্র ভাষায় ফিরিয়ে দেয়া, দুর্ব্যবহার করে নয় ঃ মানুষ মাত্রই আত্মমর্যাদাবোধ দ্বারা পরিচালিত। আল্লাহ বলেন, "আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।"[৯৬] মানুষের এই মৌলিক প্রকৃতিকে পারস্পরিকভাবে সম্মান করতে ইসলাম আহবান করছে। আত্মীয়দের মধ্যে কেউ অভাবী হলে, কোন মানুষ মিসকীন কিংবা মুসাফির হলে, এমনকি সে যে ধর্মেরই হোক না কেন, তাকে ফিরিয়ে দিতে হলে নম্র ভাষায় ফিরিয়ে দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই দুর্ব্যবহার বা কর্কশ ভাষা ব্যবহার করে কারো আত্মমর্যাদায় আঘাত না করা। তার প্রতি অসম্মানজনক আচরণ না করা। এই সর্বজনীনতা ও আন্তর্জাতিকতা ইসলামের এক অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। ইসলাম ছাড়া আর

---

৯৬. সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ আয়াত নং-৭০

www.pathagar.com

কোন জীবনদর্শনে মানুষকে এতটা সম্মানের চোখে বিবেচনা করেনি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের এই অধিকার ঘোষণা করেনি। আল্লাহতায়ালা হুকুম করেছেন; আর তা মানার কাজ তো মানুষের। আর এভাবে মানুষের অধিকার স্বেচ্ছায় প্রদান করা হলে পৃথিবীতে অশান্তি বিরল অনুভূতিতে পরিণত হবে।

২৬.৫] অপচয়কারী শয়তানের ভাই। সম্পদ বা সময় অপচয় না করা ঃ অপব্যয় বা অপচয় উভয়টিই ব্যক্তির ব্যক্তিগত খেয়াল বা মর্জির উপর নির্ভরশীল। যে কোন বিচারে লোভ ও অহংকারই অপব্যয় বা অপচয়ের নেপথ্য প্রেরণাদায়ক শক্তি। তাই অপচয় বা অপব্যয়ের জন্য তিনটি শর্ত প্রযোজ্য : ০১. অহংকার ০২. লোভ ০৩. সম্পদের প্রাচুর্য। উক্ত তিনটি শর্তের মধ্যে সম্পদের প্রাচুর্য উল্লেখ করা হলেও সীমিত সম্পদেও অপব্যয় বা অপচয় করা সম্ভব। সম্পদ সীমিত হোক বা প্রাচুর্য থাকুক অহংকার ও লোভ, মানুষকে সম্পদের অপচয় বা অপব্যয়ে অলক্ষ্যে পরিচালিত করে। অপব্যয় বা অপচয় ধনীকে দরিদ্র এবং দরিদ্রকে দরিদ্রতর অবস্থানে উপনীত করে প্রাকৃতিক নিয়মেই। এছাড়া অপব্যয় বা অপচয় সমাজে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানকে কমাতে সাহায্য করে না বরং বাড়িয়ে দেয়। কোনো ব্যক্তি বা জাতিই অপচয়কারী হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে এমন একটি দৃষ্টান্তও নেই। সম্পদ ও সময়ের সুষ্ঠূ ব্যবহারের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে বিশ্বের সব উল্লেখযোগ্য সভ্যতা। আল্লাহ মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সূত্রই মানবজাতিকে জানিয়ে দিলেন আর সতর্ক করলেন অহংকারী শয়তানের ধ্বংসের পথ, দরিদ্রতার পথ ও পতনের পথকে এড়িয়ে চলতে। অহংকার ও লোভের কারণে অপব্যয় বা অপচয় এবং অপচয়ের ফলাফল দারিদ্রতায় উপনীত হওয়া এ সবকিছু মানুষকে প্রকারান্তরে অকৃতজ্ঞ মানুষে পরিণত হতে সাহায্য করে। অহংকারী শয়তানের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, "ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করলো; সে অমান্য করলো ও অহংকার করলো। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।"[৯৭] আল্লাহ আরো বলেন, "নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু"[৯৮] এবং শয়তান "কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে"।[৯৯] শয়তান "দয়াময় আল্লাহর প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ"।[১০০] এভাবে অহংকার ও লোভের প্রবৃত্তির প্রশ্রয়ে আর অহংকারী ও অকৃতজ্ঞ শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ হয়ে উঠে অপচয়কারী আর পরিণত হয় 'শয়তানের সহোদর'-এ।

২৬.৬] অর্থ সম্পদ ব্যয়ে না কৃপণতা, না ছন্নছাড়া বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ঃ ধন-সম্পদের ব্যাপারে মানুষের দুর্বলতার একটি বস্তুনিষ্ঠ চিত্র ফুটে উঠেছে সূরা আত্ তাকাসুর-এ। আল্লাহতা'আলা বলেন, "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন

---

৯৭. সূরা বাকারা ০২ ঃ আয়াত নং-৩৪।
৯৮. সূরা ইউসুফ ১২ ঃ আয়াত নং-০৫।
৯৯. সূরা নাস ১১৪ ঃ আয়াত নং-০৫।
১০০. সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ আয়াত নং-২৭।

www.pathagar.com

রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।"[১০১] প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতার মাঝে লুকিয়ে আছে কৃপণতা এবং উপর্যুপরি সম্পদ বৃদ্ধির মানসিকতা। মানসিকতাটি এতই তীব্র যে, কবরে উপনীত হওয়া পর্যন্ত মানুষের এই প্রবণতার স্থায়িত্ব। এই প্রবণতায় সম্পদ খরচের চেয়ে জমা করা বা পুঞ্জিভূত করা বা কৃপণতা করাই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এতে সম্পদ কিছু লোকের মাঝে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হতে থাকে। "দারিদ্র কখনো কখনো কুফরি বা সত্য প্রত্যাখ্যানে পরিণত হতে পারে।"[১০২]

ইসলাম সে ব্যক্তিকে মুমিন বলে স্বীকার করেনি, যার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে আর সে নিজে পেট পুরে খায়। "সে ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে তার প্রতিবেশী যখন তার নিকটেই ক্ষুধার্ত রয়েছে, তখন সে পেট পুরে খায়।"[১০৩] তাই সম্পদ ব্যয়ে আল্লাহতা'আলা মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, "তুমি তোমার হাত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখোনা এবং তা সর্ম্পূর্ণ প্রসারিতও করোনা, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।"[১০৪]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিভিন্ন হাদীস হতে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "প্রতিদিন বান্দাহ যখন সকালে উঠে তখন দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ, খরচকারীর ধন আরো বাড়িয়ে দিন এবং দ্বিতীয়জন বলেন, হে আল্লাহ, কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।"[১০৫]

'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "ইসলামের কোন্ কাজটি সবচেয়ে উত্তম বা কল্যাণকর? তিনি বললেন ঃ অভুক্তকে বা ক্ষুধার্তকে আহার করানো এবং চেনা-অচেনা সকলকে সালাম দেয়া।"[১০৬]

হাকীম ইবন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ "স্বচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান করা হয় সেটাই উত্তম দান। উপরের হাত [দাতা] নিচের হাতের [ভিক্ষাকারী বা প্রার্থনাকারী] চেয়ে উত্তম। তুমি তোমার পোষ্যদের থেকে দান-খয়রাত শুরু করো।"[১০৭]

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "একটি দীনার তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করলে, একটি দীনার দাস

---

১০১. সূরা তাকাসুর ১০২ ঃ আয়াত নং-১,২।
১০২. আস-সূয়ুতি, 'আল-জামী আস-সগীর।'
১০৩. আল বাইহাকী, ইবন আব্বাস বর্ণিত।
১০৪. সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ আয়াত নং-২৯।
১০৫. সহীহ মুসলিম [কিতাবুয্ যাকাত]; হাদীস নং-২৩৩৬/৫৭।
১০৬. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-১৬০/৬৩।
১০৭. সহীহ মুসলিম, [কিতাবুয্ যাকাত];হাদীস নং-২৩৮৬/৯৫।

www.pathagar.com

মুক্তির জন্য, একটি দীনার মিসকীনদেরকে দান করলে এবং আর একটি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করলে। এর মধ্যে [সাওয়াবের দিক দিয়ে] ঐ দীনারটিই উত্তম যা তুমি তোমার পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করলে।"[১০৮]

মুস'আব ইবন সা'দ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি একবার মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট সংবাদ পাঠালাম। তিনি আসলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি তিন আমার যেখানে ইচ্ছা আমার যাবতীয় সম্পদ বন্টন করে দেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করলেন। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক বন্টন করে দেই? কিন্তু তাতেও তিনি রাজি হলেন না। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ বন্টন করি? এবার তিনি নিরব রইলেন। এরপর এক-তৃতীয়াংশ [ওসিয়াত করা] জায়েয হয়ে গেলো।"[১০৯]

২৬.৭] ছেলে হোক বা মেয়ে হোক দারিদ্রের আশংকায় সন্তান হত্যা না করা ঃ আল্লাহ খেলাচ্ছলে বিশ্ব সৃষ্টি করেননি। বিশ্ব সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য আছে। আল্লাহ বলেন, "আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মাঝে যা আছে তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।"[১১০] আল্লাহ আরো বলেন, "আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সে সব খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি সেগুলি সৃষ্টি করেছি সঠিক উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাদের অনেকেই তা বোঝে না।"[১১১] আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তেমনি এক মহান উদ্দেশ্যে। যারা দারিদ্রের আশংকায় সন্তান হত্যার মত অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তারা একদিকে নিজেদের দায়িত্ব অবহেলার দায় প্রকারান্তরে সন্তানের উপর চাপায়, অন্যদিকে আল্লাহর মহান উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখে। আল্লাহ বলেন, "তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি, তারা নিজেদের ক্ষতি করেছে।"[১১২] তাদের দৃষ্টিতে সন্তান সম্পদ নয়, আপদ। অথচ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষ মাত্রই সম্পদ। মানুষ জন্ম থেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়। মানুষকে সম্পদে পরিণত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের এই সামান্য দায়িত্বটুকু পালন করতে ব্যর্থ হয়ে আমরা ভ্রূণ পর্যায়ে সন্তান হত্যায় লিপ্ত হই। অভাব বা অস্বচ্ছলতার আশংকায় বা স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবকে কেন্দ্র করে যারা এ ধরণের হত্যায় লিপ্ত তাদের অধিকাংশই সম্পদের বিচারে অভাবী নন। এটা শুধুই তাদের মানসিক ভয়। আর এই ভয়ের তাড়নায় তারা ভ্রূণ হত্যার মত পাপে জড়িয়ে পড়েন। তবে মানুষকে সম্পদে পরিণত করার এই কাজটুকু নিঃসন্দেহে ব্যক্তির একার পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতায় তা কেবল সম্ভব হতে

---

১০৮. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৩১১/৩৯।
১০৯. সহীহ মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, হাদীস নং-৬২৩৮/৪৩।
১১০. সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ আয়াত নং-১৬।
১১১. সূরা দুখান ৪৪ ঃ আয়াত নং-৩৮, ৩৯।
১১২. সূরা বাকারা ০২ ঃ আয়াত নং-৫৭।

www.pathagar.com

পারে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "বিশ্বাসীরা একে অন্যের নিকট একটা ইমারত [এর অংশ] স্বরূপ, প্রত্যেক অংশ অপর অংশগুলোকে দৃঢ় করে।"[১১৩] সুতরাং সন্তান হত্যার মত পাপকর্ম হতে বেঁচে থাকতে ব্যক্তির ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকাও। প্রসংগত রাষ্ট্রের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা উপলব্ধি করতে হযরত 'উমার (রা) জীবন থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি ঃ হযরত উমার (রা) তাঁর জীবনের শেষ বছরে একাধিকবার বলেছেন, "আল্লাহ যদি আমাকে পরমায়ূ দেন আমি দেখবো - যাতে করে 'সানা' পর্বতমালার নিঃসংগ মেষপালকও জাতির সম্পদে তার অংশ পায়।"[১১৪]

"হযরত 'উমারই [রা] ২০ হিজরীতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর আদমশুমারীর উদ্দেশ্যে 'দীওয়ান' নামক একটা বিশেষ সরকারী বিভাগের গোড়াপত্তন করেন। এই আদমশুমারীর ভিত্তিতে কতিপয় শ্রেণীর লোকের জন্য বার্ষিক রাষ্ট্রীয় পেনসন নির্ধারিত হতো। এরা হচ্ছেন ঃ ক. বিধবা এবং ইয়াতিমেরা; খ. রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিতকালে ইসলামের সংগ্রামে যারা পুরোভাগে ছিলেন তাঁদের সকলে, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিধবা পত্নীগণ, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকরীদের মধ্যে যাঁরা বেঁচেছিলেন তাঁরা, গোড়ার দিকের মুহাজিরগণ এবং গ. সকল অক্ষম, পংগু, অসুস্থ, বৃদ্ধ লোকেরা। এই পরিকল্পনা মুতাবিক ন্যূনতম বার্ষিক ভাতার পরিমাণ ছিল দু'শত দিরহাম। এমনকি শিশুরা নিজেদের ভরণ-পোষণ করতে অসমর্থ কালে এই নীতির ভিত্তিতে জন্মমুহূর্ত থেকে শুরু করে সাবালকত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়ের জন্য শিশুদের নিয়মিত ভাতারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল, আর এই ভাতা দেয়া হতো বাবা-মা অথবা অভিভাবকদেরকে।"[১১৫]

এমন একটি মানবিক সমাজ আর জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল রাষ্ট্রপ্রধান তো সবারই প্রত্যাশিত। কিন্তু সারা বিশ্বের ম্যাকিয়াভেলীর ভাবশিষ্যরা মানুষকে মানবিক জীবন-যাপন করতে দিতে প্রস্তুত নয়। কারণ এরা মানুষকে সিংহ আর শৃগাল-এর চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে শিখেনি।

২৬.৮] ব্যভিচারের কাছেও না যাওয়া ঃ একজন মুসলিমকে আল্লাহতা'আলা ব্যভিচারের কাছে যেতেই নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, "আর ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"[১১৬] সেই সাথে এও আদেশ করেছেন, "মুমিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।"[১১৭] যারা আল্লাহ তা'আলার এই আদেশকে অহংকারের সাথে অস্বীকার করে

---

১১৩. সহীহ আল বুখারী, আবু মূসা বর্ণিত।

১১৪. ইবন সা'দ ৩/১ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২১৪-২১৭।

১১৫. মুহাম্মাদ আসাদ, *ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি*, শাহেদ আলী অনূদিত, পৃ.-১০৫।

১১৬. সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ আয়াত নং-৩২।

১১৭. সূরা নূর ২৪ ঃ আয়াত নং-৩০।

www.pathagar.com

এবং পরিণতির বিষয়ে আল্লাহ বলেন, "আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে, অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি [অর্থাৎ তার কর্মদোষে সে অবনতির নিম্ন স্তরে পৌঁছে।]"[১১৮] আল্লাহ আরো বলেন, "কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; এরাই সৃষ্টির অধম। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।"[১১৯] ব্যভিচারের প্রতি এতটা সুস্পষ্ট নৈতিক অবস্থান পৃথিবীর আর কোথাও নেই। নারীর মর্যাদার এই গ্যারান্টি, এই সুরক্ষা আর কে দিয়েছে ইসলাম ছাড়া? বর্তমানে নারীরা সমাজে প্রগতির দোহাই এবং অচলায়তন ভাঙ্গার উছিলায় যেভাবে নিজেদের খোলামেলা উপস্থাপন করছে তাতে একজন পুরুষের এবং একজন নারীর চোখের দৃষ্টি থেকে মস্তিস্কের নির্দেশে ডোপামিন নরএপিনেফ্রিন, ফিনাইল-ইথাল এমাইন এবং অক্সিটোসিন হরমোন নিঃসরণ করে ক্রমাগত। দৃষ্টি ও দর্শন যত বাড়বে হরমোনের নিঃসরণ ততই বাড়বে আর এই হরমোনগুলো নারী-পুরুষের ভেতরে জৈবিক প্রয়োজন সৃষ্টি করবে। মানুষ অনুভব করবে Biological তাড়না। এটি সৃষ্টিগতভাবেই এমন। আল্লাহ যেভাবে তৈরি করেছেন তাকে অস্বীকার করার কোনো ক্ষমতা মানুষের নেই। আর তাই পাশ্চাত্য জগতে নারীকে যতই দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় করতে উন্মুক্ত হতে বলা হচ্ছে, ধর্ষণের মাত্রা ততই বাড়ছে। আর ব্যভিচারের মাত্রা তো কল্পনাতীত সংখ্যক। ফ্রি সেক্সের গোটা পাশ্চাত্যের দেশগুলোর দিকে নজর দিলেই এর প্রমাণ মিলবে। গোটা পাশ্চাত্য আজ ব্যভিচারে সয়লাব। অস্ট্রেলিয়ান বংশোদ্ভুত বিশ্বে আলোড়িত 'দি ফিমেল ইউনাক' বইয়ের নারীবাদী লেখিকা 'জামেইন গৃয়ার'-এর উপর 'যায়যায়দিন প্রতিদিন' একটি ফিচার প্রকাশ [৮ এপ্রিল, ১৯৯৯] করেছিল। তাতে লেখিকার ভালবাসার নামে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া এবং পরবর্তীতে তার ধর্ষিতা হবার বর্ণনার ভেতর দিয়ে পাশ্চাত্য সমাজে ব্যভিচার ও ধর্ষণ যে পাল্লা দিয়ে চলছে তার এক নিখুঁত চিত্রই ফুটে উঠেছে। মুসলিম হিসেবে নিজেদের দর্শন [Philosophy], ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং পৌরানিক ও পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতার ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনের প্রভাবে হীনমন্যতা রোগে আক্রান্ত বেশকিছু আদমশুমারী ভিত্তিক মুসলিম প্রধান দেশ ব্যাপকভাবে ব্যভিচার ও ধর্ষণ সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের কেউ কেউ ধর্ষণের সেঞ্চুরীও উদযাপন করেছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত অনাহারী মানুষ যেমন ক্ষুধার তাড়নায় খাদ্য-অখাদ্য বিবেচনাবোধ হারিয়ে ইতর প্রাণীর সাথে খাদ্য অন্বেষণে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় তেমনি স্খলিত কিছু নারী-পুরুষ যৌন দুর্ভিক্ষে এতটাই আক্রান্ত হয়েছে যে তা বর্ণনার অতীত। ব্যভিচার ও ধর্ষণ দিয়ে কোনো মানবিক ও উচ্চ নৈতিকতার সমাজ গঠন হয় না। ম্যাকিয়াভেলীর শৃগাল ও সিংহের সমাজ হতে পারে।

---

১১৮. সূরা তীন ৯৫ ঃ আয়াত নং- ৪ ও ৫।
১১৯. সূরা বায়্যিনা ৯৮ ঃ আয়াত নং- ৬ ও ৭।

www.pathagar.com

২৬.৯] আল্লাহ্ তা'আলার বিধান সম্মত নয় এমন কোন হত্যাকাণ্ড না ঘটানো ঃ হত্যার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যে কোন লোক কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম। সে চিরকালই সেখানে থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তার প্রতি অভিশাপ করেন এবং তার জন্য কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।"[১২০] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "কোনো মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাওয়াই আল্লাহতা'আলার কাছে অধিকতর সহজ।"[১২১] হত্যা প্রধানতঃ তিনভাবে হতে পারে। এক. ইচ্ছাকৃত হত্যা; দুই. ভুলবশতঃ হত্যা; তিন. কারণবশত: হত্যা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ইচ্ছাকৃত হত্যাতেই কেবল মৃত্যুদণ্ড প্রযোজ্য হবে।"[১২২] হত্যাকাণ্ড কতটা ভয়ানক ক্রোধ ও শাস্তির কারণ তা কুরআনের আয়াত ও হাদীস হতে সুস্পষ্ট। আত্মহত্যা করাকেও আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন হারাম করে দিয়েছেন। "শুধু পাচঁটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ হত্যার অনুমতি দিয়েছেন। এক. ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীকে কিসাসের দণ্ড হিসেবে হত্যা করা। দুই. যুদ্ধের ময়দানে ইসলামের দুশমনকে হত্যা করা। তিন. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা উৎপাটনের চেষ্টাকারীকে দণ্ডস্বরূপ হত্যা করা। চার. বিবাহিত নারী-পুরুষকে, যারা পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যভিচার করেছে; তার দণ্ডস্বরূপ রজম করা। পাঁচ. মুরতাদকে দণ্ডস্বরূপ হত্যা করা। তবে কোন ব্যক্তি বা দল নিজেই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারী নয়। এজন্য ইসলামী আদালতের রায় প্রয়োজন হবে।"[১২৩] সার্বিক বিচারে একজন মুসলিম বেপোরোয়া জীবন-যাপন করতে পারে না। একজন মুসলিমকে এতটা সতর্ক থাকতে হবে যে তাকে দিয়ে যেন কোন ইচ্ছাকৃত তো দূরে থাক, কোনো ভুলবশতঃ হত্যাকাণ্ডও যেন না হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ডারউইনের যোগ্যতমের উদ্বর্তন আর ম্যাকিয়াভেলীর জাতীয় রাষ্ট্রদর্শনের প্রভাবে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সারা বিশ্বে রাজনৈতিক মতপার্থক্যকের ফলে অসহিষ্ণুতার কারণে অন্যায় হত্যাকাণ্ড মামুলী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব পাশবিকতার মূল কারণ, আল্লাহর বিধানকে পাশ কাটিয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান করার ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ খোঁজা। উপর্যুপরি অন্যায় হত্যাকাণ্ডে বিবেকবান মানুষের অন্তর আজ অধিক শোকে নির্বাক পাথর হয়ে গেছে।

২৬.১০] ইয়াতিমের সম্পদকে হিফাযাত করা, আত্মসাৎ না করা ঃ মৃত্যু ও জীবনকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, পরীক্ষা করে দেখতে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ? আল্লাহ বলেন,

---

১২০. সূরা নিসা; ০৪ ঃ আয়াত নং-৯৩।

১২১. আত তিরমিযী, [কিতাবুদ দিয়াত], হাদীস নং-১৩৯৫; ইবন মাজাহ, [কিতাবুদ দিয়াত], হাদীস নং- ২৬১৯।

১২২. দারাকুতনী, আস-সুনান, [কিতাবুদ দিয়াত], হাদীস নং-৪৫।

১২৩. এ.কে.এম. নাজির আহমদ, *দারসুল কুরআন সংকলন-২*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, পৃষ্ঠা:৩৭-৩৮।

www.pathagar.com

"মহামহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ত; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য - কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম?"[১২৪] পিতার মৃত্যুর কারণে অভিভাবকহীন সন্তানই ইয়াতিম। আর মৃত্যু আল্লাহতায়ালাই সৃষ্টি করেছেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে সন্তান অসহায় ও ইয়াতিম হলো আল্লাহতায়ালা তার দায়িত্ব নেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে মানবিক সমাজ গঠনে সমাজ ও রাষ্ট্রের করণীয় কী তা বলে দিলেন। সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কাউকে না কাউকে ইয়াতিমের অভিভাকত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং তাকে ইয়াতিমের সম্পদের রক্ষকরূপে দায়িত্ব পালন করতে হবে। যিনি ইয়াতিমের সম্পদের রক্ষক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন, অবশ্যই তিনি উন্নত নৈতিক গুণ আমানাতদারীর পরীক্ষায় পড়ে গেলেন। এই পরীক্ষায় যেন উত্তীর্ণ হওয়া যায়, রক্ষক হয়ে যেন কেউ ভক্ষক না হয় বা ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ না করে সে কথা আল্লাহতায়ালা স্মরণ করিয়ে দিলেন। অর্থাৎ কেউ যদি রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তবে তা যে নিকৃষ্টতম কর্ম তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তাই ইয়াতিমের অভিভাবকত্ব গ্রহণ একদিকে যেমন একটি পরীক্ষা অন্যদিকে তা মানবিক সমাজ গড়ার অন্যতম হাতিয়ার।

২৬.১১] ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি পালন করা ঃ পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, জীবনের সকল ক্ষেত্রে যখন ওয়াদা পালনকারীকে বোকা এবং ওয়াদা খেলাপকারীকে বাহাদুর মনে করার মত সামাজিক প্রবণতা কোন সমাজে দেখা যায়, তখন বোধগম্য কারণেই সমাজে ওয়াদা খেলাপকারী, ঋণখেলাপকারী ইত্যাদি নানা খেলাপকারীর জ্যামিতিক হারে পয়দা হতে থাকে। আর এটা বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না যে, সে সমাজে শান্তি বায়বীয় পদার্থে পরিণত হয় এবং সে সমাজ বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। সমাজকে এতটা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে খাবি খেতে দিতে ইসলাম মোটেই পছন্দ করেনি। সমাজের শান্তি বিনষ্টকারী এই কুঅভ্যাসকে ইসলাম কঠোর জবাবদিহির বিষয় বলে আগাম জানিয়ে দিয়েছে। সমাজে নৈরাজ্য উৎপাদনকারী সেই উপকরণকে প্রশ্রয়দানকারী ব্যক্তি ও সমাজ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবতার শত্রু এবং এরা সংখ্যায় কম নয়। এসব ব্যক্তিও সমাজের কাছে ইসলামের প্রতিশ্রুতি পালনের সংস্কৃতি বোকামী সদৃশ এবং এরা এ সংস্কৃতির ঘুণ। প্রতিশ্রুতি পালন যে শান্তিতে জীবন-যাপনের জন্য অপরিহার্য উপাদান সচেতন যে কোন নাগরিককে তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

২৬.১২] মাপে কম না দেয়া, পূর্ণমাপে প্রদান করা ঃ মাপে কম না দেয়া বা পূর্ণ মাপে দেয়ার বিষয়টি জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। মাপের বিষয়টি শুধু ব্যবসা সংশ্লিষ্ট নয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, আন্তর্জাতিক, ব্যবসায়িক জীবনের সব ক্ষেত্রেই রয়েছে লেনদেন। আর লেনদেন মানেই পরিমাপ। হয় কম বা বেশি। ইসলাম সকল প্রকার লেনদেনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথে

---

১২৪. সূরা মুল্‌ক ৬৭ ঃ আয়াত নং-১ ও ২

www.pathagar.com

পূর্ণমাপে তার প্রাপ্য প্রদানের কথা বলেছে। যদি বাস্তবিকই তা আমরা করতে সক্ষম হই তবে পৃথিবীতে সুবিচার এতটা দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠবে না; যতটা এখন আমরা পাই। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথে পূর্ণমাপে লেনদেন করার বিষয়টি যদি ধরে নেয়া হয় যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে তবে পৃথিবীতে শান্তির দুলর্ভতা দূর হয়ে যেত। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, আন্তর্জাতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছি। মিথ্যাচার করা প্রকৃতপক্ষে এক ধরণের মাপে কম দেয়া, মানুষকে ঠকানো। মিথ্যাচার যেন জীবনের প্রতি বন্দরে বন্দরে নোঙর করা জাহাজ। এভাবে মানুষকে ঠকিয়ে কে কবে শান্তির বিশ্ব গড়ে তুলতে পেরেছে? ইসলাম জীবনের সব ক্ষেত্র হতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে পরিমাপে কম দিয়ে ঠকানোর অনৈতিক অমার্জনীয় অমানবিক গুরুতর অপরাধকে অংকুরেই মিটিয়ে দিতে চায়। মানুষের নৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে এই গুরুতর অমানবিক অপরাধকে মিটিয়ে দিতে পারলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই বিশ্ব কি এক অনির্বচনীয় আত্মার বন্ধনে একসূত্রে গ্রথিত হতো না? ধর্ম-রক্ত-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষকে আত্মার আত্মীয় করার ইসলামের এই সূদুর প্রসারী মনোভংগিটি জাত-পাত দিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর নির্মাণকারীদের কাছে কোনদিন সহনীয় হবে?

২৬.১৩] জ্ঞান ও যাচাইকৃত তথ্যভিত্তিক আচরণ করা ঃ তথ্যকে যাচাই না করেই ঘটনার প্রতিকারে লেগে যাওয়া কিংবা তথ্যকে যাচাই না করেই কারো বিরুদ্ধে বা কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বা কোনো জাতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সমাজের জন্য ক্ষতিকর পরিণতি বয়ে আনে। চক্ষু-কর্ণ-হৃদয় দিয়ে যাচাই করে, প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে বিবেকসম্মত উপযুক্ত মতামত বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বা logical। এতে অন্যের সম্মান ও মর্যাদায় অর্বচীনের মত অহেতুক আঘাত করা থেকে বেঁচে থাকা যায়। বিনা কারণে কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অভদ্রতা ও ইতর সদৃশ আচরণ থেকে দূরে থাকা যায়। একইভাবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও নাযিলকৃত কিতাব সম্পর্কে না জেনে কোন মন্তব্য করা, চক্ষু-কর্ণ-হৃদয় থাকা সত্ত্বেও এক ধরণের অন্ধত্ব। ইসলাম জ্ঞানভিত্তিক আচরণ বা চক্ষু-কর্ণ-হৃদয় দিয়ে যাচাই করা পরিশীলিত আচরণ করতেই মানুষকে নির্দেশ দিচ্ছে। সমাজে এ ধরণের আচরণের প্রসার ঘটলে সে সমাজ সোনালী সমাজে পরিণত হয়। মুমিনদের মধ্যে এভাবেই নাগরিক অধিকারগুলোর চর্চা হোক এবং বিকশিত হোক - এটাই ইসলামের দাবী।

২৬.১৪] ভূ-পৃষ্ঠে দাম্ভিকতার সাথে চলাফেরা না করা ঃ যত বিশাল পরাশক্তির কর্ণধার হউন না কেন, এককভাবে কোন মানুষ তো নয়ই, পৃথিবীর সব মানুষের পদভারেও পৃথিবী বিদীর্ন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে, মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব।[১২৫] সুতরাং দম্ভভরে চলার কোন যুক্তিসংগত কারণ মানুষের নেই। তারপরও আমরা অহেতুক গর্ব অহংকারে মত্ত হই। আর এই অহংকারই

---

১২৫. সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ আয়াত নং-৭০।

www.pathagar.com

পৃথিবীতে সকল ধরনের বৈষম্য সৃষ্টির উৎস। সকল ধরনের অনৈক্যের ও অশান্তির কারণ। বিশ্বের দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের কারণও এটি - তৎকালীন পরাশক্তিগুলোর অহংকার। দুই বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বকে বাসের অযোগ্য করে তুলেছিল। এ সবই পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় দর্শনের অসামান্য উপহার। অন্যদিকে ইসলাম মানুষকে আহ্বান করছে, অনুসরণ করতে বলছে যে, মানুষের অহংকার করার কিছু নেই। আল্লাহই সব মানুষের রব বা প্রতিপালক, মালিক এবং সৃষ্টিকর্তা। অহংকার করার অধিকার আল্লাহর। যোগ্যতা আল্লাহর। মানুষকে বিনয়ী হয়ে চলতে বলা হয়েছে। প্রিয় পাঠক, পরাশক্তিগুলো যদি শক্তির মাদকতায় অহংকারী না হয়ে বাস্তবে বিনয়ী হত; তবে পৃথিবীতে কি বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হওয়া সম্ভব ছিল? পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া করার মনোভাব ছাড়া বিনয়ী যে কোন মানুষের সাথে ঝগড়া করা কি সম্ভব? অহংকার পতন আর অশান্তির প্রতীক। বিনয় শান্তি ও মর্যাদার প্রতীক। ইসলাম মানুষকে বিনয়ী হতেই নির্দেশ দিচ্ছে। শান্তি ও মর্যাদার দিকেই ইসলামের আহ্বান। ব্যক্তি, জাতি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই ইসলামের লক্ষ্য ।

মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। এর পাহারায় নিয়োজিত রয়েছে কঠিন শক্ত ফেরেশতারা। যারা আল্লাহর নির্দেশের অবাধ্যতা করে না। তারা তাই করে যা তাদের প্রতি আদেশ দেয়া হয়ে থাকে।"[১২৬]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, " স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও, এবং ফেরেশতাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দ্বার দিয়ে এবং বলবে ' তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছো বিধায় তোমাদের প্রতি শান্তি; কত ভাল এই পরিণাম!'।"[১২৭]

পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মধ্য দিয়ে একটি উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন পরিবার গড়ে তোলার মাধ্যমে এক মানবিক সমাজ গড়ে তোলাই ইসলামের লক্ষ্য। সুন্দর ও আকর্ষণীয় উন্নত নৈতিক চরিত্রের ব্যক্তি ও শান্তিপূর্ণ মানবিক সমাজ বিনির্মাণে, উন্নত সভ্যতার গোড়াপত্তনে আল কুরআনে বর্ণিত উপরের ডিভাইন ফর্মুলার বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই।

২৭. উপসংহার [Conclusion] ঃ

যেখানে শিক্ষা সেখানেই নৈতিকতার পাঠ। শিক্ষা যখন অশিক্ষা-কুশিক্ষার নামান্তর হয়; তখন নৈতিকতাও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। নৈতিকতা সব সময়ই শিক্ষার অনুগামী। শিক্ষা নিরপেক্ষ নৈতিকতার কোন অস্তিত্ব নেই। তাই নৈতিকতা আগে না

---

১২৬. সূরা তাহরীম ঃ ৬৬ : আয়াত নং-০৬।
১২৭. সূরা আর রাদ; ১৩ : আয়াত নং-২৩ ও ২৪।

www.pathagar.com

শিক্ষা আগে এ নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। শিক্ষাই নৈতিকতার উৎস। একটি মানবিক সমাজ গড়তে শিক্ষার গুরুত্ব তাই অপরিসীম।

আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিকতার বহুরূপ আমরা দেখতে পাই। আর এর পেছনে রয়েছে শিক্ষার ভূমিকা। পাশ্চাত্য, ভারতীয় ইত্যাদি নানা আদর্শের শিক্ষা নানামুখী নৈতিকতা সৃষ্টিতে নিরলস অবদান রেখে যাচ্ছে এ দেশে। এ শিক্ষা যে শুধু আনুষ্ঠানিক তা নয়, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার অবদান এক্ষেত্রে সিংহভাগ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীরা যতটুকু নৈতিকতার পাঠ পায় তার চেয়ে বেশি পায় টিভি, মুভি, ইন্টারনেট এসব অনানুষ্ঠানিক Education Source হতে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এই বহুমুখীতায় এমন একটি সমাজ ক্রমশঃ গড়ে উঠছে বা উঠেছে যেখানে নাগরিকদের মাঝে চিন্তার কোনো ঐক্য নেই। নৈতিকতার ঐক্য নেই। এ ধারার শিক্ষায় কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। রক্ত-বংশ-বর্ণ-গোত্র-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মানবিক নৈতিকতা সৃষ্টিতে অবদান রাখতে সক্ষম এমন একটি শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হলে তা শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই নমুনা হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারতো। ইসলাম নৈতিকতার যে ডিভাইন ফর্মূলা দিয়েছে, তা বাস্তবায়ন করা হলে অনায়াসে একটি উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন মানবিক সমাজ গড়া সম্ভব।

বাংলাদেশে বর্তমানে অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি কার্যতঃ ম্যাকিয়াভেলীর শৃগাল ও সিংহের নৈতিকতাসম্পন্ন পাশবিক সমাজ গঠনের বিকাশ ঘটাবে এবং সমাজে ছড়িয়ে পড়বে নৈরাজ্য, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা, খুন-খারাবি, ছিনতাই-রাহাজানি, সম্ভ্রমহানি আর ধনী-দরিদ্রের অর্থনৈতিক বৈষম্যের আকাশ ছোঁয়া ব্যবধান। আর এভাবে দেশের মানুষের জীবন অসহনীয় হয়ে উঠা সময়ের ব্যাপার মাত্র। ইসলামী নৈতিকতার মত একটা মানবিক দিক নির্দেশনা থাকার পরও যারা ভিন্ন শিক্ষাদর্শনের অনুগামী হয়ে মনুষ্যত্ব ধ্বংসকারী নৈতিকতার জনক-জননী হতে আগ্রহী তাদের মনুষ্যত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন সৃষ্টি হতেই পারে। ইসলামী নৈতিকতাগুলো এতটা টেকসই ও স্থিতিস্থাপক যে তা অনায়াসে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র - একই সাথে সবক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা সম্ভব। মানবতার কল্যাণকামী সব বিদগ্ধজনেরা বস্তুনিষ্ঠভাবে ইসলামী নৈতিকতাগুলো প্রয়োগ করলে মানবজাতি মুক্তির দিশা ফিরে পেত। কারণ ইসলামী নৈতিকতাতে শুধু মুসলিমদের নয়; গোটা মানবজাতিরই অধিকার রয়েছে।

লেখক পরিচিতি : জনাব শেখ মোহাম্মাদ শোয়েব নাজির-বিশিষ্ট লেখক, প্রাবন্ধিক এবং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ফিন্যান্স),দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ লি:), গাজীপুর।

লেখা পরিচিতি : প্রবন্ধটি ৩০শে জুলাই, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামী কৌশল: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

ভূমিকা

দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এবং মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনের চেষ্টায় রত জন্মলগ্ন থেকেই[১] তবে বর্তমান অবস্থায় বাংলাদেশ একটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল, দরিদ্র এবং সমস্যা পীড়িত উন্নয়নকামী দেশ।[২] দীর্ঘ প্রায় চার দশকের অগ্রযাত্রায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সূচকে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হলেও এখনও এদেশ বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিম্ন জীবনযাত্রার মান, নিরক্ষরতা, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করণে পিছিয়ে থাকা, পরনির্ভরশীলতা, কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব, প্রাকৃতিক সম্পদের অপর্যাপ্ততা, আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তোলন ও সুষ্ঠু ব্যবহার করতে না পারা, অনুকূল সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশের অভাব, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা, পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশের ওপর নানা ধরনের আক্রমণ, বিশ্বমন্দার ধাক্কা তথা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা মুকাবিলা, হতোদ্যম বেসরকারী খাত, বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্থবিরতা বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির পথে সংকট তৈরি করছে। বাংলাদেশের জন্য দারিদ্র্য এক বিরাট অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

---

১. ড. মো. আব্দুল ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি, দ্বিতীয় সংস্করণ; এপ্রিল ১৯৯৮, আজিজিয়া বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ.২৬

২. ইনাম আহমেদ চৌধুরী, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভবিষ্যত, দৈনিক কালের কণ্ঠ, শুভযাত্রা সংখ্যা-১, ১০ জানুয়ারী ২০১০, পৃ. ১৮

www.pathagar.com

এ অভিশাপ আয়ের দারিদ্র্য (Income Poverty) এবং জ্ঞানের দারিদ্র্য (Knowledge Poverty) উভয় ক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এটি সতিই দুর্ভাগ্য যে, দারিদ্র্য বিমোচনের ফলপ্রসূ ও কার্যকর পদ্ধতির একমাত্র ধারক হয়েও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্রদেশগুলোর অন্যতম।

দারিদ্র্য ও ইসলাম

ইসলাম মানব জীবনের জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ দর্শন। এই জীবন দর্শন কতিপয় আনুষ্ঠানিক 'ইবাদাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের প্রতিটি দিক, ক্ষেত্র এবং পর্যায়ে সকল সমস্যার নির্ভুল সমাধান এতে বিদ্যমান। ব্যক্তি থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের পর্যায়ে মূল্যবোধ সমন্বিত এক কল্যাণকর আদর্শ এতে রয়েছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিচার ব্যবস্থা অন্য-কথায় জীবনের সকল দিক সম্পর্কেই ইসলাম সুষ্ঠু কাঠামো ও মঙ্গলময় বিধান পেশ করেছে। সুতরাং জীবনের কোন দিক বা পর্যায়ের কোন সমস্যার সমাধান অন্যত্র খুঁজে বেড়াবার প্রয়োজন নেই, ইসলাম এর অনুমতিও দেয় না। ইসলাম দুনিয়ার সামনে যে আদর্শ পেশ করেছে তা যেমন জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সবদিক দিয়ে ও সব বিভাগে ইনসাফে ও সুবিচারে একমাত্র নিয়ামক তেমনি তা মানুষের অর্থনৈতিক জীবনেও ইনসাফের প্রতিষ্ঠাতা। আর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভবই নয়। আসলে প্রকৃত ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা একমাত্র ইসলামী জীবন আদর্শের মাধ্যমেই সম্ভব। ইসলাম সূচনালগ্ন থেকেই দারিদ্র্য সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা, দৃষ্টিভঙ্গি, দারিদ্র্য দূরীকরণের নীতি, পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলাম ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রকে ধনী ও দরিদ্র বিষয়ক ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

বর্তমানে মানবজাতি দারিদ্র্যের মত একটা বড় সমস্যা মুকাবিলা করছে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ও অধিকাংশ মানুষ আজ দারিদ্র্য সমস্যায় জর্জরিত। বর্তমান শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে এবং তাদের অধিকাংশই শুধু বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিশেষ করে মুসলিম দেশ সমূহে দারিদ্র্য উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও ইসলামে দারিদ্র্য 'কুফর' এর মতই ঘৃণিত। বিশ্বের দু'পরাশক্তির স্নায়ুযুদ্ধ থেমে গেলেও স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্বে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তীব্র যুদ্ধ আজও অব্যাহত আছে এবং এই চরম শত্রুকে পরাস্ত করা বেশ কষ্টসাধ্য। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সৃষ্ট অসম আয় ব্যবস্থাই দারিদ্র্যের মূল কারণ। এই অর্থনীতিতে মানুষ অযৌক্তিক, বিবেক বর্জিত ও অসৎপন্থা অবলম্বন করে নিজের স্বার্থ (self interest) চরিতার্থ করার প্রয়াস পায়। ফলে সাধারণ মানুষ ক্রমে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর এবং অবশেষে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। মূল্যবোধে অনিরপেক্ষতা, সুদ, কালোবাজারী, মজুদদারী, চোরাচালান ইত্যাদি পুঁজিপতিদেরকে রাতারাতি সম্পদের পাহাড় গড়তে সাহায্য করে। বিপুল জনগোষ্ঠীর হাতে ক্রয় ক্ষমতা না থাকায় নিত্য

www.pathagar.com

ব্যবহার্য পণ্য ক্রয় করে মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতাও তাদের থাকেনা। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিও দারিদ্র্য দূর করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এ অবস্থায় ইসলামী আদর্শই কেবলমাত্র দারিদ্র্য বিমোচনে সফল হতে পারে।

দারিদ্র্যের প্রত্যয়গত ধারণা ও সংজ্ঞা (Defination of Poverty)

মানব জাতির ইতিহাসের সূচনাতে একটি সমস্যা হিসেবে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হলেও দারিদ্র্যের প্রচলিত সংজ্ঞা এবং পরিমাপ পদ্ধতিতে এখনও বেশ কিছু অসঙ্গতি এবং অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান। অবশ্য দারিদ্র্যের ইতিহাস প্রাচীন হলেও দারিদ্র্য পরিমাপের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে অনেক পরে।[৩] সংজ্ঞা ও পরিমাপ বিষয়ে এ সব দ্বিধা ও দ্বিমতের কারণে অনেক ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিস্থিতির বাস্তব প্রতিফলন ঘটে না।[৪]

বিগত তিন দশক ধরে অর্থনীতির পাতায় দারিদ্র্যের ধারণা ও পরিমাণগত সমস্যার ওপর বিস্তর লেখা হয়েছে। পঞ্চাশ এবং ষাট দশকে 'চুইয়ে পড়া তত্ত্বের' ওপর অর্থনীতিতে যে জোর দেয়া হয়েছিল, সত্তর দশকে তা ম্রিয়মান হয়ে পড়ে এবং অর্থনীতিবিদগণ প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে দারিদ্র্য বিমোচনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। বস্তুত: দারিদ্র্যের গতি প্রকৃতির সাথে প্রবৃদ্ধির সামঞ্জস্যহীনতা এবং দরিদ্র জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে অর্থনীতিবিদদের অনেকেই প্রধান সমস্যা হিসেবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চেয়ে দারিদ্র্যের সমস্যার ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। দারিদ্র্য সমস্যার ওপর বিপুল পরিমাণ কাজ হলেও দারিদ্র্যের প্রত্যয়গত ধারণা এবং পরিমাণগত সমস্যা এখনও বিতর্কমূলক অবস্থায় রয়েছে। দারিদ্র্যের সংজ্ঞা নিয়ে সমাজতত্ত্ববিদ এবং অর্থনীতিবিদদের মধ্যকার চিন্তার বিভিন্নতা দীর্ঘকালের।

দারিদ্র্য একটি ব্যাপক ও মারাত্মক সমস্যা, যাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। দরিদ্র বলতে এমন ব্যক্তি বা দেশকে বুঝায় যার সামান্য সম্পদ, অল্প আয় রয়েছে; যার

---

৩. দারিদ্র্যের ওপর প্রথম বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা শুরুর কৃতিত্ব উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বুথ এবং রাওনট্রির। ১৮৮০ এর দশকে বুথ পরিচালিত পূর্ব লন্ডনের সমীক্ষা সম্ভবতঃ দারিদ্র্য পরিমাপের প্রথম সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। দেখুন Charles Booth, Labour and Life of the People in London, 1902; Seebohm Rowntree, Poverty and Progress, London,1941; উদ্ধৃত বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, দ্বাদশ খণ্ড, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫, পৃ.১৪৫

৪. এ প্রসংগে উল্লেখ্য, কিভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ করা সম্ভব, এর অনেক কিছুই এখনো জানতে বাকী রয়েছে। দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তথ্য- কারা দরিদ্র এবং কোথায় তাদের অবস্থান, তারা কি ধরণের বাধার সম্মুখীন হয়, তাদের সংখ্যা এবং অবস্থার পরিবর্তন এই সকল বিষয়ে তথ্য, এমনকি পরিসংখ্যান সমৃদ্ধ দেশেও অনেকটাই সীমিত। তথ্যের সীমাবদ্ধতা এবং দারিদ্র্য ও উন্নয়নের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের জটিলতা, এই উভয় কারণেই দারিদ্রের উপর সংশ্লিষ্ট নীতিমালা এবং কর্মসূচীর প্রভাবের আংশিক মূল্যায়ন করাও একটা দুরূহ ব্যাপার (The World Bank's support for the alleviation of poverty, A World Bank Publication, Washington D.C, USA 1988)

www.pathagar.com

দ্বারা ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন (Basic Needs) মেটাতে ব্যর্থ।[৫]

দারিদ্র্যের অর্থ হচ্ছে অভাব ও দীনতা, দরিদ্র অবস্থা। জীবনের মৌলিক চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে অক্ষমতাকে দারিদ্র্য বলা হয়। মানুষের জরুরীয়াত বা মৌলিক প্রয়োজন পূরণের (Basic Needs Fulfilment) ক্ষেত্রে স্বল্পতা ও সংকট হল দারিদ্র্যতা। অন্যকথায় মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে মানুষের অভাব ও সমস্যাকে দারিদ্র্যতা বলা হয়। মানুষের অনেক ধরনের প্রয়োজন থাকে কিন্তু মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও প্রাপ্তি মানুষের মৌলিক অধিকার।

ড. এম. এ. মান্নান লিখেছেন, "যুগে যুগে মানুষের ন্যূনতম আয়ের হিসাব পরিবর্তনের কারণে দারিদ্র্যের ধারণাতেও পরিবর্তন এসেছে। বাস্তবিকপক্ষে দারিদ্র্য পরিমাপ করতে হলে বর্তমান বিবেচনায় একজন ব্যক্তি তার আয় দিয়ে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মত মৌলিক প্রয়োজনগুলো কতটা পূরণ করতে পারছে তা দেখতে হবে। আসলে দারিদ্র্য হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যেখানে জনগণ উপরোক্ত মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণে ব্যর্থ হয়।"[৬]

মিখাইল রোজ দারিদ্র্যকে জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের অভাব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন[৭] অন্যকথায় দারিদ্র্যকে একটি নূন্যতম জীবনযাত্রার মান অর্জনে ব্যর্থতা হিসেবে গণ্য করা যায়। এক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠী হচ্ছে তারাই যারা জীবন ধারনের জন্য মৌলিক চাহিদা মেটাতে অপারগ। এই অক্ষমতা তাদের সীমিত সামর্থের প্রতিফলন। সাধারণতঃ এই সীমিত সামর্থের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ধরা হয় মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে যেসব দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন তা ক্রয় করার মত ক্রয়ক্ষমতার অভাবকে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমতঃ মৌলিক চাহিদা কি এবং এর উপাদান গুলোই বা কি।[৮] দ্বিতীয়তঃ জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান কিভাবে নির্ধারণ করা হবে। বিশেষতঃ এই ন্যূনতম মান স্থির নয় এবং স্থান ও কাল ভেদে ভিন্ন হতে পারে। যেমন একটি সামগ্রী কোন দেশে সৌখিন দ্রব্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যা

---

৫. J.L. Hanson, A Dictionary of Economics and Commerce, P. 308

৬. প্রফেসর ডঃ এম এ মান্নান, নীরব অর্থনৈতিক বিপ্লবঃ বিকল্প চিন্তাধারা, (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, এপ্রিল ২০০৪), পৃষ্ঠা ৫২

৭. Michael Roze, The relief of Poverty, Macmillan, London

৮. অনেকের অভিমত হচ্ছে মৌলিক চাহিদার কার্যকর ধারণা বহুমাত্রিক হওয়া প্রয়োজন। শুধু ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বঞ্চনার বিভিন্ন দিক এতে অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। অন্যদিকে এর বিপরীত মত হচ্ছে, যদিও দারিদ্র্য একটি বহু মাত্রিক বিষয় তথাপি আয় এবং ভোগ বঞ্চনার অন্যান্য উপাদানের সাথে পর্যাপ্তভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ জন্য শুধু এই দুই নিয়ামকের উপর দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। অবশ্য যেখানে উভয় নিয়ামকের তথ্য বিদ্যমান, সেক্ষেত্রে ব্যয়ের ওপর অগ্রাধিকার প্রযোজ্য কারণ আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী স্থিতিশীল

www.pathagar.com

অন্য দেশে অত্যাবশ্যকীয়।[৯] এজন্য জীবন যাত্রার ন্যূনতম মান নির্ধারণে একটি অংশ আপেক্ষিক এবং দেশ বা কাল ভেদে পরিবর্তিত হয়। অপর অংশ যা মৌলিক চাহিদা নির্ধারণ করে (যেমন- খাদ্য) তা অনেকাংশে অপরিবর্তনশীল।[১০]

সমাজতত্ত্ববিদ বুথ[১১] দারিদ্র্যকে অভাব ও বঞ্চনার মধ্যে দেখতে চেয়েছেন। বি. সুবাই রাউনট্রি [১২] বলেন, দারিদ্র্য হল স্বল্প আয় যা কিনা শুধু প্রকৃত দক্ষতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনসমূহ অর্জনে অপ্রতুল। অর্থনীতিবিদ টাউনসেন্ড এবং রেইন দারিদ্র্যকে সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং বৈষম্যের ভেতর খুঁজেছেন। স্তরবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শ্রেণী, মর্যাদা, ক্ষমতা, পেশা, আয়, শিক্ষা, সামাজিক গতিশীলতা অথবা এগুলো সব মিলিয়ে যা হয় তাই।

অর্থনীতিবিদ মিলার এবং রবী[১৩] অর্থনৈতিক মর্যাদাকে দীর্ঘস্থায়ীত্বের মূল বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এরপর তারা শিক্ষা এবং সামাজিক গতিশীলতাকে দরিদ্রজনের ভবিষ্যত জীবনযাত্রার মান নির্ণায়ক হিসেবে তুলে ধরেছেন। তাঁরা সমাজের আয় বন্টনের দিক দিয়ে বঞ্চিত শ্রেণীকে দরিদ্র বলে চিহ্নিত করেন। কার্ল মার্কস (১৮১৩-১৮৮৩) সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিকের ওপর সর্বাপেক্ষা জোর দিয়েছেন। টিটুমাস আয়ের জায়গায় সম্পদের ওপর কর্তৃত্বের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে ম্যাক্স ওয়েভার উল্লেখিত শ্রেণী, মর্যাদা ও ক্ষমতা এ তিনটি উপাদানের সাথে মিলার এবং রবী শিক্ষা এবং সক্ষমতাকে (সামর্থকে) যুক্ত করেছেন। অনেকেই দারিদ্র্যকে বৈষম্য এবং বন্টন সমস্যার সাথে এক করে দেখতে চেয়েছেন।

অর্থনীতিবিদ ওঝা,[১৪] ডান্ডেকার ও রাথ,[১৫] আহলুওয়ালিয়া [১৬] দারিদ্র্যকে পুষ্টির ঘাটতি অথবা অপুষ্টির আঙ্গিকে দেখেছেন। এ ব্যাপারে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা

---

৯. P. Streeten : 'Poverty: Concepts and Measurement', (1990) The Bangladesh Development Studies, 18(3)

১০. রুশিদান ইসলাম রহমান, দারিদ্র্য ও উন্নয়নঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, বি আই ডি এস, অক্টোবর ১৯৯৭, পৃ. ৬৮

১১. Charles Booth, Labour and life of the people in London (1902)

১২. Seebohm Rowntree, 'Poverty and Progress' Longmangreen, London (1941)

১৩. S.M. Miller & Pamela Roby, Poverty Changing Social Stratification 1968 in(cd) D.P. Mayrihan,1969

১৪. P.D. Ojha, Configuration of Indian Poverty, 1970, RDI Bulletin, 24(I) P.1-12

১৫. VM Dandekar & N.Rath, Poverty in India, EPW, Jan 2 & 9 Issues

১৬. S. Montek Ahluwalia, Rural Poverty and Agricultural Performance in India, Journal of Development Studies 1978

www.pathagar.com

যাবে যে অপুষ্টি যদিও সাধারণত স্বল্প ক্রয়ক্ষমতাহেতু গরিবী খাদ্য গ্রহণের ফলেই সৃষ্টি হয়, অপুষ্টিতে ভোগা সবাই কিন্তু আবশ্যিকভাবে গরীব নয় এবং সব গরীব অপুষ্টিতে ভুগছে এ রকম বলা সংগত হবে না। অনেক বিত্তবান লোকও রোগের কারণে অপুষ্টিতে ভুগতে পারে। অনেক সময় অপুষ্টি সুষম খাদ্য জ্ঞানের অভাবেও হতে পারে। এ ছাড়া একই পুষ্টির স্তরে একজনের পৌছাতে অনেক সময় বেশী খাবার প্রয়োজন হতে পারে যদি তার মেটাবলিক রেট হয় খুব বেশী। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, কায়িক পরিশ্রমে, সন্ত ানসম্ভবা রমনীর, স্তন্যদাত্রী নারীর পরগাছা বহনকারী রোগে ভোগা অবস্থায় মেটাবলিক রেট অপেক্ষাকৃত বেশী থাকায় খাদ্যগ্রহণ বেশি হলেও পুষ্টি বেশি নাও হতে পারে। তাই, খাদ্য গ্রহণ আর পুষ্টির মধ্যে ফাঁক থাকতে পারে এবং তা বিভিন্ন শারীরিক, আবহাওয়াগত এবং সামাজিক চলক দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের [১৭] মতে দারিদ্র্য ধারণাটির উৎপত্তি হয়েছে বঞ্চনা থেকে অর্থাৎ দারিদ্র্যকে বলা যেতে পারে 'একটি বঞ্চনার কাহিনী'। বঞ্চনা একটি সামাজিক ধারণা যা কাল এবং স্থান ভিত্তিক। উন্নয়নশীল দেশ সমূহে দারিদ্র্যকে চরম বঞ্চনার সমার্থক হিসেবে গণ্য করা হয় যা জীবন ধারণের ন্যূনতম চাহিদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অপরপক্ষে উন্নত বিশ্বে দারিদ্র্য ধারণাটি মূলত: আপেক্ষিক বঞ্চনা নির্দেশক যা একটি গ্রহণযোগ্য এবং নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানদণ্ডে নির্ধারিত জীবন যাত্রার মান অর্জনে ব্যর্থতা নির্দেশ করে। তাঁর মতে, চাহিদানুসারে মৌলিক বিষয়গুলো অর্জন বা করতে পারার যে স্বাধীনতা, তার অভাবই হলো দারিদ্র্য।[১৮] তিনি আরো বলেন, দারিদ্র্যে ধারণাটির উৎপত্তি হয়েছে বঞ্চনা থেকে অর্থাৎ দারিদ্র্যকে বলা যেতে পারে 'একটি বঞ্চনার কাহিনী'।[১৯] বঞ্চনা একটি সামাজিক ধারণা যা কাল এবং স্থানভিত্তিক। উন্নয়নশীল দেশসমূহে দারিদ্র্যকে চরম বঞ্চনার সমার্থক হিসেবে গণ্য করা হয় যা জীবন ধারণের ন্যূনতম চাহিদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অপর পক্ষে উন্নত বিশ্বে দারিদ্র্য ধারণাটি মূলতঃ আপেক্ষিক বঞ্চনা নির্দেশক যা একটি গ্রহণযোগ্য এবং নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানদণ্ডে নির্ধারিত জীবনযাত্রার মান অর্জনে ব্যর্থতা নির্দেশ করে। বেঞ্জামিন পেজ ও জেমস সিমন্স বিষয়টিকে আরো ব্যাখ্যা করে বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার অধিকাংশ প্রতিবেশী কর্তৃক ভোগ্য সুযোগ-সুবিধা অর্জনে অসমর্থ হয়, এটি তখন ঐ ব্যক্তির মধ্যে এক ধরনের অক্ষমতা তৈরি করে এবং তার আত্মমর্যাদা ও আত্মপ্রত্যয় কমিয়ে দেয়। এটিও এক ধরনের দারিদ্র্য[২০]। এ ছাড়াও অমর্ত্য সেনের সাথে দ্বিমত পোষণ করার যো

---

১৭. Sen, A.K. (1981) : Poverty and Famines, Clarendon Press, Oxford

১৮. Sen, A.K.(1979): 'Issues in Measurement of Poverty', Scandinavian Journal of Economics

১৯. Sen, A.K. (1981), পূর্বোক্ত; নাজীর আহমদ জীবন, ইসলাম ও দারিদ্র্য বিমোচন, পালক পাবলিশার্স, মার্চ ২০০৮, পৃ-৮।

২০. উদৃত, বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসন কৌশল পত্র (পি আর এস পি) মূল্য প্রতিপাদ্য ও বাস্ত-বায়নের চ্যালেঞ্জ, সিপিডি প্রকাশিত, মার্চ ২০০৬, পৃ. ১৮

www.pathagar.com

নেই যে দারিদ্র্য তথা জীবনযাত্রার মানের সাথে সম্পৃক্ত সমস্যাটা খাবার নিয়ে নয়, সেই খাবার আর অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে একজন কি ধরনের জীবন অতিবাহিত করছে সমস্যাটা সেখানে। খাদ্য গ্রহণ, পুষ্টি এবং দারিদ্র্য তিনটিই ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত হলেও পৃথক বিষয়। পুষ্টি যেমন শুধু খাদ্য গ্রহণ দিয়ে হয় না, তেমনি দারিদ্র্যও শুধু পুষ্টি দিয়ে নির্ণয় করা যায় না। তবে এর অর্থ এ নয় যে, দারিদ্র্যের সাথে পুষ্টির সম্পর্ক নেই। বরঞ্চ অপুষ্টি এবং দারিদ্র্য স্বাভাবিকভাবে একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু খাদ্য গ্রহণ নিয়ে যে পুষ্টি নির্ণয় তার চেয়ে স্বাস্থ্যগত অবস্থা দিয়ে পুষ্টি নির্ণয় অনেক বেশি দারিদ্র্য এবং জীবনযাত্রার মানকে প্রতিফলিত করে। বস্তুত খাদ্য এবং খাদ্য ছাড়া জীবন এবং পরিবেশের অন্যান্য উপাদানও দারিদ্র্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। পুষ্টিহীনতার আঙ্গিকে একজন লোককে তখনই দরিদ্র বলা হয়, যদি সে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ক্যালরী বা পুষ্টি না পায়। যেহেতু পুষ্টিগত প্রয়োজন স্থান এবং পেশাভেদে বিভিন্ন হয় সেহেতু সমস্ত লোকের পুষ্টি-ঘাটতি পরিমাপ করাও কঠিন হয়ে পড়ে। এ ধারণা অনুযায়ী একজন লোক বা একটি পরিবারকে দরিদ্র বিবেচনা করা যাবে তখনই, যদি তার আয়/ব্যয়ের মান ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ক্যালরী এবং অন্যান্য পুষ্টির মান বজায় রাখতে অসমর্থ হয়। অর্থাৎ পুষ্টির একটি ন্যূনতম সীমারেখায় পৌছাতে না দেয়।

কোন কোন অর্থনীতিবিদ দারিদ্র্যকে ক্ষুধার যন্ত্রণার মধ্যেও দেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে, একটি পরিবার তখনই দরিদ্র বলে বিবেচিত হবে, যদি তার কোন সদস্যকে বছরের কোন না কোন দিনে না খেয়ে থাকতে দেখা যায়।[২১] এ রকম ধারণা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। জেকসন দারিদ্র্যকে অভাব এবং বঞ্চনার সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[২২] জেকসন অনুভব করেন যে, একটি লোকের ভোগের জন্য খাদ্য প্রবাহের সাথে সাথে বিভিন্ন সেবা মূলক প্রবাহের প্রয়োজন। আর ভোগযোগ্য সেবার প্রবাহ আসবে বাড়ি, কাপড়-চোপড়, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মত মজুত (Stock) চলক (Variables) থেকে, যা স্বচ্ছন্দ সামাজিক সক্রিয়তার জন্য একান্ত প্রয়োজন। যদি সে ভোগ্য পণ্যের প্রবাহ না পায়, তাহলে সমস্যা যেটা, তা হবে অভাবের, আর মজুতের ব্যর্থতার জন্য যে সমস্যা, তা হবে বঞ্চনার।

আমরা দারিদ্র্যকে অক্ষমতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। এ অক্ষমতা হল ন্যূনতম জীবনমান অর্জনের অথবা মৌলিক প্রয়োজন পূরণের। অন্যভাবে এটাকে সনাক্ত করতে পারি অভাব এবং বঞ্চনার অবস্থা হিসেবে, যা স্বাভাবিক জীবন ধারণে এবং যথার্থ সামাজিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ন্যূনতম ভোগ্য প্রবাহ এবং মজুত মান রক্ষণে ব্যর্থ।

---

২১. Desai, 1978, Rural Development for Rural Poor, Dharampur Project Report, IIMA, Ahmadabad. India.

২২. Dudley, Jackson, 1972, Poverty, Macmillan, Delhi

www.pathagar.com

জে জনউনমকির মতে, দারিদ্র্য হল এমন এক ব্যবস্থা যাতে প্রয়োজনসমূহ সম্পূর্ণভাবে পূরণ হয় না। ডেলটুসিং বলেছেন, মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের অপ্রতুলতাই হল দারিদ্র্য। থিওডরসনের মতে, দারিদ্র্য হল প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক উপোষ। দারিদ্র্য কোন একজন বা কোন একদল লোকের জীবনযাত্রার নিম্নমান যা যথেষ্ট সময় পর্যন্ত স্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার প্রতি অবমাননামূলক। রবার্ট চেম্বার্স দারিদ্র্যকে জীবন ধারনের জন্য আয় এবং ব্যয়ের চৌহদ্দি থেকে আকস্মিক সংকটে পড়ার অবস্থা বা সম্ভাবনা (সম্পদ বিক্রী অথবা মন্দার সময় ঋণে জড়িয়ে পড়া ইত্যাদি), পরাধীনতা, নিরাপত্তাহীনতা, ক্ষমতাহীনতা এবং একাকীত্বের অবস্থা পর্যন্ত বিস্তৃতি দিয়েছেন।[২৩]

সারণি-১

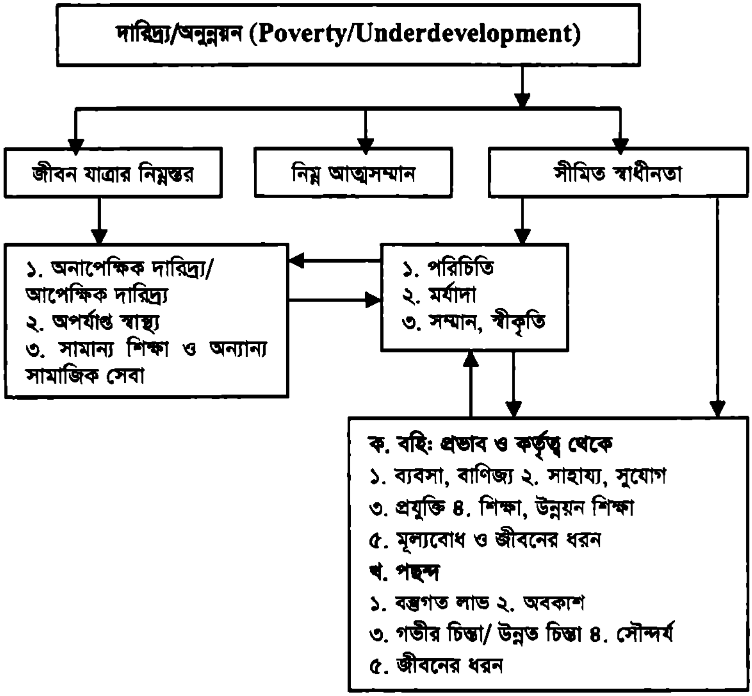

বৈষয়িক উন্নতি ছাড়াও আরো অনেক দিক রয়েছে, যা দরিদ্র শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ বলে অনুভব করে। এগুলোর মধ্যে ভাল কাজের পরিবেশ, কাজ বাছাইয়ের স্বাধীনতা, আত্মপ্রত্যয়, অত্যাচার থেকে স্বাধীনতা, ঐতিহ্যগত, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আচার

২৩. Robert Chambers, 1988: 'Poverty in India, Concepts, Research and Reality', Discussion paper 241, IDS, Sussex

www.pathagar.com

অনুষ্ঠান পালনে স্বাধীনতা,, ক্ষমতায় অংশগ্রহণের সুবিধা, সমাজগ্রাহ্যতা, সামাজিক মর্যাদা, স্বাধীন (অবসর) সময় এবং এটার ব্যবহার সুবিধা, স্বেচ্ছামূলক সেবা প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ ইত্যাদি। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দারিদ্র্য প্রত্যয় হিসেবে বস্তুত জীবনের অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত এবং রাজনৈতিক অবস্থার সামগ্রিক দিক সম্বলিত জীবনাবস্থার একটি জটিল এবং বহুমুখী বিষয়। তাই দারিদ্র্যের গঠনজাত বহুলতা ইদানীং কালের অর্থনীতিবিদদের অনেকেই গুরুত্বের সাথে দেখতে বাধ্য হচ্ছেন।

অমর্ত্য সেনের স্বত্বাধিকার এবং সক্ষমতা থিসিস অনুযায়ী আমরা দারিদ্র্যকে ন্যূনতম জীবনযাপন মান অর্জনে স্বত্বাধিকারের অভাব অথবা অক্ষমতার অবস্থাকে বুঝাতে পারি। ন্যূনতম জীবন মান বলতে কি বুঝায় তা বের করাটাই প্রধান সমস্যা। ন্যূনতম জীবন মান বলতে ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে আমরা বুঝি, এমন একটা জীবন যাপন ব্যবস্থা, যার তলায় দেশের মানুষের অবস্থান কাম্য নয়।

অর্থনীতিবিদ পিগু[২৪] এটাকে প্রকৃত আয়ের ন্যূনতম পরিমাণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং পণ্যের কতখানি কোন মানুষের আওতাধীন তা দিয়ে ন্যূনতম মান বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, 'জীবনধারনের এই ন্যূনতম সূচক গঠিত হবে বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শৌচ ব্যবস্থা, কাজের নিরাপত্তা ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট মান আর পরিমাণ দিয়ে। প্রাসঙ্গিকতার বিচারে যেহেতু জীবনযাত্রার মান খুবই বিস্তৃত বিষয়, একে ব্যবহার যোগ্যতার মাপকাঠিতে আনাটা খুবই গুরত্বপূর্ণ। তাই খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা দিয়ে একটা ন্যূনতম জীবনযাপনে অধিকারী করে তোলার ব্যর্থতার অবস্থাকে আমরা দারিদ্র্য বলতে পারি। অনেক সময় ন্যূনতম জীবনযাপনকে মৌলিক প্রয়োজনের সন্তোষ সাধন অবস্থা দিয়ে প্রতিস্থাপন করার কথা বলা হয়। এটা সত্য যে, মৌলিক প্রয়োজন জীবনযাপনের উন্নতির সাথে পরিবর্তিত হয়। তবে দু'টোর মধ্যে ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে পার্থক্য বের করা কষ্টকর । দারিদ্র্য নির্ণয়ে ন্যূনতম জীবনমান অথবা মৌলিক প্রয়োজন যেটাই নিই না কেন, এখানে মূল সমস্যা হল, ন্যূনতম বা মৌলিক প্রয়োজনকে সঠিকভাবে চিহ্নিত এবং নিরূপণ করা। এখানে প্রয়োজন কিছু গুরুত্ব আরোপনের পদ্ধতির সাহায্যে অভাব বা বঞ্চনার সূচক নির্মাণের। যদিও মজুদ (Stock) এবং প্রবাহের (Flow) ন্যূনতম মান পরিমাণগতভাবে বের করা যায়, তবুও আমাদেরকে ভোগ্যপণ্যের ঝুড়িতে তাদের অবদান কতটুকু সে বিচারে আর্থিক মূল্য নিরূপণের ওপর নির্ভর করতে হবে। এভাবে ন্যূনতম জীবন মান থেকে বঞ্চিত হওয়ার মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য সংজ্ঞায়িত করলে পুরো বিষয়টির মূল হয়ে দাঁড়ায় দারিদ্র্য রেখা নিরূপণ, যা সমাজে দরিদ্রদেরকে স্পষ্টভাবে পৃথক করতে সাহায্য করবে। দি পেঙ্গুইন ডিকশনারী অব ইকনমিকস এ দারিদ্র্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "The situation facing there in society where material needs are

২৪. A.C. Pigue, The Economics of Welfare, London, Macmillan, 1952

www.pathagar.com

least satisfied" অর্থাৎ সমাজের এ সমস্ত দরিদ্ররা বস্তুগত প্রয়োজন খুব কমই মেটাতে পারে।

অনেকেই দারিদ্র্যতার সংজ্ঞাকে ক্যালরী গ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত করেন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্ত রের নিচে ক্যালরী গ্রহীতারাই দরিদ্র। ফাও (FAO), বিবিএস (BBS) এর গবেষণায় দেখা যায় প্রায় ২২০০ ক্যালরী শক্তি যারা পায় না তারাই দরিদ্র। প্রতিদিন জীবন ধারনের জন্য ২১২২ ক্যালরী খাদ্য ও ৫৮ গ্রাম প্রোটিন ক্রয়ে অক্ষম জনগোষ্ঠীকে ধরা হয় দারিদ্র্য সীমার নিচে। আর ১৮০৫ ক্যালরী খাদ্যও কোন ভাবে জুটাতে পারেনা যে জনগোষ্ঠী চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে তাদের অবস্থান। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহের জন্য এই মান নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

সারণি-২

দারিদ্র্য পরিমাপের পদ্ধতি

<table>
<tr><th>দারিদ্র্যের স্তর</th><th>FAO</th><th>WB</th><th>UNDP</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>অনপেক্ষ দারিদ্র্য (Absolute Poverty)</td><td><= দৈনিক মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ</td><td><= বার্ষিক মাথাপিছু ৩৭০ মার্কিন ডলারের নিম্নের আয়</td><td rowspan="2">(HDI+HFI) + মাথাপিছু বার্ষিক আয়</td><td rowspan="2">বাংলাদেশ FAO এর নির্দেশনা অনুযায়ী দারিদ্র্য পরিমাপ করে থাকে</td></tr>
<tr><td>চরম দারিদ্র্য (Hard Core Poverty)</td><td><= দৈনিক মাথাপিছু ১৮০৫ কিলো ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ</td><td><= বার্ষিক মাথাপিছু ২৭৫ মার্কিন ডলারের নিম্নের আয়</td></tr>
</table>

বয়লি (Boyle), রেইন (Rein) দারিদ্র্যের তিনটি ধারণা ব্যবহার করেন। যেমন:

১। জীবন ধারণ।

২। অসমতা।

৩। সহিষ্ণুতা।

প্রথমটি মূলত সমাজে কাজ করে খাওয়ার মত শক্তি ও স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে যে পরিমাণ খাদ্য ও সেবা প্রয়োজন তা যারা পায় না তাদেরকেই বুঝান হয়।

দ্বিতীয়টি মূলত সম্পদ বন্টনে বৈষম্যের ভিত্তিতে নির্ণীত হয়।

তৃতীয়টি হচ্ছে যে, সামাজিক দৃষ্টিভংগীতে যাদের অবস্থান নিম্নে, যারা কম খায়, ভাল কাপড় পরতে পারে না, বাহ্যিক চাকচিক্য নেই তারাও দরিদ্র।

বিশ্ব ব্যাংক দারিদ্র্য সম্পর্কে তার বিভিন্ন প্রতিবেদনে দু'টি দারিদ্র্যের সীমা টেনেছেন। সাধারণ দারিদ্র্য সীমা নির্ধারিত হয়েছে যেখানে জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপি ৩৭০ মার্কিন ডলার এবং নিম্নতর চরম দারিদ্র্যের সীমা হচ্ছে ২৭৫ ডলার। যেখানে জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপি ৩৭০ ডলারের কম, সে দেশকে উচ্চতর দারিদ্র্য সীমার অন্তর্ভুক্ত দেশ হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ইউএনডিপির মতে দারিদ্র্য অবস্থা নির্ণয় করার সময় মানব উন্নয়ন

www.pathagar.com

সূচক (Human Development Index-HDI) ও মানব স্বাধীনতা সূচক (Human Freedom Index-HFI) কে মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের সাথে যুক্ত করা উচিত। কথাটি এভাবে বলা হয়েছে, মানব উন্নয়ন সূচক এবং মানব স্বাধীনতা সূচককে যৌথভাবে মাথাপিছু আয়ের ধারণার সাথে একত্রিত করলে স্পষ্টভাবে দারিদ্র্য অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব। মানব সম্পদ সূচকে আয়ুষ্কাল, বয়স্ক শিক্ষা ও ক্রয়ক্ষমতাকে একীভূত করা হয়েছে।

দারিদ্র্যের ইসলামী সংজ্ঞা

দারিদ্র্য এমন একটি অবস্থা যখন মানুষ তার বেঁচে থাকার মত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় বা মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। ইংরেজীতে তাকে বলা হয় A Situation of Deprivation. ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য হচ্ছে এমন এক অবস্থা যা মানব জীবনের অব্যাহত প্রয়োজনীয় পণ্য বা মাধ্যম উভয়েরই অপর্যাপ্ততা থাকে। অন্য কথায় দারিদ্র্য এমন ধরনের জীবন যাপন যা কোন সুস্থ খাদ্যের পর্যায়ে পড়ে না। এটা ব্যক্তির এমন এক অবস্থা যেখানে শুধু অব্যাহতভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা নয় বরং সুস্থ ও উৎপাদনমুখী অস্তিত্বের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, পোশাক এবং আশ্রয়ের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী সম্পদের অভাব রয়েছে। আল-কুরআন এ ধরনের ধারণা ও মৌলিক প্রয়োজনের মান সম্পর্কে বলছে:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ • وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ •

"এখানে তো তুমি মহা সুযোগ সুবিধা লাভ করেছ, না অভুক্ত উলঙ্গ থাকছ, না পিপাসা রৌদ্র তাপ তোমাকে কষ্ট দেয়।"[২৫]

কুরআন ও হাদীসে দারিদ্র্যকে দু'টি স্তরে বিন্যাস করেছে। একটি হল কঠিন দারিদ্র্য, চরম/অতি দারিদ্র্য সীমা (Hard core poverty) যার মধ্যে পড়ে ফকীর ও মিসকীন। ফকীর শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাদের জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় উপকরণ নেই যারা সর্বতোভাবেই নিঃস্ব পথের ভিখারি তারাই ফকীর। অন্যকথায় ফকীর বলতে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যাদের স্বাভাবিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা সমূহ পূরণার্থে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ বা বৈধভাবে উপার্জনের সন্তোষজনক কোন উপায় নেই। মিসকীন হচ্ছে তারা, অভাব যাদের এখনো চরমে পৌছেনি, তবে আশু ব্যবস্থা না হলে রাস্তায় দাঁড়াতে যাদের বিলম্ব হবে না। মিসকীনদের আত্মমর্যাদা ও কৌলিন্যবোধ তাদের রাস্তায় নামতে দেয় না, দেয় না কোথাও হাত পাততে। সহীহ মুসলিম শরীফে এক হাদীসে মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিসকীনদের পরিচয় এভাবে দিয়েছেন ১. যার ধনী হবার রাস্তা নেই ২. দারিদ্র্য প্রকাশ পায় না বলে ভিক্ষাও জোটেনা ৩. হাত পেতে কারো কাছে কিছু চায়ও না। এ

২৫. আল কুরআন, ২০ ঃ সূরা তা-হা : ১১৮-১১৯

www.pathagar.com

হাদীসের শেষাংশে ইংগিত করা হয়েছে সূরা আল বাকারার এ আয়াতের দিকে ১. তাদের আত্মমর্যাদার অবস্থা তো এই যে, অজ্ঞরা তাদেরকে ধনী বলেই ভাবে ২. আপনি শুধু তাদের চেহারা দেখেই ভেতরের অবস্থা আঁচ করে নিতে পারবেন ৩. তারা কখনো কারো পেছনে লেগে কিছু চেয়ে ফিরে না[২৬] যারা কর্মক্ষম হওয়া সত্বেও কাজের অভাবে বেকার থাকতে বাধ্য হন। শত চেষ্টা করেও চাকরি মিলছেনা - এক কথায় একেবারেই বেকার যারা তারাও মিসকীন। সমাজের ঐসব লোক যাদের অবস্থা কিছুদিন আগেও ভাল ছিল হঠাৎ ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বা অন্য কোন আকস্মিক দুর্যোগের কবলে পড়ে বর্তমানে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে পূর্বে তারা যত বিত্তবানই থাকুক না কেন, আজ মিসকীনের কাতারে নেমে এসেছে।

দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে সাধারণ দারিদ্র্যতা (General Poverty)। ইসলামের বিধান মুতাবিক যার নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই অর্থাৎ যিনি যাকাত আদায়যোগ্য সম্পদের মালিক নন তিনিই দরিদ্র। অন্য কথায় সাধারণ দারিদ্র্য হল এমন অবস্থা যেখানে মানুষের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন (Basic Needs) পূরণ হয়ে সামান্য উদ্বৃত্ত থাকে, যা অবশ্য যাকাতের নিসাবের চেয়ে কম। ইমাম শাতিবী (রহ)[২৭] ও ইমাম গায্যালী, (রহ)[২৮] মানুষের প্রয়োজনগুলোকে তিনটি ক্রমিক স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। এগুলো হচ্ছে:

১। জরুরীয়াত/Zaruriat-(Basic Needs/Necessities)- আবশ্যকীয়- যা একান্তই অপরিহার্য, যা না হলে মানুষের চলেই না, বস্তু জগতের সামগ্রিক অগ্রগতিতে যা একান্তই অপরিহার্য।

২। হাজিয়াত/Hajiat-(Requirement/Comforts)- প্রয়োজনীয়- যা মানুষের জীবনকে সহজ ও আরামদায়ক করে এবং কষ্ট ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

৩। তাহসিনিয়াত (Beautification)- সৌন্দর্যবর্ধক- যা মানবজীবনকে সুন্দর, পরিপাটি ও কল্যাণময় করে।

তাঁদের মতে জরুরীয়াত বা মৌলিক প্রয়োজন হচ্ছে ৬টি। যেমন-

১। দীন/আকীদা/Protection of faith, Deen, Ideology : ঈমান, দীন, আদর্শ।

২। নফস/Nafs (Life itself/Protection of life) : ত্বা'আমুন-খাদ্য, লিবাসুন-বস্ত্র, মাকানুন-বাসস্থান, মুয়ালিয-চিকিৎসা, ইয়ানাকলুন-পরিবহন, মুহিতুন-পরিবেশ, আল ইসতিরাহাতু-বিশ্রাম, অবসর, বিশুদ্ধ পানীয়, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া, শান্তি-স্বস্তি-নিরাপত্তা ইত্যাদি সব মানুষের জীবন ধারনের সাথে সম্পৃক্ত।

---

২৬. আল কুরআন, ২ ঃ সূরা আল বাকারা : ২৭৩
২৭. ইমাম শাতিবী, Al Muwafaqat fi Usul al Shariah, Vol 2, p.177
২৮. আল গায্যালী, Al-Mustasfa (1937) Vol-1, পৃ. 139-40

www.pathagar.com

৩। নসল/Nasl/Family formation/Protection of Posterity: পরিবার গঠনের ক্ষমতা, বংশধারা সংরক্ষণ করা।
৪। আকল/Aql-Intellect/ Reason : শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা।
৫। মাল/Mal (property, wealth) : ন্যূনতম পরিমাণ সম্পদ থাকা এবং তা সংরক্ষণ করা।
৬। হুররিয়াত/Hurriat/Freedom : স্বাধীনতা।

দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম দারিদ্র্যকে দেখে স্রষ্টার প্রতি বান্দাহর আনুগত্যের পরীক্ষা ও দুর্ভোগ হিসেবে। কুরআন বলছে, আমরা নিশ্চয়ই ভয়, বিপদ, অনশন, জান-মালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাসের দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবো। এ অবস্থায় যারা ধৈর্য ধারণ করে তাদের জন্য সুসংবাদ।[২৯]

ইসলাম দারিদ্র্যকে ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে যা মানুষকে নীচতা, পাপ ও অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। এজন্য মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর কাছে থেকে এর জন্য পানাহ চেয়েছেন: হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে দারিদ্র্য, অভাব ও নীচুমনা থেকে পানাহ চাই।[৩০] এ জন্য মানুষ কাউকে খুন করতেও কুণ্ঠিত হয় না। দারিদ্র্য জর্জরিত সমাজ কখনও উন্নতি লাভ করতে পারে না। মানুষের যদি খাওয়া পরার ব্যবস্থা না থাকে, থাকার জায়গা না থাকে তাহলে সমাজে অশান্তি, নৈরাজ্য, আইন-শৃংখলার অবনতি, গর্হিত কর্ম তৎপরতা ইত্যাদি বেড়ে যায়। আল-কুরআন শিক্ষা দিচ্ছে:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"দারিদ্র্যের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করোনা। আমরা তাদের ও তোমাদের জন্য রিয্‌ক দেব। নিঃসন্দেহে তাদের হত্যা করা মহাপাপ।"[৩১]

ইসলাম মনে করে দারিদ্র্য মানুষকে কুফরীর দিকে চালিত করে। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দারিদ্র্যকে কুফরীর সাথে তুলনা করে বলেছেন: দারিদ্র্য মানুষকে কুফরের দিকে ঠেলে দেয়।[৩২] সুতরাং দারিদ্র্য হচ্ছে মানুষের ঈমান ও চরিত্র এবং সমাজের নিরাপত্তা আর স্থিতিশীলতার প্রতি হুমকি স্বরূপ। দারিদ্র্য হচ্ছে সামাজিক ব্যাধি। কারণ এর কবলে পড়ে মানুষের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, বহু সামাজিক সমস্যা তৈরি হয় এবং নিঃস্ব জাতি বিশ্বে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মানবতা ও ইসলামের প্রতি

---

২৯. আল কুরআন, ২ ঃ সূরা আল বাকারা : ১৫৫
৩০. আবু দাউদ শরীফ
৩১. আল কুরআন, ১৭ ঃ সূরা বানী ইসরাঈল : ৩১
৩২. বাইহাকী ও তাবারানী শরীফ

www.pathagar.com

একজন ঈমানদারের সামাজিক, নৈতিক ও আদর্শিক দায়িত্ব পালন বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে বলে দারিদ্র্য হচ্ছে এক আদর্শিক পাপ। দারিদ্র্য মানুষকে কাফিরের মতো কার্যকলাপের দিকে ঠেলে দিয়ে তাকে কুফরিতে লিপ্ত করে। ইসলাম তাই দারিদ্র্যকে ঘৃণা করে এবং তা নিয়ন্ত্রণ/দূরীকরণের জন্য সর্বাত্মক কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলামী উম্মাহকে সাধারণভাবে এবং সেই মুতাবিক নির্দিষ্টভাবে অভাব (Needs) থেকে নিজেদেরকে বাঁচানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর তাকিদ ও এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে নির্দেশ প্রদান করেছেন। সমাজে যাতে দারিদ্র্য না আসতে পারে তার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া ইসলামী সরকারের ও জনগণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আর দারিদ্র্য যদি কোন কারণে বিস্তৃতি লাভ করে তাহলে তা দূর করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো অবশ্য করণীয় বলে গণ্য করা হয়েছে। ইসলামী সমাজে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা পালন করা সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ইসলামী সমাজে স্থায়ী দরিদ্র হিসেবে কোন নিম্ন শ্রেণীর লোক থাকবে না; কেউ সাময়িকভাবে দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করলে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলাম অবশ্য এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক, আইনানুগ ও ব্যবহারোপযোগী কাঠামো সৃষ্টির পক্ষপাতি যা দারিদ্র্যাবস্থা নিরসনের নিশ্চয়তা দেবে এবং ন্যায় ও সমতার সাথে প্রবৃদ্ধির বিকাশে সহায়তা করবে। পাশাপাশি ইসলাম মানবিক দায়-দায়িত্বের নৈতিক সম্প্রসারণের ওপরও গুরুত্ব দিয়েছে। আর সামাজিক দায়িত্ব, অঙ্গীকার ও সংশ্লিষ্টতার বিকাশ সাধনের জন্য সমাজের প্রতি আহ্বান জানায়।

একদিকে ব্যক্তিগতভাবে কোন মানুষ বা সমষ্টিগতভাবে কোন জাতি যাতে দরিদ্র অবস্থায় পতিত না হয় তার জন্য ইসলামের কতকগুলো বাস্তব ইতিবাচক পদক্ষেপ (Positive Measures) রয়েছে, রয়েছে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ (Preventive Measures) । অন্যদিকে দরিদ্র অবস্থা থেকে ব্যক্তিকে মুক্তি দেয়ার জন্য অনেকগুলো সংশোধনমূলক পদক্ষেপ (Corrective Measures) বা নিরাময়মূলক পদক্ষেপ (Curative Measures) রয়েছে । ইসলাম একদিকে বিত্তবানদেরকে গরীবদের প্রতি/সমাজের প্রতি দায়িত্বপালন সম্পর্কে যেমন সজাগ ও সচেতন করেছে অপরদিকে অন্যায় ও অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সম্পদ আহরণ ও ভোগ ব্যবহারের অধিকার দেয়ার সাথে সাথে সম্পদ অর্জন ও খরচের নীতিমালাও ইসলাম দিয়েছে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বেচ্ছাচারী পন্থায় সম্পদ অর্জন ও ভোগ করতে বা জমা করতে পারবে না। সঠিক অর্থে ইসলামী রাষ্ট্রে কিছু মানুষ হঠাৎ করে ধনী আবার ব্যাপক গণ মানুষ দারিদ্র্যে নিপতিত হতে পারবে না।

ইসলাম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শোষণের সকল পথ বন্ধ করে দিতে চায়। অর্থ

www.pathagar.com

কেন্দ্রীভূতকরণ ও শোষণের সকল পথ বন্ধ করা হলে দেশ/অঞ্চল রাতারাতি ধনী হওয়া আর কোন দেশ দরিদ্রে পরিণত হওয়া স্বাভাবিক নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ পন্থায় সম্পদ সঞ্চিতকরণ ও ব্যবহার দণ্ডনীয় অপরাধ, সেটি ব্যক্তি পর্যায়ে, গোষ্ঠী বা জাতীয় পর্যায়ে বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হোকনা কেন। এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের হাতে বা কোন বিশেষ অঞ্চলে বা কোন বিশেষ দেশে সম্পদ কেন্দ্রীভূত করতঃ অন্যান্য ব্যক্তি বা অপরাপর অঞ্চল বা অন্যান্য জাতিকে দারিদ্র্যে নিপতিত করা কাঙ্ক্ষিত ও স্বাভাবিক নয়।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য সমস্যার কারণ

ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেকের মতে, যে কোন দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীর ভিত্তি হবে দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান করা। আসলে দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতার জন্য এর নানা উৎস ও বহুমুখী প্রকাশ ভঙ্গীই দায়ী। বাংলাদেশের যে সমস্যার কথাই বলা হোকনা কেন শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে তার মূলে আছে এই দারিদ্র্যের সমস্যা। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির এ এক কঠিন সংকট। বাংলাদেশের আর্থ- সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে দারিদ্রের প্রধান প্রধান কারণ সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। দুর্নীতি (Corruption)

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ দুর্নীতি। তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে পরিচিত। এদেশে দুর্নীতির মাত্রা অনেক বেশী। রাজনৈতিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব দুর্নীতি প্রসারে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।[৩৩] ২০১০ সালে ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনালের (টি আই) দুর্নীতি ধারণা সূচকে (করাপশন পারসেপশন ইনডেক্স বা সি আই পি) বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বাদশ। ১০ নম্বরের (স্কোর) মধ্যে বাংলাদেশ পেয়েছে মাত্র ২.০৪। গত বছরেও তাই ছিল। তবে গতবার অবস্থান ছিল ১৩ তম। যে দেশ গুলোর পয়েন্ট ১০ এর মধ্যে ৩ বা তার চেয়ে কম, সি আই পি র হিসাব অনুযায়ী সে দেশগুলোতে দুর্নীতির ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশী।[৩৪] দুর্নীতি আজ এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে পঙ্গু করে দিয়েছে। দুর্নীতির করাল গ্রাস বাংলাদেশের জনগণকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে।[৩৫] এই দুর্নীতিই বাংলাদেশের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। সহজ ও অবৈধ উপায়ে ধনী হওয়ার প্রক্রিয়া চালু থাকার ফলে বাংলাদেশের দারিদ্র্য কমছে না। সমাজে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী শ্রেণীর দুর্নীতি দুর্বল শ্রেণীর দারিদ্র্যের জন্য বহুলাংশে দায়ী। আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

---

৩৩. দুর্নীতির কারণ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, দৈনিক যুগান্তর রিপোর্ট, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০২, পৃষ্ঠা ১
৩৪. বাংলাদেশে দুর্নীতি কমেনি, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা রিপোর্ট, ২৯ অকটোবর, ২০১০, পৃষ্ঠা - ১
৩৫. দৈনিক মানব জমিন, ৮ অকটোবর, ২০০৯

www.pathagar.com

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ •

"আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অবৈধ পদ্ধতিতে খেয়ো না এবং শাসকদের সামনেও এগুলোকে এমন কোন উদ্দেশ্যে পেশ করো না যার ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে তোমরা অন্যের সম্পদের কিছু অংশ খাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাও।"[৩৬]

২। সম্পদের সুষ্ঠু আহরণ ও ব্যবহার ব্যবস্থা যথাযথ না থাকা

বাংলাদেশ আয়তনে ছোট। কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় স্বল্পায়তন বিশিষ্ট এ দেশে সম্পদের অভাব নেই। প্রাকৃতিক সম্পদসহ অন্যান্য সম্পদও যথেষ্ট আছে। কিন্তু এই সম্পদের সুষ্ঠু আহরণ ও ব্যবহার ব্যবস্থা না থাকার কারণে এ দেশবাসী দরিদ্র থেকে যাচ্ছে।

৩। অসৎ ও দুর্নীতিবাজ নেতৃত্ব

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ সততার এবং সৎ মানুষের অভাব। সততার প্রকটতা ও সৎ মানুষের অভাবের কারণে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির প্লাবন সৃষ্টি হয়েছে। নানাবিধ সংকটের সাথে প্লাবনের মত এই দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশ ক্রমাগত দারিদ্র্যপীড়িত হচ্ছে। একশ্রেণীর অসৎ ও দুর্নীতিবাজ লোকের নেতৃত্বের কারণেই এই দেশ দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হচ্ছে।[৩৭]

৪। পূর্ণ বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্ব

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ হল পূর্ণ বেকারত্ব বা বেকার সমস্যা ও আধাবেকারত্ব যা সম্পদের চরম ঘাটতি ও অসম বন্টন থেকে উদ্ভূত। বেকারত্ব এমন একটি অবস্থা যাতে কর্মক্ষম কোন ব্যক্তি প্রচলিত মজুরীতে কাজ করতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও তাদের যোগ্যতানুযায়ী কোন কাজ পায়না। কিছু সংখ্যক লোক যে কাজের যোগ্যতা তার আছে তা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ধরনের কাজে নিযুক্ত থাকতে পারে– এসব শ্রমিককে অর্ধবেকার বলা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ কর্মক্ষম লোক বেকার রয়েছে। এর পরিমাণ হলো দেশের শ্রমশক্তির প্রায় ৩৩ ভাগ। এছাড়া বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বিদ্যমান। আর বেকারত্বের কারণেই দারিদ্র্য সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এবং এ সমস্যা ক্রমাগত তীব্রতর হচ্ছে।

৫। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে বাংলাদেশের মানুষ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। অনুন্নত অর্থনীতি যে দারিদ্র্য অবস্থার মধ্য দিয়ে চক্রাকারে আবর্তিত হয় সেই অবস্থাকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে।

---

৩৬. আল কুরআন, ২ ঃ সূরা আল বাকারা : ১৮৮

৩৭. সৎ মানুষের অভাব (সম্পাদকীয়), দৈনিক সংগ্রাম, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ৪

www.pathagar.com

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। প্রফেসর নার্কস সর্বপ্রথম "দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র" এর ধারণা প্রবর্তন করেন। সাধারণত: অনুন্নত দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়, অপুষ্টি ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে। ফলে তাদের উৎপাদনশীলতা কম বলে উৎপাদন ও আয় কম। উৎপাদন ও আয় কম বলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার কম। ফলে বিনিয়োগ কম হয়। দরিদ্র দেশের এমন অর্থনৈতিক অবস্থা নার্কস অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। এ ক্ষেত্রে তার অভিমত হলো, "A Country is poor because it is poor." অর্থাৎ একটি দেশ দরিদ্র কারণ সে দরিদ্র। বিশ্বের অন্যান্য দরিদ্র দেশের ন্যায় বাংলাদেশও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবর্তিত হচ্ছে।

চিত্রঃ মূলধনের যোগানের প্রেক্ষিতে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র

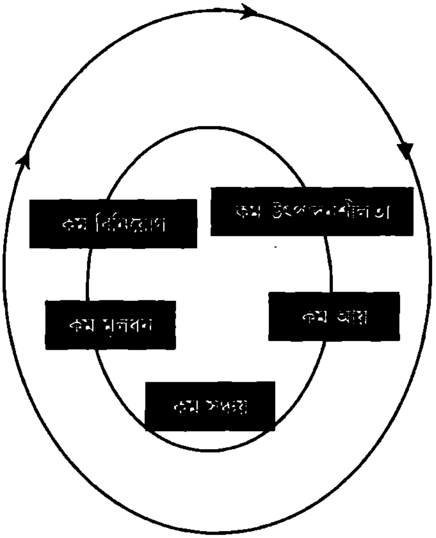

চিত্রানুযায়ী কম উৎপাদনশীলতা → কম আয় → কম সঞ্চয় → কম মূলধন → কম বিনিয়োগ → কম উৎপাদনশীলতা। এভাবে মূলধনের যোগানের দিক থেকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রটি আবর্তিত হয়।

৬। বিদ্যমান শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থা

বাংলাদেশের ব্যাপক জনগণের বিশ্বাস, আক্বীদা ও মূল্যবোধবিরোধী প্রচলিত শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থাই দারিদ্র্যের মূল কারণ।

www.pathagar.com

৭। পুঁজিবাদী অর্থনীতি

এদেশে বিদ্যমান পুঁজিবাদী অর্থনীতিই দারিদ্র্য সৃষ্টির কারখানা। বাংলাদেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে এবং দরিদ্ররা দরিদ্রতর হচ্ছে; দারিদ্র্য বিমোচনের কোন কৌশলই কাজে আসছে না।

৮। মুষ্টিমেয় বিত্তবানদের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হওয়া

মুষ্টিমেয় বিত্তবানদের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়াও বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। ধন বন্টনে ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় অর্থনৈতিক বৈষম্য এখানে প্রকট। অর্থনৈতিক বৈষম্য সামাজিক অস্থিরতা ও চরম দারিদ্র্যের সৃষ্টি করে যা মানুষের জীবনের সার্বিক নিরাপত্তাকে ব্যাহত করে। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে বাংলাদেশে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোন সফলতা দেখাতে পারেনি, বরং তাদের Systemetic inaccuracy এর কারণে এদেশে দারিদ্র্যের চরম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বন্টন ব্যবস্থায় সাম্যের অভাবের ফলে বর্তমানে দেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য বেড়েই চলছে। দারিদ্র্যের মূল কারণ কতিপয় লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত থাকা। আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ •

"সম্পদ যেন তোমাদের সম্পদশালীদের মধ্যেই কেবল আবর্তিত না থাকে।"[৩৮]

৯। সুদভিত্তিক অর্থনীতি

সুদভিত্তিক অর্থনীতি বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। সুদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্র্যের মধ্যে আকাশ পাতাল বৈষম্য সৃষ্টি হয়। সুদী অর্থনীতিতে আসলে তেলা মাথায় তেল দেয়া হয়। ফলে একদিকে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে বিনিয়োগ-উৎপাদনও কম হয়। সুদ দরিদ্রকে আরো দরিদ্র বানায় এবং ধনীকে আরো ধনী করে দেয়। সুদী অর্থনীতি দারিদ্র্য সৃষ্টি করে প্রসংগে মাইকেল রোবোথাম লিখেছেন, "অসংখ্য অতীত ঋণগ্রহীতাকে দেউলিয়া বানিয়ে পথে বসানো হয়, বেশুমার লোককে বাড়ি ঘর থেকে উৎখাত ও বেদখল করা হয়, কারবারগুলোকে ধ্বংস করা হয় এবং মিলিয়ন মিলিয়ন কর্মক্ষম মানুষকে বেকারত্বের অভিশাপের মধ্যে ঠেলে দেয়া হয় এবং অর্থনীতি মানুষের দুর্দশার স্থবির সাগরে রূপ নেয়।"[৩৯]

১০। সুদভিত্তিক মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতারণা

শোষণের অন্যতম হাতিয়ার সুদনির্ভর ক্ষুদ্রঋণ বা মাইক্রো ফাইন্যান্স উদ্ভাবন করে কোন কোন বিশেষজ্ঞ দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে চমক সৃষ্টি করলেও কার্যত দারিদ্র্যের

---

৩৮. আল কুরআন, ৫৯ ঃ সূরা আল হাশর : ৭

৩৯. Michael Rowbotham, উদ্ধৃত দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম পৃ. ১৬৩

www.pathagar.com

মাত্রা ও পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। ড. কাজী খালিকুজ্জামান আহমদ বলেছেন, "নিজস্ব প্রডাক্ট বিক্রি, ভর্তি ফিসহ নানা খাত উপখাত নিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হারে সুদ আদায় করছে অনেক এনজিও। ক্ষুদ্রঋণ দেয়া এবং সুদসহ তা আদায় করাই এদের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য।"[৪০] উচ্চ সুদের হার তথা পূর্ব নির্ধারিত মূলধন খরচ অর্থাৎ সুদভিত্তিক মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচী নিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা টিএমএসএ এবং প্রায় আট হাজারের মত ছোট বড় দেশী বিদেশী এনজিওর এত রং ছড়ানো উন্নয়ন তৎপরতা সত্ত্বেও দারিদ্র্য হটানো সম্ভব হয়নি। দেশে শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে এবং বৈষম্য বেড়েই চলছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মতে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের নামে দরিদ্রদের নিয়ে ব্যবসা করাই মাইক্রো ক্রেডিট কার্যক্রমের বর্তমান উদ্দেশ্য।[৪১]

১১। প্রাকৃতিক দুর্যোগ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। বন্যা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, নদী ভাঙ্গন, খরা, আইলা, সিডর প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্বল্প আয়ের মানুষগুলো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এক দিকে তাদের হাতে কোন সঞ্চয় থাকেনা, অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের কাজের উৎস ও পরিধি আরো সংকুচিত হয়ে পড়ে। তারা যেমন আশ্রয়চ্যুত হয় তেমনি হাতে অর্থ ও কাজ না থাকায় খাদ্য সংস্থানেরও উপায় থাকেনা তাদের। ফলে দেশের অগুনিত মানুষ হয়ে পড়ে দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অনটন, ও দারিদ্র্যের ভয়াবহ শিকার। এ অবস্থার করুণ চিত্র দেখা যায় দেশের বন্যা প্লাবিত, খরা কবলিত, মঙ্গা পীড়িত ও নদী ভাঙ্গণ কবলিত অঞ্চলসমূহে। এ সকল অঞ্চলের দরিদ্র জনগণ অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্ভোগের মধ্যে জীবন-যাপন করে থাকে।

১২। সামাজিক দুর্ঘটনা

বিভিন্ন সামাজিক দুর্ঘটনাও এদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। হঠাৎ দুর্ঘটনায় পড়ে অনেকে সর্বস্ব হারিয়ে ফেলে। অর্থনীতির চক্রাকারে উঠা-নামা, মন্দা-সংকট ইত্যাদির মুখে টিকে থাকার ক্ষমতার অভাব দারিদ্র্য বাড়িয়ে তুলছে।

১৩। গরীবরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত

বাংলাদেশে এটিও দারিদ্র্যের কারণ। অনগ্রসর নারী-পুরুষেরা সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ফোরামে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত।

১৪। উদ্যোক্তার অভাব

উদ্যোক্তার অভাবও বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। গরীব জনগোষ্ঠীকে দক্ষ

---

৪০. দৈনিক আমার দেশ, ৫/১১/২০১০

৪১. ক্ষুদ্র ঋণদাতারা দারিদ্র্য দূর করার নামে ব্যবসা করছে, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সেমিনারে বক্তারা, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৭, পৃষ্ঠা - ১৬

www.pathagar.com

করে গড়ে তোলা, তাদেরকে উদ্যোক্তাসুলভ গুণাবলীর অধিকারী বানিয়ে সমাজে স্বাবলম্বী করে তোলা ইত্যাদি এদেশে পরিকল্পিতভাবে হচ্ছেনা।

১৫। দারিদ্র্যকে জিইয়ে (বাঁচিয়ে) রাখা

বাংলাদেশে দারিদ্র্যকে জিইয়ে (বাঁচিয়ে) রাখা বা সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনার চেষ্টাই এ যাবৎ করা হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ (Eradication of Poverty) এজন্য এদেশে হয়নি।

১৬। দুর্বল মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের জন্য দুর্বল মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাও দায়ী। নিম্নস্তরের মানবসম্পদ উন্নয়ন, অশিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তির জ্ঞানের অভাব এদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

১৭। সম্পদহীনতা

সম্পদহীনতাও বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। অন্যকথায় কাজ করার জন্য যে সম্পদের দরকার সে সম্পদের উপর দরিদ্র জনগণের সীমিত প্রবেশাধিকার দারিদ্র্যকে প্রলম্বিত করছে।

১৮। আয় ও সম্পদের অসম বন্টন

পুজিবাদী অর্থব্যবস্থার সৃষ্ট অসম আয় ব্যবস্থাই বাংলাদেশের দারিদ্র্যের অন্যতম মূল কারণ। এই অর্থনীতিতে মানুষ অযৌক্তিক, বিবেক বর্জিত ও অসৎপন্থা অবলম্বন করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াস পায়। ফলে সাধারণ মানুষ ক্রমে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর এবং অবশেষে নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। সম্পদের অসম বন্টনই সমাজে সৃষ্টি করে ভারসাম্যহীনতা।

১৯। হারাম পন্থায় উপার্জনের সুযোগ

হারাম পন্থায় উপার্জনের সুযোগও বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। সুদ, ঘুষ বা উপরি আয় বা বখশিশ বা Invisible Cost বা Speed Money, জুয়া, লটারি, ধোঁকা, প্রতারণা, মজুতদারি, কালোবাজারি, মুনাফাখোরী, ফটকাবাজারি, চোরাচালান, চটকদার ভুয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করা, হারাম পণ্য উৎপাদন ও বিপণন, ওজন ও পরিমাপে কম দেয়া, মালে ভেজাল মিশানো, ভেজাল পণ্য বিক্রি করা, বেশ্যাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, অশ্লীলতা প্রসারকারী ব্যবসায়, জবরদখল, লুন্ঠন, চুরি বা System Loss, ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস, মাস্তানী, চাঁদাবাজি, বখরাবাজি, টেন্ডারবাজি, ছিনতাই, আত্মসাৎ, চোরাই মাল ক্রয়-বিক্রয়, খিয়ানাত, ধাপ্পাবাজি, সিন্ডিকেট করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো, শেয়ার বাজারে কেলেংকারী ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন বা অন্য কোন অসাধু উপায়ে বাংলাদেশে সম্পদ অর্জন করে অনেকে রাতারাতি সম্পদের পাহাড় গড়ছে। অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক বনী আদমের ভাগ্যের বিনিময়ে যেহেতু অসৎ উপায় অবলম্বনকারীরা ধনী হচ্ছে সেহেতু দারিদ্র্য এদেশে বেড়েই চলছে।

www.pathagar.com

২০। সমন্বিত পরিকল্পনা ও উদ্যোগের অভাব

বাংলাদেশ একটি উন্নয়ণশীল দেশ। এদেশে সুষ্ঠু সমন্বিত পরিকল্পনার ও উদ্যোগের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সমন্বিত সুষ্ঠু পরিকল্পনার ও যথাযথ উদ্যোগের অভাবে আজও দারিদ্র্য দূরীকরণ হয়নি।

২১। অনগ্রসর কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা (Underdeveloped Agriculture)

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কিন্তু এদেশের কৃষি ব্যবস্থা অনুন্নত। অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা দারিদ্র্যের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। এদেশে কৃষি উৎপাদনের তুলনায় জনসংখ্যার বৃদ্ধির পরিমান অধিক। বাংলাদেশে একর প্রতি কৃষি উৎপাদন ১৫ মণ। উন্নত বিশ্বে একর প্রতি উৎপাদন হল ৬০ থেকে ৬৫ মণ। কৃষি উৎপাদন কম হওয়ায় জনগনের চাহিদা পূরণ অসম্ভব। ফলে দারিদ্র্য বিরাজমান।

২২। অনগ্রসর ও অনুন্নত শিল্পায়ন (Underdeveloped Industry)

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ হল শিল্পে অনগ্রসরতা। এদেশের শিল্প ব্যবস্থা অনেকটা অনুন্নত। বৃটিশ আমলে এদেশের শিল্পের উন্নয়ন ঘটেনি। পাকিস্তান আমলে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭২ সালে জাতীয়করণের মাধ্যমে তাও শেষ করে দেয়া হয়েছে। গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে বর্তমানে শিল্পের উন্নয়নের গতি মন্থর। জাতীয় আয়ে এদেশের শিল্পের অবদান শতকরা ১০ ভাগ।

২৩। ক্রটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা

ক্রটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাও বাংলাদেশে দারিদ্র্য সৃষ্টির অন্যতম কারণ। দারিদ্র্য আর ক্রটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা সমান্তরালভাবে চলার কারণে এদেশের এক বিরাট জনসংখ্যাকে এখনো জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব হয়নি।

২৪। অশিক্ষা (Illiteracy)

অশিক্ষাকেও বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ মনে করা হয়। মানুষের অবস্থা ও অবস্থান নির্ধারণের পিছনে শিক্ষার অবদান রয়েছে। এদেশের মানুষ বিনামূল্যে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেনা। দরিদ্র মানুষের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ নেই। কাজেই অশিক্ষিত বলেই তারা দরিদ্র নয়, বরং দরিদ্র বলেই তারা অশিক্ষিত এবং অশিক্ষা মানুষকে আরো দুর্ভোগের দিকে ঠেলে দেয়। শিক্ষাহীনতা দারিদ্র্যের কারণ নয়-বরং এর ফলশ্রুতি।

২৫। নারী শিক্ষার অভাব (Lack of Women Education)

বাংলাদেশ নারী শিক্ষায় এখনো পিছিয়ে। এদেশের মোট জনগণের প্রায় অর্ধেকই নারী। বিভিন্ন কুসংস্কার, মটিভেশনের অপ্রতুলতা, দারিদ্র্যের কারণে এদেশে নারী শিক্ষার প্রসার আশানুরূপ ঘটছে না। ফলে তারা উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করতে পারছে না।

www.pathagar.com

২৬। কারিগরি জ্ঞানের অভাব (Lack of Technical Knowledge)

বাংলাদেশ বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-কারিগরি জ্ঞানে অনুন্নত। অনুন্নত কারিগরি জ্ঞানের অভাবে এদেশে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত নয়। উন্নত প্রযুক্তির অভাবে কলকারখানায় উৎপাদন বাড়ছে না। উৎপাদন বৃদ্ধি না পেলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি মন্থর হয়। ফলে জনসাধারণ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে। তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটছে না।

২৭। বর্তমান ভূমি মালিকানার ধরন ও কাঠামোঃ

ড. কে. এস. হুদা লিখেছেন, গ্রাম বাংলায় দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে সম্ভবত: বর্তমান ভূমি মালিকানার ধরন ও কাঠামো। সাম্প্রতিক এক জরিপ থেকে দেখা যায় যে, সময়ের ব্যবধানে জমির মালিকানা ক্রমাগত মুষ্টিমেয় বৃহৎ ভূ-স্বামীদের হাতে চলে যাচ্ছে এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা ভূমিহীন হয়ে পড়ছে। কৃষিখাতে সম্পদের প্রবাহ ও সুফল ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে।[৪২]

২৮। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা (Political Instability)

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অসন্তোষ থাকলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। জাতীয় উৎপাদন হ্রাস পায়। জাতীয় উৎপাদন হ্রাস পেলে মাথাপিছু আয়ও হ্রাস পায়। ফলে জনগণ উত্তরোত্তর দারিদ্র্যের দিকে ধাবিত হয়।

২৯। প্রশাসনিক দুর্বলতা (Administrative Weakness)

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো দুর্বল প্রকৃতির। এ দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এখনো অনুন্নত। গণমুখী এবং উন্নয়ণমুখী নয়। প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে উন্নয়ণ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটছে। প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে এদেশে গণমুখী প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠছেনা। প্রশাসনিক কারণে অর্থের অপচয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩০। মূলধনের অভাব (Lack of Capital)

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ হল মূলধনের অভাব। এদেশের অধিকাংশ জনসাধারণের উৎপাদন ক্ষমতা স্বল্প। স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতার কারণে তারা অধিক আয় করতে পারেনা। তাদের মূলধন যোগাড়ের ক্ষমতা কম। মূলধনের অভাবে উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়না। নতুন মূলধনও সৃষ্টি হচ্ছেনা।

৩১। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি (High Price of Commodity)

এ দেশে দ্রব্যমূল্যের প্রায়শঃই উর্ধ্বগতি। বাংলাদেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অনেকটা অনিয়ন্ত্রিত। অনিয়ন্ত্রিত পণ্যমূল্য সাধারণ জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে।

---

৪২. ড. কে এস হুদা, বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণসমূহ ও দারিদ্র্যকরণপ্রক্রিয়ার সারসংক্ষেপ (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ), পৃষ্ঠা ১

www.pathagar.com

এদেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু মানুষের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছেনা। তাই দারিদ্র্যের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জনসাধারণের জীবন যাত্রার মানে নিম্নগতি সাধিত হচ্ছে।

৩২। সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর অভাব

সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা এদেশের জনগণকে দারিদ্র্যের গহ্বরে নিক্ষেপ করছে। এদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। কিন্তু গ্রামীণ পর্যায়ে যথেষ্ট নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। নিরাপত্তার অভাবে অনেকে উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করতে পারেনা। সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে গ্রামীণ পর্যায়ে দুর্যোগের কারণে ফসলের হানি ঘটে। সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা দারিদ্র্যকে আরো সম্প্রসারিত করছে। অসহায় বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত মহিলা, বৃদ্ধ, অক্ষম ইত্যাদি সবচেয়ে গরীব পরিবারগুলোর জন্য বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তার অভাব রয়েছে।

৩৩। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিম্নহার

বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত নিম্ন আয়ের দেশ রয়ে গেছে। তবে অন্যান্য নিম্ন আয়ের দেশের তুলনায় বাংলাদেশে সরকারি ব্যয় দরিদ্র্যদের প্রতি মনোযোগী। এতসব করেও দরিদ্র লোকের সংখ্যা কমেনি। অর্থনীতিতে আয়ের বৈষম্যও বেড়েছে। দরিদ্র লোকের সংখ্যা কম হ্রাস পাওয়া এবং আয়ের বৈষম্য বেড়ে যাওয়ার তথ্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি যথেষ্ট পরিমান দরিদ্রবান্ধব হয়নি। এর মর্মার্থ হচ্ছে অর্থনীতিতে জিডিপির প্রবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি।[৪৩]

৩৪। স্বাস্থ্যসেবার অভাব ও পুষ্টিহীনতা

স্বাস্থ্যসেবার অভাব ও পুষ্টিহীণতা বাংলাদেশের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। এদেশের গরীব মানুষেরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং নিরাপদ পানি পানের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। স্বাস্থ্যসেবায় গরীব ও অসহায় মানুষের সীমিত প্রবেশাধিকার বাস্তব সত্য। গরীবদের সারা বছর অসুখ বিসুখ লেগে থাকে। অসুস্থতার কারণে এরা কোন কিছু করতে পারেনা। স্বাস্থ্যের নিয়ম কানুন মানেনা, এজন্য এরা দরিদ্র - এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। আসলে দারিদ্র্যের জন্য গরীব মানুষ পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার পায়না, শিক্ষার অভাবে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা থাকেনা, স্বাস্থ্যসম্মত আবাস ও পয়:ব্যবস্থা তাদের নেই। দারিদ্র্যের কারণে এগুলোর অভাব তাদের অসুস্থ করে তোলে এবং তাদের আর্থিক অবস্থাকে আরো বিপর্যস্থ করে। কাজেই অসুস্থতা দারিদ্র্যের কারণ নয়। বরং দারিদ্র্যই বড় অসুস্থতা যা মানুষকে রোগাক্রান্ত করে।

৩৫। ঔপনিবেশিক শাসন (Colonial Rule)

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে অনেক সময় ঔপনিবেশিক শাসনকেও দায়ী করা হয়ে থাকে। আসলে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ হল এদেশের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। প্রায় দীর্ঘ ২০০ বছর বৃটিশরা বাংলাদেশ শাসন করেছে। বৃটিশ ও পাকিস্তানীরা

---

৪৩. ড. জায়েদ বখত, উন্নয়নের টেষ্ট কেস: অগ্রগতির কিছু দিক, দৈনিক প্রথম আলো, ৪ নভেম্বর, ২০১০, পৃ. ৭

www.pathagar.com

এদেশকে কাঁচামালের উৎস হিসেবে ব্যবহার করত। শিল্পগুলো ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। ফলে জনগণের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি।

৩৬। সুশাসনের অভাব (Lack of Good Governance)

সুশাসনের অভাব বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। সুশাসন ছাড়া উন্নয়ন অর্থহীন। বিশ্ব ব্যাংক সুশাসনের যে ছয়টি সুচক চিহ্নিত করেছে সেগুলোর অভাব বাংলাদেশে দারিদ্র্যকে বাড়িয়ে তুলেছে। বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সহিংসতার অনুপস্থিতি, আইনের শাসন, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সূচকে বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান অনেক নিচে।

ওপরের সবগুলো কারণই বাংলাদেশে দারিদ্র্য সৃষ্টির জন্য কম বেশী দায়ী।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামী প্রতিকার

বাংলাদেশে সামষ্টিক পর্যায়ে দারিদ্র্যের সম্ভাব্য দু'টি কারণ রয়েছে । প্রথমটি হচ্ছে জিএনপির নিম্নহার। জনগণ দরিদ্র; কারণ তারা দরিদ্র দেশে বাস করে এবং জনপ্রতি বার্ষিক আয় (GNP) কম।

দ্বিতীয়ত. আয়ের অসম বন্টন। জনগণ দরিদ্র, কারণ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কাছে আয় ও সম্পদ হয়ে পড়েছে কেন্দ্রীভূত, অন্যেরা হয়ে পড়েছে গরীব, নিঃস্ব।

ব্যষ্টিক পর্যায়ে (micro level) দারিদ্র্যের বেশ ক'টি কারণ রয়েছে। কোন ব্যক্তি বেকার, পঙ্গু এবং অন্যান্য নানা কারণে দরিদ্র হতে পারে। অথবা দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে বলে সামাজিক সুযোগ সুবিধা না পাওয়ায় সে হয়েছে গরীব। দারিদ্র্য নির্মূল কর্মসূচীতে একটি কার্যকর নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্য দারিদ্র্য উচ্ছেদ। দারিদ্র্য বিমোচনকে ইসলামী অর্থনীতিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণে তাই ইসলামী প্রতিকারসমূহ নিয়েই অগ্রসর হতে হবে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের দারিদ্র দূরীকরণে ৪ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

১। ইতিবাচক পদক্ষেপ (Positive Measures)
২। প্রতিকার/প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ (Preventive Measures)
৩। নিরাময়/সংশোধনমূলক পদক্ষেপ (Curative/Corrective Measures)
৪। উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ (Development Measures)

১। বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের ইসলামী ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ (The Positive Measures to Eradicate Poverty)

দারিদ্র্য দুরীকরণে ইসলামের ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে:

১. আয় উপার্জন বৃদ্ধি

ইসলাম আয় উপার্জন বৃদ্ধির শিক্ষা দিয়েছে। দিয়েছে আত্ম কর্মসংস্থানকে প্রাধান্য। একজন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কর্মসংস্কৃতি ও অবস্থা নির্ভরশীল হয় তার দেশের আয়ের ক্যাটাগরি এবং তার কর্ম প্রচেষ্টা থেকে। ইসলাম এমন এক পদ্ধতি পেশ করেছে যা উচ্চ

www.pathagar.com

আয় বাড়ানোর অনুকূল। সম্মানজনক জীবিকা উপার্জনের জন্য ইসলাম গঠনমূলক কার্যক্রমের নীতি পেশ করেছে। অল্পে তুষ্টি ও পরিমিত খাদ্যাভ্যাসের ইসলামী নিয়ম-নীতির ফলে প্রয়োজনীয় সঞ্চয় করা যায়। এ পদ্ধতিতে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে এবং দক্ষতার সাথে তা সদ্ব্যবহার করলে পুঁজি গড়ে ওঠে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। কুরআন শিক্ষা দিচ্ছে:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ •

সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো।[৪৪]

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ •

মানুষ ততটুকুই পায় যতটুকুর জন্য সে চেষ্টা করেছে।[৪৫]

শ্রমবিমুখ অলস জীবনকে ইসলাম অত্যন্ত ঘৃণা করে । তাই ইসলাম জীবিকার সন্ধান করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে । মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: অন্যান্য ফরযের সঙ্গে হালাল উপার্জনও একটি ফরয।[৪৬] শ্রমবিমুখ হয়ে অন্যের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকা বাঞ্ছিত নয় । মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: কারো জন্যে নিজের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম কোন আহার নেই ।[৪৭] মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবন সংগ্রাম থেকে এটি সুস্পষ্ট হয় যে জীবিকা ও পেশার সাথে সম্পৃক্ত কর্মতৎপরতাই আখিরাতে সাফল্য ও ব্যর্থতার সোপান রচনা করে। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপার্জন ও পেশাকে মৌলিক চাহিদা পূরণ, জনকল্যাণ, সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির মাপকাঠিতে বিবেচনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন। হালাল আয়-উপার্জন ইবাদাত কবুল হওয়ার শর্ত। নামায-রোযা সম্পাদনের পর হালাল জীবিকা অর্জন হচ্ছে ফরয কাজ। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শ্রমজীবী ও পেশাজীবি মানুষকে আল্লাহর বন্ধুত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রে হীনমন্যতার অবসান ঘটিয়েছেন যা দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের জন্য কিংবা পরের জন্য পরিশ্রম করতে পরাম্মুখ সে আল্লাহর পুরস্কার হতে বঞ্চিত।[৪৮] মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে প্রশ্ন করা হয়েছিল উপার্জনের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে পবিত্র ? উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ মানুষ নিজ হাতে

৪৪. আল কুরআন, ৬২ সূরা জুমুআ : ১০
৪৫. আল কুরআন, ৫৩ ঃ সূরা আন নাজম : ৩৯
৪৬. বাইহাকী
৪৭. সহীহ আল বুখারী
৪৮. সহীহ আল বুখারী

www.pathagar.com

যা উপার্জন করে।[৪৯] মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ পরিবার পরিজনের খোরপোশের দায়িত্ব বহনকারী মেহনতী মানুষ আল্লাহর প্রিয়পাত্র। পক্ষান্তরে সুস্থ শরীরের অধিকারী হয়েও যে ব্যক্তি পার্থিব পরিশ্রম বিমুখ এবং দীনী কর্তব্য পালনে উদাসীন আল্লাহ তাকে ভালবাসেন না ।[৫০] যারা দারিদ্র্যের শিকার মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে কর্মের ও শ্রমের মাধ্যমে নিজ অবস্থার উন্নয়নের জন্য তাকিদ দিয়েছেন। কর্মের ও শ্রমের ব্যাপারে সূরা আল বালাদে আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে কঠোর কষ্ট ও শ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি ।"[৫১] বস্তুত কঠোর শ্রম ও সামাজিক কম প্রচেষ্টাই ব্যক্তি ও একটি জাতির ভাগ্যন্নোয়ন ঘটাতে পারে। অপরদিকে অলসতা ও পরমুখাপেক্ষীতা গরিবী ও দারিদ্র্য বাড়াতে পারে যা মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপছন্দ করেছেন। এসব বাণী এবং কার্যক্রম ব্যক্তির জন্য আয় উপার্জনের পথকে উন্মুক্ত করবে, জাতীয় পর্যায়ে উচ্চতর আয়ের প্রবৃদ্ধি হবে যা প্রকারান্তরে দারিদ্র্যকে বিদূরিত করবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এ দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। কঠোর পরিশ্রম ও সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশে উচ্চ আয়ের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে।

২. ভিক্ষুকের হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করণের শিক্ষা- জীবিকার্জনের জন্য উদ্যোক্তাসুলভ সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করা

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জনৈক আনসারী সাহাবী মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসে কিছু সাহায্য ভিক্ষা চাইলেন, কিন্তু মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ থেকেও তাকে কিছু দেয়ার চেষ্টা করলেন না এবং অন্য কারও নিকটও তার জন্য সাহায্য চাইলেন না এবং সে দরিদ্র সাহাবী কে বললেনঃ তোমার ঘরে কি কিছু আছে? উত্তরে সাহাবী বললেন, হাঁ একখানা কম্বল আছে তার এক অংশ গায়ে দেই ও অন্য অংশ বিছাই; আর একটি পেয়ালা আছে যা দ্বারা পানি পান করি । তখন মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে হুকুম দিলেন, যাও কম্বল ও পেয়ালা নিয়ে এসো । তারপর মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বস্তু দু'টি নিজ হাতে তুলে নিয়ে বললেনঃ এ জিনিস দু'টি কে ক্রয় করবে ? এক সাহাবী বললেন, আমি এক দিরহামে ক্রয় করতে পারি । মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ এক দিরহামের বেশী কে দেবে? রাহমাতুল্লিল আলামীন (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দরিদ্র সাহাবীর জিনিসের দাম আরও বাড়াতে চান- নিলাম ডাক দু'দিরহামে শেষ হলো। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'দিরহামে জিনিস দু'টি বিক্রি করে দিরহাম দু'টি আনসারী সাহাবীর হাতে দিলেন এবং

৪৯. সহীহ বুখারী, মিশকাত
৫০. ইবনে মাজাহ
৫১. আল কুরআন, ৯০ ঃ সূরা আল বালাদ : ৪

www.pathagar.com

বললেনঃ এক দিরহাম দিয়ে খাদ্য ক্রয় করে তোমার পরিবারকে দাও। আর এক দিরহাম দিয়ে একখানা কুড়াল কিনে আমার নিকট নিয়ে এসো । গরীব সাহাবী তাই করলেন এবং কুড়াল কিনে রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট পেশ করলেন। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ হাতে সে কুড়ালে কাঠের বাট লাগিয়ে দিলেন। তারপর সে কুড়াল সাহাবীর হাতে দিয়ে তাগিদ করে বললেন:
যাও (পাহাড়ে-জঙ্গলে যেয়ে) কাঠ কেটে আনো এবং বিক্রি করো আর আমি যেন তোমাকে পনের দিন পর্যন্ত না দেখি অর্থাৎ পনের দিনের মধ্যে আর আমার সাথে দেখা করো না।
দরিদ্রজনের উপার্জন শক্তিকে বাড়িয়ে তুলে তার মূল্য ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার কি আন্তরিক প্রয়াস! আনসারী (রা) চলে গেলেন। পনের দিন পর যখন রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খেদমতে হাজির হলেন তখন আনন্দিত চিত্তে বললেনঃ হুজুর এই পনের দিনে দশ দিরহাম উপার্জন হয়েছে। তা থেকে কয়েক দিরহামের কাপড় আর কয়েক দিরহামের খাদ্য ক্রয় করা হয়েছে। দরিদ্রের দারিদ্র্য মোচন যার মুবরাক চেহারাকে উজ্জ্বল করে দিতো আনসার সাহাবীর এই রিপোর্ট শুনে তিনি বলতে লাগলেন;
'কিয়ামাতের দিন তোমার চেহারায় ভিক্ষার কলঙ্ক থাকবে,
এর চেয়ে এই শ্রমের উপার্জন তোমার জন্য অনেক ভাল।'[৫২]
আত্ম কর্মসংস্থান ও জীবিকা অর্জনের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের এই যে আদর্শ তা হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নিজের শক্তি ও সামর্থ্যকে বেকার নষ্ট করে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসাতে যাওয়া ইসলামে আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। এজন্যই তো কবি বলেছেন, 'নবীর শিক্ষা করোনা ভিক্ষা, মেহনত করো সবে।' শ্রমই দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার এবং সম্পদ উপার্জনের প্রধান উপায় বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ চেতনা সর্ব মহলে বিকশিত করতে হবে।

৩. আয়ের ব্যবহারিক বন্টন (Functional Distribution of Income)

একটি দেশে জনপ্রতি বার্ষিক আয় বিপুল পরিমাণ হলেও সে দেশে দারিদ্রাবস্থা বিরাজমান থাকতে পারে। এ জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যেটি যে কাজ করে তার ভিত্তিতে উৎপাদনের উপকরণ সমূহের মধ্যে অর্জিত আয় সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা জরুরী। এতে আয়ের ব্যবহারিক বিতরণের প্রশ্ন এসে যায়। পাশ্চাত্যের প্রচলিত অর্থনীতিতে এ ধরনের বন্টন হয় বিচারের নিয়ম নীতি ছাড়াই চাহিদা ও সরবরাহের বাজার সূত্রের মাধ্যমে। উপকরণের মূল্য সংক্রান্ত ইসলামী নীতির ভিত্তি হচ্ছে ন্যায়বিচার ও স্বচ্ছতা। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হচ্ছে:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ •

---

৫২. আবু দাউদ শরীফ, ইবনে মাজাহ

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই আল্লাহ 'আদল ন্যায়পরায়ণতা ও ইহসান (সদাচারণ/কল্যাণের) আদেশ দিচ্ছেন।[৫৩]

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ • الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ • وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ •

দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা প্রতারণা ও ঠগবাজী করে। তারা মানুষের কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করে পরিপূর্ণ ওজনে, কিন্তু দেয়ার সময়ে ওজনে কম দেয়।[৫৪]

ন্যায়পরায়ণতা (আদল) ছাড়াও উৎপাদনের মানবিক উপকরণের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি মানবিক দিক রয়েছে-এটি হচ্ছে শ্রম। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ যার অধীনে যাকে ন্যস্ত করেছেন তিনি যা খান তাকে তাই খাওয়াতে হবে এবং যা পরেন তাই পরতে দিতে হবে।[৫৫] উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে সর্বোচ্চ অবদান রাখার বিষয়টি স্মরণে রেখে শ্রম শক্তিকে ন্যূনতম মজুরী দেয়ার ধারণা এ থেকে পাওয়া যায়। পুঁজির প্রাপ্য নির্ধারণে ইসলামী অর্থনীতিতে লাভ-ক্ষতিতে অংশীদারিত্বের নীতি অনুসৃত হয়। এক্ষেত্রে মূলধনের অনুপাতের ভিত্তিতে মুনাফা বন্টিত হয়। এর ফলে ব্যাংকের মুদারাবা আমানতকারীদের কাছে সরাসরি মুনাফার অংশ মূলধনের পরিমাণ অনুসারে পৌছে যায়। মুনাফা বেশী হলে তারা বেশী পরিমাণে মুনাফা পায় এবং কম হলে পায় কম। ফলে অর্জিত আয়ের বন্টন সমান হারে হয়ে থাকে। উচ্চতর আয়ের প্রবৃদ্ধির সাথে আয় বন্টনের সমতা দারিদ্র্যাবস্থার হ্রাস ঘটায়।[৫৬]

৪. জীবিকা অর্জনের সুযোগ অবারিত ও উন্মুক্ত রাখা (Equal Opportunity)

দারিদ্র্য হচ্ছে একটি নির্মম অভিশাপ। এ অভিশাপ মানুষকে কুঁরে কুঁরে খায়। সমাজ সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে পিছিয়ে দেয়। জীবিকা অর্জনের সুযোগ না থাকার কারণে অনেকে দারিদ্র্যাবস্থায় নিপতিত হয়। এ জন্য ইসলামে জীবিকা উপার্জনের সুযোগের সমতা বিধানের নির্দেশনা রয়েছে। জীবিকা অর্জনের সুযোগকে অবারিত ও উন্মুক্ত রাখাই ইসলামী অর্থনীতির শিক্ষা। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি অপরিহার্য নীতি হচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চল ও জাতিসত্তাসহ

---

৫৩. আল কুরআন, ১৬ ঃ সূরা আন নাহল: ৯০
৫৪. আল কুরআন, ৮৩ ঃ সূরা মুতাফ্‌ফিফীন: ১-৩
৫৫. সহীহ্ আল বুখারী
৫৬. ড.এ এইচ এম সাদেক, Poverty Eradication : An Islamic Perspective, Thoughts on Islamic Economics Vol 6:3, P.16

www.pathagar.com

সমগ্র জনসংখ্যার জন্য একই ধরনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রাখা এবং তা অনুসরণ করা। ইসলাম ন্যায় ও ইনসাফের পক্ষে এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার বিধান রয়েছে। সম্পদ ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সকলের জন্য, যা সমাজের মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী লোকের মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না।

সমান সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য নীতি হচ্ছে শিক্ষা লাভের ব্যাপারে সকলের সমানাধিকার নিশ্চিত করা। কারণ সর্বজনীন শিক্ষা সমাজের স্তর বিন্যাস ভেঙ্গে ফেলে এবং শ্রম বাজারে বিভক্তি রোধ করে। শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের ফলে দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, বেতন পার্থক্য হ্রাস পায়। সুতরাং দারিদ্র্য কমে আসে। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর শিক্ষা লাভ করা ফরয; এ জন্য প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে শিক্ষালাভের। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে পল্লী এলাকা, অনুন্নত এলাকা এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীসহ দেশে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা। যদি দেশের কোন গোষ্ঠী সামঞ্জস্যহীনভাবে অন্যদের চেয়ে বেশী অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়, তাহলে রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে সবরকম রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা দিয়ে অনগ্রসর গোষ্ঠীকে এগিয়ে নেয়ার জন্য। এ জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন ও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এমনকি প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রকে ভবিষ্যতের বড় বড় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে যাতে করে অগ্রসর বিত্তবান জনগোষ্ঠী তাদেরকে এসব কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়ার সুযোগ দিতে বাধ্য হয়।

অনুরূপভাবে ব্যাংকিং সেবা, ব্যবসায়, শিল্প প্রতিষ্ঠান, নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক কার্যক্রম, প্রাকৃতিক সম্পদসহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও কার্যক্রম সকলের সমান অংশ গ্রহণ/কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা জরুরী। এ ধরনের সুযোগ সুবিধা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করবে। ফলে দেশে দারিদ্র্যাবস্থা হ্রাস পাবে।[৫৭] মোটকথা বাংলাদেশের সকল মানুষের উন্নয়নের দিকটি সামনে রেখে জীবিকা অর্জনের সুযোগ অবারিত ও উন্মুক্ত রাখতে হবে।

২। দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রতিকারমূলক বা প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপসমূহ (Preventive Measures to Eradicate Poverty)

সমাজে বিত্তবান ও বিত্তহীন, ধনী ও দরিদ্র এ দু'ধরনের শ্রেণীর উদ্ভব হওয়ার পেছনের কারণ হচ্ছে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া। এ ধরনের অবস্থার যাতে সৃষ্টি

---

৫৭. ড. এইচ এম সাদেক, পূর্বোক্ত, পৃ, ১৭

www.pathagar.com

হতে না পারে সেজন্যে ইসলামে ব্যবস্থাদি রয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিতে এমন কতকগলো প্রতিকারমূলক পদক্ষেপের বিধান রয়েছে যার ফলে সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ বন্ধ হয় এবং যার মাধ্যমে সম্পদের ইনসাফপূর্ণ বন্টন সম্ভব হয়। এধরনের পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. মালিকানা নিয়ন্ত্রণ (Control of ownership)/মালিকানা বিষয়ক ধারণার পরিবর্তন সাধন

সম্পদের মালিকানা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা সুস্পষ্ট। ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আল্লাহ। মানুষ এসব সম্পদের আমানাতদার, জিম্মাদারমাত্র। ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল করতে হবে যে সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ তাআলা। সম্পদের মালিকানা সম্পর্কিত এ ধারণার বিকাশের সম্পদ যেন তেন ভাবে অর্জনের উন্মুক্ত ও অবৈধ পন্থা সমূহ নিয়ন্ত্রিত হবে, যা বাংলাদেশে নতুন দারিদ্র্য সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধক হবে। আল-কুরআন এরশাদ হয়েছে :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

"যা কিছু আকাশ সমূহে রয়েছে এবং যা কিছু জমীনে রয়েছে, সবই আল্লাহর।"[৫৮]

মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি[৫৯] হিসেবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সব কিছু ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে[৬০] অতএব সম্পদের মালিকানা সার্বভৌম নয় বরং নিয়ন্ত্রিত। এ নিয়ন্ত্রিত মালিকানা উদ্দেশ্য বিহীনও নয়, এটা নিজেই শেষও নয়। ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে মানুষ তার সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করবে যাতে করে তার ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ হয়। সম্পদ গুটিকয়েক লোকের হাতে কুক্ষিগত হতে পারবে না। সম্পদে আল্লাহর মালিকানার আর একটি তাৎপর্য হল মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে সকল সম্পদের পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করবে। কেউ যদি গাফিলতি করে কোন গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ফেলে রেখে দেয় ইসলামী রাষ্ট্র সে সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার অধিকার রাখে। মানুষের আমানতী মালিকানা তার জীবন কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর সে সম্পদ ইসলামের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী তার ওয়ারিসদের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে।

যে সব সম্পদ জনস্বার্থে ব্যবহৃত হয় এবং যার মালিকানা হস্তগত হওয়ার ফলে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে পারে, সেগুলোর মালিকানা বেসরকারী খাতে দেয়া যাবেনা। ইসলামী অর্থনীতিবিদরা এ বিষয়ে একমত যে অনুরূপ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট

---

৫৮. আল কুরআন, ২ ঃ সূরা আল বাকারা : ২৮৪
৫৯. আল কুরআন, ২ ঃ সূরা আল বাকারা : ৩০
৬০ আল কুরআন, ৫৯ ঃ সূরা আল হাশর : ৭

www.pathagar.com

অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদও এ তালিকায় সংযুক্ত হতে পারে যাদের মালিকানা বেসরকারী পর্যায়ে থাকতে পারে না। কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যেতে পারে। যেমন-যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈরির কারখানা। রাষ্ট্র উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিদ্যমান বেসরকারী খাতের জনগণের উপযোগিতা সংক্রান্ত শিল্প জাতীয়করণ করতে পারেন।

২. সম্পদ অর্জন, ভোগ ও বন্টনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা

ইসলাম সম্পদ অর্জন, ভোগ, ব্যয় ও বন্টনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান আরোপ করে তা মেনে চলার শিক্ষা দিয়েছে। বৈধ পন্থায় ইসলামী নীতির আওতায় সম্পদ অর্জন ও ভোগ করতে হবে এবং সমস্ত হারাম ও অবৈধ পন্থা পরিহার করতে হবে। শোষণমূলক পন্থায় বঞ্চনা চালিয়ে বা অন্যকে ঠকিয়ে দরিদ্রে নিপতিত করে কেউ ধনী হতে পারবে না।

৩. সম্পদ কেন্দ্রীভূতকরণ নিষিদ্ধ

ইসলাম প্রেষণার (Motivation) মাধ্যমে সম্পদ কেন্দ্রীভূত করাকে বন্ধ করার পদক্ষেপ নিয়েছে। মানুষ যা উপার্জন করবে তা অবশ্যই বৈধ পন্থায় হতে হবে। ইসলামের এ শিক্ষা মেনে নেয়ার সাথে সাথে অবৈধ উপায়ে আয়ের তথা সম্পদ কুক্ষিগত করন, ভোগ ও বন্টনের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে যা হালাল তা অর্জনের জন্য সকলে সচেষ্ট হবে তেমনি যা হারাম তা বর্জনের জন্যও সর্বাত্মক প্রয়াস চালাবে। আর তাহলে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হবেনা। এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ •

সম্পদ যেন কেবল ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।"[৬১]

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ•

যারা স্বর্ণ, রৌপ্য, টাকা-পয়সা সঞ্চয় করে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেনা তাদের কঠিন শাস্তির সংবাদ দাও।[৬২]

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ• يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ• كَلَّا ۖ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ• وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ• نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ• الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ• إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ• فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ•

"যে লোক ধন মাল সঞ্চয় করেছে এবং গুণে গুণে রেখেছে, সে মনে করে যে,

৬১. আল কুরআন, ৫৯ ঃ সূরা আল হাশর : ৭
৬২. আল কুরআন, ৯ ঃ সূরা আত্ তাওবা : ৩৪

www.pathagar.com

তার ধন সম্পদ চিরকাল তার নিকট থাকবে। কখনই নয় ...." [৬৩]

আল-কুরআনের এসব নির্দেশনার আলোকে চিন্তা করলে কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্যকে ঠকিয়ে বা শোষণ করে বা অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে অর্থ সঞ্চিত করে বা কেন্দ্রীভূত করে রাখা সম্ভব নয়, যা দরিদ্র শ্রেণী সৃষ্টির অন্যতম কারণ ।

৪. দুর্নীতির মাধ্যমে/হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জন নিষিদ্ধকরণ

উপার্জনের অসমতাসহ যে সকল কর্মকাণ্ডে সামাজিকভাবে অনাকাংখিত পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং সে কারণে জনগণের একাংশ দারিদ্র্যে নিপতিত হয় তা প্রতিরোধ করতে হবে। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হারাম অথচ লাভজনক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা অবৈধ ও বেআইনী । জুয়া[৬৪] বাজী, লটারী, মওজুদদারী,[৬৫] কালোবাজারী, ফটকাবাজারী ও ডাম্পিং, মুনাফাখোরী, চোরাচালান, ক্ষমতা ও পদের প্রভাব খাটিয়ে অর্থ উপার্জন, প্রতারণা বা ছলনা, চটকদার ভূয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করে উপার্জন করা,[৬৬] হারাম পণ্য উৎপাদন ও বিপনন, ওজন ও পরিমাপে কম দিয়ে অর্থোপার্জন, ভেজাল পণ্য বিক্রি করে আয় করা, ভেজাল মিশ্রণের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন, বেশ্যা বৃত্তি, পতিতা বৃত্তি ও ব্যাভিচারের মাধ্যমে উপার্জন, অশ্লীলতা প্রসারকারী উপায় উপকরণের ব্যবসা, মাদক[৬৭] দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা, মূর্তি বানানো ও মূর্তির ব্যবসা, ভাগ্য গণনার ব্যবসা, জবর দখলের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন, লুণ্ঠন, ছিনতাই-রাহাজানী, যাদুমন্ত্রের ব্যবসা, চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন, আত্মসাৎ, চোরাইমাল ক্রয়-বিক্রয়, আমানাতের খিয়ানাত করে সম্পদ উপার্জন, ধাপপাবাজি, টেণ্ডারবাজি, সিন্ডিকেট করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো, শেয়ার বাজারে কেলেংকারীর মাধ্যমে অর্থোপার্জন ইত্যাদি ইসলামী অর্থনীতিতে নিষিদ্ধ। এছাড়াও অন্য কোন অসাধু উপায়ে অর্থনৈতিক ভাগ্য গড়ে তোলা এবং তা যেহেতু অন্যদের ভাগ্যের বিনিময়ে ধনী হওয়ার নামান্তর, সে জন্য ইসলাম সাধারণভাবে তা নিষিদ্ধ করেছে। এগুলো শোষণমূলক এবং রাতারাতি অর্থ কেন্দ্রীভূত করার

---

৬৩. আল কুরআন, ১০৪ ঃ সূরা আল হুমাযা : ২-৯

৬৪. জুয়ার যাবতীয় প্রক্রিয়াকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। দেখুন, আল কুরআন, সূরা আল মায়িদা : ৯০

৬৫. মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মওজুদদারী করে সে পাপী, (সহীহ মুসলিম) যে ব্যক্তি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস গুদামজাত করে রাখে দাম বৃদ্ধির জন্য সে অপরাধী । (সহীহ মুসলিম)

৬৬. মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে প্রতারণা করে (গ্রাহকদেরকে) সে আমাদের দলভূক্ত নয়। (সহীহ আল বুখারী)

৬৭. আল কুরআন, ৫ ঃ সূরা আলা মায়িদা : ৯০

www.pathagar.com

ম্যাকানিজম। এসব কর্মকাণ্ড বা পন্থার ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। এসব কর্মকাণ্ড বা পন্থা নির্মূল করা গেলে বাংলাদেশে দারিদ্র্য সৃষ্টির প্রক্রিয়াই বন্ধ হয়ে যাবে।

৫. সুদ ও ঘুষ নিষিদ্ধ

সমাজে অর্থ ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত করতে পারে এমন কতকগুলো শোষণমূলক আয় ও আয়ের পন্থাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। এ ক্ষেত্রে সুদ ও ঘুষ অগ্রগণ্য। সুদের কারণেই দরিদ্র শ্রেণী আরো দরিদ্র এবং ধনীরা আরো ধনী হয়। পরিণামে সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য বেড়েই চলে। সুদ দারিদ্র্য সৃষ্টির শক্তিশালী মাধ্যম। একদল লোক বিনাশ্রমে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসায় সুদের সাহায্যে। সুদ ভিত্তিক লেনদেন একটি শোষণ মূলক উপায় যা অর্থ ও সম্পদ কিছু লোকের হাতে কেন্দ্রীভূতকরণের ব্যবস্থাকে সহজ করে দেয়। ঘুষও অর্থোপার্জন ও কেন্দ্রীভূতকরণের সহজ পন্থা। ইসলাম সুদ ও ঘুষকে নিষিদ্ধ করে দারিদ্র্য সৃষ্টির পথে একটি বড় বাধা দাঁড় করিয়েছে।

৬. ভোগলিপ্সা-আত্মস্বার্থ প্রণোদনা দূরীকরণ:

বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিদ্যমান ভোগ-লিপ্সা, লাভ-লোভ-আত্মস্বার্থ প্রণোদনা ইত্যাদির পরিবর্তে ত্যাগ-তীতিক্ষা, সমষ্টিচেতনা, আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে।

দারিদ্র্য দূরীকরণে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ (Corrective Measures)

দারিদ্র্য দূরীকরণে বাস্তব ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাদি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হলে আয় ও সম্পদের বন্টন ব্যাপকভাবে অসম হওয়ার এবং দারিদ্র্য অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা কম। এ অবস্থায় কিছু বৈষম্য সৃষ্টি হলেও তা হ্রাস পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এর পরেও আয়ের বৈষম্য ও দারিদ্র্য বিদ্যমান থাকতে পারে এবং যতদূর সম্ভব তা সংশোধন করতে হবে। দারিদ্র্য দূরীকরণের অনন্য সংশোধনমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদ হস্তান্তরিত হয়। যেমন -

১. সম্পদ হস্তান্তরের ম্যাকানিজম সমূহ :

ক) বাধ্যতামূলক হস্তান্তর (Compulsory Transfers)

খ) ওয়াজিব হস্তান্তর (Wajib Transfers)

গ) ঐচ্ছিক হস্তান্তর (Nafl Transfers)

২. **রাষ্ট্রের দায়িত্ব** (State Responsibility)

১. দারিদ্র্য বিমোচনে ট্রান্সফার ম্যাকানিজমসমূহ:

(Transfer Mechanism to Eradicate Poverty)

পবিত্র কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে, সমাজের ধনীদের মধ্যেই শুধু সম্পদ

www.pathagar.com

আবর্তিত হবে না। এ বক্তব্যের পর শুধু ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করেই নয় বরং ধন সম্পদের ব্যাপক বন্টন নিশ্চিত করার জন্য বাস্তব কর্মপন্থার কথা উল্লেখ করেছে। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দারিদ্র্যকে অবাঞ্চিত ও অনাকাংখিত অবস্থা মনে করতেন বলেই দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা চালানোকে ঈমানদারদের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের জন্যও একাজকে অপরিহার্য করে নিয়েছিলেন। এ ছাড়াও তিনি বিত্তবানদেরকে বিভিন্নভাবে তাদের সম্পদ বন্টন ও দরিদ্রদের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রতিনিয়ত সচেতন সতর্ক করতেন। ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়ে ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনে সম্পদ হস্তান্তরের সুনির্দিষ্ট ম্যাকানিজম নির্দেশ করেছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের ট্রান্সফার ম্যাকানিজমসমূহ নিম্নরূপ:

সারণি-৪

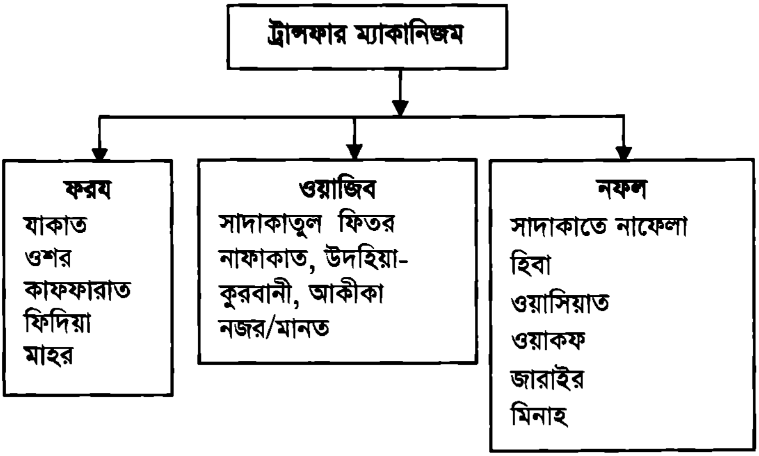

ক. বাধ্যতামূলক বা ফরয হস্তান্তর (Compulsory Transfers)

ইসলামে সম্পদ হস্তান্তরের বাধ্যতামূলক বিধান রাখা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

১. যাকাত (Zakat): ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে যাকাত হচ্ছে তৃতীয় স্তম্ভ। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনা রাষ্ট্রে সম্পদ বন্টন তথা সামাজিক সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক অনন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে যাকাতকে প্রতিষ্ঠা করেন। দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাত বিশাল ভূমিকা পালন করে।

www.pathagar.com

সমাজে-ধন সম্পদের আবর্তন ও বিস্তার সাধন, সামাজিক নিরাপত্তা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের মহান উদ্দেশ্যেই ধনীদের ওপর যাকাত ফরয করা হয়েছে। যাকাত দরিদ্র, অভাবী, দুঃস্থ এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি। দারিদ্র্য বিমোচন যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকাতের মাধ্যমে জনগণকে দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করণে ভূমিকা পালন করেছেন। যাকাত দরিদ্রকে প্রবৃদ্ধি দান করে। যাকাত নিছক কোন দান নয় যা প্রার্থী ও দরিদ্রকে দয়া করে দেয়া হয়; বরং যাকাত হচ্ছে ধনীর সম্পদে আল্লাহ পাক কর্তৃক নির্ধারিত দরিদ্রদের অধিকার। আল-কুরআনের সূরা আয যারিয়াতে বলা হয়েছে, "বিত্তবানদের ধনমালে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের সুস্পষ্ট ও সুপরিজ্ঞাত অধিকার রয়েছে।" (৫১: সূরা আয যারিয়াত ঃ ১৯)

যাকাত আদায়ের বিষয়টি যাকাত দাতার ইচ্ছার ওপর আদৌ ছেড়ে দেয়া হয়নি এবং প্রত্যেক বিত্তবান বা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকগণ যাতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য তাদের যথা সর্বস্ব নিয়ে এগিয়ে আসে, সেজন্য ইসলাম শুরু থেকেই উৎসাহিত করেছে। জনগণের মনোভংগীকে মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকাত আদায়কে বাধ্যতামূলক করে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার সংরক্ষণ, সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের স্থায়ী ব্যবস্থা করেছেন।

মানুষের মধ্যে যোগ্যতার যে স্বাভাবিক তারতম্য রয়েছে তার জন্য মানুষের আহরিত রুজি রোজগারেও কিছুটা তারতম্য হয়। কম যোগ্যতার কারনে কিছু লোক স্বীয় উপার্জন দ্বারা নিজের ভরন পোষণ করতে পারে না। তাছাড়া সমাজে স্বাভাবিক কারনে এতীম, বিধবা, বৃদ্ধ, রুগ্ন, পঙ্গু ও অক্ষম দুঃস্থ লোক রয়েছে যারা কিছুই উপার্জন করতে পারে না। ইসলাম এসব মানুষের অভাব বিমোচন ও মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যেই স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে যাকাতকে প্রাতষ্ঠানিক রূপ দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রয়োজনীয় কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলেই দারিদ্র্য দূর হয়না। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তখনই দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখে যখন এর সুফল ন্যায্যভাবে দরিদ্রদের হাতে পৌছে। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক নীতিমালা, কর্মসূচী ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। যাকাত এমনি ধরনের এক অনন্য অর্থ ব্যবস্থা। আল্লাহ তায়ালা যাকাত কাদের প্রাপ্য অর্থাৎ কাদের মধ্যে যাকাতের অর্থ বন্টন করে দিতে হবে সে সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। বলা হয়েছে ঃ "যাকাতের মাল সম্পদ তো গরীব, অভাবগ্রস্ত (মিসকীন), যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী, যে সব লোককে সন্তুষ্ট করা দরকার তাদের জন্য, আর দাস মুক্তি দানে ও ঋণগ্রস্তের

www.pathagar.com

ঋণ পরিশোধে এবং আল্লাহর পথে ও নিঃস্ব পথিকদের প্রয়োজন পূরণে ব্যয়িত হবে। এটি আল্লাহর তরফ হতে ফরয এবং আল্লাহ সব জানেন ও সব বুঝেন।"[৬৮] এ আয়াতে বর্ণিত ৮টি খাতেই যদি যাকাতের অর্থ ব্যয়িত হয় তাহলে দারিদ্র্য ও অন্যান্য বহু আর্থ সামাজিক সমস্যা নিরসন হবে। দারিদ্র্য দূরীকরণার্থে যাকাত প্রদানে কোন বিত্তবান মুসলিম নিষ্ক্রিয় থাকলে ইসলামের মহান চেতনাই ব্যাহত হয়। যাকাত আরোপের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জাতীয় সম্পদকেই যাকাতের আওতাভুক্ত করা হয়েছে তথা দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[৬৯] পৃথিবীতে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও সমৃদ্ধি আনয়নে যাকাত ব্যবস্থার বিকল্প নেই।

দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা অত্যন্ত বিস্ময়কর। এরই ফলে উদ্বৃত্ত সম্পদের একটা অংশ প্রতিবছর নিয়মিতভাবে সরাসরি দরিদ্রদের হাতে চলে যায়। এরই মাধ্যমে দরিদ্র অক্ষম অভাবগ্রস্ত লোকদের পূর্ণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দানের ব্যবস্থা করা যায়। বাংলাদেশে যাকাত যথাযথভাবে আদায় করা হলে এবং হকদারদের হাতে প্রতিবছর পৌঁছানো হলে এবং গ্রহীতারা তা আত্মকর্মসংস্থান/আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্পে ব্যবহার করলে এ দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সম্ভব।

২. **ওশর (Ushr):** ওশর আরবী শব্দ, অর্থ দশমাংশ, দরিদ্র সাধারণের সাহায্যার্থে উৎপন্ন ফসলের দশমাংশ নির্ধারণ করা। ইসলামী পরিভাষায় জমির ফসলের যাকাতকে ওশর বলা হয়। ওশর ফরয। আল্লাহ বলেন: হে ঈমানদারগণ, তোমরা হালাল উপার্জন থেকে এবং আমরা তোমাদের জন্য জমি থেকে যা কিছু বের করি তা থেকে ব্যয় কর। আর ব্যয় করতে গিয়ে খারাপ জিনিস দিতে ইচ্ছে করোনা।[৭০] জমির সব ধরনের উৎপন্নের ওপরই ওশর ফরয। ওশর আদায়ের কারণ হচ্ছে জমির ফসল লাভ। ওশর আদায় করতে হবে প্রতিটি ফসল থেকেই। অন্য কথায় যেসব জমিতে বছরে দুটি বা তিনটি ফসল হবে সে ফসলের প্রত্যেকটি থেকেই নিসাব পরিমাণ ফসল হলে ওশর আদায় করতে হবে। আদায়কৃত ওশর দারিদ্র্য বিমোচনে অনন্য ভূমিকা পালন করে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময় যাকাত প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ ওশর আদায় করতেন। তবে কোন কোন সময় ওশর আদায়ের জন্য পৃথক কর্মকর্তাও নিয়োগ করা হত। এ ধরনের কর্মকর্তাকে সাহিবুল ওশর[৭১] বলা

---

৬৮. আল কুরআন, ৯ ঃ সূরা আত তাওবা : ৬০

৬৯. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, যাকাত এর প্রকৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (প্রবন্ধ) দ্র. আল কুরআনে অর্থনীতি, প্রথম খণ্ড (১৯৯০), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পৃঃ, ৫৯৮

৭০. আল কুরআন, সূরা আল বাকারা : ২৬৭।

৭১. ড. মুহাম্মদ ইয়াসিন মাজহার সিদ্দিকী, রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর

www.pathagar.com

হত। বাংলাদেশে ৩০০০ হাজার কোটি টাকার ওশর আদায় হতে পারে এবং তা হকদারদের হাতে পৌঁছানো সম্ভব হলে দারিদ্র্য দূরীকরণে বিরাট সফলতা আসবে। '

৩. **কাফফারাত (Kaffarat):** কোন অবাঞ্ছিত কাজ বা পাপ কর্ম হয়ে গেলে সে পাপ স্খলনের জন্য যে কাজ করতে হয় তাকে কাফফারা বলে। পাপ ও দারিদ্র্যের মধ্যে কোনপ্রকার সম্পর্ক না গড়েও কেউ পাপ করলে বাধ্যতামূলকভাবে দরিদ্রদের দান করার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। প্রতিজ্ঞাভংগ করলে,[৭২] জিহার করলে[৭৩] শরয়ী ওজর ছাড়া রামাদানের রোযা ভাংলে কাফফারা আদায় করতে হয়। কাফফারা আর্থিকভাবে আদায় করা হলে তা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হয়। কাফফারার মাধ্যমে দরিদ্রদের মধ্যে সম্পদ হস্তান্তর করা সম্ভব হয়।

৪. **ফিদিয়া (Fidya):** যে সব লোক অতিরিক্ত বার্ধ্যক্য জনিত কারণে রোযা রাখতে অপারগ কিংবা দীর্ঘ কাল রোগ ভোগের দরুন দুর্বল হয়ে পড়েছে অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, সে সব লোকের ক্ষেত্রে রোযা না রেখে রোযার বদলায় ফিদিয়া দেয়ার সুযোগ রয়েছে।[৭৪] একটি রোযার ফিদিয়া অর্ধ সা গম অথবা তার মূল্য। অর্ধ সা প্রায় দুই কেজি। এ পরিমাণ গম বা তার দাম কোন মিসকিসনকে দান করলে ফিদিয়া আদায় হয়ে যায়।[৭৫] এর মাধ্যমে দরিদ্রজনরাই উপকৃত হয়।

৫. **মাহর (Mahr):** বিবাহের জন্য স্বামী স্ত্রীকে যে অর্থ দান করে তাকে মাহর বলে ।[৭৬] মাহর এমন সম্পদ যা বিয়ের সময় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদান করতে হয়। এটা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেয়া সন্মাননা। ইসলামী শরীয়াহ মুতাবিক স্ত্রীকে এই সম্পদ পরিশোধ করা অবশ্য কর্তব্য (ফরয)। মাহর স্ত্রীদের মৌলিক অর্থনৈতিক অধিকার। আল কুরআনে বলা হয়েছে: তোমরা নারীদের তাদের মাহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে; তবে তারা মাহরের কিয়দংশ সন্তুষ্টচিত্তে ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ

সরকার কাঠামো, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, আগাস্ট ১৯৯৪, পৃঃ২৭৯।

৭২. ওয়াদা ভংগের কাফফারা আদায়ের বিধান বিস্তারিত জানার জন্য, ৫ : সূরা আল মায়িদার ৮৯ নং আয়াত দ্রষ্টব্য

৭৩. জিহারের কাফফারা আদায়ের বিধান, ৫৮ : সূরা আল মুজাদালার ২-৪ নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে

৭৪. আল কুরআন, ২ ঃ সূরা আল বাকারা : ২৮৪

৭৫. আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ

৭৬. আল ওয়াসীত ১/৮৮৯

www.pathagar.com

করবে।[৭৭] "হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীদের যাদের তুমি মোহর প্রদান করেছ।"[৭৮] মাহরের অর্থ দরিদ্র, বিত্তহীন নারীদের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে।

খ. ওয়াজিব হস্তান্তর (Wajib Transfers)

১. **সাদাকাতুল ফিতর** (Sadaqatul Fitr): পবিত্র রমযান মাসের সিয়াম পালনের পর ঈদুল ফিতরের দিন বিত্তশালীদের ওপর গরীব দুঃখী দরিদ্রদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে সে বিশেষ দানের নির্দেশ রয়েছে তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলে। এর গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, সাদাকাতুল ফিতর আদায় না করা পর্যন্ত রোযাদার ব্যক্তির রোযা, আসমান ও যমীনের মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় বিরাজ করে, আল্লাহর নিকট পৌছায় না। যাকাতের তুলনায় সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্র অনেকটা বিস্তৃত। কারণ যাকাতের তুলনায় ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত অনেকাংশে সহজ ও শিথিল। প্রত্যেক বিত্তবানকে তার নিজের এবং পরিবার-পরিজন ও পোষ্যদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতে হয়। সাদাকাতুল ফিতর ব্যক্তিগত দান হলেও মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনা রাষ্ট্রে তা আদায় করে দরিদ্র ও গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

২. **নাফাকাত** (Nafakat): ব্যয়, খরচ, মহার্ঘ্য ইত্যাদি অর্থে অভিধানে নাফাকা শব্দ ব্যবহৃত হয়।[৭৯] স্বামীর ওপর স্ত্রীর জন্য আহার্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, আবাস, সন্তান লালন-পালন, পরিচর্যা ইত্যাদির নিমিত্ত যে অর্থ ইসলামের বিধান মুতাবিক বর্তায় তাকে শরীয়তের পরিভাষায় নাফাকা বলে।[৮০] কুরআনে নাফাকা সম্পর্কে বলা হয়েছে (তালাক প্রদত্ত নারী প্রসংগে) "তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে বাস কর তাদেরও সেখানে বাস করতে দেবে, সংকটে ফেলার জন্য তাদের উত্যক্ত করবে না, তারা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদের স্তন্য দেয় তবে তাদের পারিশ্রমিক দেবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে। বিত্তবান নিজ সামর্থ অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা

---

৭৭. আল কুরআন, ৪ ঃ সূরা আন নিসা : ৪

৭৮. আল কুরআন, ৩৩ ঃ সূরা আল আহযাব : ৫০

৭৯. আল-মিসবাহুল মুনীর ৬১৮; আল ওয়াসীত ২/৯৪২-৯৪৩

৮০. আল ওয়াসীত ২/৯৪২

www.pathagar.com

থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তার চাইতে গুরুতর বোঝা তিনি তার ওপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দেবেন।"[৮১] শারীরিক এবং মানসিকভাবে সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে নিজের এবং নিজের পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণ করা। আত্মীয় স্বজন, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ প্রতিবেশীকেও এ আওতায় আনা হয়েছে। এমন কেউ কি আছে যার কোন গরীব আত্মীয় নেই। দারিদ্র্য দূরীকরণে নাফাকাত বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। এ প্রসংগে মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে উদর পূর্তি করে খায় আর পাশ্বেই তার প্রতিবেশী অভূক্ত থাকে।[৮২] অন্য একটি হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছেঃ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহতায়লা কিয়ামাতের দিন বলবেন, হে বনি আদম। আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি। বান্দাহ বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনাকে কি করে খাবার দিতাম আপনি যে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক? তিনি জবাবে বলবেন, তুমি কি অবগত নও যে, আমার অমুক বান্দাহ তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল কিন্তু তাকে খাবার দাওনি। তুমি কি জানাতে না যে, তুমি যদি তাকে তখন খাবার দিতে তাহলে (আজ) আমার কাছে তা পেয়ে যেতে।[৮৩] স্বয়ং আল্লাহ যেখানে বুভূক্ষ মানুষের পক্ষে কথা বলবেন সেখানে এর গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। জান্নাতে যাওয়ার জন্য যা করণীয় তার অন্যতম হচ্ছে বুভূক্ষকে খাদ্য দান। হাদীসে আছে, "তোমরা দয়াময়ের ইবাদাত করবে, (দরিদ্রকে) অন্ন দান করবে এবং সালামের প্রচলন করবে তাহলে স্বচ্ছন্দে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৮৪] আল-কুরআনে বলা হয়েছে জাহান্নামের কঠোর শাস্তির অন্যতম কারণ হচ্ছে অভাবীদের খাদ্য দান না করা। ইরশাদ হয়েছে ঃ "ধর একে, গলায় বেড়ী লাগিয়ে দাও। অতঃপর তাকে শৃংখলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ শিকলে। (কারণ) নিশ্চই সে মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাসী ছিলনা এবং অভাবীদের খাদ্য দিতে উৎসাহিত করতো না।"[৮৫]

৩. **উদহিয়া** (Udhiya) ঃ উদহিয়া হচ্ছে কুরবানী। কুরবানীর আভিধানিক অর্থ আত্মত্যাগ, অপরের জন্য ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করা। ইসলামের পরিভাষায়,

---

৮১. আল কুরআন, ৬৫ ঃ সূরা আত্ তালাক : ৬-৭
৮২. সহীহ আল বুখারী
৮৩. সহীহ মুসলিম
৮৪. জামে আত তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ
৮৫. আল কুরআন, ৬৯ ঃ সূরা আলা হাক্কা : ৩০-৩৪

www.pathagar.com

আল্লাহকে নিজের জীবন ও ধনসম্পদের প্রকৃত মালিক স্বীকার করে সে মহান মালিকের ইচ্ছানুযায়ী তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এগুলোকে তারই পথে ত্যাগ করার নিদর্শন স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট পন্থায় পশু জবেহ করার নামই হচ্ছে কুরবানী। কুরবানীর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামাতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার। মানুষ যে যাবতীয় ধন সম্পদ ও নিয়ামাতের জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ, কুরবানী করে সে তারই নিদর্শন পেশ করে। কুরবানীর গোশত নিজে খাওয়া যায়, আত্মীয় স্বজন ও গরীব দুঃখীদের মধ্যেও বন্টন করা যায়। কুরবানীর পশুর চামড়ার বিক্রিত অর্থ গরীব-দুঃখী, অভাবগ্রস্তদের মধ্যেই বন্টিত হয়। ইয়াতিম অসহায়দের দান করা যায়। কিংবা গরীবদের শিক্ষা, চিকিৎসা, পুনর্বাসনের জন্য কেউ কোন প্রকল্প গ্রহণ করে থাকলে তাতেও দান করা যায়। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (Islamic Development Bank) বর্তমানে হাজ্জের সময় কুরবানীকৃত পশুর গোশত কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করে পরে বিভিন্ন মুসলিম দেশে দরিদ্রদের মধ্যে বন্টনের জন্য নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রেরণ করে থাকে।

৫. **আকীকা** (Aqiqah) ঃ সন্তান জন্মের পর সন্তানদের কল্যাণ কামনায় হালাল গৃহপালিত পশু জবেহ করাকে আকীকা বলে। আকিকার গোশত সন্তানদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনরা খেতে পারে। এ গোশত অভাবগ্রস্তদের মধ্যেও বন্টন করা যায়। আকীকার পশুর চামড়া গরীব অভাবগ্রস্তদের দান করে দিতে হয়। এতে দরিদ্রজনরা উপকৃত হয়।

৬. **নজর** (Nazr) ঃ এর অর্থ নজরানা, মানত ইত্যাদি (৩ : সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৫) কোন মনোবাসনা পূরণের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানত করতে হয়। মানতের পরে মনোবাসনা পূর্ণ হলে ঐ মানত আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। মানতের মাধ্যমে অভাবগ্রস্ত গরীব-দুঃখীরাই উপকৃত হয়।

গ. ঐচ্ছিক হস্তান্তর (Nafl Transfers):

স্বচ্ছল ব্যক্তিগণকে বার বার তাকিদ করা হয়েছে অপেক্ষাকৃত অসচ্ছলদের প্রতি সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করার জন্য। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদেও সম্পদে মানুষের জন্য যাকাতের বাইরেও অধিকার রয়েছে।[৮৬] এখানেই ঐচ্ছিক ম্যাকানিজম গুলো এসে পড়ে। এগুলো হচ্ছে:

১. **সাদাকাতে নাফেলা** (Sadaqat-E-Nafela)ঃ যদি কোন ধনসম্পদ বিনা প্রতিদানে কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাউকে প্রদান করা হয়

---

৮৬. তিরমিযী

www.pathagar.com

তাকে সাদাকাতে নাফেলা বলে । দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনের জন্য সাদাকাতকে মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমলে খায়ের বা সৎকাজ বলে তা উৎসাহিত করেছেন। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ ধরনের সাদকাহর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। তাকে ইসলামের একটি বিশেষ নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৮৭] এ ধরনের সাদাকাহ বা দান সর্বোত্তম মানবীয় গুণ। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমার কাছে থাকা একটি খেজুরের একাংশ হলেও দান কর। দান দরিদ্র ও নিঃস্বদের জীবনে স্বস্তি আনার সাথে সাথে দাতার জীবনেও আনে অফুরন্ত কল্যাণ। এ ধরনের দানের ফায়দা অনেক। যেমন-

- দান উপার্জনকে শুদ্ধ করে।
- দান পাপ মোচন ও অন্তরে তৃপ্তি দান করে।
- দান বালা-মুসিবত ও রোগ-ব্যাধি দূর করে।
- দান ভয়-পেরেশানি ও দুঃখ-কষ্ট দূর করে।
- দান দারিদ্র্য বিমোচন ও সম্পদে বরকত দান করে।
- দান বেহেশত প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করে।

তবে যারা আসলেই অভাবী নয় এবং যারা স্বাস্থ্যবান ও শারীরিক দিক থেকে সক্ষম তাদের দান করাকে মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবৈধ ঘোষণা করেছেন।[৮৮]

২. হিবা (Hiba) ঃ যদি কোন সম্পত্তি কোন প্রতিদান গ্রহণ ব্যতিরেকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহীতাকে হস্তান্তর করা হয় তাহলে তাকে হিবা বলে। হিবা দানের অন্যতম একটি প্রকার। হিবা জনকল্যাণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের একটি ভাল উপায়। মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিবার মাধ্যমে দান করা বৈধ বলে তা করতে উৎসাহিত করেছেন।[৮৯]

৩. ওয়াকফ (Waqf) ঃ ওয়াকফ একটি আরবী শব্দ। কোন সম্পত্তি আল্লাহর নামে উৎসর্গ করাকে ওয়াকফ বলে।

> সাধারণত ওয়াকফ (বহুবচনে আওকাফ) দ্বারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী কোন লোক কর্তৃক তার যে কোন সম্পত্তি ইসলামী আইন (Shariah) দ্বারা স্বীকৃত ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক অথবা দানের উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে উৎসর্গ করাকে বুঝায়।
>
> সাধারণত: ওয়াকফ দ্বারা স্থায়ীভাবে দানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়কে বুঝায়।

---

৮৭. আল কুরআন ২ : ১৬৭, ২ : ১৯৫; ২ : ২৫৪; ৫১ : ৯; ৩০ : ৩৮
৮৮. আবু দাউদ, ভলিউম-১, পৃ.৩৭৯
৮৯. সহীহ আল বুখারী

www.pathagar.com

ওয়াকফ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রতিরোধ করা বা বিরত রাখা (Prevent or restrain) আরবী ভাষায় এর অর্থ অবরুদ্ধ রাখা অথবা আটক রাখা (Confinment or detention)।

ইসলামী শারীআ মতে, ওয়াকফ হল এমন একটি কাজ যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি এমন কোন সম্পদ ব্যবহার এবং হস্তান্তর থেকে বিরত থাকে যার দ্বারা যে কোন ব্যক্তি লাভবান হতে পারে অথবা যতদিন টিকে থাকে ততদিন এ সম্পদ অন্যের উপকারার্থে– ব্যবহৃত হতে পারে।

হানাফী মতে, ওয়াকফ এর অর্থ হচ্ছে যে কোন সম্পদের মালিকানা ত্যাগ করে তা স্থায়ীভাবে আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করা এবং অন্যের কল্যাণে এ সম্পদ ব্যয় করা।

অন্যকথায়, ওয়াকফ হচ্ছে অন্যের উপকারের জন্য স্থায়ীভাবে উৎসর্গীকৃত যে কোন সম্পত্তি, যার দ্বারা অর্জিত আয় তার নির্দেশিত ইসলামী শরীয়াধীন কিছু নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে ব্যয় করা হয়।

ইসলামে ক্যাশ ওয়াকফও স্বীকৃত। অটোম্যান যুগেও এর ব্যবহার সনাক্ত করা যায়। আর্থিক ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবেও ক্যাশ ওয়াকফ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ওয়াকফ করা একটি নফল ইবাদত। ব্যাপক হারে এর প্রচলন করতে মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উৎসাহিত করেছেন। মানুষের দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। হালাল উপায়ে অর্জিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হতে মিল্লাতে মুসলিমার কল্যাণের জন্য ওয়াকফ করে গেলে সদকায়ে জারিয়া রূপে তা মানুষকে অমর করে রাখে। সদকায়ে জারিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব প্রধান হচ্ছে ওয়াকফ। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ভাল কাজে ওয়াকফ সম্পত্তির আয় নিয়োজিত করতে হবে এবং এ ওয়াকফ মোট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগের বেশী হবে না।" [৯০] যে সম্পত্তি আল্লাহর নামে ওয়াকফ করা হবে তার আয় গরীব, মিসকিন, মুসাফির, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, ইয়াতিম ইত্যাদির জন্য ব্যয় করতে হবে। ওয়াকফ এর মাধ্যমে মানুষ ফল লাভ করে যুগ যুগ ধরে।

ওয়াকফ এর মাধ্যমে

১. গরীবের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
২. গরীবের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হয়।
৩. বিত্তশালী ব্যক্তিও এক ধরনের সামাজিক শান্তি অনুভব করে।
৪. গরীব ও বিত্তশালীদের মাঝে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সেতুবন্ধন সৃষ্টি

---

৯০. সহীহ আল বুখারী

www.pathagar.com

হয়। এর মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসে।

৫. একটি নতুন সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় যেখানে একে অপরের আয়ের ওপর আস্থাশীল হয়, সবাই পরস্পরের অপরের সহযোগিতা নিয়ে সমৃদ্ধ এক সমাজ বিনির্মাণ করতে পারে।

৬. সমাজের ব্যাপক কল্যাণ সাধিত হয়।

ওয়াকফ সমপত্তির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা করা যায়। ওয়াকফ সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার বাংলাদেশে সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

৪. **ওয়াসিয়াত** (Wasiat)ঃ মৃত্যুর সময়ে সমাজকল্যাণমূলক কাজে বা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সাধারণভাবে স্বীয় সম্পদের একাংশ দান করে যাবার নাম ওয়াসিয়াত (উইল)। [৯১] মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পদের তিন ভাগের একভাগ ওয়াসিয়াত করতে বলেন এর বেশী নয় । অন্য কথায় ওয়াসিয়াত সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ করা যাবে। এক-তৃতীয়াংশের বেশী ওয়াসিয়াত করলে, অতিরিক্ত অংশ বাতিল বলে গণ্য হবে। ওয়াসিয়াত এমন একটি আমল যা দ্বারা বিত্তবানরা জীবনের শেষ মুহূর্তে সৎকাজ হিসেবে দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্তকে আর্থিক উপকার করতে পারে।

৫. **জারাইর** (Zarair)ঃ দরকার মত দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ক্ষেত্রেও নিজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং সকলকে উৎসাহিত করেছেন ।[৯২]

৭. **মিনাহ** (Minh)ঃ দরিদ্র দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ আর একটি ম্যাকানিজম হচ্ছে মিনাহ। এ ম্যাকানিজমে উৎপাদনমুখী কোন সম্পদ অভাবী দরিদ্র কোন ব্যাক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিদান ছাড়া প্রদান করা হয়। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং এই ম্যাকানিজমের শুভ সূচনা করেন। মদিনার সামর্থবান সাহাবারা (রা) মক্কা থেকে হিজরাতকৃত মুহাজিরদেরকে এ পদ্ধতিতে সহায়তার হাত প্রসারিত করেছিলেন । মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস থেকে অর্থ, ভারবাহী পশু, দুধেল পশু, কৃষি জমি, ফলের বাগান এবং বাড়ী এই ছয় ধরনের মিনাহ এর কথা জানা যায়।[৯৩]

উপরোক্ত ম্যাকানিজম গুলো কার্যকরী করার মাধ্যমে ইসলামী সমাজে

---

৯১. তিরমিযী

৯২. ড. হাসান জামান, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (জুলাই ১৯৭৭) পৃঃ ৪৬

৯৩. ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ, Islam, Poverty and Income Distribution, The Islamic Foundation, UK (1991) P-44

www.pathagar.com

সম্পদ বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে বন্টিত হয়ে যায়। যার ফলে দরিদ্র ব্যক্তি সম্পদের মালিক হয়ে দারিদ্র্য সীমা অতিক্রম করে সাহেবে নিসাব হতে পারে।

উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ (Development Measures) ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব (State Responsibility)

ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। ইসলামী অর্থনীতির আওতায় দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে বহু পথের সন্ধান দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে কতগুলো হচ্ছে ব্যক্তিগত দায়িত্ব, কতগুলো পূরণ করতে হবে সমাজকে, কতগুলো হচ্ছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং কতগুলো হচ্ছে রাষ্ট্র ও সমাজের শরীকানা দায়িত্ব। ইসলামের ম্যাকানিজম সমূহের কোন কোনটি খোদ রাষ্ট্রকেই বাস্তবায়ন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ যাকাত, ওশর ও কাফফারাতের কথা বলা যেতে পারে। রাষ্ট্র আল হিজবা নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে পারে। এরপরেও দারিদ্র্য থেকে গেলে রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে সরকারী ট্রেজারী থেকে এবং অতিরিক্ত কর বসিয়ে অবশিষ্ট দারিদ্র্য দূরীকরণের সম্পূরক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এভাবে রাষ্ট্র জনগণের মধ্যেকার স্বল্প আয়ের গোষ্ঠীর জন্য বিত্তবানদের কাছ থেকে অতিরিক্ত সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে দরিদ্রদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে পারে। এটি আশার কথা যে, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সাধারণ মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন এবং দুর্বলকে ক্ষমতায়ন করার ব্যাপারে বাংলাদেশের উদ্যোগ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

উপসংহার (Conclusion) ও সুপারিশমালা (Recommendation):

পরিশেষে বলা যায় যে ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনে যে পদ্ধতির কথা বলেছে, যে নীতি নির্দেশনা পেশ করেছে আজও তা অনুসরণ করলে জাতীয় জীবন থেকে অতি দ্রুত দারিদ্র্য দূরীভূত হবে এবং দেশে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ফিরে আসবে। ইতিহাস সাক্ষী, ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শই মদীনা রাষ্ট্রের দারিদ্র্য পরিস্থিতিকে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে আমূল পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ইসলামী উম্মাহর যুদ্ধ আজ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশও দারিদ্র্য দূরীকরণের লড়াইয়ে নিয়োজিত। আলো-আঁধারের সহ অবস্থান যেমন অসম্ভব তেমনি মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে ধনী-দরিদ্রের সহাবস্থান অকল্পনীয়। একইসাথে অনেক ধনী ও অনেক দরিদ্রের এই অসম্ভব প্রতিপাদ্য থেকে মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশ যত দ্রুত বেরিয়ে আনতে পারবে তত বেশী আমরা আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। কিন্তু কাজটি খুব সহজ নয়। এ জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত ও সুসংগঠিত প্রয়াস। ক্ষমতার মগডালে অসৎ লোকদের বসিয়ে রেখে দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ কায়েমের স্বপ্ন দেখা অবাস্তব ও অবান্তর। এ সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে। দারিদ্র্যের কারণসমূহ চিহ্নিত হয়েছে, দারিদ্র্য দূরীকরণ দরকার এ বিষয়ে কারোই দ্বিমত নেই। কিন্তু কৌশল

www.pathagar.com

পাল্টাতে হবে। ইসলামী কৌশলের নিরিখে বাস্তবভিত্তিক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Developement Goals) অর্জনসহ বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব। এ বিষয়ে সুপারিশ সমূহ নিম্নরূপ:

দরিদ্র ও অভাবীদের জন্য সুপারিশ

১। নিরন্তর পরিশ্রমের মাধ্যমে আয়-উপার্জন বাড়িয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

২। সঞ্চয় মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে।

বিত্তবানদের জন্য সুপারিশ

১। সালাত-সিয়ামের মতই যাকাত-ওশরকে ফরয মনে করতে হবে।

২। সুনির্দিষ্ট দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যাকাত ফান্ডকে ব্যবহার করতে হবে।

৩। করজে হাসান প্রদানের মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

৪। ইসলামী ব্যাংকে ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব খুলে দারিদ্র্য দূরীকরণের ইসলামিক কৌশলের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

সকল জনগণের জন্য সুপারিশ

১। দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত ইসলাম ভিত্তিক সমাজ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর তৎপর হতে হবে।

২। দারিদ্র্য থেকে মুক্তির মহানবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শিক্ষা অনুযায়ী চেষ্টা ও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

৩। সুদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে হবে।

এনজিও/মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন ও ব্যাংক সমূহের জন্য সুপারিশ

১। জামানত বিহীন মাইক্রো ফাইন্যান্স কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে।

২। সুদবিহীন মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রদান করতে হবে। সুদমুক্ত লেনদেন নিশ্চিত করতে হবে।

৩। করজে হাসান কর্মসূচী চালু করতে হবে। অন্যকথায় করজে হাসান বা সুদমুক্ত ঋণ দানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাময়িক অর্থ চাহিদা পূরণ করতে হবে।

ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সুপারিশ

১। পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টিকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।

২। ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

৩। কৃষি ভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন ও নতুন শিল্প স্থাপনে অর্থায়ন বাড়াতে হবে।

৪। গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য আয়ের সুযোগ সৃষ্টির জন্য নতুন বিনিয়োগ প্রডাক্ট বাজারে আনতে হবে।

৫। বিত্তবানদের সহায়তা নিয়ে ও সরকারী অনুমতি নিয়ে মাইক্রো ফাইন্যান্স এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমকে সাদাকাত, যাকাত ও ওয়াকফের সাথে সমন্বয় করতে হবে।

৬। গ্রামকেন্দ্রিক ইসলামী ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করতে হবে।

www.pathagar.com

৭। পল্লী অঞ্চলে বিনিয়োগের বলয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে হবে।

৮। ইসলামী ব্যাংকসমূহকে বর্গাচাষী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য সমবায় বিপনন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

সরকারের জন্য সুপারিশ

১। অবিলম্বে যাকাত মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে।

২। সকল পর্যায়ে সুদকে নিষিদ্ধ করতে হবে।

৩। কর্মবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

৪। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী আরো জোরদার করতে হবে এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়াতে হবে।

৫। জীবিকা বা অর্থোপার্জনের উপায় বৃদ্ধি (Livelihood Promotion) করতে হবে।

৬। জীবিকা বা অর্থোপার্জনের সংরক্ষণ (Livelihood Protection) করতে হবে।

৭। দেশের অতি দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলকে গুরুত্ব দিতে হবে।

৮। অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী জোরদার করতে হবে। দেশের মঙ্গা, আইলা, বন্যাপ্রবণ ও চর এলাকাকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৯। সরকারী কোষাগার থেকে নাগরিকদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

১০। সামষ্টিক অর্থনীতির স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণ এবং মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার নীতিমালা ও কাঠামো তৈরি করতে হবে।

১১। ভূমিহীন দরিদ্র মানুষের জন্য খাস জমিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

১২। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য আইডিবি'র সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে।

১৩। আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন তথা ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করাতে হবে।

১৪। প্রধান দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় সরকারী ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

লেখক-পরিচিতি : ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম– বিশিষ্ট ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ এবং প্রাবন্ধিক।

লেখা পরিচিতি : প্রবন্ধটি ১৩ অগাস্ট, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত হয়।

www.pathagar.com

"টিপাইমুখ বাঁধ ঃ বাংলাদেশের আরেক মরণ ফাঁদ।"

ইঞ্জিনিয়ার এস.এম. ফজলে আলী।

ভূমিকা ঃ

'টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশের আরেক মরণফাঁদ'-এটাই আজ জাতির কাছে; দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এই মরণফাঁদ থেকে বাঁচার জন্য গোটা জাতি উদ্বিগ্ন। তাই এর প্রতিবাদে দেশের বুদ্ধিজীবী, পরিবেশবিধ, প্রকৌশলী, পানি বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক-ছাত্র তথা আপামর জনগণ প্রতিবাদ মুখর। টিপাইমুখ বাঁধে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক তৃতীয়াংশের যে মারাত্মক ক্ষতি হবে তার জন্য কোন বিশেষজ্ঞের মতামতের প্রয়োজন নেই। খোলা চোখেই তা যে কোন দৃষ্টি সম্পন্ন লোকের নিকট প্রতিভাত হবে। ফারাক্কা বাঁধের কারণে দেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা যে কোন লোকই প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাচ্ছেন। ঐ অঞ্চলে মরুকরণ শুরু হয়েছে। প্রমত্তা পদ্মা তার নাব্যতা হারিয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে শত শত ধুধু বালুচর। নদীর এপার থেকে ওপারে যেতে এখন নৌকায় পার হতে হয় না। বালুচরের ওপর দিয়ে গরুর গাড়ী, ট্রাক নির্দ্বিধায় পার হয়ে যাচ্ছে। নদীতে পানি নেই, ক্ষেত-খামারে সেচ কাজও নেই। নেই নদীতে মাছ ও জলজ প্রাণী। পানির লবণাক্ততা মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেছে এবং তা পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। অতিরিক্ত লবণাক্ততায় বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ম্যানগ্রোভ সুন্দর বনের গাছ-পালা মরে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

যে ম্যানগ্রোভ দক্ষিণাঞ্চলের মানুষকে সাইক্লোন, সিডর ও আইলার হাত থেকে ঢাল হিসেবে রক্ষা করেছে তা ধ্বংস হলে ঐ অঞ্চলের হত দরিদ্র লোকের বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। ফারাক্কা বাঁধ যে বর্তমানে আমাদের মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা আরো স্পষ্ট। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পানি সেচ প্রকল্প জিকে প্রজেক্ট পদ্মার পানি প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়েছিলো। এর দ্বারা কুষ্টিয়া, ভেড়ামারা, ঝিনাইদহ, মাগুরা জেলার প্রায় ৩.০ লক্ষ হেক্টর জমিতে জল সেচের মাধ্যমে চাষ হয়ে এসেছিলো। কিন্তু পদ্মায় পানি না থাকায় সে প্রকল্প আজ বাতিল পর্যায়ে। এখন ঐসব এলাকায় গভীর নলকূপ ও শ্যালো টিউবওয়েল দ্বারা কোন প্রকারে পানি সেচের কাজ চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। এতে ফসলের উৎপাদন অর্ধেকে নেমে আসছে। ওদিকে তিস্তা নদীতে পানি নেই। তাই বাংলাদেশের প্রকৌশলীদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় নির্মিত তিস্তা-প্রকল্প ভেস্তে যেতে বসেছে। ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ১০০ কিলোমিটার উজানে গজলডোবা নামক স্থানে বাঁধ দিয়ে তিস্তার প্রায় সব পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। তার উজানে আরো ৫টি খাল কেটে তিস্তার পানি সরিয়ে নিচ্ছে ভারত। আমাদের তিস্তা সেচ প্রকল্প আজ প্রায় অচল। এতে বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার প্রায় ৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ কাজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এ অঞ্চলে এমনিতেই পানির সমস্যা আছে। ভারত একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করায় এ অঞ্চলে মরুকরণ শুরু হয়েছে। পানির স্তর অস্বাভাবিকভাবে নীচে নেমে যাওয়ায় ডিপ টিউবওয়েলগুলোতেও পানি পাওয়া যাচ্ছে না। এর পরও কি কোন বিশেষজ্ঞ মতামতের প্রয়োজন আছে টিপাইমুখ বাঁধ হলে বাংলাদেশের ক্ষতি হবে কিনা? বৃহত্তর সিলেট, কুমিল্লা ও কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, চাঁদপুর জেলায় পানির মারাত্মক অভাব দেখা দেবে। টিপাইমুখ ড্যাম কোন কারণে ধ্বংস হলে এ অঞ্চলে সুনামির চেয়েও ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে।

টিপাইমুখ বাঁধের ইতিকথা

বিএনপির শাসনামলে (১৯৯১-৯৬) টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানানো হয়েছিলো। কিন্তু বর্তমান মহাজোট সরকার ভারতের নিকট নতজানু হওয়ায় বাংলাদেশের ভয়াবহ ক্ষতি হবে জেনেও কোন প্রতিবাদ করছে না। এতে মহাজোট সরকার দেশের জনগণের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে গেল। যে দেশের পানি সম্পদ মন্ত্রী মন্তব্য করতে পারে যে "টিপাইমুখ বাঁধে বাংলাদেশের কি ক্ষতি হবে? এতে বরং আমাদের উপকার হবে। এ বাঁধ বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ দেবে। আর যদি আমাদের ক্ষতি হয়ই তখন দেখা যাবে।"[১] ভারতের কোন সাধারণ লোকও এ ধরনের মন্তব্য করতে সাহস পেত না। কারণ তারা জানে এ প্রকল্পে বাংলাদেশের অবশ্যই ক্ষতি হবে। আর

---

১. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৭ শে মার্চ, ২০০৯।

www.pathagar.com

আমাদের পানি সম্পদ মন্ত্রী বলছেন আমাদের ক্ষতি হবে না। বর্তমান সরকার ভারতের কত বড় পদলেহী তা তার এ মন্তব্যে স্পষ্ট। এরা জাতীয় স্বার্থ দেখছে না-দেখছে গদীর মোহ। মীরজাফর ও ঘসেটি বেগমরা এখনো সক্রিয় আছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য আমাদেরকে সদা জাগ্রত থাকতে হবে।

সিলেট জেলার পূর্ব সীমান্ত থেকে ১০০ কিলোমিটার উজানে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মনিপুরের চোরা চাঁদপুর জেলার টিপাইমুখ নামক স্থানে এই বাঁধটি নির্মিত হচ্ছে। জানা গেছে ভারতীয় মুদ্রার ৮ হাজার ৮৬৭ কোটি রুপি ব্যায়ে ত্রিপুরার বরাক নদীর ওপর এই বাঁধ নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনই এর লক্ষ্য। এই ড্যামের উচ্চতা হবে ১৮১ মিটার এবং ড্যামের দৈর্ঘ হবে ৪৯৫ মিটার। এতে লেকের যে পানির ধারণ ক্ষমতা হবে তার পরিমাণ ১৫০০ বিলিয়ন ঘন মিটার। ভারত বলে আসছে এ ড্যামের দ্বারা বাংলাদেশে পানি প্রবাহে কোন বাঁধার সৃষ্টি হবে না। কিন্তু এখন জানা গেছে টিপাইমুখ বাঁধের ১০০ কিলোমিটার উজানে সুবর্ন শিরিতে আরেকটি ড্যাম দিয়ে পানি প্রত্যাহার করে ত্রিপুরা-মনিপুর রাজ্যে পানি সেচের কাজও তারা করবে। তাই ত্রিপুরার নিম্নাঞ্চলে ও বাংলাদেশের ভূখণ্ডে বরাক নদীর থেকে আর কোন পানি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে না। বাংলাদেশের পানি ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে এই বাঁধ নির্মাণের ফলে দেশের গোটা পূর্ব ও মধ্য অঞ্চলে মরুকরণ দেখা দেবে। একই সাথে দেশের সার্বিক জীববৈচিত্রে বিপর্যয় নেমে আসবে। অন্য দিকে পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে ভূমিকম্পসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিনিয়ত বাংলাদেশকে তাড়া করে বেড়াবে।

১৯৯৫ সালে ভারতের কেন্দ্রিয় সরকার টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করলেও মনিপুরের জনগণের তীব্র প্রতিবাদ ও আপত্তির মুখে তার বাস্তবায়ন স্থগিত রাখে। তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো কখন প্রাদেশিক সরকারে কেন্দ্রিয় সরকারের অনুগত দল ক্ষমতায় আসে। সে সুযোগ তারা এখন পেয়েছে। তাই তারা এ প্রকল্পের কাজ জোরে সোরে শুরু করেছে। ভারতের বর্তমান সরকার এই অঞ্চলের জনমতকে উপেক্ষা করে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশকে আমলে না নিয়ে নিজের ইচ্ছামত এ কাজ শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক নিয়ম হলো, আন্তর্জাতিক নদী যেসব দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত তাদের সবার স্বার্থ বজায় রেখে সমতার ভিত্তিতে কোন প্রকল্প গ্রহণ করবে।

আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহারের বিধি-বিধান ঃ

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দুই বা ততোধিক দেশের ওপর দিয়ে কোন নদী প্রবাহিত হলে, সে নদীর পানি সমূহের ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। এ ক্ষেত্রে যে সব দেশের ওপর দিয়ে নদীটি প্রবাহিত হয় তার প্রতিটি দেশের দায়িত্ব হচ্ছে এমনভাবে নদীটি ব্যবহার করা যাতে অন্যান্য দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হয়। উক্ত নদীর

www.pathagar.com

পানি সমতার ভিত্তিতে ব্যবহার করতে হবে। কোন একটি দেশ সে নদীর পানি নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে না। নিম্নাঞ্চলের দেশকে উক্ত নদীর পানি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আন্তর্জাতিক আইনে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আছে। আন্তর্জাতিক নদীর একতরফা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন অথবা পানি প্রত্যাহার করা সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য ও বেআইনী। আন্তর্জাতিক নদী সংক্রান্ত হেলসিং নীতিমালা ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া আছে। প্রতিটি অববাহিকাভুক্ত রাষ্ট্র, অভিন্ন নদীগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই অন্য রাষ্ট্রের ক্ষতি না করেই তা ব্যবহার করতে হবে। ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক আইনানুসারে হেলসিংক নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১৫ এ বলা হয়েছে নদীটি প্রবাহিত প্রতিটি রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম ও সমতার ভিত্তিতে পানির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং অনুচ্ছেদ-২৯ এ বলা হয়েছে এক অববাহিকাভুক্ত রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহারের পদক্ষেপের ক্ষেত্রে অবশ্যই অবহিত করবে। ১৯৯২ সালের ডাবলিন নীতিমালার ২নং নীতিতে বলা হয়েছে, পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় অবশ্যই সবার অংশগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্পের ব্যাপারে ভারত সে রকম কোন ব্যবস্থা করেনি। বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারে রেখেই ভারত এ প্রকল্পের কাজ করে যাচ্ছে। ইহা আন্তর্জাতিক জল-প্রবাহ কনভেনশন ১৪ নং অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ লংঘন।

এ সম্পর্কে প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক নদী বিষয়ক আইন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ওপেনহেইম বলেন "কোন রাষ্ট্রকে নিজ ভূখণ্ডে প্রবাহিত নদীর প্রাকৃতিক অবস্থা এমনভাবে পরিবর্তন করতে দেয়া যাবে না যার ফলে প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে। অথবা কোন অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে।" আন্তর্জাতিক নদীর ব্যবহার সম্পর্কে অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছে আন্তর্জাতিক আইন ইনস্টিটিউট। আন্তর্জাতিক নদী ব্যবহার সম্পর্কে ১৮১৫ সালে ভিয়েনা সম্মেলনে এবং ১৯২১ সালে আন্তর্জাতিক দানিয়ুব নদী কমিশন কর্তৃক প্রণীত আইনে এই নীতির উল্লেখ আছে। নদীটি প্রবাহিত প্রতিটি রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম ও সমতার ভিত্তিতে পানির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পানি সম্পদের সুসম বন্টনের নীতি ১৯৭২ সালে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত মানব পরিবেশ সংক্রান্ত জাতিসংঘের কনফারেন্সের ঘোষণা পত্রের ৫১ অনুচ্ছেদে স্থান পায়। ১৯৪৯ সালের বিখ্যাত করফু নদী (Corfu channel) মামলায় (ব্রিটিশ বনাম আলবেনিয়া) আদালত তার সিদ্ধান্তে উল্লেখ করে, একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বহি:প্রকাশ কখনোই এমনভাবে হতে পারে না যার বিরূপ প্রভাব সেই রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে অনুভূত হতে পারে। বিশ্বে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক মামলা ও চুক্তি রয়েছে যেখানে পানির হিস্যার প্রশ্নে ভাটির দেশের নদীকে স্বীকৃত দেয়া হয়েছে এবং পানির একচেটিয়া ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৫৭ সালে লেক লেনও (Lake Lanou)

www.pathagar.com

মামলার (স্পেন বনাম ফ্রান্স) রায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক নদীর প্রাকৃতিক জল প্রবাহের ধারা এমনভাবে পরিবর্তন করা যাবে না, যার পরিণতি অপরাপর রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক হুমকি হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে Wyoming Vs Colrado কিংবা Chicago Divesion case ১৯২৫, মামলার রায়ে উল্লেখ করা আছে যে, আন্তর্জাতিক নদীর একচেটিয়া ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইন বিরোধী এবং নদীর স্থানীয় অংশের ওপর পার্শ্ববর্তী কোন রাষ্ট্রের অবাধ সার্বভৌমত্ব কার্যকর হতে পারে না। ১৯২১ সালে সুদান ও মিশরের মধ্যে নীল নদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তাতে উল্লেখ আছে যে সুদান নীল নদে এমন কোন ব্যবস্থা করবে না যাতে মিশরের কোন স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে পারে। ১৯৬০ সালে ভারত ও পাকিস্তানের স্বাক্ষরিত সিন্ধু অববাহিকা চুক্তিতেও এমন ঘোষণা উল্লেখ ছিলো যে, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র এমন কোন ব্যবস্থা নেবে না যাতে অপর রাষ্ট্রে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হতে পারে।

২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলা-ভারত যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকে ত্রিপুরার টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণে আপত্তি তোলা হলে ভারতের পানি সম্পদ মন্ত্রী মিষ্টি কথায় বোঝাতে চেয়েছেন যে, বাংলাদেশের ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ তারা করবে না। এ কথাটিই ভারতের প্রধান মন্ত্রী মনমোহন সিং বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়াকে ঢাকায় সার্ক সম্মেলনের সময় আশ্বস্ত করেছিলেন। কিন্তু সেই মনমোহন সিংই ঐ বছরের শেষের দিকে টিপাইমুখ ড্যামের উদ্বোধনের কাজটি করেন। যৌথ কমিশনের আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় ঐ প্রকল্পের নকশা ও তথ্যাদি বাংলাদেশকে ভারত পাঠাবে। তারা অন্যান্য বিষয় যেভাবে কুটনীতির মারপ্যাঁচে চানক্য চাল চালিয়ে বাংলাদেশের ন্যায্য দাবী অগ্রাহ্য করেছে এখানেও তার ব্যত্যায় হয়নি। তারা আজ পর্যন্ত টিপাইমুখ বাঁধের তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশকে দেয়নি।

বাঁধটিকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মনিপুর ও মিজোরামপুর রাজ্যেই আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু হয়েছে। কিন্তু দিল্লীর কেন্দ্রিয় সরকার ছল-চাতুরির মাধ্যমে মনিপুরে কংগ্রেস দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে এ প্রকল্প কার্যকরী করতে যাচ্ছে। এ বাঁধের বিরুদ্ধে মনিপুরে হরতালসহ কেন্দ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। মনিপুরের পরিবেশবাদীরা ঢাকার উপমহাদেশীয় পানি সম্পদ সম্পর্কিয় ২০১০ সালের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে স্পষ্ট ভাষায় এ প্রকল্পের ঘোর বিরোধীতা করেছেন। তারা জানান এই প্রকল্পের ফলে প্রায় ৫০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা পানিতে ডুবে যাবে। এতে ৫ লক্ষ লোক তাদের চাষের জমিসহ বসত বাড়ি হারাবে। তারা আয় রোজগার হারাবে। তারা প্রস্তাব দিয়েছেন বাংলাদেশের পানি বিজ্ঞানী, পরিবেশবিধ ও সুশীল সমাজসহ যৌথভাবে মিলিত হয়ে একটি শক্তিশালী সংগঠন করা হোক।

মেকং নদীর পানি জাতি সংঘের মধ্যস্থতায় কম্পোচিয়া, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড মেকং রিভার কমিশনের মাধ্যমে নির্বিঘ্নে ব্যবহার করে আসছে। ইউরোপের

www.pathagar.com

দানিউব নদী ১২টি রাষ্ট্র সমতার ভিত্তিতে ব্যবহার করছে। নীল নদের পানি ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, সুদান ও মিশর যৌথভাবে ব্যবহার করছে। বিশ্বে এ রকম শত শত উদাহরণ আছে। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো ভারত। সে সব পানি ও পানি উপজাত সব কিছু একাই ভোগ করবে। তাতে অন্যের অস্তিত্ব ধ্বংস হলেও তার কিছু যায় আসে না। এটা কোন সভ্য সমাজের রীতি হতে পারে না। বরাকনদী এবং বাংলাদেশের সুরমা ও কুশিয়ারা একই উৎস থেকে উৎপত্তি হয়েছে। তাই এ নদীর পানির অংশিদার ভারত যেমন তেমনি বাংলাদেশও।

বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির বাঁধ পরিদর্শনের প্রহসন ঃ

এটি একটি সম্পূর্ণ কারিগরী প্রকল্প হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য একটি সংসদীয় কমিটি পাঠিয়েছিলো বর্ষাকালে। সে সময় সেখানে প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় সে সংসদীয় কমিটি প্রকল্প এলাকা সরে জমিনে দেখতে পারেনি। হেলিকপ্টারে তারা আকাশ ভ্রমণ করেছেন। সে দলে একজন প্রকৌশলীও ছিলো না। তারা কি দেখে আসছেন সে ব্যাপারে মিডিয়াকেও কিছু জানান নি। দেখা যাচ্ছে মহাজোট সরকার দেশের বিরাট স্বার্থ নিয়ে লুকো চুরি খেলছেন।

বরাক নদীতে টিপাইমুখ বাঁধ দেয়ার কারণে সুরমা ও কুশিয়ারা নদী নাব্যতা হারাবে এবং সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জসহ মেঘনা অববাহিকার বিস্তির্ণ অঞ্চল শুকিয়ে যাবে। সিলেটের যে বিশাল এলাকা জুড়ে হাওড় রয়েছে তাও শুকিয়ে যাবে। কৃষি ও মৎস্য খাতে এর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়বে। দেশের খাদ্য উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ আসে এ অঞ্চল থেকে। তা দারুন হুমকীর মুখে পড়বে।[২] নৌপরিবহন, শিল্প, সেচ ব্যবস্থা ও দৈনন্দিন জীবনে যে পানির প্রয়োজন হবে তাতে ভীষণ অভাব দেখা দেবে। লাখ লাখ মানুষ বেকার হবে এবং খাদ্যাভাব দেখা দেবে। আবার বর্ষাকালে প্রবল বর্ষণের কারণে টিপাইমুখ ড্যামের ওপর যখন পানির প্রবল চাপ পড়বে তখন স্লুইজ গেট গুলো খুলে দিলে ভাটির দেশ বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে মারাত্মক বন্যার সৃষ্টি হবে। ভূমিকম্পন প্রবল এলাকায় বাঁধটি অবস্থিত।

পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে টিপাইমুখ বাঁধের কারণে গোটা সিলেট অঞ্চলে ভূমিকম্পের আশংকা বেড়ে যাবে। টিপাইমুখ বাঁধ এলাকাটি ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় পড়েছে। সারা বিশ্ব ১১টি কঠিন শিলার টেকটেসিক প্লেটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে পূর্ব দিকে ৭নং প্লেটটি আসাম-মনিপুর মিজোরামপুর হয়ে মিয়ানমারের দিকে ধাবিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই ৭নং প্লেটটি টিপাইমুখ বাঁধের কাছাকাছি দিয়ে চলে গেছে। এ কারণে এ অঞ্চলে পূর্বে অনেকগুলো ভূমিকম্প হয়েছে। ৭.৫ রিখটার স্কেলের উর্ধে যে সব ভূমিকম্প হয়েছে- ১৮৬৯, ১৮৯৭, ১৯১৮, ১৯২৩,

---

২. WRAPO প্রতিবেদন, ২০১০।

www.pathagar.com

১৯৪১, ১৯৪৩, ১৯৪৭, ১৯৫০, ১৯৭০ ও ১৯৮৮।[৩] প্লেটটি প্রতি ১০০ বছরে একবার ভয়াবহ রূপে আন্দোলিত হয়। তখন প্রবল ভূমিকম্প হয়। এখন সেই ১০০ বছর পার হয়ে গেছে। তাই যে কোন সময় সে আন্দোলন শুরু হলে টিপাইমুখ ড্যাম ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। সে সময় বরাক নদীর টিপাইমুখ ড্যামে আবদ্ধ ১৫০০ বিলিয়ন ঘন মিটার পানি যখন বাংলাদেশে প্রবল বেগে ধাবিত হবে, তখন তার উচ্চতা ২৫ থেকে ৩০ ফুট হবে। বৃহত্তর সিলেট, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা জেলার মানুষ, গরু-ছাগল, গাছ-পালা, ঘর-বাড়ি, খড়কুটার মত ভেসে যাবে। এটি ২০০৪ সালের সেই ভয়াবহ সুনামীর চেয়ে আরো মারাত্মক হবে। টিপাইমুখ থেকে ১০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে বিগত ১৫০ বছরে দুটি উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্পের রেকর্ড আছে।[৪] পরবর্তী ভূমিকম্প যখন হবে তখন টিপাইমুখ প্রকল্প তার পূর্বেই কার্যকরী হলে ১৮৩ মিটার উচ্চতার পানির চাপে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি ভাটি অঞ্চলে ভয়াবহ হবে। উক্ত ড্যামের কারণে বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল শুধু মরুকরনের শিকার হবে না, ভূমিকম্পের কারণে এ অঞ্চল আরো বড় ধরনের ধ্বংসযজ্ঞে নিপাতিত হবে। আর ভূমিকম্পকে ঠেকাবার মত কোন ব্যবস্থা অত্যাধুনিক জগতে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। তা হলে জাপানের ফুকুদা অঞ্চলের ভূমিকম্প ঠেকানো সম্ভব হতো এবং পারমাণবিক কেন্দ্রটি রক্ষা পেত।

টিপাইমুখ বাঁধের কারণে মনিপুর ও বাংলাদেশের যে মারাত্মক ক্ষতি হবে তার Study মনিপুরের বিশ্ব বিদ্যালয়ের আর্থ-সাইন্স বিভাগের প্রফেসর সুইরাম ইবেটম্বির (Soiram Ibetombi) গবেষণার অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি লিখেছেন- "The trend of Earthquakes shows that the regions which have experienced earthquakes in the past are more prone to it. The magnitude of future earthquakes may uniform to the past onces and the earthquake occurance. Geological data and techtonic history all have close correlation. The Tipaimuk Dam site has been chosen at the higher risk seismically hazardous zone."[৫] ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল কিভাবে সে দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব অস্বীকার করতে পারে? ভারতের আরেকজন বিশেষজ্ঞের অভিমত হলো- "টিপাইমুখ ও সুবর্ণগিরি নদীর বাঁধ প্রকল্প বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ জল বোমা।"[৬]

---

৩. নয়াদিগন্ত, ১০ নভেম্বর, ২০০৯।

৪. আমার দেশ, ২৭ জুন, ২০১০।

৫. Soiram Ibtombi-Research paper Monipur University, 2009.

৬. নয়াদিগন্ত, ১৭ ডিসেম্বর, ২০১০।

www.pathagar.com

"টিপাইমুখ বাঁধ ৭ কোটি মানুষকে ঝুকির মুখে ফেলবে।" এ মন্তব্য করেছেন আনান্ত খাশিয়া ত্রিস্টাশিস প্রিন্ট-নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর অর্গানাইজেশন রিসার্স এন্ড এডুকেশন এবং সদস্য ভারতীয় উন্নয়ন কমিশন।

অধিকন্তু স্থানীয় জনগণও এ বাঁধের বিপক্ষে। এখন একটা কাজ করা যায়। ভারতের ত্রিপুরা-আসাম ও মনিরামপুরের জনগণ এক সাথে টিপাইমুখ বাঁধ এলাকায় একটি লংমার্চ করতে পারে। আশা করা যায় দুই দেশের সম্মিলিত জনতার দাবী ভারত সরকার উপেক্ষা করতে পারবে না। এ ব্যাপারে উভয় দেশের সমমনা বুদ্ধিজীবী পরিবেশবিদ, পানি-বিশেষজ্ঞ ও সমাজ সেবীরা যৌথ উদ্যোগ নিতে পারেন।

টিপাইমুখ বাঁধ ভারতের সামরিক প্রকল্প

এতদিন আমরা টিপাইমুখ বাঁধের কারণে ভারতের মনিপুর, ত্রিপুরা ও মিজোরামপুর এবং বাংলাদেশের যে সব সমস্যা হবে সেসব বলে এসেছি। এ সব কিছুর পরেও টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে আরো উদ্বেগের কারণ আছে।

ভারতের কেন্দ্রিয় সরকার মাত্র ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য মনিপুরের বরাক নদীতে ড্যাম তৈরি করার কথা নয়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, এর আসল কারণ সাত কন্যার সামরিক গুরুত্বের জন্য এ ড্যাম তৈরি হতে যাচ্ছে। জল-বিদ্যুৎ সেচ কাজের কথা বলা হলেও ভারত সামরিক কৌশলগত কারণেই এ ড্যাম তৈরি করছে। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অরুনাচল পর্যন্ত যাতায়াতের পথকে সুগম করার জন্য বরাক নদীতে বাঁধের প্রয়োজন। তাই কেন্দ্রিয় সরকার এ বাঁধের নির্মাণ কাজে জোর দিচ্ছে। বাঁধটির নির্মাণকার্য ভারতের কেন্দ্রিয় সরকার সামরিক বাহিনীর হাতে ন্যাস্ত করেছে। বর্তমানে ড্যামের পূরো এলাকাই সামরিক বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের অধীনে। ১৯৬২ সালে চীন ভারত যুদ্ধের পর ইস্টার্ণ কমান্ডের সৃষ্টি। সেই ইস্টার্ণ কমান্ডের কাছেই এ ড্যাম নির্মাণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারা ড্যামের জরিপ, প্লানিং ও ডিজাইনের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ করে ফেলেছে। জানা গেছে, বাঁধ নির্মাণের দায়িত্ব নর্থ-ইস্ট ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশনের হলেও এর পরিকল্পনা ও ডিজাইন তাদের হাতে নেই। এর পুরো দায়িত্বই নিয়েছে ইস্টার্ণ কমান্ড আর্মির শিলচরের বেইজ কমান্ড।

১৯৯৭ সালে এই ড্যামের ওপর একটি জরিপ ইস্টার্ন আর্মি কমান্ড সেরে ফেলেছে। তারা সম্পূর্ণ ইকোলজিকাল সার্ভেও শেষ করেছে। ডিজিটাল সার্ভে সহ এ্যারোপ্লেন-পিকচার নেয়ার কাজও শেষ করেছে। মনিপুরের জয়েন্ট অফিসার কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সাকসেনা এই ড্যাম এলাকার সার্বিক তত্ত্বাবধানে আছেন। অপর দিকে এ ধরনের একটি ড্যাম হলে সিভিল আর্মি সম্পর্ক কি ধরনের হতে পারে তা নিয়ে ২০১০ সালের ২০ শে জুন নয়াদিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক হয়। তারা একমত হন যে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার 'ভারত-ভাবাপন্ন' হওয়ায় ড্যামের কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে। তা

www.pathagar.com

ছাড়া এ নিয়ে দুই দেশের সুশীল সমাজের আলোচনার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এখানে সুশীল সমাজ বলতে ভারতমুখী বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীদেরকে বোঝানো হয়েছে। ড্যাম নির্মাণের পক্ষের লোকদের নিয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে একটি বিশেষ গ্রুপকে। এতে উভয় দেশের সমমনা সুশীলরা ও বুদ্ধিজীবীরাই সেবা দেবে। এদেরকে দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এ ধরনের একটি বৈঠক ৩ এপ্রিল, ২০১০ দিল্লিতে হওয়ার কথা ছিলো। ফেব্রুয়ারী, ২০১০-এ পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের কারণে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ভারতের সামরিক বাহিনী, বিশেষ করে ইস্টার্ণ কমান্ডের অনেক অফিসার যোগদান না করতে পারায় সে বৈঠক বাতিল করা হয়।[৭]

প্রথমে ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের অধীনে টিপাইমুখ ড্যাম নির্মাণের কথা ছিলো। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত পাল্টিয়ে দায়িত্বটা নর্থ ইস্টার্ণ ইলেকট্রিক কর্পোরেশনকে দেয়া হয়। তা আবার পরিবর্তন করে মনিপুরের প্রাদেশিক সরকারের মালিকানাধীন ন্যাশনাল হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশনের ওপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে সামরিক কৌশলগত কারণে। কারণ কোম্পানীটি সরকারের হওয়ায় ভারতের সামরিক বাহিনী তাদের মন মতো কাজ করিয়ে নিতে পারবে।[৮]

অন্য সূত্রে জানা গেছে ২০১০ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আসামের জোড়হাটে সামরিক বাহিনীর যৌথ মহড়ায় এই ড্যাম নির্মাণের ব্যাপারে ইস্টার্ণ কমান্ডের সম্পৃক্ততার কথা প্রকাশ পায়। সেই মহড়ায় নকশা এঁকে উভয় দেশের সেনা কর্মকর্তাদের জানানো হয় কোথায় ড্যাম নির্মাণ হতে যাচ্ছে।[৯] স্বাভাবিক ভাবে এলাকাটি জলমগ্ন হবে। তখন কি ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদের উদ্ভব হবে, তাও উল্লেখ করা হয়। সে পরিস্থিতিতে ভারত ও বাংলাদেশকে তাদের কিভাবে মুকাবিলা করতে হবে তাও বিষদভাবে বোঝানো হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তখন ভিন্ন কৌশলে তৎপরতা চালাতে পারে, তাও বাংলাদেশকে অবহিত করা হয়। এতেই বাংলাদেশের সামরিক কর্মকর্তারা নিশ্চিত হয়ে যান যে ভারত টিপাইমুখ বাঁধ করবেই। সামরিক দিক থেকে জলমগ্ন এলাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুকাবিলায় ভিন্ন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য। কারণ ইস্টার্ণ কমান্ডের পক্ষে ঘন বনাঞ্চল ঘেরা এলাকাটিতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুকাবিলা করা দুরূহ হয়ে পড়বে। কাপ্তাই ড্যামের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে যে দুঃসহনীয় পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে তা বাংলাদেশী সেনা কর্মকর্তারা ভারতের সেনাকর্মকর্তাদের বিষদভাবে বুঝিয়ে বলেন।

---

৭. আমার দেশ, ৩০ অকটোবর, ২০১০।

৮. Monipur News, 25 August, 2009.

৯. প্রথম আলো, ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১০।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পুরো এলাকা দীর্ঘ ৩০ বছর অস্থিতিশীল করে রেখেছিলো, তারা ভারতীয় বর্ডার অতিক্রম করে আশ্রয় নিত। ফলে দুই দেশের সীমান্ত এলাকাও অস্থিতিশীল হতো। ভারত তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় ও সামরিক ট্রেনিং দিতো। তারা এখনো বাংলাদেশের এক দশমাংশ এলাকা অস্থিতিশীল করে রেখেছে। তাই টিপাইমুখ ড্যাম হলে এ ধরনের পরিস্থিতি ত্রিপুরা মনিপুর, মিজোরাম ও আসামে হতে পারে। তা ভারতীয় সেনা বাহিনীর জন্য সুখকর হবে না। কিন্তু ভারত এ কথা আমলে নেয় নি।[১০]

এ দুর্গম এলাকায় এ ধরনের ড্যাম নির্মাণে ভারতের আসল উদ্দেশ্য, ভারতের পূর্বাঞ্চলে শক্ত সামরিক ঘাটি নির্মাণ। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের পর থেকে চীন অরুনাচল প্রদেশটিকে তিব্বতের অংশ বলে দাবী করে আসছে। ভারতের ভয় কোন এক সময় হয়তো হিমাচলের নিকটবর্তী আকসাই অঞ্চলের মতো এই প্রদেশটিও চীন দখল করে নিতে পারে। তাই ভারত এখানকার সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করছে। কয়েক মাস আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং অরুনাচল প্রদেশ সফরের প্রোগ্রাম করলে চীন তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাতেই বোঝা যায় সমস্যার গভীরতা কত বেশি। তার অংশ হিসেবেই এই টিপাইমুখ বাঁধ ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। আসলে চীনের সাথে ভারত এ সমস্যার সামরিক সমাধান করতে পারবে না। তার উচিত সমস্যাটির রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করা। ভারত কখনো চীনের সামরিক শক্তির সমকক্ষ হতে পারবে না। অতি দ্রুত চীন যেমনি অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করছে, তেমনি সামরিক শক্তিও তার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অল্প দিনের মধ্যে চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক শক্তিতে পরিণত হবে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে চীনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে ব্যবহার করছে এবং ভারতকে সামরিক সাহায্য সহায়তা করছে, কিন্তু ভারতে এখনো এক-তৃতীয়াংশ লোক দরিদ্র সীমার নীচে বাস করছে। তাই সামরিক খাতে ব্যয় বাড়ানোতে তার সীমাবদ্ধতা আছে।[১১]

ওদিকে ড্যাম তৈরি হলে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উসকে দেয়া হবে। তখন ভারতের পূর্বাঞ্চল অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যে এ সাত রাজ্যে বহু মুক্তিকামী সংগঠন গড়ে উঠছে। তাকে সামাল দিতে ভারতকে এ অঞ্চলে পাঁচ লক্ষ সৈন্য মোতায়েন রাখতে হচ্ছে এবং তা বেড়েই চলেছে। আসাম, মনিপুর ও মিজোরামের সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবীরাও এ ড্যামের ঘোর বিরোধী। আসামের কৃষক নেতা অখিল গগৈ ঘোষণা করেছেন "রক্ত দেব তবু টিপাইমুখ বাঁধ হতে দেব না।" তিনি আরো বলেন, "টিপাইমুখ বাঁধ তৈরি করলে

---

১০. টিপাইমুখ বাঁধ : ভারতের সামরিক প্রকল্প, আমাদের দেশ, ১ ডিসেম্বর, ২০০৯।
১১. নয়াদিগন্ত, ২৫ জুলাই, ২০১০।

www.pathagar.com

ধ্বংস হয়ে যাবে আসামের বরাক উপাত্যাকা যা কখনই হতে দেব না।"[১২] কাজেই টিপাইমুখ এলাকার লোকদের সাথে বাংলাদেশের জনগণের টিপাইমুখ বাঁধ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করার এখনই সময়। ইতিমধ্যে সিলেটের জনগণ এ বাঁধের বিরুদ্ধে ফুশে উঠেছে। তারা সারা সিলেট এলাকায় এ বাঁধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা আন্দোলন, সেমিনার, গণ যোগাযোগ শুরু করেছে। ঢাকার সচেতন নাগরিকরাও বসে নেই। তারা এ ব্যাপারে মহাজোট সরকারের নীরবতাকে ধিক্কার দিচ্ছে। বাংলাদেশের এ দাবী থেকে পিছিয়ে আসার কোন সুযোগ নেই। এ বাঁধ হলে বৃহত্তর সিলেট, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ এলাকার লোক মরুকরণে পতিত হবে। প্রায় ৪ কোটি লোক খাদ্য নিরাপত্তা হারাবে। কাজেই ভারতের এ ধরনের অঘোষিত যুদ্ধে আমরা আত্মাহুতি দিতে পারি না। বর্তমান মহাজোট সরকারের ভ্রান্তনীতির জন্য আজ বাংলাদেশের রাজনীতি অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে। তার সরকার আদৌ দেশের স্বার্থে কোন কাজ করবে কিনা তা তাদের বিগত আড়াই বছরের কর্মকান্ডে মানুষ সন্দিহান। তারা ভারতকে ফ্রি ট্রানজিট দিচ্ছে, সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করতে দিচ্ছে, সমুদ্র এলাকা ভারতের দখলে চলে যাচ্ছে, নৌ-রুট বিনা শুল্কে ব্যবহার করতে দিচ্ছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ভারতের কব্জায়। তদসত্ত্বেও ভারত সরকার বাংলাদেশকে পানিতে শুকিয়ে মারার চক্রান্ত করে যাচ্ছে। ভারতের বিখ্যাত বাংলাপত্রিকা আনন্দবাজার যা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় তাতে প্রতিবেদন বের হয়েছে- "বর্তমান সরকারের জনপ্রিয়তার পারদ নিম্নমুখী এবং নির্ভরতা বাড়ছে ভারতের ওপর। ক্ষমতার আড়াই বছর পার না হতেই মহাজোট সরকারের জনপ্রিয়তার পারদ নিম্নমুখী, এটা সবাই স্বীকার করেন। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সরকার ভারতের ওপর আরো নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। মসৃণতার ঠিক উল্টো পথে হাঁটছে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক জীবন। সেখানে ভরপুর খানাখন্দক, যা হরতালে আরো স্পষ্ট।"[১৩] এছাড়া শেখ হাসিনাকে ভয় দেখাবার ফন্দিতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী মনমোহন সিং জুলাই-২০১১ মাসের প্রথম দিকে দিল্লীতে সম্পাদকদের সাথে আলোচনার সময় বলেছেন "বাংলাদেশের সরকারের পতন যে কোন সময় হতে পারে। সেখানে উগ্রপন্থী জামায়াতে ইসলামীকে শতকরা ২৫ ভাগ লোক সমর্থন করে অর্থাৎ তারা ভারত বিরোধী।" এর আসল উদ্দেশ্য হতে পারে হাসিনা ভয় পেয়ে তার রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড দিল্লীর সাউথ ব্লোকের পরামর্শ মত যেন চালায়।

এহেন অবস্থায় এ সরকারের কাছে টিপাইমুখ বাঁধের ব্যাপারে জোরালো কোন প্রতিবাদ আশা করা যায় না। হাসিনা ফারাক্কা বাঁধের ব্যাপারে ৩০ বছরের যে পানি চুক্তি

---

১২. আমার দেশ, ৯ জুলাই, ২০১১।

১৩. আনন্দবাজার, কলকাতা, ৬ জুলাই, ২০১১।

www.pathagar.com

করেছে তাতে কোন গ্রান্টি ক্লোজ না থাকায় আমরা আমাদের ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছিনা। শুষ্ক মৌসুমে ভারত তেমন পানিই দিচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে সেপ্টেম্বরে মনমোহন সিং যখন ঢাকায় রাষ্ট্রীয় সফরে আসবেন তখন তিস্তা ব্যারাজের খন্ডকালিন চুক্তি হবে। কথা হলো চুক্তি করে তা কার্যকরী না করলে সে চুক্তিতে বাংলাদেশ শুধুই ধোকাবাজীতে পড়বে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আজ পর্যন্ত ভারত যে সামান্য কয়টি চুক্তি করেছে তার একটাও তারা কার্যকরী করে নি। তারা বেরুবাড়ী নিয়েছে- তিন বিঘা করিডোর আজ পর্যন্ত দেয় নাই, ফারাক্কা চুক্তি করেও পানি দিচ্ছে না, তালপট্টি জবর দখল করে আছে, আমাদের সমূদসীমা ২৯০০০ বর্গ কিলোমিটার দখল করে নিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশীদের নির্বিচারে পাখির মত গুলি করে হত্যা করছে, সীমান্তের বিরোধপূর্ণ এলাকার ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে, সীমান্ত জরীপের নামে আমাদের ভূমি ভারতের ইচ্ছামত তাদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে, কাটা তারের বেড়া দিচ্ছে।[১৪] এই কি ভারতের বন্ধুত্বের নমুনা? আর হাসিনা সেই বন্ধুত্বের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ ধরনের অসম বন্ধুত্ব কারো কাম্য নয়। এ কারণেই বাংলাদেশীরা ভারত বিদ্বেষী। ভারত পানি নিয়ে এ ধরনের বৈরী আচরণ করছে বাংলাদেশের সাথে।

ব্রহ্মপুত্র নদের পানি প্রত্যাহারে চীনের নতুন প্রকল্প ঃ

ওদিকে ব্রহ্মপুত্র নদী প্রবাহিত পুরো অববাহিকা আজ আরেক মারাত্মক সমস্যায় পড়তে যাচ্ছে। বাংলায় একটা প্রবাদ বাক্য আছে 'নেপো মারে দই'। ব্রহ্মপুত্রের পানি নিয়ে আজকে সে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ভারত এক তরফাভাবে ব্রহ্মপুত্র নদীর পুরো পানি তার আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পে প্রবাহিত করার পরিকল্পনা পাকা-পোক্ত করে ফেলেছে। আর এতে বাংলাদেশে পানির অভাবে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে তা নিয়ে ভারতের সাথে বহু দিন থেকে দেন-দরবার করে আসছে। ভারত তাতে মোটেই কান দিচ্ছে না। কিন্তু বর্তমানে ভারতও ব্রহ্মপুত্রের পানি পাবে কি না তা অনিশ্চিত। ইতিমধ্যে চীন ঘোষণা দিয়েছে যে তারা তিব্বতের মানোস সরবর থেকে উৎপত্তি ব্রহ্মপুত্র নদের নিম্নে ইয়ারলুং সাংপো নদীতে বিরাট ড্যাম নির্মাণ করবে। তাদের উদ্দেশ্য এই ড্যামের দ্বারা ৬০ হাজার মেগাওয়াট জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তার দ্রুত বিকশিত অর্থনীতির চাকা সচল রাখবে। চীনের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের খড়া পীড়িত অঞ্চলে এই ব্রহ্মপুত্রের পানি সরবরাহ করে সেখানে জল-সেচ করে কৃষির উন্নয়ন সাধন করা এবং মানুষও প্রাণীর সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা। ব্রহ্মপুত্রের ওপর সে জংমু বাঁধের কাজ চীন শুরু করেছে। এই বাঁধের দ্বারা ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ পরিবর্তন করে খরাকবলিত জিনজিয়াং অঞ্চলে পুরো পানি নিয়ে যাবে। তাই ভাটি অঞ্চলে ভারত ও বাংলাদেশ ব্রহ্মপুত্রের কোন পানিই

---

১৪. ব্লাক হোলের দিকে ধাবিত বাংলাদেশ, আমার দেশ, ১৫ই অকটোবর, ২০১০।

www.pathagar.com

পাবে না।[১৫] চীনের এ প্রকল্প শেষ হলে ভারতের ফারাক্কা, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, আমাদের তিস্তা বাঁধ সব প্রকল্প ভেস্তে যাবে। ইতিমধ্যে ভারত এতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

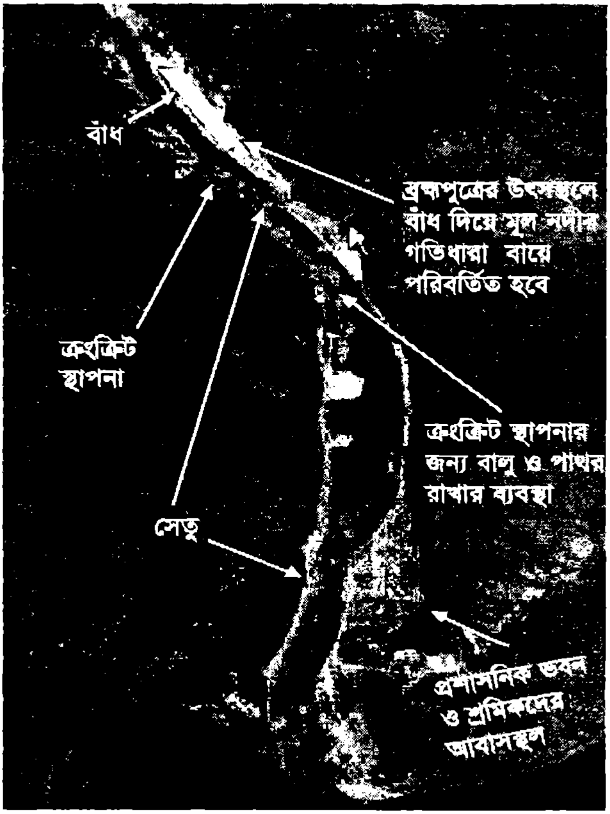

চীন-ভারতের সাথে বাংলাদেশের কূটনীতি ঃ

ভারতের সাথে চীনের যে বিরূপ সম্পর্ক বিরাজ করছে তাতে ভারতের কোন কথায় চীন কান দেবে বলে মনে হয় না। চীনের তীব্বত দখলকে ভারত বক্রদৃষ্টিতে দেখে আসছে এবং তিব্বতের ধর্মগুরু ও নেতা দালাইলামাকে ভারত আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে। চীন এটা মেনে নিতে পারে নি। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের পরে এখনো সীমান্তে যুদ্ধাবস্থা

১৫. নয়াদিগন্ত, ৩০শে জুন, ২০১০, প্রবন্ধকারের 'নেপোমারে দই'-এ বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

বিরাজ করছে। চীন ভারতের অরুনাচল প্রদেশকে তিব্বতের অবিচ্ছেদ্ধ অংশ বলে মনে করে। ছোট দেশ হলেও বাংলাদেশ ব্রহ্মপুত্র নদী সংক্রান্ত ব্যাপারে চীন-ভারতের মধ্যে দূতিয়ালী করতে পারে, যদি মহাজোট সরকার ভারত ঘেষা নীতি পরিহার করতে পারে। সত্তুরের দশকে ভারত যখন বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে কোণ ঠাসা করতে শুরু করলো, তখন দূরদর্শী ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চীনের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে শুরু করেন। চীন সরকারও তা সাদরে গ্রহণ করে বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়ন ও সামরিক বাহিনীকে পূর্ণগঠনে যথেষ্ট সাহায্য করে আসছে। চীনের নিজস্ব অর্থেও কারিগরী সহায়তায় বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি বড় ব্রীজ তৈরি করে দেয়। জিয়াউর রহমানের সময় উভয় দেশের কুটনৈতিক সম্পর্ক অত্যন্ত হৃদ্ধতাপূর্ণ ছিলো। চারদলীয় জোট সরকারও জিয়াউর রহমানের অনুসৃত নীতি অনুসরণ করে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি পূর্বমুখী করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে সে ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্র নীতি পরিহার করে অতিরিক্ত ভারত মুখী হয়ে পড়ে। চীন থেকে সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় বন্ধ করে দেয়। এতে চীন বাংলাদেশের ওপর নাখোশ হয়। যাইহোক আড়াই বছরের শাসন আমলে বর্তমান সরকারের হয়তো বোঁধদয় হয়েছে যে ভারত শুধু নিতে জানে দিতে জানে না। তাই তারা চীনের সাথে আবার যোগাযোগ বৃদ্ধি করেন। এতে চীন সন্তুষ্ট। এখন তারা আমাদের গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ ও মায়ানমার হয়ে চীনের দক্ষিণাঞ্চল কুমিংটাং এর সাথে সড়ক ও বিমান যোগাযোগের প্রস্তাব দিয়েছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ সাহস করে ব্রহ্মপুত্র নদের ব্যাপারে দূতিয়ালী করার একটা সুযোগ নিতে পারে। তবে তার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ঢেলে সাজাতে হবে। জিয়াউর রহমানের আমলে প্রফেসর শামসুল হক সাহেব যে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সার্ক গঠন, গংগার পানি চুক্তি ও ইরান-ইরাক যুদ্ধের ক্ষেত্রে নমনীয়তা আনতে সক্ষম হয়েছেন, আমাদের সে রকম একজন দক্ষ ও বুদ্ধিদীপ্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দরকার। তখনকার পররাষ্ট্র নীতি কার্যকর করার জন্য জিয়াউর রহমানের মত একজন রাষ্ট্র নায়ক ছিলেন। মহাজোট সরকারের উচিত চীনের সাথে আরো গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা। তা হলে তারা চীনকে বলতে পারবেন যে ব্রহ্মপুত্র নদের পানির ওপর তার অববাহিকার ৩.৬ লক্ষ বর্গকিলোমিটারে বসবাস রত প্রায় ১৫০ কোটি লোকের ভাগ্য নির্ভরশীল। চীনের ঐতিহ্যগত স্বভাব হলো তারা একরোখা নয়। তাদেরকে বোঝাতে পারলে সে প্রস্তাবে সায় দেয়। ব্রহ্মপুত্রের পানির ওপর বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও চীনের অধিকার আছে। তাই এর পানি সমতার ভিত্তিতে সবাই ব্যবহার করলে এই ১৫০ কোটি অভাবী জনগণ উপকৃত হবে।[১৬] সারা বিশ্বে এরকম বহু প্রকল্প আছে যাতে আন্তর্জাতিক নদী যে সব দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে যৌথভাবে সে নদীর

১৬. নয়াদিগন্ত, নেপোমারে দই, প্রবন্ধকার, ৩০শে জুন, ২০১০।

www.pathagar.com

অববাহিকার উন্নতি করে তারা সবাই উপকৃত হয়েছে। হালে মেকং নদীর পানি কম্পুচিয়া-কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড ব্যবহার করছে। জাতিসংঘের সহায়তায় মেকং নদী পরিচালনা কমিশন এটা চালাচ্ছে। চীন বিরাট দেশ- তার মনও উদার [ভারতের মত কুটিল মনা নয়]। আশা করা যায় তারা এতে সায় দেবে। তবে এর জন্য ভারতকে চীনের সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে সমঝোতায় আসতে হবে। ব্রহ্মপুত্র নদীর পানির একটা সম্মানজনক সমাধান করতে পারলে, তখন টিপাইমুখ বাঁধের ব্যাপারেও ভারত একটা সমাধানে আসতে বাঁধ্য হবে। চীনের সাথে ব্রহ্মপুত্র নদের পানির একটি সম্মানজনক সমাধানে বাংলাদেশ ভূমিকা রাখতে পারলে, ভারত তার কৃতজ্ঞতা জানাতে টিপাইমুখ ড্যাম নির্মাণে অবশ্যই বাংলাদেশের কথা মাথায় রাখবে। ড্যাম করলেও আমাদের পানির ন্যায্য হিস্যা দিয়েই তা করতে হবে। ভারতের কূটচাল ছেড়ে বিশ্ব-পরিস্থিতিকে বিবেচনা করে তাকেও চলতে হবে। মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের মত বড় দেশও প্রতিবেশীদেরকে অনেক ছাড় দিয়ে চলে। মেক্সিকোকে পানামা খালের ব্যাপারে সমঝোতার ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক ছাড় দিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারত তার প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রের সাথেই সুসম্পর্ক গড়ে তোলতে পারে নি। শ্রীলংকায় এলটিটিকে লেলিয়ে দিয়ে দেশটির সার্বভৌমত্বে হুমকীর সৃষ্টি করেছিলো। ভুটানকে করদরাজ্য হিসেবে ব্যবহার করছে। নেপাল বিশ্বের একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র হলেও তার অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে ভারতের আগ্রাসন চলছেই। পাকিস্তানের সাথে স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকেই বৈরী আচরণ করে আসছে। ইতিমধ্যে ৩ টি বড় ধরনের যুদ্ধে পাকিস্তানের সাথে লিপ্ত হয়। আর বাংলাদেশকে রাজনৈতিকভাবে গ্রাস না করলেও অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ভাবে আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। আর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে তার চাহিদাগুলো সহজেই পূরণ হয়। এ সব করে প্রতিবেশীদের মন জয় করা যায় না। ভারত বিরাট দেশ, তার অর্থনীতিও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সেখানে দরিদ্র লোকের সংখ্যাও কম নয়। এক প্রতিবেদনে দেখা যায় ভারতে ৪৫ কোটি লোক দরিদ্র সীমার নীচে বাস করছে। বিরাট দেশ হিসেবে তার অন্তরটাই বড় হবে এ প্রত্যাশা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর। চানক্য নীতির শেষ পরিণতি কোনদিন ভাল হয় না।[১৭]

বাংলাদেশের সাথে যে ৫৩ টি অভিন্ন নদী আছে, তার পানি বন্টন চুক্তি সমতার ভিত্তিতে করতে হবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৭৪ সালে যৌথ নদী কমিশন নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার কোন তৎপরতা নেই। বাংলাদেশ পানি সংক্রান্ত যে কোন প্রস্তাব দিক না কেন তার বাস্তব সম্মত সমাধানের দিকে অগ্রসর না হয়ে শুধু কুট চাল ভারত চালাতে থাকে এবং অহেতুক অপ্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত দাবী করে যাচ্ছে। ফলে ভারত একটা নদীর ব্যাপারেও আজ পর্যন্ত সমাধানে আসতে পারে নি। ভারতের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন না হলে কোন নদীর পানির হিস্যার কোন সমাধান

---

১৭. আমার দেশ, মাহমুদুর রহমান, ২৫ জুলাই, ২০১১।

www.pathagar.com

হবে না। শুধু টিপাইমুখ বাঁধই যে বাংলাদেশের ক্ষতি করবে তা কিন্তু নয়। পূরো ব্রহ্মপুত্র নদীর অববাহিকা [৩.৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার] এলাকার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করছে এ অঞ্চলের পানি সমস্যা ও পরিবেশ সমস্যার। সমাধানের পথ একমাত্র ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল। সে কাজ ভারত কোন দিন একা করতে পারবে না। এর জন্য চীনকে অবশ্যই সম্পৃক্ত করতে হবে। তার জন্য বাংলাদেশকে গঠনমূলক সমাধান নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। পানি বিশেষজ্ঞ, পরিবেশবিদ, অর্থনীতিবিদ ও প্রকৌশলীদের নিয়ে একটি আঞ্চলিক ফোরাম গড়ে তুলতে হবে। তাতে চীন, ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটানের বিশেষজ্ঞরা যুক্ত থাকবেন। বাংলাদেশ এ রকম একটা উদ্যোগ নিতে পারে। ব্রহ্মপুত্রের পানির হিস্যা চীনকেও দিতে হবে। অন্যথা নিম্নাঞ্চলের দেশ নেপাল, ভুটান, ভারত ও বাংলাদেশের ভাগ্যে দুর্দিন আছে। কারণ চীন ব্রহ্মপুত্রের সব পানি প্রত্যাহার করে তার খরাপীড়িত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে নিয়ে গেলে ব্রহ্মপুত্র নদের ভাটি অঞ্চলে আর পানি থাকে না। "বাঁচও বাঁচতে দাও" এটি চিরায়ত নীতিকে চীন ভারত উভয়কে সম্মান দেখাতে হবে। মনিপুর, আসাম, ত্রিপুরা ও প্রতিবেশী বাংলাদেশে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও পরিবেশবাদী সংস্থা এবং টিপাইমুখ বাঁধের ফলে যে সব লোক ক্ষতিগ্রস্থ হবে তারা প্রকল্পের বিরোধীতা করলেও কেন্দ্রিয় ও আসামের রাজ্য সরকার সরকারীভাবে ঘোষণা করেছে যে টিপাইমুখে বরাক নদীতে প্রস্তাবিত জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবেই। নর্থ-ইস্টার্ণ ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান প্রেমচাদ পংকজ হালে সরকারী এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি জানান প্রস্তাবিত ১৫শ' মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম টিপাইমুখ প্রকল্পের কাজ যথারীতি এগিয়ে চলছে। নতুন নতুন প্রকল্প ঘোষণার পাশাপাশি নির্মীয়মান প্রকল্পগুলোর কাজ অনতিবিলম্বে সম্পূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর আসাম সরকার।[১৮] তাই ভারতের প্রধান মন্ত্রী মনমোহন সিং বাংলাদেশকে যে আশ্বাসবাণী শোনাচ্ছেন- তা শুধু কথার ফানুস ছাড়া আর কিছু নয়। এ প্রকল্প থেকে ভারত শুধু ১৫শ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনই করবে তা নয়, টিপাইমুখের উজানে সুবর্ণ-শিবির কুলের তলায় একটি ব্যারাজ নির্মাণেরও পরিকল্পনা ভারতের আছে।

বাংলাদেশের উজানে প্রধান তিনটি অববাহিকার নদী [গংগা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা] নিয়ে চীন ও ভারতের বহুমুখী পরিকল্পনায় বাংলাদেশ হবে বলির পাঠা। এতে বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রকৃতি ও খাদ্য নিরাপত্তার ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। ইতিমধ্যে ভারত ফারাক্কা ব্যারাজ দিয়ে গংগা নদীর পানি প্রত্যাহার করে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তারাঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত করছে এবং আরো এক মরণ ফাঁদ গজলডোবায় তিস্তা নদীতে বাঁধ দিয়ে আমাদের তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প অকার্যকর করে রাখছে। তার ওপর এখন তারা টিপাইমুখে বাঁধ দিয়ে দেশের পূর্বাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলকে

১৮. আমার দেশ, ২৭ জুন, ২০১১।

www.pathagar.com

মরুভূমিতে পরিণত করার চক্রান্তে মেতে উঠেছে। কাজেই টিপাইমুখ ড্যাম আমাদের জন্য আরেক মরণ ফাঁদ রূপে দেখা দেবে। বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির যে অপতৎপরতা চালাচ্ছে ভারত তা উভয় দেশের জনগণ, পরিবেশবিদ ও বিশেষজ্ঞদের যৌথ প্রচেষ্টায় বন্ধ করতে হবে। তাতেও যদি ভারত টিপাইমুখ ড্যামের নির্মাণ কাজ বন্ধ না করে তখন আমাদেরকে জাতিসংঘ, আন্ত র্জাতিক ফোরাম ও আন্তর্জাতিক আদালতে আমাদের বাঁচার ন্যায্য দাবী তুলে ধরতে হবে। তার জন্য এখন থেকে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। বরাক নদী ও বাংলাদেশের কুশিয়ারা ও সুরমা নদীর বিস্তারিত হাইড্রোলিক স্টাডী, পরিবেশের ক্ষতিকর দিকগুলো পরীক্ষার মাধ্যমে চার্ট, ম্যাপ ও গাণিতিক বিশ্লেষণ তুলে ধরতে হবে। এতে করে বিশ্ব বিবেকও জাগ্রত হবে এবং আমাদের ন্যায্য দাবীর প্রতি সমর্থন দেবে। গায়ের জোরে যে সব কিছু হয় না তা ভারতকেও মানতে হবে।

সরকার ও বিরোধী দলের অবস্থান :

দেরীতে হলেও বর্তমান প্রধান মন্ত্রী বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। তিনি বিষয়টি নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে মিশরে ন্যাম সম্মেলনের ফাঁকে আলাপ করেছেন বলে পত্রিকায় প্রকাশ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার প্রথাগত কথা কপচিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বললেন যে- ভারত এমন কোন কাজ করবে না যাতে বাংলাদেশের কোন ক্ষতি হয়। আমার মনে হয় তিনি মনমোহন সিংয়ের আশ্বাসবাণীতে পুরোপুরী সন্তুষ্ট হতে পারেন নাই। ন্যাম সম্মেলন থেকে ফিরে এসে এক সভায় প্রধান মন্ত্রী বলছেন 'টিপাইমুখ বাঁধ জাতীর ইস্যু, এটাকে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হলে আমাদের বিরোধের সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র তাদের স্বার্থ উদ্ধার করবে। তাই আসুন আমরা সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এই জাতীয় ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ হই। সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকলে আমাদের জাতীয় স্বার্থ উদ্ধার করতে পারবো।'

ওদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী একই দিন শেরাটন হোটেলের উইন্টার গার্ডেনে টিপাইমুখ বাঁধ সম্পর্কে তাদের অবস্থান জনগণকে জানানোর জন্য এক সভা ডাকেন। তাতে দেশের বুদ্ধিজীবী, প্রকৌশলী, পরিবেশবিদ, পানি বিশেষজ্ঞ, আইনবিদ, সাংবাদিক এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের এক জনাকীর্ণ সম্মেলনে বলেন "টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধে এক যোগে প্রতিবাদ করার জন্য সরকার সহ সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। সরকারকে জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। মাথা নোয়াবার প্রয়োজন নেই। ভয় পাবেন না। আপনারা একা নন। জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখতে আমরা আপনাদের পাশে থাকবো।'

দুই নেত্রীর ওই বক্তব্যে এটা স্পষ্ট, উভয়েই জাতীয় স্বার্থকে সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন। এটাই স্বাভাবিক। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে এ নীতিই অনুসরণ করা হয়। বৃটেনের লেবার পার্টি ও কনজারভেটিভ পার্টি জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে থাকে। বৃটেনে সন্ত্রাস দমনে তাদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। আশা করি

www.pathagar.com

দুই নেত্রীর সে বক্তব্যের মাধ্যমে টিপাইমুখ বাঁধের ব্যাপারে তারা ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। ইতিমধ্যে এই ইস্যু নিয়ে পাল্টা পাল্টি বক্তব্য এসেছে। এতে জাতি খানিকটা বিভ্রান্তিতে ছিলো। এখন তারা মিলিত ভাবে টিপাইমুখ বাঁধের বিরুদ্ধে জাতিকে আহ্বান করলে দেশের ১৫ কোটি মানুষ তাদের ডাকে সাড়া দেবে। জাতি চায় উভয় নেত্রী একই প্লাটফর্ম থেকে টিপাইমুখ বাঁধ বাতিলের আহ্বান করুক। দেখবেন ১৫ কোটি মানুষ আপনাদের ডাকে কিরূপ সাড়া দেয়। ১৫ কোটি মানুষের প্রাণের দাবী কোন হেলা ফেলার বিষয় নয়। ভারত যতই শক্তিশালী ও জনবহুল ও বড় দেশ হোক না কেন, তাদের নিজেদের জাতিগত ও অঞ্চলগত অনেক বিভেদ রয়েছে। এই টিপাইমুখ বাঁধের বিরুদ্ধেই মনিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও আসামের জনগণ। তারা এটা ভাল বোঝে যে, এ বাঁধে তাদের লাখ লাখ লোক ঘরছাড়া হবে। হাজার হাজার হেক্টর জমি বন, ফসল আবদ্ধ পানিতে ডুবে যাবে। তাদের প্রকৃতি ও জীব বৈচিত্রের চরম ক্ষতি হবে। সর্বোপরি এ অঞ্চল ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা। ড্যামের পানির স্তর অতি উঁচু হওয়ার কারণে ভয়াবহ ভূমিকম্প যে কোন মুহুর্তে হতে পারে। ড্যাম এলাকা ভঙ্গুর টেকটোকি প্লেটের ওপর অবস্থিত। তাই পানির চাপেও তা বিচ্যুত হতে পারে। ভূমিকম্পের কারণে তো ড্যাম ধ্বসে যেতেই পারে। তাতে ড্যামের ভাটিতে আসাম-মনিপুরের ১০০ কিলোমিটার এলাকা ও বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল হঠাৎ করে ২৫ থেকে ৩০ ফুট পানিতে ডুবে যাবে- জনপদ ও নদী-নালা, হাওড় বাওড়। মানুষজন ও অন্যান্য প্রাণীর আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। তাই বাঁচার জন্য ভারতে পূর্বাঞ্চলের সাত কন্যার জনগণ ও বাংলাদেশের জনগণকে এক প্লাট ফর্মে দাঁড়িয়ে এ বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে গণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

উজান থেকে পানি না আসলে তা বাংলাদেশের জন্য জীবন-মরণ সমস্যা হবে। আজকে বিশ্বে একটি কথাই আলোচিত হচ্ছে যে বিশ্বে যদি ৩য় বিশ্ব-যুদ্ধ শুরু হয়, তবে তা হবে পানির জন্য। পানি ছাড়া বিশ্বের যে কোন দেশই অচল হয়ে যাবে। বিশ্বে অফুরন্ত পানি থাকলেও সুপেয় পানির বড়ই অভাব। বিশ্বের মোট অঞ্চলের পাঁচ ভাগের চার ভাগই পানি। কিন্তু সে পানির ৯৭ ভাগই সমুদ্রের লোনা পানি যা ব্যবহার অযোগ্য। আর ২ ভাগ হলো বরফাবৃত। মাত্র ১ ভাগ পানি ব্যবহার যোগ্য। সে ১ ভাগ পানিও সব মানুষ সমতার ভিত্তিতে পাচ্ছে না। দেশে দেশে পানি আগ্রাসন শুরু হয়ে গেছে।[১৯] তাই অভিজ্ঞ মহল আশংকা করছে পানি নিয়ে বিশ্বে মারাত্মক বিবাদ দেখা দেবে। চীন যদি একা ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি গ্রাস করে, তবে ভারত বসে থাকবে না। গংগা নদীর উৎপত্তিস্থান গংগোত্রী (যা ভারতে অবস্থিত) থেকে প্রবাহিত হয়ে তিব্বতের অংশ বিশেষের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। গংগোত্রীতে ভারত ড্যাম দিয়ে গংগার পানি ভারতের উত্তরাঞ্চলে প্রবাহিত করলে তিব্বতের হাওড়া পশ্চিমাঞ্চল পানি শূন্য হবে। এতে করে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা আরো বাড়বে। যে অর্থ দারিদ্র দূর করার জন্য

---

১৯. পানি সংক্রান্ত জাতি সংঘের প্রতিবেদন, ১৯৯৭।

www.pathagar.com

ব্যবহার করা যেত তা তখন সামরিক ও অনুৎপাদনশীল খাতে খরচ হবে। তখন পুরো হিমালয় ও তার আশ-পাশের বিরাট অঞ্চল সমস্যা জর্জরিত হয়ে পড়বে।

ড্যামের প্রাকৃতিক ক্ষতিকর দিক ঃ

আজকে সারা বিশ্বে ড্যামের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছে। ড্যামের দ্বারা প্রাথমিক অবস্থায় যে উপকার-জলসেচ ও জল বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়, পরবর্তীতে এ ড্যামের কারণে স্থানীয় নানা সমস্যা দেখা দেয়। তা প্রাথমিক আয়ের চেয়ে অনেক ক্ষতিকর। স্থানীয় জীব বৈচিত্রের ধ্বংস হয়, এলাকার লোকদের বসতবাড়ী ধ্বংস হয়, বিরাট এলাকা স্থায়ী পানি-বদ্ধ হয়। নিম্নাঞ্চলে পানির অভাব দেখা দেয়। এ সব বিবেচনা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে ৫০০ ড্যাম ভেংগে ফেলছে।[২০] তারা আরো বহু ড্যাম নদী থেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। ইউরোপের বহু জায়গায় ড্যামের বিরুদ্ধে মানুষ স্বোচ্চার হওয়ায় তারাও ড্যাম ভেংগে ফেলছে। স্বয়ং ভারত মধ্য প্রদেশ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, কর্নাটক ও কেরালা ইত্যাদি প্রদেশের সেই আদিকালের ড্যাম ভেংগে দিয়ে অন্য পদ্ধতিতে পানি সেচ ব্যবস্থা চালু করছে। জাপানও তার তৈরি ড্যামগুলো সরিয়ে ফেলছে এর বিরূপ প্রভাবের জন্য। বর্তমানে পৃথিবীর মোট বাঁধের শতকরা ৫৭ ভাগই চীন ও ভারতে। তথাকথিত কৃষি বিপ্লবের জন্যই তারা এটা করেছে। নদীর ওপর আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে কাঠামোগত হস্তক্ষেপ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এখনো অধিক হারে অব্যাহত রয়েছে। চীনের ইয়াংশি নদীর ওপর বাস্তবায়িত হচ্ছে তিন স্তরের প্রকল্প। তবে ইতিমধ্যে প্রকৃতি এর বিরুদ্ধে মারাত্মক প্রতিশোধ নিয়েছে। প্রায় ১০ কোটি লোককে ভাসিয়ে নেয় প্রবল বন্যার পানিতে। নদীর ওপর বাণিজ্যিক দৃষ্টি ভঙ্গির আর একটি বিরাট ব্যয়বহুল প্রকল্প হলো ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পটি [Indian River Linking Project] যা একই সংগে একাধিক নদীর ওপর হস্তক্ষেপ করবে এবং ব্যাপ্তী ও আকারের দিক দিয়ে এটি এ যাবত কালের পৃথিবীর অন্যসব নদী-প্রকল্পকে ছাড়িয়ে যাবে। এটা কার্যকর হলে ব্রহ্মপুত্র ও গংগা নদীদ্বয়ের নিম্নাঞ্চল বাংলাদেশ একেবারে পানিশূন্য হয়ে পড়বে।

ভারতের ধারণা তারা গংগা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর উদ্বৃত্ত পানি তাদের দক্ষিণাঞ্চলের পানি স্বল্প এলাকায় প্রবাহিত করবে। পরিবেশগত বিবেচনায় কোন নদী অববাহিকাকে “পানি উদ্বৃত্ত” অথবা “পানি স্বল্প” হিসেবে আখ্যায়িত করা মারাত্মক ভুল। প্রতিটি নদীই তার উপত্যকায় স্বকীয় প্রাকৃতিক ইকোলজীর জন্ম দেয়। এ অবস্থায় এক নদী থেকে অন্য নদীতে পানি প্রত্যাহার করা হলে উভয় নদীর অববাহিকার ইকোলজীরই দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতি সাধিত হবে।[২১] প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে স্বল্প পানির অঞ্চল গুজরাটে গত বছর প্রবল বন্যা হয়ে গেছে। সে অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণও বেড়ে গেছে।

---

২০. National Geography, March, 1988.

২১. World Commission, Dams Related.

www.pathagar.com

সে অঞ্চলে এক সময় আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাতিল করতে হবে। বরং স্বল্প ব্যয়ে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার লক্ষ্যে জলাধার নির্মাণই হবে প্রাকৃতিক উপায়ে পানি সংরক্ষণ করার উত্তম পদ্ধতি।[২২]

বাঁধ বিষয়ক বিশ্ব-কমিশনের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় প্রকৃতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় অর্থে নির্মিত প্রকল্পগুলো সাধারণত সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। এ সব প্রকল্প প্রায়ই ভুল কৃষি উৎপাদনকে উৎসাহিত করেছে এবং জলাবদ্ধতা ও জমির লবণাক্ততা এবং ভূমি দূষণ করে আসছে।[২৩] এর বড় উদাহরণ বিশ্ব ব্যাংকের প্ররোচনায় বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে বেড়ী বাঁধ। দীর্ঘ মেয়াদে আর্থ-সামাজিক, পরিবেশগত এবং মানবিক ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় নিলে দেখা যাবে যে, বাঁধ দিয়ে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কোন সস্তা ও নির্দোশ প্রক্রিয়া নয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বরং বিভিন্ন বিকল্প উৎসের ব্যবহার অনেক বেশি লাভজনক। এ সব বিকল্প উৎসের মধ্যে রয়েছে পুনঃপৌণিক শক্তির উৎস [Renewable Energy], বায়ু প্রবাহ, বায়োমাস, প্রাকৃতিক গ্যাস, সৌরশক্তি, ও কয়লা ইত্যাদি। সর্বোপরি বিদ্যুৎ ব্যবহারেও সাশ্রয়ী হতে হবে। বাণিজ্য দৃষ্টি ভংগি প্রসৃত বৃহদাকার নদী হস্তক্ষেপ মূলক প্রকল্পগুলো নদীর স্বাভাবিক নাব্য ও মৎস্য সম্পদের প্রভুত ক্ষতি সাধন করে। এর বড় উদাহরণ হলো ফারাক্কা বাঁধ। নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নদী অববাহিকার দেশ বা রাজ্যগুলোর মধ্যে এক অশুভ প্রতিযোগিতা ও মতভেদের সৃষ্টি করে। প্রতিটি দেশ বা রাজ্য তার প্রতিবেশীকে বঞ্চিত করে নদীর পানি যতটা বেশী পরিমাণে নিজ অঞ্চলে প্রবাহের চেষ্টা করে। নদীগুলোর পানি হরনের এই অশুভ প্রতিযোগিতা বস্তুত নদী হননের প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হয়, যা নদী উপত্যাকার বিশেষতঃ নদীর নিম্ন অববাহিকার জনগোষ্ঠীর প্রতি চরম অন্যায়। এর বড় উদাহরণ হলো বাংলাদেশ। এই অভিজ্ঞতা থেকে এখন নদীর প্রতি একটি ভিন্ন প্রাকৃতিক দৃষ্টি ভংগির [Echological Approach] উদ্ভব ঘটেছে। এই নতুন দৃষ্টি ভংগি নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহকে বাঁধাগ্রস্ত না করে নদী সম্পদের টেকসই ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। অতি সামান্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নির্মিত কাপ্তাই বাঁধের কারণে বাংলাদেশকে বিস্তর সামাজিক, রাজনৈতিক, মানবিক এবং পরিবেশগত মূল্য দিতে হয়েছে। কাপ্তাই বাঁধের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের আবাস ভূমির এক বড় অংশ জলমগ্ন হয়ে যায় এবং তা উপজাতিদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। তাদের এই অসন্তোষ ও অন্যান্য কারণে সৃষ্ট সেখানকার সশস্ত্র আন্দোলন বাংলাদেশের অনেক জীবন হানি ও অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়েছে। বদ্বীপ ও প্লাবন ভূমি এলাকার নদীর প্রতি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি অবরোধ পদ্ধতির [Cordon Approach] জন্ম দিয়েছে। জমিকে স্বাভাবিক প্লাবন থেকে বঞ্চিত করায় এসব অঞ্চলের জমি উর্বরতা শক্তি হারাচ্ছে।

---

২২. Indian Echosystem, Dr. Surendra Banarjee, Delhi.

২৩. World Commission, Dams Related.

www.pathagar.com

নদী প্রকৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নদী প্রকৃতির ইকোসিষ্টেমের আদি জনক। প্রতিটি নদী তার অববাহিকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ইকোসিষ্টেমের জন্ম দেয়। প্রাকৃতিক বৈচিত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রতিটি নদী তার অববাহিকায় অবস্থান করে। নদীই সভ্যতার জনক। আদিকাল থেকেই নদীর তীর ঘেঁসে জনবসতি গড়ে ওঠে এবং তার সঙ্গে গড়ে ওঠে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সভ্যতা। নদী তার উপত্যাকায় শত শত বছর ধরে পুরোনো সংস্কৃতিকে লালন করে এসেছে। নদী উপত্যকার জনগোষ্ঠী নদীর পানি, উপত্যকার জমি, বন ও মৎস্য সম্পদের ওপর জীবনধারা গড়ে তোলে। সুতরাং নদী অববাহিকার জনগোষ্ঠীর রয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও অধিকার। নদী সম্পদের ব্যবহার ও সে সম্পর্কে যে কোনো পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও তাদের অধিকার থাকতে হবে।

ভারত সরকার স্থানীয় জনগণের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও টিপাইমুখ ড্যাম নির্মাণের বদ্ধ পরিকর। তার অরুনাচল প্রদেশেও কয়েকটি ছোট ড্যাম নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। কিন্তু সেগুলো মূলতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। চীনকে টেক্কা দেয়াই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু চীনও এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে যে কোন সময় চীনের সাথে ভারতের বিরোধ চরম আকার ধারণ করতে পারে।

সুপারিশমালা

ফারাক্কা ও তিস্তা নদীর মরণোত্তর বাঁধের মত টিপাইমুখ ড্যামও বাংলাদেশের জন্য আরেক মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়াবে। বাংলাদেশ নামের এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রটিকে সার্বিকভাবে পশ্চিম-উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে চিরতরে মরুভূমি করণের দিকে ঠেলে দেবে। এর থেকে বাঁচার জন্য আমাদের নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেয়া জরুরী।

১। সবচেয়ে জরুরী হলো দেশের মধ্যে টিপাইমুখ বাঁধ ইস্যুতে রাজনৈতিক ঐক্য। বর্তমানে সরকার ও বিরোধী দল দুই মেরুতে অবস্থান করছে। ইহা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। সাধারণ মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে ঐক্যের কোন অভাব নেই। কিন্তু রাজনৈতিক ঐক্য না থাকলে প্রতিবেশী বিরাট ও শক্তিধর রাষ্ট্রের নিকট আমাদের ন্যায্য দাবীও স্বীকৃতি পাবে না। তারা একতরফাভাবে টিপাইমুখ বাঁধ দিয়ে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগদখল করবে।

২। দেশের ভিতরে ও বাইরে এ বিষয় জনসচেতনতা সৃষ্টি করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করতে হবে।

৩। ভারত বাংলাদেশের ন্যায্য যুক্তি-তর্ক উপেক্ষা করে যদি একতরফাভাবে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করতেই দৃঢ় হয়, তাহলে বিষয়টি বাংলাদেশকে জাতিসংঘ সাধারণ সভায় তুলতে হবে। সেখানে সুরাহা না হলে বিষয়টি আন্তর্জাতিক আদালতে আমাদের ন্যায্য দাবীসহ সমস্ত তথ্যাদি তুলে ধরতে হবে। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লবিং করতে হবে।

৪। দেশের পররাষ্ট্রনীতিকে ঢেলে সাজাতে হবে। দক্ষ ও আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক দ্বারা পরারাষ্ট্র মন্ত্রণায়লকে সাজাতে হবে। তাদেরকে শতভাগ

www.pathagar.com

দেশের প্রতি আনুগত্যশীল হতে হবে। জাতীয় ইস্যু বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট যৌক্তিকভাবে তুলে ধরার সক্ষমতা থাকতে হবে। তেমনি আন্তর্জাতিক ফোরামে তা তুলে ধরার ব্যাপারে দক্ষ হতে হবে। যেহেতু ভারতের ওপর দিয়ে নদীগুলো (গংগা, যমুনা, মেঘনা) প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে তাই নিম্নাঞ্চলের সার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক বিধিবিধান ফোরামে তুলে ধরতে হবে।

৫। যেহেতু টিপাইমুখ বাঁধের কারণে ভারতের ত্রিপুরা, মনিপুর, মিজোরাম ও বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এ অঞ্চলের জনগণ এ বাঁধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর তাই বাংলাদেশসহ সব অঞ্চলের প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদ, অর্থনীতিবিদ দিয়ে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করতে হবে। তারা এই বাঁধের কারণে বরাক সুরমা কুশিয়ারার অববাহিকার আর্থিক, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক কি ক্ষতি হবে তা নিরূপণ করে ভারত ও বাংলাদেশের মিডিয়ায় প্রকাশ করবে। এতে জন সচেতনতা আরো বাড়বে। আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটি ইতিমধ্যেই একটা উদ্যোগ নিয়েছে।

৬। ফারাক্কা বাঁধের বিপরীতে তখনকার পাকিস্তান সরকার ১৯৬০ সালে গংগা নদীতে গংগাবাঁধ নামে একটি প্রকল্প করার উদ্যোগ নিয়েছিল। যে ব্যারাজ সম্বন্ধে ১৯৭৪ সালে ভেড়ামারায় ভিত্তিপ্রস্তরও করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর আর কোন অগ্রগতি নেই। বাংলাদেশের বিশিষ্ট পানি বিজ্ঞানী জনাব বি.এম. আব্বাস, যমুনা নদীতে ব্রীজ করার যখন চিন্তাভাবনা হচ্ছিলো তখন তিনি ব্রিজের পরিবর্তে যুমনা ব্যারাজ করার জন্য জোড়ালো বক্তব্য তুলে ধরেন। শুধু ব্রিজ না করে ব্যারাজ করলে তাতে বাংলাদেশের বহুমুখী সমস্যার সমাধান হতো। আমাদের মধ্য অঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত পানি সেচের অভাব হতো না। ব্রহ্মপুত্র নদের পানি নিয়ে ভারত চীনের যে কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছে তাতে আমাদের নিজস্ব ব্যারাজ ছাড়া সমস্যার সমাধান দেখা যাচ্ছে না।

৭। সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের পাহাড়ী এলাকায় ছোট ছোট ড্যাম করা যায়। তাতে যে পানি জমা থাকবে তা শুষ্ক মৌসুমে সেচের কাজে ব্যবহার করা যাবে। কিশোরগঞ্জসহ এ অঞ্চলে হাকালুকিসহ বহু হাওড়-বাওড় আছে। তাতে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করলে তাও শুষ্ক মৌসুমে ব্যবহার করা যাবে।

৮। বাংলাদেশেকে বলা হয় নদীমাতৃক দেশ। এখানে নদীগুলো জালের মত ছড়িয়ে আছে। নদীর নাব্যতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত নদীগুলো ড্রেজিং করতে হবে। নদীতে প্রচুর পানি জমা থাকলে সে পানি লোক-লিফ্‌ট পাম্পের দ্বারা বহু এলাকায় পানি সেচ করা যাবে। ভিতরের খালগুলোতেও পানি স্টোর করার পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের খাল খনন স্কিম সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে।

৯। তিব্বত থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত গংগা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার এই বিরাট অববাহিকার পানি সমস্যা নিরাময়ে চীন একটি বড় ফ্যাক্টর। কাজেই পুরো এলাকার পানি ব্যবস্থাপনায় চীন, ভারত, নেপাল, ভূটান ও বাংলাদেশেকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। ভারত একা পানি আগ্রাসন করতে চাইলে তা

www.pathagar.com

কোন দিন সফল হবে না। তীব্বতকে ব্রহ্মপুত্র নদীতে ড্যাম দিয়ে পানি যদি চীন তার মরু অঞ্চল জিনজিয়া অঞ্চলে নিয়ে যায়, তবে নিম্ন অঞ্চলের নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশ আর পানি পাবে না। তাই চীনকে সমঝোতায় বসে এ অঞ্চলের পানির সমস্যা সমাধান করতে হবে।

১০। টিপাইমুখ বাঁধ দিলে ভারতের যে রাজনৈতিক সমস্যায় পড়তে হবে তাকে বাংলাদেশের কর্ণফুলী ড্যাম থেকে শিক্ষা নিতে হবে। কর্ণফুলী ড্যামের কারণে যে সব লোকের ঘর-বাড়ি, জমি-জমা জলমগ্ন হয়ে গেছে তারা বিচ্ছিনতাবাদী কার্যক্রম শুরু করে দেশের এক দশমাংশ এলাকা বিগত তিন যুগ যাবৎ অস্থিতিশীল করে রেখেছে। টিপাইমুখ ড্যাম হলে সেখানেও একই পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। বাংলাদেশকে এ কথাটি ভারতীয় রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারকদের নিকট তুলে ধরতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের প্রায় তিন দিকই ভারত বেষ্টিত। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমানা হলো ২৫৬৬ মাইলের মত। এই সীমানা দিয়ে ভারত থেকে ৫৩টি নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। পূর্বে প্রত্যেকটি নদী তার নিজ অববাহিকা নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে চলে এসেছে। তখন বাংলাদেশের পানির কোন সমস্যা ছিলো না। নদী তার নিজস্ব গতিতে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হতো। কিন্তু পাক ভারত-উপমহাদেশের বিভক্তির পরে ভারত নদীগুলোর ওপর ড্যাম তৈরি করে এক তরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করতে শুরু করে। অন্যত্র নিয়ে জল সেচের মাধ্যমে তার কৃষিতে বিপ্লব আনা শুরু করলে, তখনই প্রতিবেশীদের বিপত্তি দেখা দেয়। ভারতের নিম্নাঞ্চলের দেশ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে এটা প্রকটরূপ ধারণ করলো। পাকিস্তানের চাপে ও বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় সিন্ধু নদে বাঁধ দিয়ে পঞ্চনদীর পানিতে পাকিস্তানের হিস্যা ভারত মেনে নেয়ায় সে দেশের পানির সমস্যার সমাধান হয়েছে। ভারত ফারাক্কায় বাঁধ দিয়ে গংগা নদীর পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে কিন্তু তার বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশের জন্য কিছুই করে নি। যে সব পানি চুক্তি করেছে, সে অনুসারে বিগত ৪০ বছর যাবত ভারত প্রয়োজনীয় পানি দিচ্ছে না। তারা উজানে পানি বিভিন্ন পয়েন্টে (৩০টি) প্রত্যাহার করায় এখন ফারাক্কা পয়েন্ট প্রায় পানি শূন্য। অনুরূপভাবে তিস্তা নদীতে ভারতের গজলডোবায় বাঁধ দিয়ে তিস্তার পানি প্রত্যাহার করায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলও পানি শূন্য হতে যাচ্ছে। ফারাক্কার কারণে জিকে প্রজেক্টের মত তিস্তা প্রকল্প আজ চরম হুমকীর মুখে পড়েছে। এতেও দেশের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা মরুকরণের দিকে ধাবিত হচ্ছে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এত দিন নিরাপদ থাকলেও আজকে ভারত বরাক নদীর ওপর টিপাইমুখ বাঁধ দিয়ে এ অঞ্চলও মরুকরন সহ অন্যান্য ভৌগলিক ও জিওলজিকাল সমস্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ভারতের মতিগতি দেখে মনে হয় তারা এ প্রকল্প থেকে সরে আসবে না। তাদেরকে সরিয়ে আনার জন্য আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করা ছাড়া উপায় নেই। ভারত কোন দিন দ্বি-পাক্ষিক ভাবে এ সমস্যার সমাধানে আসবে না। আমাদের জনগণ ও আসাম-মনিপুরের জনগণের মধ্যে এ বাঁধের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকারকে ভারতের

www.pathagar.com

সেবা-দাস হলে চলবে না। ভারত বিভোর না হয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের উচিত জাতীয় স্বার্থে কাজ করা, তা না হলে তাদেরকে জনগণের রোশে পড়তে হবে। তখন ভারতও তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

এ অঞ্চলের সব চেয়ে টেকসই পানি ব্যবস্থা হবে চীনের সঙ্গে ঐক্যমত্বের ভিত্তিতে গংগা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা বেছিনের পানি সমতার ভিত্তিতে ভাগাভাগি করে নেয়া। এ ব্যাপারে চীনকে উদ্বুদ্ধ করতে বাংলাদেশের একটা ভূমিকা আছে। বাংলাদেশ নিরপেক্ষ থেকে ভারত-চীনের বিরোধ কমিয়ে আনার জন্য দূতিয়ালী করা। ছোট রাষ্ট্র বলে নিজেদের ছোট মনে করার কারণ নেই। চীনের স্বার্থে বালাদেশকেও তার প্রয়োজন আছে। ভারতের উচিত সব কিছু একা ভোগ-দখল করার প্রবণতা পরিহার করে চীনের সাথে একটি ন্যায্য সমাধানে আসা। অহেতুক দালাইলামাকে নিয়ে বিশ্ব রাজনীতি না করে তার থেকে সরে আসলে চীনও তখন ভারতের সাথে সমঝোতায় আসার সম্ভাবনা থাকে। ভারতের তখন টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে এত আগ্রাসী হওয়ার কারণ থাকবে না।

এ দিকে আমাদেরকে চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না। আমাদের সেচ ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য হাওড়-বাওড়, নদী-নালায় প্রচুর বর্ষার পানি ধরে রাখতে হবে। খাল খনন জোরদার করতে হবে। নদীর নাব্যতা রক্ষার জন্য ড্রেজিং করতে হবে ধারাবাহিক ভাবে। সবচেয়ে বড় শক্তি হলো জনগণের শক্তি। এ শক্তিকে যারাই উপেক্ষা করেছে তারাই ধ্বংস হয়ে গেছে। আশা করা যায় সে পরীক্ষার জন্য আর কেউ ও পথে এগোবে না। এক দেশ এক দল করেও দেখা গেছে। কিন্তু তা এক বছরও টিকতে পারে নি। তাই যে কোন সরকারকেই জনগণের স্বার্থ দেখতে হবে আগে। টিপাইমুখ বাঁধ জনগণের স্বার্থের চরম পরিপন্থী। এ বাঁধ হলে মানুষের দুর্ভোগের শেষ থাকবে না। চাষ-বাস বন্ধ হয়ে গেলে মানুষের বাঁচা মরার প্রশ্ন এসে যাবে। তখন দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চরম নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে। এ রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি যাতে না হয়, তার জন্য সরকারকে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যেতে হবে।

তথ্যপঞ্জী ঃ

১। আব্বাস, বি.এস এটি ঃ ফারাক্কা ব্যারেজ ও বাংলাদেশ, ১৯৮০, ঢাকা
২। সচিত্র বাংলাদেশ বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৫, ঢাকা।
৩। হোসন, মোকাররম, বাংলাদেশের নদী, ১৯৯৫, ঢাকা
৪। বাংলা পিডিয়া, বাংলা একাডেমী; ২০০৭, ঢাকা
৫। জসিমউদ্দিন, প্রফেসর, ড.– ভারতের পানি আগ্রাসন ও আন্তর্জাতিক আইন ১৯৯৬, ঢাকা।
৬। Dr. Khan. F. H : Geology of Bangladesh. 1972, Dhaka.
৭। মোঃ শামীম আহসান, আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী ও সম্ভাবনা, মেসার্স কনসার্ন, পিরোজপুর।
৮। প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন : বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ও বিহর্বিশ্ব, ১৯৯৪।

লেখক-পরিচিতি : ইঞ্জিনিয়ার এস.এম. ফজলে আলী, বিশিষ্ট প্রকৌশলী, পানি বিশেষজ্ঞ, পরিবেশবিদ ও কলামিষ্ট। ।

লেখা পরিচিতি : প্রবন্ধটি ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১১ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com